এবং জয়েন উদ্দীনের জ্যেষ্ঠপুত্র মিরজা মোহম্মদকে উত্তরাধিকারী করিবার জন্য তাঁহাকেই পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতিহাসে এই পোষ্যপুত্রের নাম নবাব সিরাজদ্দৌলা। বর্গীর হাঙ্গামায় বঙ্গভূমি যখন নিরতিশয় নির্য্যাতন সহ করিতেছিল, তখন বীরবালক সিরাজদ্দৌলা মাতামহের সঙ্গে অসি হস্তে উড়িষ্যায়, মেদিনীপুরে, বর্দ্ধমানে, বেহারে—নানা স্থানে শত্রুদলনে ছুটিয়া বেড়াইতেছিলেন।* সাহসে, সমরকৌশলে, কূটনীতিতে অথবা অদম্য হৃদয়-বেগে বালক হইয়াও সিরাজদ্দৌলা লোকসমাজে সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কেবল মাতামহের অসঙ্গত স্নেহপ্রবণতায় বাল্যজীবনে প্রবৃত্তি-দমনের শিক্ষা না পাইয়া, তাঁহার তরুণ হৃদয় অশান্ত ঝটিকার ন্যায় তীব্রতেজে সহসা আলোড়িত হইয়া উঠিত।

সিরাজদ্দৌলার প্রতি আলিবর্দ্দীর আন্তরিক অনুরাগ দেখিয়া, আলিবর্দ্দীর কন্যা বা জামাতাদিগের মধ্যে কেহই আনন্দলাভ করেন নাই। নওয়াজেস এবং সাইয়েদ আহম্মদ একরূপ প্রকাশ্যভাবেই প্রতিদ্বন্দী হইবার ভয়প্রদর্শন করিতেন। সুতরাং যে সময়ে বহিঃশত্রুর প্রবল প্রতাপে বঙ্গভূমি কম্পিত-কলেবরে বর্ষাযাপন করিত, সেই সময়ে রাজধানীতে বসিয়া পাত্রমিত্রগণ এবং প্রধান প্রধান জমিদারদল, কে কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিবেন, তাহার জন্য নানারূপ কলকৌশল বিস্তার করিতেন। রাণী ভবানী এই গৃহকলহে কোন পক্ষেই যোগদান না করিয়া, নিপুণভাবে রাজ্যরক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন।

উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি।

দীর্ঘতমা সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ ইতিপূর্ব্বে "সাহিত্যে" প্রকাশিত হইয়াছে। †

---

* Mutakherin.

† সাহিত্য; ৭ম ভাগ ৫ম। ৬ষ্ঠ সংখ্যা এবং ৮ম ভাগ ২য় সংখ্যা। এই শেষ সংখ্যার প্রবন্ধে অনেকগুলি ছাপার ভুল প্রবিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি ভ্রম অর্থগ্রহণপক্ষে ব্যাঘাত উৎপাদন করে বলিয়া নিম্নে সংশোধিত হইল :—

পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ পাঠ	শুদ্ধ পাঠ।
৭৪	২	পৌরব	কৌরব
"	৪	পৌরবেরা	কৌরবেরা
"	২৬	পুরুবংশে	কুরুবংশে
৭৮	২১	১০।১৫ বৎ	১০।১৫ বৎসর

অধিকন্তু যে ঋষির প্রকৃত নাম বসিষ্ঠ, তাহা বশিষ্ঠ বলিয়া অশুদ্ধ ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে।

তাহাতে প্রথম প্রবন্ধে ঋষির জীবনবৃত্তান্তঘটিত দুই একটি কথার উল্লেখ করিয়াছি; দ্বিতীয় প্রবন্ধে তাঁহার আবির্ভাবকাল ও জন্মস্থান সম্বন্ধে বিচার করিয়াছি। পাঠকবৃন্দের স্মরণ হইবে, এই বিচার অনুসারে ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দপূর্ব্ব বৎসরে উক্ত ঋষি বিদ্যমান ছিলেন, সিদ্ধান্ত হইয়াছে। ইহা একটি স্থূল সিদ্ধান্ত; দশ বৎসর এদিক ওদিক হইতে পারে। সহজে স্মরণ রাখিবার জন্য অতঃপর খ্রীষ্টাব্দপূর্ব্ব ১৭০০ বৎসরকে দীর্ঘতমার আবির্ভাবকাল বলিয়া ধরা যাইবে।

প্রাচীন ইতিহাসে দীর্ঘতমার স্থান।

কেবল খ্রীষ্টাব্দপূর্ব্ব ১৭০০ বৎসরে দীর্ঘতমা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এই কথায় ইতিহাসে দীর্ঘতমার স্থান পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় না। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে আমরা এই সমালোচনা করিতেছি; অতএব বর্ত্তমান সময়ের ৩৫৯৭ বৎসর পূর্ব্বে ঋষি দীর্ঘতমা জীবিত ছিলেন। কিন্তু আমাদের ইতিহাসের প্রারম্ভ কোথায়?

যে বিশাল বেদশাস্ত্রের একটি কোণে দীর্ঘতমা নিদ্রিত রহিয়াছেন, তাহা কোন্ সময়ে রচিত হইতে আরম্ভ হয়, এবং তাঁহার এদিকে ওদিকে আরও যে বহুসংখ্যক ঋষি তাঁহার ন্যায় নিদ্রামগ্ন, তাঁহারাই বা কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন? যখন দীর্ঘতমা জীবিত ছিলেন, তখনও ভারতবর্ষের 'ভারতবর্ষ' নাম হয় নাই। তিনি যে চক্রবর্ত্তী রাজাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেই শকুন্তলাপুত্র ভরত আমাদের আদিম ঐতিহাসিক রাজা নহেন। ভরতের পূর্ব্বপুরুষেরা কোথায় পূর্ব্বে বসবাস করিতেন, কোন্ সময়ে এ দেশে প্রবিষ্ট হয়েন, এবং সাম্রাজ্যের সূত্রপাত করেন, তাহা না জানিলে, ভরত রাজা এবং তাঁহার রাজসভার প্রধান ঋষি দীর্ঘতমার ইতিহাস সম্যক্ বোধগম্য হইতে পারে না। এজন্য প্রাচীন ইতিহাসে দীর্ঘতমার স্থাননিরূপণ করা আবশ্যক।

অতি প্রাচীনকালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা, পৃথিবীর যে অংশের সহিত তাঁহাদের পরিচয় জন্মিয়াছিল, তাহাকে জম্বুদ্বীপ বলিতেন। তাঁহারা অনুমান

জম্বুদ্বীপ।

করিয়াছিলেন যে, জম্বুদ্বীপ চারি দিকেই লবণসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। বাস্তবিক ভারতবর্ষের তিন দিকেই লবণসমুদ্র, ইহা নিশ্চয়ই তাঁহারা দেখিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া গেলে, বহুদূরে যে মহাসমুদ্র দৃষ্ট হয়, তাহার সহিত তাঁহাদের পরিচয় ছিল কি না, নিশ্চয় বলা যায় না। জনরবে হয় ত তাঁহারা শুনিয়াছিলেন, উত্তরেও সুদূরে লবণসমুদ্র আছে। ফলতঃ, জম্বুদ্বীপের সীমা ও আয়তন অধিকাংশই কাল্পনিক

ভারতবর্ষকে তাঁহারা জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণনা করিতেন ; ভারতবর্ষের সহিতই তাঁহাদের উত্তরকালে সম্যক্ পরিচয় হইয়াছিল। ভারতবর্ষেরই বিবরণ তাঁহারা যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পক্ষান্তরে, জম্বুদ্বীপের কথা প্রায়ই কাল্পনিক। জম্বুদ্বীপের বহির্দ্দেশে দধিসমুদ্র, ক্ষীরসমুদ্র ইত্যাদি নিরবচ্ছিন্নকল্পনামূলক সমুদ্রবেষ্টিত অন্যান্য ছয়টি দ্বীপের কথা শুনা যায়, এবং পৃথিবী এইরূপে সপ্তদ্বীপা বলিয়া কল্পিত হয়েন। চিন্তাশীল পাঠকমাত্রেরই কৌতূহল জন্মিবে যে, এরূপ একটা কাল্পনিক জম্বুদ্বীপের কথা আমাদের সমাজে কেন সমীচীন বলিয়া একদা পরিগৃহীত হইয়াছিল ? বাস্তবিক কি কোনও জম্বুদ্বীপ ছিল না ? তবে অসংখ্য লোকে বহুকাল ধরিয়া জম্বুদ্বীপের কথায় বিশ্বাস করিত কেন ? জম্বুদ্বীপকল্পনার উৎপত্তিই বা কিরূপে হইল ?

জম্বুদ্বীপ অধিকাংশই কল্পনা ; কিন্তু যে সত্য হইতে এই কল্পনার উদ্ভব, তাহার নাম জম্বুখণ্ড। এই জম্বুখণ্ড একটি যথার্থ ঐতিহাসিক নাম। পৃথিবীর একটি স্থান বাস্তবিকই একদা জম্বুখণ্ড নামে বিখ্যাত ছিল। তদ্দেশবাসিগণ বাস্তবিকই তাহাকে 'জম্বু'-দেশ বলিত। যেমন ইয়োরোপের তুর্কি এক সময়ে রোম না হইয়াও রোমানগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া রোম নামে বিখ্যাত হইয়াছিল, তেমনি জম্বুর আর্য্যেরা ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইলে, ইহাও জম্বু নামে বিখ্যাত হয়। দীর্ঘতমার সময়ে তৎকালীন ভারতবর্ষ এইরূপে 'জম্বু' নাম লাভ করে। কিন্তু আদিম জম্বুখণ্ড ভারতবর্ষের বহির্দ্দেশে অবস্থিত ছিল। জম্বুখণ্ডের আর্য্যেরা দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িলে, জম্বু নামটিও সম্প্রসারিত হইয়া উঠে।

জম্বুখণ্ড।

আদিম জম্বুখণ্ড কোথায় ছিল ? কুতূহলী পাঠক মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্ব উদ্‌ঘাটন করিলে দেখিতে পাইবেন, ভীষ্মপর্ব্বের প্রারম্ভেই 'জম্বুখণ্ডবিনির্ম্মাণপর্ব্বাধ্যায়।' ইহার পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে জম্বুখণ্ডের কথা আছে। তদনুসারে হিমালয় পর্ব্বতের উত্তরে আর একটি বিশাল পর্ব্বতশ্রেণী আছে, তাহার নাম হেমকূট পর্ব্বত। যেমন হিমালয়ের দক্ষিণে ভারতবর্ষ, তেমনই হিমালয় ও হেমকূটের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের নাম হৈমবতবর্ষ। হেমকূটেরও উত্তরে আর একটি পর্ব্বতের নাম নীল পর্ব্বত, এবং তাহারও উত্তরে অপর একটি পর্ব্বতের নাম নিষধ পর্ব্বত। হেমকূট ও নীল পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের নাম হরিবর্ষ ; এবং নীল ও নিষধ পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের নাম ইলাবৃতবর্ষ। এই সকল প্রাচীন বর্ষ সম্ভবতঃ এক

মহাভারতে জম্বুখণ্ডের বিবরণ।

একটি বা কতকগুলি পর্ব্বতবেষ্টিত উপত্যকামাত্র। ইলাবৃতবর্ষেরই একাংশের নাম জম্বুখণ্ড।

ইলাবৃতবর্ষের মধ্যস্থলে একটি অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ বিদ্যমান ছিল; ইহা আমাদের সাহিত্যে অতিশয় প্রসিদ্ধ। ইহাই আমাদের মেরু বা সুমেরু পর্ব্বত।

ইলাবৃতবর্ষ।

ইহার হিমানীমণ্ডিত মনুষ্যের অগম্য মেঘসঞ্চরণপ্রদেশেরও উর্দ্ধবর্ত্তী শিখরে দেবলোক অবস্থিত বলিয়া প্রাচীনেরা কল্পনা করিয়াছিলেন। মধ্যস্থলে এই বিশাল পর্ব্বত অবস্থিত থাকায় ইলাবৃতবর্ষ চারি খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল। মেরুর পশ্চিমে কেতুমাল খণ্ড; উত্তরে উত্তরকুরু-খণ্ড; পূর্ব্বে ভদ্রাশ্বখণ্ড; এবং দক্ষিণে জম্বুখণ্ড। এই জম্বুখণ্ড একটি প্রকাণ্ড নদের উৎপত্তিস্থান; জম্বুখণ্ডের নদ বলিয়া ইহার নাম 'জম্বুনদ' হইয়াছিল। জম্বুনদের সিকতায় সুবর্ণ পাওয়া যাইত; তজ্জন্য আমাদের প্রাচীনেরা সুবর্ণকে 'জাম্বুনদ' বলিতেন। এই জম্বুনদই বর্ত্তমান আমুদরিয়া বলিয়া বোধ হয়। নদ বলিলে, মৃদুগামিনী, মৃদুভাষিণী, ক্ষীণাঙ্গী রমণীগণের মধ্যে ধাবন কুর্দ্দনে পটু গম্ভীরকণ্ঠ দীর্ঘাকার পুরুষের ন্যায়, ক্ষুদ্রাবয়বা স্রোতস্বতীগণের মধ্যে বিপুল জলপ্রবাহ বুঝিতে হইবে। সিন্ধুনদের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত; তাহার উত্তরে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী আমুদরিয়া ভিন্ন আর অন্য নদ দেখা যায় না। 'আমু' শব্দের সহিত 'জম্বু' শব্দের কোনও সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা আমি অবগত নহি। জম্বুনদের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাতে ইহাকে স্পষ্টই আমুদরিয়া (Oxus) বলিয়াই উপলব্ধি হয়। জম্বুনদ সুমেরু পর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করিয়া উত্তরকুরুতে প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া বর্ণিত। উত্তরকুরু কোথায়?

মহাভারতে উত্তরকুরুর বর্ণনা এইরূপ:—

"সুমেরুর উত্তর ও নীলপর্ব্বতের দক্ষিণপার্শ্বে সিদ্ধগণনিষেবিত অতিপবিত্র উত্তরকুরু প্রতিষ্ঠিত আছে। তথায় বৃক্ষসকল প্রতিনিয়ত মধুররসসম্পন্ন সুস্বাদু ফল ও সুগন্ধি কুসুম-নিচয় প্রসব করে; সেই স্থানে সর্ব্বপ্রকার কামফলপ্রদ কতকগুলি পাদপ সকলের মনোরথ পরিপূর্ণ করিয়া থাকে এবং ক্ষীরী নামে কতকগুলি বৃক্ষ ষড়রসযুক্ত অমৃতোপম ক্ষীরধারা-বর্ষণ ও ফলগর্ভে বস্ত্র ও আভরণসমূহ উৎপন্ন করে। সেই স্থানের সমস্ত ভূভাগ মণিময় ও সূক্ষ্মকাঞ্চন-বালুকাসম্পন্ন। কোনও কোনও ভূমিখণ্ড হীরক বৈদূর্য্য ও পদ্মরাগতুল্য অতি রমণীয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। তত্রত্য পুষ্করিণীসকল পঙ্কশূন্য ও মনোরম; তাহার সলিল সকল ঋতুতেই সুখস্পর্শ হইয়া থাকে। মনুষ্য সকল দেবলোক হইতে পরিচ্যুত হইয়া তথায় জন্ম-গ্রহণ করে; তাহারা সকলেই প্রিয়দর্শন ও শুক্লবংশোদ্ভূত। স্ত্রী সকল অপ্সরাসদৃশ। সেই স্থানের সমুদায় লোক ক্ষীরীপাদপের অমৃতসদৃশ ক্ষীর পান করিয়া থাকে। তথায়

চক্রবাকযুগলের ন্যায় নরমিথুন এককালে জন্মগ্রহণ করিয়া সমভাবে পরিবর্দ্ধিত হয়; তাহারা তুল্যরূপগুণসম্পন্ন, তুল্য বেশে সুশোভিত, রোগশূন্য ও নিত্যসন্তুষ্ট। তাহারা একাদশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকে এবং কেহ কাহারে কখনও পরিত্যাগ করে না। তাহারা কলেবর পরিত্যাগ করিলে তীক্ষ্ণতুণ্ডসম্পন্ন অতি ভয়ঙ্কর ভারুণ্ড নামে পক্ষী সকল তাহাদিগকে হরণ করিয়া গিরিদরীতে নিক্ষেপ করিয়া থাকে।" (১)

কেহ কেহ বিবেচনা করেন, এই উত্তরকুরুই আমাদের বৈদিক ঋষিদের পূর্ব্বপুরুষগণের আদিম বাসস্থান। আমার বিবেচনায় তাহা নহে, উহা ঋষিদের পূর্ব্বপুরুষগণের জ্ঞাতিস্থানীয় প্রাচীন ইরানী আর্য্যগণের আদিম বাসস্থান। এক্ষণে যথায় বোখারা ও সমরখন্দ নগর অবস্থিত, সেই তরুলতাসুশোভিত উর্ব্বরভূমিই উত্তরকুরু। ইরানীরা ইহাকে "বেরেকধা" (বৃকধা; বৃক=লাঙ্গল; বৃকধা=লাঙ্গলের দেশ) ও যবনেরা বাকত্রিয়া বলিত। কৃষি-অনুরাগী ইরানীগণ হলকর্ষণ করিয়া এই প্রদেশকে উদ্যানবৎ করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইহার মধ্য দিয়া জম্বুনদ প্রবাহিত ছিল, সুতরাং তাহাই যে আমুদরিয়া, তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। ইরানীদের আবস্তিক শাস্ত্র পাঠ করিলে, তাঁহারা কিরূপ কৃষি-অনুরাগী ও কৃষিনিপুণ ছিলেন, তাহা সবিশেষ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। উত্তরকুরুর সমৃদ্ধি ও ফলপুষ্পাদির কথা শুনিয়া যেমন ইরানীদের আদিম স্থানের কথা মনে পড়ে, তেমনি উত্তরকুরুর লোকের আচারব্যবহারেও তাহাদিগকে স্পষ্টই ইরানী বলিয়া চেনা যায়। কেন না, উপরের বর্ণনাতে তাহাদের মধ্যে ভাই ভগিনীর বিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিল, দেখা যায়। চক্রবাকযুগলের ন্যায় নরমিথুন, অর্থাৎ ভ্রাতা ভগ্নী এককালে জন্মগ্রহণ করিয়া সমভাবে পরিবর্দ্ধিত হয় ও পরে "কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করে না;—" অর্থাৎ পতিপত্নীর ন্যায় ব্যবহার করে। ইহা ইরানী আচার—কোন কালেরই বৈদিক আচার নহে। ইরানীগণের মধ্যে এই আচারের নাম 'খেতুদা।' তাহার পর উত্তরকুরুর লোক কলেবর পরিত্যাগ করিলে তাহাদের মৃতদেহ যে পক্ষী কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইত, এবং অবশিষ্ট কঙ্কাল গিরিদরীতে নিক্ষিপ্ত হইত, ইহা পাঠ করিয়া, বোম্বাই নগরে পারসীক সমাজের Tower of Silenceএর কথা কাহার না স্মরণ হয়? উত্তরকুরুর এই আচার অদ্যাপি পারসীক সমাজে চলিয়া আসিতেছে। পারসীকগণের প্রাচীন রাজাদের মধ্যে অনেকের 'কুরু' নাম ছিল। তাহাদের যে দিগ্বিজয়ী রাজা ইংরেজীতে Cyrus বলিয়া লিখিত, এবং সাইরস্ বলিয়া

---

(১) কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।

কথিত হয়েন, যিনি বাবীলন রাজ্য ধ্বংস করিয়া পারস্য সাম্রাজ্য স্থাপিত করেন, তাঁহার প্রকৃত নাম 'কুরু।' বোধ হয়, যে সময়ে অস্মদ্দেশে বাক্-ত্রিয়াকে উত্তরকুরু নাম অর্পণ করা হয়, তখন কুরু-নামধারী রাজারা তথায় রাজত্ব করিতেন। গঙ্গাতীরের কুরুরা দক্ষিণকুরু, ও জম্বুনদতীরের কুরুরা উত্তরকুরু বলিয়া কথিত হইতেন। পণ্ডিতেরা অবধারণ করিয়াছেন যে, প্রাচীন ইরানীদের ভাষা (যাহা অবস্তা শাস্ত্রে সংরক্ষিত) এবং প্রাচীন বৈদিক ভাষা, একই ভাষার দুইটি dialect বা স্থানীরূপমাত্র। উত্তরকুরুতে আবস্তিক ভাষা ও জম্বুতে বৈদিক ভাষা প্রচলিত ছিল।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ইরানী জ্ঞাতিদের উত্তরকুরু যেমন শ্রীসম্পন্ন ও ধনধান্যে সুশোভিত ছিল, তাঁহাদের নিজের জম্বুখণ্ড ঠিক তাহার বিপরীত।

জম্বুখণ্ডের অনুর্ব্বরতা ও দারিদ্র্য।

জম্বুখণ্ড পর্ব্বতাকীর্ণ ও ভীষণ স্থান ছিল। এই খণ্ডে মাল্যবান নামে এক পর্ব্বত ছিল,—তৎসম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে;—"মাল্যবান পর্ব্বতের শিখরদেশে সম্বর্ত্তক নামে কালাগ্নি নিরন্তর পরিদৃশ্যমান হইতে থাকে।" বলা বাহুল্য, ইহা একটি আগ্নেয় গিরি। ইহাতে স্পষ্টই অনুমান করা যাইতে পারে যে, জম্বুখণ্ডে ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতের উপদ্রব ছিল। এই উপদ্রবের স্মৃতি ঋগ্বেদী ঋষিদের হৃদয় হইতে একবারে অন্তর্হিত হয় নাই। গৃৎসমদ শৌনক ইন্দ্রের বর্ণনা করিতে গিয়া বলিতেছেন,—

> যঃ পৃথিবীং ব্যথমানাম্ অদৃংহৎ
> যঃ পর্ব্বতান্ প্রকুপিতান্ অরম্নাৎ।—ঋগ্বেদ ; ২।১২।২

"যে ইন্দ্র একদা কম্পমানা ধরণীকে দৃঢ় করিয়াছেন, যিনি প্রকুপিত আগ্নেয় গিরিকে প্রশান্ত করিয়াছেন," তাঁহাকে স্পষ্টই জম্বুখণ্ডের ইন্দ্র বলিয়া চেনা যায়। এই ভয়ানক মাল্যবান গিরির সন্নিকটেই আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা একদা বসবাস করিতেন। লিখিত আছে, "মাল্যবান পর্ব্বত পঞ্চাশ যোজন বিস্তীর্ণ। সেই স্থানে সুবর্ণবর্ণ মনুষ্য সকল জন্মগ্রহণ করিয়া অতি কঠোর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক ঊর্দ্ধরেতা হইয়া থাকেন। তাঁহারা সকলেই দেবলোকপরিভ্রষ্ট ও ব্রহ্মবাদী।" এই 'ব্রহ্মবাদি'গণ হইতেই আমরা উৎপন্ন হইয়াছি।

আমুদরিয়ার উৎপত্তিস্থানের সন্নিকটে এক দিকে হিমানীমণ্ডিত মেরু ও অপর দিকে কালাগ্নিসঙ্কুল মাল্যবান পর্ব্বতের পাদদেশে জম্বুনামক উপত্যকায় আমাদের 'দেবলোকভ্রষ্ট' ব্রহ্মবাদী পিতামহগণ একদা বসবাস করিতেন। এই সময়ের ইতিহাসের মধ্যে কেবল এই একটি কথা জানা যায় যে, উক্ত পিতামহ-

গণ দস্যুবৃত্তিপরায়ণ হইয়া উত্তরকুরুবাসী জাতিগণের চক্ষে অতিশয় নিন্দনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। আপনাদের দেশ অনুর্ব্বর, তথায় কৃষিকার্য্য তাদৃশ ফলপ্রদ ছিল না; আর উত্তরকুরু যেমন উর্ব্বরা, তেমনি ধনধান্যপূর্ণ। কঠোর অভাবের দায়ে তাঁহারা দলে দলে উত্তরকুরুর জনপদসকল লুণ্ঠন করিতে যাইতেন। তাঁহারা দেবার্চ্চনা করিয়া এই লুণ্ঠনব্যাপারে নির্গত হইতেন, দেবতাদের নামোচ্চারণ করিতে করিতে সম্প্রহারে প্রবৃত্ত হইতেন। তাহাতে উত্তরকুরুর লোকে কালক্রমে দেবতার নাম শুনিলে চমকিয়া উঠিত। অবশেষে তাহারা দেবগণকে এবং দেবোপাসকগণকে এতই ঘৃণার চক্ষে দেখিত যে, তাহাদের ভাষায়, ইংরেজীতে Devil বলিলে যাহা বুঝায়, 'দেব' বলিলে তাহাই বুঝাইত।

দেব-শব্দটি অতি প্রাচীন; গ্রীক, রোমক, পারসীক, হিন্দুস্তানী, সকল আর্য্যভাষাতেই এই শব্দ বিদ্যমান। ইহার অর্থ উজ্জ্বল বা জ্যোতির্ম্ময়। উপাস্য সত্ত্বগণকে ইলাবৃতবর্ষের লোকে 'যজত' বলিত। এই শব্দ বেদে এবং অবস্তায় তুল্য অর্থে ব্যবহৃত দেখা যায়। যজতগণকে এক সময়ে উত্তরকুরু এবং জম্বু, উভয়ত্রই সমভাবে দেব অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়, এবং অসুর অর্থাৎ বলশালী বলিয়া উল্লেখ করা হইত। জম্বুতে এবং পরে ভারতবর্ষেও বৈদিক ঋষিগণের মধ্যে ঐ রীতি অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু জম্বুখণ্ডবাসীদের প্রতি ঘৃণাপরবশ হইয়া উত্তরকুরুবাসিগণ আপনাদের যজতগণকে আর 'দেব' বলা রীতি পরিত্যাগ করিল। তাহারা দেবশব্দকে ঘৃণাসূচক জ্ঞান করিয়া যজতগণকে কেবল অসুর বলিতে আরম্ভ করিল।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুতেই এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কল্পনা করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি বাক্য উপাসনার জন্য ব্যবহৃত হইত, এবং তাহা অতিশয় পবিত্র বলিয়া গণনীয় ছিল। ইহাদের সাধারণ নাম 'বাক্'। অন্যান্য পদার্থের ন্যায় বাকেরও এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পিত হইয়াছিলেন—তাঁহার নাম বাগ্দেবী। দ্যুলোকে তাঁহার নাম 'ভারতী'; কেন না, তিনি মনুষ্যের স্তুতি বহন করিয়া দেবতাদের সমক্ষে লইয়া যান। অন্তরিক্ষে তাঁহার নাম 'সরস্বতী'; কেন না, 'সরস্বান্' সূর্য্যের সহিত তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ। আর পৃথিবীতে তাঁহার নাম 'ইলা'। ইল্ ধাতুর অর্থ স্তব করা। ইলা অর্থাৎ স্তুতি। এবং সেই স্তুতির অধিষ্ঠাত্রী বাগ্দেবী। ইরান বা ইলান শব্দ এই 'ইলা' হইতেই উৎপন্ন বোধ হয়।

ইলাবৃত শব্দের ব্যাখ্যা।

ইলা দ্বারা আবৃত, অথবা ইলা কর্ত্তৃক বৃত (প্রার্থিত) দেশকে 'ইলাবৃত বর্ষ' বলা যায়। যে জম্বুখণ্ড ইলাবৃতবর্ষের অন্তর্গত, সেখানে যে 'ইলা'-সংজ্ঞক বাক্যরাশি বিদ্যমান ছিল, তাহার সন্দেহ কি? এই সকল ইলাই আমাদের বেদের মূল।

জম্বুখণ্ডে বসবাসকালে আমাদের মধ্যে কোন ঐতিহাসিক মহাপুরুষের নাম শ্রুত হওয়া যায় না। সমাজ তখন কতিপয় বৃহৎ পরিবারের আকারে বিদ্যমান ছিল; এবং এক এক পরিবারের কর্ত্তা 'প্রজাপতি' বলিয়া কথিত হইতেন। প্রজাপতিগণ পরস্পরের মধ্যেও সর্ব্বদা কলহ করিতেন। সুতরাং অশান্তি এবং অশান্তিমূলক দারিদ্র্য ও দুরবস্থার মধ্যে তাঁহারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তবে অশান্তির মধ্যে বাস করিলে মনুষ্য স্বভাবতঃই যেমন সাহসী, কষ্টসহিষ্ণু ও উগ্র হয়, তাঁহাদের স্বভাবও তাদৃশ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

জম্বুখণ্ড হইতে বাহির হইয়া প্রতিষ্ঠানে আগমন।

অনেকগুলি প্রজাপতি জীবিকার্জ্জনের জন্য জম্বুখণ্ড হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া, হিন্দুকুশ পর্ব্বত পার হইয়া, বর্ত্তমান কাবুলের সন্নিকটেই উপনিবিষ্ট হয়েন। এই নূতন উপনিবেশের রাজধানীর নাম 'প্রতিষ্ঠান', এবং ঐ নগর মহাবীর আলেকজাণ্ডারের সময়েও বিদ্যমান ছিল, দেখা যায়। আলেকজাণ্ডারের ইতিহাসলেখকগণের লিপিতে উহা অর্তোস্পান বা পর্তোস্পান, এবং চীনদেশীয় লিপিতে উহা

কো-জি-সি-সা-টাং-না
প্র—তি—ষ্ঠা—ন

বলিয়া লিখিত হয়। (১) প্রতিষ্ঠান হইতেই আমাদের ধারাবাহিক ইতিহাস পুরাণাদিতে লিখিত হইয়াছে। বৈবস্বত মনু এই প্রতিষ্ঠানের রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহারই বংশে মহারাজা পুরু, এবং পুরুর বংশে মহারাজা ভরত জন্মগ্রহণ করেন।

প্রতিষ্ঠান রাজধানীর উৎপত্তিতে আমরা আমাদের সমাজে সর্ব্বপ্রথম রাজত্বের আবির্ভাবসমাচার প্রাপ্ত হই। বৈবস্বত মনুই আমাদের সমাজের সর্ব্বপ্রথম রাজা। তিনি সর্ব্বপ্রথমে করের ব্যবস্থা ও কর-গ্রহণ করিয়া 'মনু' নাম পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজা উপাধি ধারণ করেন। (২) তাঁহার পূর্ব্বের সময়কে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি।

পিতামনু ও মন্বন্তর।

(১) Cunningham's Ancient Geography of India. কনিংহাম সাহেব প্রতিষ্ঠানের বিষয় জানিতেন না। সুতরাং নগরটির প্রকৃত নাম কি, তাহা তিনি অবধারণ করিতে পারেন নাই।

(২) বৈবস্বতো মনুর্নাম মাননীয়ো মনীষিণাম্।
আসীন্ মহীক্ষিতামাদ্যঃ প্রণবশ্ছন্দসামিব॥—রঘুবংশ। ১। ১১

প্রথম,—প্রাজাপত্য যুগ; দ্বিতীয়,—মানবযুগ। প্রাজাপত্যযুগে প্রজাপতিগণ স্ব-স্ব-প্রধান হইয়া বিচরণ করিতেন, কেহ কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতেন না। এক এক প্রজাপতি এক একটি প্রকাণ্ড সংসৃষ্ট পরিবারের কর্ত্তাস্বরূপ ছিলেন; এক দিকে দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, অপর দিকে সেনাপতি ছিলেন;—কিন্তু করগ্রাহী ছিলেন না। কর দিবেই বা কে? শ্রমসাধ্য কার্য্যনির্ব্বাহের জন্ত দাসদাসী ছিল; ভাই বন্ধু পুত্র পৌত্রগণ যুদ্ধ বিগ্রহেই নিযুক্ত থাকিত। এই অবস্থায় সমাজ অতিশয় ক্ষুদ্র ছিল। এই যুগের শেষে আমাদের আদি-ব্যবস্থাপক পিতা মনু প্রাদুর্ভূত হয়েন। পিতা মনু ঋগ্বেদে অতিশয় প্রসিদ্ধ। ইনিই আমাদের ইতিহাসের আদিম ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইনি হয় জম্বুখণ্ডে বনবাসকালেই হউক, অথবা জম্বুখণ্ড হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইবার পর কিন্তু প্রতিষ্ঠান নগরের উৎপত্তির পূর্ব্বেই হউক, প্রাদুর্ভূত হইয়া, ভৃগু অঙ্গিরা মরীচি প্রভৃতি অপর দশ জন প্রজাপতির সহিত সম্মিলিত হইয়া সমাজের গতি ফিরাইয়া দিলেন। যাঁহারা এই মিলিত সমাজের শাসনকর্ত্তা, তাঁহারা পিতামনুর নাম বা উপাধি অনুসারে 'মনু' নামে বিখ্যাত হয়েন। এবং তাঁহাদের এক এক জনের শাসনকাল মন্বন্তর নামে অভিহিত হয়। পৌরাণিকেরা এই মন্বন্তরকে এক বিশাল কালাবয়বে পরিণত করিয়াছেন। কিন্তু শব্দার্থেই আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, মনু-উপাধিধারী এক এক শাসনকর্ত্তার অধিকার-কালই মন্বন্তর। সচরাচর বৈবস্বত মনুর পূর্ব্বে ছয় মন্বন্তর গণিত হয়। সুতরাং পিতা মনু হইতে ছয় জন মনু অন্তর্দ্ধান করিলে, মনুর স্থান রাজাতে অধিকার করিলেন। ছয় মন্বন্তরে সম্ভবতঃ ন্যূনাধিক ১৮০ বৎসরকাল অতি-বাহিত হইয়াছিল। অর্থাৎ, পিতা মনুর প্রায় ১৮০ বৎসর পরে তৎপ্রতিষ্ঠিত 'মানবসমাজে' সর্ব্বপ্রথমে রাজার অভ্যুত্থান হয়।

এক্ষণে আমাদের ভাষায় নরনারীমাত্রই মানব। চীন ও ইংরেজ আমাদের ন্যায় মানব। কিন্তু মানব শব্দের আদিম অর্থ অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ।

মানবসমাজ।

পিতা মনু যে সমাজের আদি ব্যবস্থাপক, চাতুর্বর্ণ্য যাহার লক্ষণ,—আদিম অর্থে তাহাই মানবসমাজ। সেই সমাজের সকল লোকই আপনাদিগকে পিতা মনুর সন্তান বলিয়া কল্পনা করে, তাই তাহারা মানব। সেই সমাজের আচার ব্যবহার পৃথিবীতে মানব ধর্ম্মশাস্ত্র নামে প্রসিদ্ধ। ফলতঃ, এক্ষণে যাহাকে হিন্দুসমাজ বলা যায়, তাহারই প্রাচীন নাম মানবসমাজ। মানবসমাজ আমাদের আপনাদের ঘরের কথা; আর

হিন্দুসমাজ এই নামটি আমরা বৈদেশিকগণের নিকট হইতে পাইয়াছি। যত দিন আমরা একটি স্বাধীন জাতি ছিলাম, ততদিন আমরা মানবজাতি ছিলাম, স্বাধীনতা হারাইয়া এক্ষণে আমরা হিন্দুজাতি হইয়াছি। ফলতঃ, যে সময়ে আমরা সিন্ধুতীরে রাজত্বস্থাপন করিতে পারি নাই, সে সময়ের কথা লিখিতে গেলে, হিন্দুসমাজ লেখা ভাল দেখায় না। তাই উপরে মানবসমাজের উল্লেখ করিলাম।

সবিস্তার লিখিতে গেলে প্রবন্ধ অতিশয় বাড়িয়া যায়, সেই জন্য সংক্ষেপে এইমাত্র এ স্থলে বক্তব্য যে, ঋগ্বেদে ভূরি ভূরি স্থানে পিতা মনুর উল্লেখ আছে, এবং তাঁহার কীর্ত্তির প্রশংসা আছে। এই সকল কীর্ত্তির মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য;—

মানবসমাজের আদি ব্যবস্থাপকের কীর্ত্তি।

(ক) "শং যোঃ" ব্যবস্থা।

একজন ঋষি বলিতেছেন,—"হে রুদ্রদেব! পিতা মনু স্বকীয় প্রজাগণকে শং ও যোঃ নামক যে কল্যাণদ্বয় প্রদান করিয়াছিলেন, আমরা যেন তোমার নায়কতায় তাহা প্রাপ্ত হই।"—১।১১৪।২ শং=শান্তি; যোঃ=সম্মিলন। শং যোঃ=অর্থাৎ শান্তি ও সংমিলন। পিতা মনু ও অপর দশ জন প্রজাপতি, এই একাদশ প্রজাপতিতে (১) সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পরস্পরের মধ্যে কলহ বিবাদ পরিত্যাগ করেন। তাঁহাদের মধ্যে পরস্পরের বিবাদভঞ্জনের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়; এবং বহিঃশত্রুর সহিত বিবাদ ঘটিলেও সমাজের অভ্যন্তরে শান্তি সংস্থাপিত হয়। এই "শং যোঃ" নামক কল্যাণের প্রসাদে মানবসমাজ পৃথিবীতে মস্তক উত্তোলন করিয়া এক মহাজাতিতে পরিণত হইয়াছিল।

(খ) কৃষিব্যবস্থা।

পিতা মনুর পূর্ব্বে গোচারণ ভিন্ন লুণ্ঠনই ধনাগমের প্রশস্ত উপায় ছিল;

---

(১) একাদশ প্রজাপতির নাম মনুসংহিতার প্রারম্ভে দ্রষ্টব্য। মনুসংহিতার লিখন অনুসারে পিতা মনু অপর দশ প্রজাপতির সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি করিলেন কিরূপে? তপস্যার দ্বারা। সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে, ঐ দশ প্রজাপতি পিতা মনুর ঔরস পুত্র নহেন। পক্ষান্তরে, ঋগ্বেদের এক স্থানে অঙ্গিরাবংশীয় অথর্ব্বা ও পিতা মনু, উভয়েই বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের ব্যবস্থাপক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইহাতে মনু কর্ত্তৃক অপর দশ জন প্রজাপতির যে সৃষ্টির কথা শুনা যায়, তাহাতে একাদশ প্রজাপতির সম্মিলন ব্যতিরেকে আর কোন বিচারসঙ্গত তাৎপর্য্যই পাওয়া যায় না। বিশেষ 'শং যোঃ'র শান্তি ও মিলনেও এই মিলনেরই সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

পরেও যুদ্ধ করিয়া বলপূর্ব্বক পরস্বাপহরণ যে একবারে নিষিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা নহে, কিন্তু পিতা মনু কৃষিকার্য্য দ্বারা ধনাগমের বিশেষ ব্যবস্থা করেন; এবং কৃষিকার্য্যের জন্য একটি 'গাতু' স্থাপন করেন। একজন ঋষি বলিতেছেন:—

"হে অশ্বিদ্বয়! পূর্ব্বকালে তোমরা মনুর জন্য এক 'গাতু' নির্ম্মাণ করিয়াছিলে।" ১।১১২।১৬

আর একজন ঋষি বলিতেছেন:—

"হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা মনু প্রজাপতির জন্য লাঙ্গলের দ্বারা যব বপন করিয়া অন্নদোহন করিয়াছিলে।" ১।১১৭।২১।

'গাতু' বড়ই প্রাচীন শব্দ। বেদব্যাখ্যাকারীরা ইহার এক অর্থ 'পৃথিবী' বলেন। ফলতঃ সমগ্র পৃথিবী নহে; পৃথিবীর এক একটি স্থান এক একটি গাতু। কৃষকের গ্রামের নাম গাতু। যে স্থানে নিরাপদে কৃষিকার্য্য করা যায়, তাহার নাম গাতু। ইহার আবস্তিক প্রতিশব্দ 'গয়েথ'। পিতা মনুর সময় হইতে অস্মৎসমাজে গাতু বা কৃষকের গ্রামের উৎপত্তির সূত্রপাত হয়। এবং পিতা মনু নিজে ক্ষেত্রপতি হইয়া বৃকের দ্বারা (অর্থাৎ লাঙ্গলের দ্বারা) যববপনকার্য্য আরম্ভ করেন। এই সময় হইতে গোচারণ অপেক্ষা ভূমিকর্ষণ অস্মৎসমাজে সমধিক অনুশীলিত হইতে আরম্ভ হইল।

(গ) বিশ্বদেব-উপাসনাপ্রণালীর ব্যবস্থা।

যদিও পিতা মনুর পূর্ব্বেও বেদবাক্য ছিল, কিন্তু যাহাকে আমরা বেদ বলিয়া জানি, অর্থাৎ বিশ্বদেব-উপাসনামূলক বেদ, তাহা পিতা মনু হইতেই উৎপন্ন। এই উপাসনাতে দেবদেবী কেবল নামে অসংখ্য, কিন্তু ক্রিয়াতে এক। অসংখ্য উপাসক অসংখ্য প্রকারে ঈশ্বরকে কল্পনা করে, সুতরাং দেবদেবী অসংখ্য; কিন্তু তা বলিয়া ঈশ্বর বহু নহেন। উপাসকের চক্ষে এইটি স্পষ্ট করিবার কামনায় পিতা মনু "বিশ্বে দেবাঃ" বলিয়া সকল দেবের মিলিত হোমের ব্যবস্থা করেন। মানবসমাজের ঋত্বিক্‌গণ যখন সকল দেবকে সমস্বরে আহ্বান করিয়া বিশ্বদেব হোম করিতে শিখিল, তখন তন্মধ্যে তোমার দেবতা ছোট, আমার দেবতা বড়,—এই কথা লইয়া বিবাদ বিসংবাদের পথ চিরকালের জন্য নিরুদ্ধ হইল। এ বড় কম কথা নয়।

স্বয়ং বৈবস্বত মনু পিতা মনুর এই মহতী কীর্ত্তির কথা স্মরণ করিয়া বলিতেছেন:—

নহি বো অস্তি অর্ভকো
দেবাসোন কুমারকঃ।
বিশ্বে সতো মহাংত ইৎ॥
ইতি স্তুতাসো অসথা বিশাদসো
যেস্থ ত্রয়শ্চ ত্রিংশচ্চ।
মনো দেবা যজ্ঞিবাসঃ॥ ৮।৩০।১-২

"হে দেবগণ! তোমাদের মধ্যে কেহই অন্য অপেক্ষায় ছোট নয়; সকলেই তুল্যভাবে 'সতোমহাংতঃ' (যাহা কিছু আছে তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ) তোমরা যে ৩৩ জন যজ্ঞীয় দেবতা আছ, পিতা মনু তোমাদিগকে এই বলিয়াই উপাসনা করিয়া গিয়াছেন।"

এই ৩৩ দেবতার বিষয়ে নানা মুনির নানা মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ঋগ্বেদের প্রমাণ অনুসারে ইহাঁরা কেবল স্থানভেদে ৩৩ মাত্র। অর্থাৎ, পৃথিবীতে এগার, অন্তরিক্ষে এগার ও দ্যুলোকে এগার, এই তেত্রিশ দেবতা। ইহাই সুন্দর ও সমীচীন মত। তদনুসারে পিতা মনুর 'যজ্ঞীয়' ৩৩ দেবতা মূলে এগারটি মাত্র। কিন্তু এগারটি কিরূপে হইল, ইহার কোনও ব্যাখ্যা আমি কোথাও দেখি নাই। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, যে একাদশ প্রজাপতি মিলিত হইয়া পিতা মনুর ব্যবস্থা মত নূতন সমাজের পত্তন করিলেন, তাঁহাদের জন্যই সর্ব্বপ্রথমে একাদশ মিলিত দেবতাকে "বিশ্বে দেবাঃ" বলিয়া পূজা করিবার ব্যবস্থা হয়। ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের উনত্রিশ সূক্ত একটি বৈশ্বদেব সূক্ত। কে ইহা রচনা করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, মরীচিপুত্র কশ্যপ; কেহ বলেন, বৈবস্বত মনু। এটি যে অতি প্রাচীন সূক্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সূক্ত অনুসারে বিশ্বদেবের তালিকা এই:—

১। দিব্য অলঙ্কারধারী 'সোম'
২। যোনিসদ্ 'অগ্নি'
৩। বাশীধারী 'ত্বষ্টা'
৪। বজ্রধারী 'ইন্দ্র'
৫। পিনাকধারী 'রুদ্র'
৬। মার্গরক্ষক 'পূষা'
৭। ত্রিবিক্রম 'বিষ্ণু'
৮।৯ অশ্বারোহী 'অশ্বিদ্বয়'
১০।১১ স্বর্গবাসী রাজদ্বয় 'মিত্রাবরুণ'

আমার বিবেচনা হয়, এই একাদশ দেবতাকে একাদশ প্রজাপতি আপনাদের প্রধান উপাস্যস্বরূপ গ্রহণ করেন, এবং আপনারা মিলিত হইয়া

দেবতাদিগকেও মিলিত করিয়া "বিশ্বেদেবাঃ" বলিয়া তাঁহাদের যুগপৎ হোমের বিধান করেন।

(ঘ) পরলোকতত্ত্ব-প্রচার।

হিরণ্যস্তূপ ঋষি বলিতেছেন:—

ত্বমগ্নে মনবেদ্যাম্ অবাশয়ঃ। অর্থাৎ হে অগ্নি! তুমি মৃত্যুর পর পরলোক আছে, এই সত্য মনুকে বলিয়াছিলে।

এই সত্য বেদের ভিত্তি; এবং পিতা মনু ইহার প্রচারক। অতি পূর্ব্ব-কালে দেহব্যতিরিক্ত আত্মাতে কেহ বিশ্বাস করিত না। মরিলেই সব ফুরাইল। জীবন যতদিন দুঃখপ্রধান ছিল, ততদিন এ কথায় কেহ দুঃখিত হইত না। রোমকেরা যখন জীবনে কোন সুখ নাই দেখিত, তখন আত্মঘাতী হওয়া শ্লাঘনীয় বোধ করিত। কিন্তু উত্তরকুরুর সমৃদ্ধ আর্য্যগণ কথাটা বড় পছন্দ করে নাই। মরিয়াও আবার বাঁচিয়া উঠিতে তাহাদের বড় সাধ হইত। তাহাতে তাহাদের মধ্যে এক বিশ্বাস জন্মে যে, তাহাদের প্রধান 'যজত' মেধ্যাসুর যদি কৃপা করেন, তবে অবশ্যই মরাকে বাঁচাইতে পারেন। যেমন দেহে মানুষ মরে, মেধ্যাসুরের কৃপায় আবার তেমনই দেহ লইয়া মাটি হইতে একদিন উঠিবে। এই অপূর্ব্ব মতের নাম Resurrection of the dead অর্থাৎ মৃতের পুনরুত্থান। ইরানীগণ হইতে প্রথমে ইহুদীদের কতক লোকে, পরে তাহাদের হইতে খৃষ্টশিষ্যগণ, এবং খৃষ্টশিষ্যগণের নিকট হইতে মহম্মদ এবং মুসলমানেরা, এই পুনরুত্থানমত অঙ্গীকার করিয়াছে।

এরূপ সশরীরে মৃতের পুনরুত্থানের মত মানবসমাজে কখনও সমাদৃত হয় নাই। কিন্তু না হইলেও মানবসমাজ চিরকালই মৃত্যুর পর পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে। পিতা মনু যে দেবতাগণকে উপাসনার বিধি দেন, তাঁহাদের কোন রক্তমাংসের শরীর নাই; ধার্ম্মিক মনুষ্য পরলোকে দেবজন্ম লাভ করিয়া দেবতাদের ন্যায় হইবে; পরলোকে তাহাদেরই বা রক্তমাংসের শরীরে আবশ্যকতা কি? এই পরলোকতত্ত্ব কেবল সুমার্জ্জিত বুদ্ধির বোধগম্য।

পিতা মনুর এই সকল সুব্যবস্থার ফলে দুই শত বৎসরের মধ্যে মানব-সমাজে নূতন জীবনের সঞ্চার হইয়া অভ্যুদয়ের পথ পরিষ্কৃত হইয়া গেল; আভ্যন্তরীণ শান্তির মধ্যে কৃষিকার্য্যের অনুসরণে ধনাগম ও প্রজাবৃদ্ধি হইতে লাগিল; লোকের মনে পরলোকতত্ত্ব-বিষয়ক উপদেশ বদ্ধমূল হইলে এক অপূর্ব্ব উল্লাসের উদয় হইল; ধর্ম্ম ও

মন্বন্তরসময়ে মানব-সমাজের অভ্যুদয়।

ন্ন্যায়ের সম্মান বাড়িয়া উঠিল। মানবসমাজে বীরের অসদ্ভাব কোন দিন ছিল না, এক্ষণে ধনী লোকের এবং কৃতবিদ্য ও ধার্ম্মিক লোকেরও আবির্ভাব হইতে লাগিল। এই অবস্থায়, অন্যান্য জাতির দেখাদেখি, মানবেরা আপনাদের এক রাজা মনোনীত করিলেন। এবং বিবস্বান্ নামক এক ব্যক্তির পুত্র, যিনি মনু উপাধির সহিত সমাজের শাসনভার গ্রহণ করেন, তিনিই মানবসমাজের প্রথম রাজা হইলেন।

বৈবস্বত মনুর বংশের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। বৈবস্বত মনু
|
২। ইলা
|
৩। পুরুরবা
|
৪। আয়ু
|
৫। নহুষ
|
৬। যযাতি
|
৭। পুরু
|
৮। রৌদ্রাশ্ব
|
৯। অনাধৃষ্টি
|
১০। মতিনার
|
১১। তংসু (তুংসু)
|
১২। ঈলিন
|
১৩। দুষ্মন্ত
|
১৪। ভরত

এই তালিকার রাজগণের মধ্যে যযাতি এক জন দিগ্বিজয়ী রাজা। প্রতিষ্ঠান হইতে বিনির্গত হইয়া মানবেরা সর্ব্বপ্রথমে কোন্ রাজার সময়ে পঞ্জাব প্রদেশে প্রবিষ্ট হয়েন তাহা জানা যায় না; কিন্তু দিগ্বিজয়ী যযাতি রাজার সময়ে যে তাঁহারা পঞ্জাব অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা অনুমান করা যাইতে

পারে। মহাভারতের লিখনানুসারে যযাতি মনুবংশীয় রাজগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সম্রাট পদবী লাভ করেন। তিনি অন্যান্য রাজাকে পরাজিত করিয়া এক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের গঠন করেন, এবং তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর সন্তানেরা গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্ত্তী স্থানে উপনিবিষ্ট হইয়া অতিশয় সমৃদ্ধ হইয়া উঠেন। পুরু-বংশীয় ভরত রাজাও একজন বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী রাজা হইয়া উঠেন; এবং উত্তরকালে তাঁহার বংশধরগণ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া গঙ্গা যমুনার মধ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। মৎস্যপুরাণের লিখন অনুসারে এই স্থানেই প্রতিষ্ঠান নগরী নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহার পোষকে অপর কোন প্রমাণ আমি দেখি না। তবে প্রতিষ্ঠান হইতে সমাগত মানব ক্ষত্রিয়গণ আপনাদের রাজ্যকেও প্রতি-ষ্ঠান রাজ্যেরই শাখা বিবেচনা করিতেন, ইহা সম্ভব। এবং কনষ্টাণ্টিনোপলকে যেমন 'নবরোম' নাম দেওয়া হইয়াছিল, তদ্রূপ গঙ্গা যমুনার মধ্যেও কোনও নগরের নবপ্রতিষ্ঠান নামকরণ হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু সে প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর কোনও প্রমাণ দেখি না। বৈবস্বত মনুর প্রতিষ্ঠানের সান্নিধ্যে সম্প্রতি আমীর আবদুর রহমান খাঁ রাজত্ব করিতেছেন।

এক্ষণে আমাদের প্রাচীন ইতিহাসে দীর্ঘতমার স্থান একপ্রকার নির্ণীত হইল, বলা যায়। দীর্ঘতমা হইতে ন্যূনাধিক ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে বৈবস্বত মনু, এবং ন্যূনাধিক ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে পিতা মনু বিদ্যমান ছিলেন, বিবেচনা করা যাইতে পারে। অর্থাৎ, খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব প্রায় ২৩০০ বৎসর পূর্ব্বে পিতা মনু দর্ত্তৃক মানবসমাজ ও সেই সমাজের বেদের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তদবধি গণনা করিয়া অদ্য পর্য্যন্ত ৪১৯৭ চারি হাজার এক শত সাতানব্বই বৎসর অতীত। আমরা যে মানবসমাজের লোক, ইহাই সেই সমাজের বয়স বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। আমাদের ন্যায় প্রাচীন ইতিবৃত্ত ভূভারতে অপর কোনও জাতিরই নাই। যে দীর্ঘতমা ঋষির কথা হইতেছে, তিনি পিতা মনুর ৬০০ বৎসর পরে, এবং এক্ষণকার সময়ের ৩৫৯৭ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়া-ছিলেন। অতএব, তদ্রচিত সূক্তমালায়, মানবসমাজ প্রথমে জম্বুখণ্ড হইতে ও পরে বর্ত্তমান আফ্গানিস্তান হইতে নিক্রান্ত হইয়া পঞ্জাব অতিক্রম করিয়া গঙ্গা যমুনার মধ্যে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইলে কিরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছিল, তাহা অনেকটা জানা যায়। ঈদৃশ ঋষির রচনা পাঠ করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়?

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

স্নেহের শাসন।

১

চারি বছরের শিশু সে সরল,
তার কথা ক'ব কি ?
কীর্ত্তি তাহার কহিতে অশেষ,
করিতে স্মরণ ফেলিতে নিমেষ
একবারে শত দীপশিখা সম
প্রাণে উঠে ঝলকি' !

২

দিনরাত শুধু রাজার মতন
গৃহদেশখানি করিছে শাসন,
না জানে বিরাম না মানে বারণ
জুড়াইছে রাজভাগ ;
পাশে তা'রে এক তরুণ তপসী,
তা'রই পরে করে যত রোষারোষি
তপে জপে তার ঢেলে দিল মসী,
ভেঙে দিল যোগযাগ !

৩

দূরে গেল তা'র যতেক সাধন,
ফিরে এল তার যতেক বাঁধন ;
একদিন বড় হয়ে জ্বালাতন
তাপসী কহিল তায়,
"দূর কর ছাই ! পারিনেক আর
পোড়া ছেলে সব ঘুচালে আমার ;
রে দুরন্ত ! তোর কেমন ব্যাভার !
কেবলি জ্বালাবি মা'য় ?

৪

"নাহি সাঁজ মেনে নাহিক প্রভাত
তোরই পিছে শুধু র'ব দিনরাত ?
আর কোনও কাজে নাহি দিব হাত ?
একি রে বিটলপনা !
এবে ভাল করে তোরে শিখাইব,
নিয়ে যেতে মোরে বাপেরে কহিব,
ঘুমাবি যখন তোরে ফাঁকি দিব,
হেথা আর আসিব না ! "

৫

শিশুমুখে রোষ উঠিল রাঙিয়া ;
বলে,—"চুল তোর ফেলিব ছিঁড়িয়া,
দুই চড়ে গাল দিব রে ভাঙিয়া,
কাপড় ছিঁড়িব দাঁতে।
ঘুম পেলে যবে শুবি বিছানায়,
আরসুলা ধরে ছেড়ে দিব গায়,
মাছ ফেলে দিব ভাতে !"

৬

ধেই ধেই শিশু কাঁপাইছে ঘর,
সৈনিক যেন করিছে সমর।
সভয়ে সে নারী হইয়া ফাঁফর
বলে,—"মাগো কোথা যাই !
ছেলে এ ত নয়, যেন হুতাশন,
চিরদিন মোরে করিবে দহন ;—
চারি পাশে কত হতেছে মরণ
মোর কি মরণ নাই !

৭

"বলি এইবার শোন্, রে বিটল !
দস্যুতা তোর ঘুচাব সকল ;
ছিঁড়ে ফেলে যত মায়ার শিকল
ম'রে আমি প'ড়ে র'ব।
যেই মত তোর দাদা মহাশয়,
চলি' গেলা যবে আপন আলয়,
ডেকেছিলি, তবু কথা নাহি কয়,—
সেই মত আমি হ'ব।"

৮

অতি সুকুমার শিশু সে যে, হায়,
মরণের কথা কে বুঝা'বে তা'য় ?
বাহু তুলে পুন কহিল সে মা'য়,—
"মারিব তা হ'লে তোয় !"
পলকে না জানি কিসের কারণ
মুখে আর তার সরে না বচন,
ধীরে ধীরে দু'টি তুলিয়া নয়ন
মা'র মুখ প'রে থোয়।

৯

ক্ষণেক নীরবে চাহিয়া চাহিয়া
সহসা সে শিশু উঠিল কাঁদিয়া ;
দু'টি আঁখিধারা কপোল বহিয়া
ভিজাইল গৃহতল ;
দূরে গেল তার শত আস্ফালন,
কাঁদে অসহায় অনাথ মতন,
হেরি' সে আকুল কাতর রোদন
চোখে মোর এল জল।

১০

রমণীর রোষ দূরে গেল ভাসি,
যত অভিমান ফেলে শিশু নাশি ;—
কোথা হ'তে ঝ'রি মুকুতার রাশি
শোভিল শিরসে তা'র!
অনায়াসে শিশু বিনা ছলবল
বিদ্রোহী মায়ে করিল দখল,
চুম্বনে মিশা স্নেহ-আঁখিজল
করিল তা' পরচার!

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

শিকার-কাহিনী।

প্রবন্ধ-সূচনাতেই পাঠক মহোদয়গণকে অভয় দিতেছি, আমার এ প্রবন্ধে তুষারধবলিত হিমাচলের অভ্রভেদী শৃঙ্গের বর্ণনা নাই। পশ্চিমদেশের সঙ্গে এ দেশের কোনও সুদূর সম্বন্ধ ভৌগোলিকের নিকট থাকিতে পারে, অথবা ততোধিক তীক্ষ্ণদৃষ্টি কবির থাকিতে পারে ; আমার ন্যায় খাঁটি-গন্ড মানুষের মনে পশ্চিমের সঙ্গে এ দেশের কোনও সম্বন্ধ নাই।

আমি নবেম্বর মাসের শেষে, বোধ হয় ২৭শে নবেম্বর, প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান করি। তখন চারি দিনেই পরীক্ষা শেষ হইত। এখনকার মত পঞ্চম-দিনে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রকে না হউক, অনেকগুলি বালককে "র‍্যাকেলের" আণবিক সংস্করণে পরিণত করিবার কল্পনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাতব্বরগণের উর্ব্বর মস্তিকে তখন প্রবেশ লাভ করে নাই, এবং সায়েন্স-ভীতিও এত প্রবল হয় নাই। ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের নির্জ্জন বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপন করিয়া, সরপুরিয়ার-জন্মভূমি স্বনামধন্য কৃষ্ণনগরে, পঠিত অপঠিত সমস্ত বিদ্যার বোঝা পরীক্ষকগণের পাঁচসাতশতটাকাপুষ্ট সবল স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া, একেবারে দীর্ঘ অবকাশ। মা সরস্বতীর সঙ্গে কিছু দিনের জন্য সম্বন্ধ-ত্যাগের দীর্ঘ পরওয়ানা লইয়া আমি ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। নিতান্ত শুভানুধ্যায়ী "কেতাব-কীট" কেহ পড়িতে শুনিতে বলিলে, তাঁহার প্রতিবাদ করিবার কষ্ট আর আমাকে গ্রহণ করিতে হইত না ; যাঁহারা দিবারাত্রি সুধু "পড়, পড়" ভিন্ন অন্য উপদেশ দিতেন না, তাহারাও এখন যথেষ্ট করুণকণ্ঠে, কাতরবচনে

আমার পক্ষসমর্থন করিতেন—সুতরাং স্ফূর্ত্তির সীমা এতদিন যে ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে নির্দ্দিষ্ট ছিল, এই প্রবেশিকাপরীক্ষার পরে আত্মীয়জনের স্নেহে তাহার চৌহদ্দি খুব বাড়িয়া গেল। আমি একেবারে দেশ ছাড়িয়া উত্তর দেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। উদ্দেশ্য দেশভ্রমণ।

আমার এক খুড়ামহাশয় উত্তরবঙ্গ ষ্টেট্ রেলওয়ের সৈদ্‌পুর লোকো-মোটিভ্ আফিসে চাকুরী করিতেন। আমরা আদর করিয়া তাঁহাকে "চাচা" বলিয়া ডাকিতাম; তিনি আমার অপেক্ষা ৮।৯ বৎসরের বড় ছিলেন। পূর্ব্ব হইতেই চাচার সঙ্গে বন্দোবস্ত ছিল যে, পরীক্ষার পরেই তাঁহার কাছে বেড়াইতে যাইব। সে সময়ে দারজিলিং রেল হয় নাই; উত্তরবঙ্গ রেলের সীমা শিলিগুড়ি অবধি; তবে রঙ্গপুর শাখা তখন খুলিয়াছে। চাচার কাছে যাইব, সুতরাং বাড়ীতে বিশেষ আপত্তি হইল না। চাচা আমার জন্য একখানি মধ্যমশ্রেণীর যাতায়াতের পাশ দিয়াছিলেন। তখন সবে পার্ব্বতীপুর, সৈদপুর সহর বসিতেছে; রেলও নূতন হইয়াছে। চাচা একটু উচ্চ বেতনের কর্ম্মচারী, তাই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে বলিয়া আমার জন্য একখানি পাশ যোগাড় করিয়াছিলেন।

তখনও দারজিলিং মেলট্রেণ ছিল, আমি সেই মেলট্রেণে যথাসময়ে সৈদ-পুরে চাচার বাসায় উপস্থিত হইলাম। দূর দেশে আমাকে পাইয়া চাচা এবং তাঁহার বাসার অন্যান্য বন্ধুগণ বড়ই প্রীত হইলেন। তাঁহারা ৫।৭ জনে মিলিয়া একটা বাসা করিয়া থাকিতেন। আমি কবে কোথায় বেড়াইতে যাইব, তাহার একটা Programme হইল। আফিসের বাবুরা রবিবার ব্যতীত অন্য কোনও দিন আমার সঙ্গী হইতে পারিবেন না; সুতরাং জলপাইগুড়ি, রঙ্গপুর, নাটোর প্রভৃতি স্থান একাকীই দেখিয়া আসিলাম। মধ্যে এক রবিবার জলপাই-গুড়িতে কাটিয়া গেল; এই জন্য সে রবিবারে চাচাদের সঙ্গে বেড়াইতে যাওয়া হইল না।

অবশেষে একদিন আমাদের বাসার ক্লাবেঞ্চে স্থির হইল যে, সম্মুখের শনিবার বৈকালের গাড়ীতে আমরা সকলে একত্র শিলিগুড়ির জঙ্গলে শিকার করিতে যাইব। বাসায় যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই জন বন্দুক নাড়া-চাড়া করিতে পারেন। একজন আমার চাচা, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তরপাড়ার এক ব্রাহ্মণসন্তান। ইহঁদের দুই জনের সঙ্গেই দুইটি ভাল বন্দুক ছিল।

আমার চাচা দুইটি কাজে সিদ্ধহস্ত ছিলেন; তিনি অতি সুন্দর বাঁশী

বাজাইতে পারিতেন, এবং খুব ভাল শিকারী ছিলেন। তিনি যে কখনও বাঘ মারিয়াছেন, তাহা শুনি নাই; তবে উড়ন্ত পাখী অনায়াসে মারিতে পারিতেন; সুতরাং তিনি যে একজন ভাল পাখীমারা, তাহা আমি জানিতাম। তবে জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া, বাঘের সঙ্গে লড়াই করিয়া তাহাকে বধ করা আমার পূজনীয় খুড়া মহাশয়ের সাধ্য কি না, সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ ছিল। দক্ষিণদেশী উত্তরপাড়াবাসী টেড়ীকাটা টপ্পাবাজ ব্রাহ্মণসন্তান যে সিংহের গহ্বরে প্রবেশ করিয়া সিংহশাবক লইয়া আসিতে পারেন, তাঁহার কথাবার্ত্তায়, হাবভাবে, আমি সেটা বুঝিয়া লইয়াছিলাম।

চাচাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি উপায়ে তিনি বাঘ বা অন্য হিংস্রজন্তু শিকার করিবেন। তিনি বলিলেন, যাহারা সাপ খেলায়, তাহারা বাঁশী বাজাইয়া সাপকে একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখে;—জীবজন্তুমাত্রই সুস্বর শুনিতে ভালবাসে। তাহার পর তিনি, বৃন্দাবনের শ্যামের বাঁশীতে যে যমুনা উজান বহিত, তাহাও অসম্ভব নহে, ইহা প্রমাণিত করিতে বসিলেন। বাঁশী যে অনেক গুণ জানে, তাহা এই বৈষ্ণবপ্রধান দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া, আজন্ম বৈষ্ণবগৃহে পালিত হইয়া, মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গেই জানিতে পারিয়াছি। খুড়া মহাশয় এ হেন বাঁশীর স্বরে বনের হিংস্র জন্তুকে টানিয়া আনিবেন, এবং শেষে বেশ ধীরে সুস্থে চুরুট টানিতে টানিতে তাহার প্রকাণ্ড শরীরে গুলি বসাইয়া দিবেন, ব্যাঘ্রপ্রবরও গত-জীবন [illegible] খুড়ামহাশয়ের জয়ঘোষণা করিবে,—এ বন্দোবস্ত নিতান্ত মন্দ বোধ হইল সঙ্গে

সোদপুর ও অন্যান্য রেল আফিসে সে [illegible] ব্রে [illegible] নর [illegible] স্ত কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহাদের খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি স্থানান্তর হইতে আনিবার জন্য প্রত্যেকেরই এক একখানি পাশ ছিল,—তাহার নাম Provision Pass। সে সময়ে সবে নূতন সহর বসিয়াছে, অনেক স্থানে বাজার হাট বসে নাই, তাই কর্ম্মচারিগণ ছুটীর দিনে নিজেরা যাইয়া বা অন্যদিনে চাকর পাঠাইয়া, যেখানে যে দ্রব্য ভাল ও সস্তা পাওয়া যায়, তাহা সংগৃহীত করিতেন। শনিবারে তাঁহারা সকলেই সেই রকমের এক একখানি পাশ সহ গাড়ীতে চড়িলেন; আমার এক মাসের যাতায়াতের পাশ আছে, এবং তাহাতে লেখা ছিল, এই এক মাস আমি ঐ রেলের সর্ব্বত্র যত বার ইচ্ছা বেড়াইতে পাইব।

শিলিগুড়ির রেলষ্টেশনের কর্ম্মচারিগণ আমাদের যাওয়ার সংবাদ পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন, এবং আমাদের অভ্যর্থনার জন্যও যথেষ্ট আয়োজন করিয়া-

ছিলেন। রাত্রে শিলিগুড়িতে নামিয়া ষ্টেশনে পরমসমাদরে অবস্থান করা গেল ; এবং প্রত্যুষেই জঙ্গলে ব্যাঘ্র শিকার করিতে যাওয়া হইবে, স্থির হইল। শিলিগুড়ির বন্ধুগণ নিকটস্থ একটি চা-বাগানের এক ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে পূর্ব্ব হইতেই কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই চা-বাগানের মধ্যে দুই তিন স্থানে খুব জঙ্গল ছিল, এবং সেই জঙ্গলের ধার দিয়াই একটি ক্ষুদ্রকায়া পর্ব্বতনদী ধীরে ধীরে বহিয়া যাইত। ব্যাঘ্রমহাশয়গণের অন্য দিকে দৃষ্টি আছে কি না, জানি না ; কিন্তু শরীররক্ষার জন্ত নির্ম্মল জল যে বিশেষ আবশ্যক, তাহা তাঁহাদের বিশেষ জানা আছে ; নিকটে নির্ম্মল জলাশয় না থাকিলে বাঘ সেখানে থাকেন না,—তাঁহার পানীয় জল নির্ম্মল হওয়া চাই।

পূর্ব্বকথিত চা-বাগানের ম্যানেজার সাহেব নিজে একজন ভাল শিকারী, তাঁহার অধিকার-মধ্যে যেখানে যেখানে ব্যাঘ্রের গতিবিধি আছে, এবং যে যে স্থানে তাহারা জলপান করিতে সর্ব্বদা যাতায়াত করে, তাহার সন্ধান তাঁহার জানা ছিল ; এবং তিনি সেই সেই স্থলে গাছের উপর বাঁশ, কাঠ দিয়া বেশ ভাল বসিবার স্থান প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই সমস্ত স্থানকে সে দেশে "টঙ্গ" বলে।

ডিসেম্বর মাস, শীতকাল। প্রত্যুষে উঠিয়া শীতে হি-হি করিতে করিতে প্রাতঃকৃত্য শেষ করা গেল। তাহার পর দুই তিন পেয়ালা করিয়া গরম চা পান করিয়া আমরা ছয় [illegible] ও শিলিগুড়ি ষ্টেশনের দুই জন, এই আট জনে শিকারে যাত্রা করিলাম। না ! এক জন ভৃত্য চলিল,—তাহার স্কন্ধে দুইটি বন্দুক ; ম্যানেজার সাহে[illegible] ও দুইটি বন্দুক যথাস্থানে প্রেরণ করিতে চাহিয়াছিলেন ; তিনি নিজেই এই শিকারে যোগ দিতে পারিতেন, কিন্তু সম্মুখের মেলে তাঁহাকে বি[illegible]তে অনেক চিঠিপত্র ও রিপোর্ট পাঠাইতে হইবে, সুতরাং তাঁহার অবকাশ ছিল না।

এক জন কি দুই জন হইলে, অতি সহজ কাজেও কেমন একটু আশঙ্কা হয়, কিন্তু আমরা কতকগুলি মানুষ,—উৎসাহেও কেহ কম নহেন,—সুতরাং তখন মনে বিন্দুমাত্র ভয়ের সঞ্চার হইল না ; মহা উৎসাহে আমরা পরিষ্কার চা-বাগান পার হইয়া জঙ্গলে গিয়া পড়িলাম। এই স্থানে সাহেবের বেহারা দুইটি বন্দুক লইয়া আসিল, এবং সাহেব তাহাকে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে বলিয়াছেন, তাহাও জ্ঞাপন করিল। এই বেহারা সে জঙ্গলের সমস্ত স্থানই জানিত ; সে আমাদিগকে অনেক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, শেষে

একটা ক্ষুদ্র নদীর ধারে লইয়া গেল, এবং বেলা নয়টা কি দশটার সময়ে সেখানে বাঘের আগমনসম্ভাবনা জানাইল।

আমরা তখন দুই দলে বিভক্ত হইলাম। একদল নদীর একেবারে কিনারায় যে 'টঙ্গ' ছিল, তাহাতে উঠিয়া বসিলাম; অপর দল একটু দূরে বাঘের পথের পার্শ্বে আর একটি 'টঙ্গে' বসিলেন। চাচা আমাদের দলে রহিলেন—আমাকে ছাড়িয়া থাকা তিনি সঙ্গত মনে করিলেন না; সাহেবের বেহারাও আমাদের দলেই রহিল। আমরা গাছের উপর এমন স্থানে বসিলাম যে, সেখানে বাঘের পৌঁছিবার কোনও সম্ভাবনাই নাই—আমরা নিশ্চিন্তমনে বসিয়া রহিলাম। চাচা তখন তাঁহার প্রকাণ্ড অলষ্টার-কোটের পকেট হইতে সুন্দর ফ্লুট্ বাহির করিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বাঁশী অনেক দিন অনেকবার শুনিয়াছি; কিন্তু সেদিন তাঁহার বাঁশী সত্যসত্যই অমৃতধারা প্রবাহিত করিতে লাগিল—তাঁহার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত নৈপুণ্য, বাঁশীর ভিতর দিয়া বাহির হইতে লাগিল। তিনি বাছিয়া বাছিয়া সময়োচিত সুন্দর সুন্দর রাগিণী বাজাইতে লাগিলেন। আমি দেখিলাম, খুড়া মহাশয় শিকারের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন, নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে, শুধু সেই বাঁশী একবার করুণ স্বরে, একবার তীব্র স্বরে, আবার ধীরে ধীরে, গভীর মর্ম্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। আমি অবাক্ হইয়া চাচার অদ্ভুত শিক্ষা দেখিতে লাগিলাম। বাঁশীর স্বর সমস্ত বনভূমি প্লাবিত করিয়া, দূর জঙ্গলের পত্রাবলীর মধ্যে ধীরে ধীরে মিশিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু বাঘ ত আসিল না! অবশেষে ক্লান্ত হইয়া চাচা বাঁশী ত্যাগ করিলেন।

বেলাও ক্রমে বাড়িতে লাগিল। শেষে বেহারা পরামর্শ দিল, বাঘ অবশ্যই নিকটে আছে—একবার নীচে নামিয়া একটু সন্ধান করিলে ভাল হয়। বাঘের মুখে এমন করিয়া কে যাইতে চাহে? আমরা দুই তিন জন একেবারে জবাব দিয়া বসিলাম। কখনও বন্দুক ধরি নাই,—আমরা নিতান্ত বর্ব্বরের মত প্রাণটা এই জঙ্গলে রাখিয়া যাইতে কিছুতেই সম্মত নহি। বেহারা বলিল, "এ জঙ্গলে যে বাঘ আছে, তাহারা বড় নহে; ছোট ছোট বাঘ—বোধ হয় নেকড়ে হইবে।" "হাঁ, নেকড়ে বাঘ, তারি জন্য আবার ভয়!" এই বলিয়া আমার খুড়া মহাশয় নীচে নামিতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁর Hunting dress পরা ছিল—তিনি তাহা লইয়াই নামিতেছিলেন। আমি অলষ্টারটা সায় বাঁশী সঙ্গে লইতে বলিলাম—কি জানি

যদি বাঘের উদরেই তাঁহাকে যাইতে হয়, তবে বাঁশীটিরও সহমরণে যাওয়া উচিত। চাচা অলষ্টার লইলেন না, কিন্তু বেহারাটা তাঁহার অলষ্টার কাঁধে ফেলিয়া ও দুই হাতে দুইটা গুলিপূর্ণ বন্দুক লইয়া নীচে নামিল। চাচার হাতে একটি বন্দুক। তাঁহারা আমাদিগকে বলিয়া গেলেন, যদি আমরা নিকটে বাঘের সাড়া পাই, তাহা হইলে আমরা যেন একটা শব্দ করি—শব্দ শুনিলে তাঁহারা ফিরিয়া আসিবেন।

তাঁহারা দুই জন জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের সাড়াশব্দও আর পাওয়া যায় না। এই ভাবে প্রায় আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। অবশেষে আমাদের নিকটেই জঙ্গলের মধ্যে সড় সড় শব্দ হইতে লাগিল, এবং জঙ্গলের গাছপালা কাঁপিতে লাগিল। আমরা ভাবিলাম, হয় বাঘ আসিয়াছে, আর না হয় আমাদের সঙ্গিগণই জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। চাচার আদেশমত সঙ্কেত করা আবশ্যক বোধ হইল। আমরা যে কয় জন ছিলাম, তাঁহাদের একজনের পকেটে একটা রেলওয়ে গাড়ীর Whistle ছিল; তিনি তাহাই বাজাইলেন। কিছু ক্ষণ কোনও শব্দই পাওয়া গেল না। প্রায় আট মিনিট পরে দেখা গেল, দুই তিন জন কুলি সঙ্গে, বেহারা ও খুড়ামহাশয় অতি ধীরে ধীরে, এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে আসিতেছেন। আমরা তাঁহাদের গতিবিধি বেশ দেখিতে পাইলাম। যে জঙ্গলের মধ্যে সড় সড় শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলাম, ঠিক সেই জঙ্গলের পার্শ্বে আসিয়া সাহেবের বেহারা স্থির হইয়া দাঁড়াইল; শেষে নিজের স্কন্ধ হইতে চাচার সেই প্রকাণ্ড অলষ্টার ও বাম হস্তের বন্দুকটি মাটীতে রাখিয়া, অপর বন্দুকটি লইয়া বসিল, এবং নিঃশব্দে নিশানা লইতে লাগিল; চাচাও তাহার পার্শ্বে বন্দুক ধরিয়া বসিলেন। চক্ষুর নিমেষে একটা আওয়াজ হইল, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই একটা প্রকাণ্ডকায় নেকড়ে বাঘ লাফাইয়া রাস্তার উপর আসিয়া পড়িল। বেহারা বন্দুক ছুড়িয়াছিল, কিন্তু তাহার লক্ষ্য ব্যর্থ হইয়া গেল। বাঘকে রাস্তার উপরে দেখিয়া চাচা যেই পাশ ফিরিয়া গুলি করিতে যাইবেন, অমনই দেখিতে না দেখিতে ব্যাঘ্র মহাশয় এক লম্ফে একেবারে চাচার স্কন্ধে আসিয়া পড়িলেন। আমরা ভয়ে আড়ষ্ট; কিন্তু দেখিলাম, চাচা বাঘের শরীরের নীচে হামাগুড়ি দিয়া পড়িয়াছেন, এবং তাঁহার বন্দুকটি ছুটিয়া অনেক দূরে যাইয়া পড়িয়াছে। আমরা সেই 'টঙ্গ' হইতে চীৎকার করিয়া উঠিলাম। দিশেহারা হইয়া বেহারা বেচারী আর দ্বিতীয় বন্দুক

৪২৬

কুড়াইবার অবকাশ পাইল না। তাহার মনে হইল, বাঘ হয় ত এতক্ষণ চাচার প্রাণ বাহির করিয়া ফেলিতেছে। বেহারা তখন দেখিল, তাহার হাতের কাছেই চাচার সেই প্রকাণ্ড অলষ্টার পড়িয়া আছে। সে তাড়াতাড়ি সেই অলষ্টার তুলিয়া বাঘের মাথায় ফেলিয়া দিল। সাহেবী অলষ্টারের অষ্টপৃষ্ঠেললাটে বোতাম, বন্ধনী, বেল্ট; কেমন করিয়া জানি না, অলষ্টারটি যেই বাঘের মাথায় পড়িয়াছে, আর সে মাথা নাড়া দিয়াছে। কোনও স্থানে কোনও বোতাম হয় ত আট্‌কান ছিল, বাঘ মহাশয় মাথা নাড়া দিতেই অদৃষ্টগুণে অলষ্টারটি তাহার মাথায় বেশ আটকাইয়া গেল। বাঘ মনে করিলেন, এ আবার কি এক ভীষণ জন্তু তাহার পৃষ্ঠে উপস্থিত! চাচার কথা তখন আর তাহার মনে নাই। বাঘ সেই অলষ্টারের বোঝা মাথায় করিয়া পলাইবার পথ পায় না—ভয়চকিত হইয়া সে দ্রুতপদে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং গর্জ্জন করিতে করিতে ক্রমেই দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া আমরা অবাক্! চাচা তখন গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমরা সকলে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া চাচাকে অক্ষত শরীর দেখিয়া মহা আনন্দিত হইলাম।

বেহারা বেচারীর উপস্থিতবুদ্ধিতেই চাচার এবার প্রাণরক্ষা হইল। আমাদের শিকার সে দিনের মত শেষ হইল। সকলে ফিরিবার আয়োজন করিলাম। বেহারা সাহেবের বাঙ্গালার দিকে চলিয়া গেল; আমরা তাহাকে পাঁচটি টাকা পুরস্কার দিলাম।

রাস্তায় আসিতে আসিতে চাচার আর আপশোষের সীমা নাই; তাঁর অলষ্টারটা গেল, তাহার জন্য বিশেষ দুঃখ নাই; প্রাণটি যে যাইতেছিল, সে কথাও একবারও বলা নাই। কিন্তু পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন—"তাই ত হে, আমাকে একেবারে হতভম্ব করিয়া বাঁশীটা লইয়া গেল?—এমন বাঁশী আর হবে না!"

আমার সেই পূজনীয় খুড়া মহাশয় এখন স্বর্গে, নতুবা তাঁহার মুখ হইতে এই গল্পটা শুনাইতে পারিলে বড়ই আমোদ হইত। তিনি এই শিকারের গল্প করিতে গেলেই, প্রতিবার তাঁর সেই বাঁশীটার জন্য একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেন!

শ্রীজলধর সেন।

কীর্ত্তন।

আমি কি দেখিব তোমায় হে!
তোমার সকলি সুন্দর হে—অতি সুন্দর!
তব চরণ সুন্দর, বরণ সুন্দর, সুন্দর তব নয়ন,
তুমি দাঁড়ায়ে সুন্দর, বসিয়া সুন্দর, সুন্দর তব শয়ন।
তব গমন সুন্দর, থমক সুন্দর, সুন্দর তব আলস,
তব গরব সুন্দর, অশ্রু সুন্দর, সুন্দর হাসি-বিকাশ।
তব বচন সুন্দর, রচন সুন্দর, সুন্দর তব গীতি,
তব মরম সুন্দর, সরম সুন্দর, সুন্দর তব ভীতি।

আমি কত দেখিব তোমায় হে?
তুমি সকল সময়ে মধুর হে—অতি মধুর!
তুমি দিবসে মধুর, নিশীথে মধুর, মধুর তুমি স্বপনে,
তুমি সজনে মধুর, বিজনে মধুর, মধুর তুমি গোপনে।
তুমি বিপদে মধুর, বিষাদে মধুর, মধুর যবে বরষা,
তুমি শরতে মধুর, হরষে মধুর, মধুর যবে ভরসা।
তুমি সোহাগে মধুর, মিলনে মধুর, মধুর যবে অভিমান,
তুমি কলহে মধুর, বিরহে মধুর, মধুর যবে ভাঙ্গা প্রাণ।
তুমি মধুর হে যবে আমারে ভালবাস—মধুর যবে বাস অঙ্গে,
তুমি মধুর যবে ব'স কনক-আসনে, আমার কাটে দিন দৈন্যে।

আমি কত ভালবাসিব তোমায় হে?
তুমি সদা দুর্ল্লভ হে—অতি দুর্ল্লভ!
যবে রূপে ভরি আনি দেহ কলসী—দুর্ল্লভ তুমি দুর্ল্লভ!
যবে গুণে ভরি যায় প্রাণসরসী—দুর্ল্লভ তুমি দুর্ল্লভ!
যবে সকল ভালবাসা বাসিয়া ফেলি—দুর্ল্লভ তুমি দুর্ল্লভ!
যখন অভিমানে যাইগো চলি—দুর্ল্লভ তুমি দুর্ল্লভ!
বড়ই সাধ মনে রহিব এক সনে—তুমি ফুল আমি পল্লব,
তুমি কি হবে না আমার চিরসখা,—আমার প্রাণের বল্লভ।
হে অতি-সুন্দর! হে সদা-মধুর! হে অতিশয়-দুর্ল্লভ!

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন।

826

সহযোগী সাহিত্য।

প্রত্ন-তত্ত্ব।

প্রাচীন তাম্রলিপ্ত।

আধুনিক তমলুকের সহিত আমরা পরিচিত। তমলুক মেদিনীপুর জেলার একটি মহকুমা; কলিকাতা হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় আঠার ক্রোশ দূরে সংস্থাপিত। তমলুকের প্রাচীন নাম তাম্রলিপ্ত;—পূর্ব্বকালে তাম্রলিপ্ত অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। তখন তাম্রলিপ্তের পদমূল ধৌত করিয়া সুনীল সিন্ধু চঞ্চল তরঙ্গ তুলিয়া সফেন উচ্ছ্বাসে বহিয়া যাইত, আর সেই বন্দর হইতে বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবযান মন্দ পবনে কেতন উড়াইয়া যাত্রী ও পণ্য লইয়া চীন প্রভৃতি দূরদেশে যাইত। এখন আর সে দিন নাই; এখন সেই পদতলবাহী সিন্ধুস্রোতের মত তাম্রলিপ্তের গৌরবও বিদূরিত হইয়া গিয়াছে। সমুদ্র হইতে দূরে, বিগতগৌরব তাম্রলিপ্ত সমৃদ্ধির শ্মশানের মত পড়িয়া আছে। সম্প্রতি বাবু রাজেন্দ্রলাল গুপ্ত প্রাচীন তাম্রলিপ্ত সম্বন্ধে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা সেই প্রবন্ধের সারসংগ্রহ করিয়া দিলাম।

পৌরাণিক যুগ।

পূর্ব্বকালে তাম্রলিপ্ত মৌর্য্যবংশীয় মোমধ্বজ ও তাম্রধ্বজ নৃপতিদ্বয়ের রাজধানী ছিল। তাম্রধ্বজ গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন; তিনি সম্মুখসংগ্রামে শ্রীকৃষ্ণসহায় পাণ্ডবদিগকে পরাভূত করিয়া পরিশেষে তাঁহাদিগের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করেন। তাঁহার শৌর্য্যে ও তদীয় পিতার দানশীলতায় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, সন্ধির সর্ত্তানুসারে তাঁহারা আবশ্যক হইলেই তাম্রলিপ্তে আসিতে স্বীকৃত হয়েন। যে প্রাচীন মন্দিরে তাঁহাদিগের মূর্ত্তি পূজিত হইত, সহরের একাংশের সহিত সে মন্দির এখন রূপনারায়ণের গর্ভে বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন আর তাহার চিহ্নমাত্র নাই। অপেক্ষাকৃত অল্পদিন পূর্ব্বে নির্ম্মিত আর একটি মন্দিরে এখনও তাঁহাদিগের মূর্ত্তি পূজিত হয়। সে মন্দিরে আজও অনেক যাত্রী পুণ্যলাভাশায় আসিয়া থাকে।

তমলুকের বর্ত্তমান রাজা প্রাচীন মৌর্য্যবংশের বংশধর বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন; কিন্তু মৌর্য্যবংশীয়গণ রাজপুত ছিলেন, আর বর্ত্তমান রাজা কৈবর্ত্ত। কথিত আছে, তিনি কালু ভুঁইয়ার ষড়্‌বিংশ বংশধর। মোগলসম্রাটদিগের সময় বঙ্গদেশ যে সকল অংশে বিভক্ত ছিল, সে সকল দ্বাদশ ভুঁইয়ার অধিকারে ছিল। কালু ভুঁইয়া এই দ্বাদশ ভুঁইয়ার একজন।

বৌদ্ধ যুগ।

পৌরাণিক যুগের পর তাম্রলিপ্তে বৌদ্ধপ্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এখানে অনেকগুলি বৌদ্ধবিহার ছিল ও অনেক ভিক্ষু সেখানে বাস করিতেন। এখানে প্রায় দুই শত ফিট উচ্চ একটি স্তম্ভ ছিল, তাহা অশোক কর্ত্তৃক সংস্থাপিত বলিয়াই প্রসিদ্ধ। তাম্রলিপ্ত তখন বাণিজ্যবাহুল্যে প্রধান বন্দর বলিয়া কীর্ত্তিত; এই বন্দর হইতেই চাইনিস্ ভ্রমনকারীরা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইহার পর সমুদ্রসলিল দূরে অপসারিত হইয়া গেল; কাজেই খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতেই তাম্রলিপ্তের বন্দরের বাণিজ্য বিলুপ্ত হইয়া গেল। ইহারও চার পাঁচ শতাব্দী পূর্ব্বেই তাম্রলিপ্ত হইতে বৌদ্ধপ্রভাব বিদূরিত হইয়াছিল। বর্গভীমার মন্দির পূর্ব্বে বৌদ্ধ মন্দির ছিল; ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক উহা কালীর মন্দিরে পরিণত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ মহাসমারোহে ঐ

মন্দিরমধ্যে কালীমূর্ত্তি সংস্থাপিত করেন। এখনও সেইখানে কালীমূর্ত্তি সংস্থাপিত রহিয়াছে। পণ্ডিতপ্রবর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার পুস্তকসমূহে এই মন্দিরের বর্ণনা করিয়াছেন। সার্‌-উইলিয়াম হণ্টার বলেন যে, কেহ কেহ বলেন, ইহা দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার বিরচিত। এই মন্দির অতি বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরে গঠিত; কিরূপে সেই সকল প্রস্তর অত উচ্চে উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। যে স্থানে এই মন্দির সংস্থাপিত, সে স্থান সহর অপেক্ষা অনেক উচ্চ। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রবল ঝড় ও বানের সময় বহুসহস্র সহরবাসী সেখানে আশ্রয় লইয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিল।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে রূপনারায়ণ পুর্ব্বখাদ পরিত্যাগ করিয়া নূতন খাদে প্রবাহিত হয়। সেই সময় ভূগর্ভ হইতে বহু প্রাচীন মুদ্রা ও মৃৎমূর্ত্তি (Terra cotta) বাহির হইয়াছিল। সে সকল

প্রাচীন মূর্ত্তি ও মুদ্রা।

স্থানীয় পাঠাগারে সংগৃহীত হয়। মেদিনীপুরের তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার উইল্‌সন ও মহকুমার প্রধান কর্ম্মচারী সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় তাহার মধ্যে কতকগুলি এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরণ করেন। মুদ্রাগুলির মধ্যে অধিকাংশই সচ্ছিদ্র, সে সকলের উপর কিছুই লিখিত ছিল না—কেবল পদ্ম, চক্র, চৈত্য অথবা হস্তী, মৃগ ও সিংহ প্রভৃতি জন্তুর মূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল। এই সকল মুদ্রা খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল বলিয়াই বোধ হয়। একটি বৃহৎ সুবর্ণ মুদ্রা গুপ্তরাজগণের সময়ের—তাহার এক পার্শ্বে লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত। গুপ্তরাজারা লক্ষ্মীর উপাসক ছিলেন। পণ্ডিতবর বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসু ও কলিকাতার অন্য অনেক প্রাচীন মুদ্রাতত্ত্ববিৎ একটি ক্ষুদ্রতর স্বর্ণমুদ্রায় লিখিত অক্ষরগুলি পাঠ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ঐ সকল মুদ্রার মধ্যে মোগল সম্রাটদিগের সময়ের কতকগুলি মুদ্রাও ছিল। আরঙ্গজীব তাম্রলিপ্ত নগরে একটি মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; তাহাও এখন নদীগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আর তাহার চিহ্নমাত্রও নাই।

সেই সময় যে সকল মৃৎমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল, সে সকলের মধ্যে একটি মারের—মার বৌদ্ধদিগের মতে কতকটা খ্রীষ্টানদিগের শয়তানের মত; একটি বুদ্ধজননী মায়াদেবীর—হস্তিদন্তের আকারে বুদ্ধদেব ইহারই গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন বুদ্ধ গৃহত্যাগের সঙ্কল্প করিলে, বৃদ্ধ রাজা শুদ্ধোধন পুত্রের গৃহত্যাগী মন সংসারে বদ্ধ করাইবার অভিপ্রায়ে যে সকল বিলাসচতুরা সুন্দরীদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সে সকলের মধ্যেও দুই জনের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল।

বোধ করি, অনুসন্ধান করিলে আরও বহু মূর্ত্তি ও মুদ্রা পাওয়া যাইত। ভারতবর্ষের প্রাচীন সহর সকল অনুসন্ধান করিলে, প্রাচীন সভ্যতা ও শিল্পের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু হায়, আমরা এখনও প্রত্নতত্ত্বোদ্ধারের জন্য শ্রমস্বীকার করিতে শিখি নাই। সসঙ্কোচে এ কথা স্বীকার করিতে হয় যে, প্রকৃতপক্ষে আমরা এখনও অতীতগৌরবের উদ্ধার ও নবগৌরবলাভের জন্য প্রয়াসী হইতে পারি নাই।

জীবনচরিত।

লর্ড টেনিসন।

টেনিসনের মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পরে এইবার তদীয় পুত্র তাঁহার জীবন-চরিত রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। জীবনচরিত প্রকাশে পিতার বড় বিতৃষ্ণা ছিল; তবে তিনি বলিয়াছিলেন যে, পুত্র মনে করিলে তাঁহার জীবনী প্রকাশ করিতে পারেন। তাহাতে আর কিছু না হউক, এই একটা বিশেষ লাভ হইবে যে, অন্য কেহ জীবনী রচনা করিলে তাহাতে যে সকল ভ্রম প্রমাদ থাকিবে, পুত্র জীবনী রচনা করিলে সে সকল থাকিবে না। পুত্র এতদিনে সেই জীবনী প্রকাশিত করিয়াছেন। গোপনীয় পত্রাদিও অনেক সময় জীবনীতে প্রকাশিত হয়। সে সম্বন্ধে টেনিসনের মত তিনি মিষ্টার গ্লাডষ্টোনকে লিখিত এক পত্রে স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, তিনি একজন মহিলার কথা শুনিয়াছেন; দেশের অনেক প্রতিষ্ঠাপন্ন লোক তাঁহাকে পত্রাদি লিখিতেন; কুড-বিরচিত কার্লাইলের জীবনী প্রকাশিত হইলে, তিনি সে সকল পত্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন; তিনি বলিয়াছিলেন—সে সকল পত্র তাঁহার জন্য, সাধারণের জন্য নহে। টেনিসন বলেন, সেই বৃদ্ধা মহিলার উদ্দেশে একটা মন্দির সংস্থাপন করা উচিত।

জীবনচরিত।

অভিজাতত্ব লইতে টেনিসনের বিশেষ আপত্তি ছিল। "ব্যারনেট্‌সি" লইতে অনুরুদ্ধ হইয়া, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি মিষ্টার গ্লাডষ্টোনকে বলেন যে, মিষ্টার ও মিসেস্ টেনিসন থাকিতেই তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর ইচ্ছা; তবে তাঁহাদের পুত্রকে সম্মানিত করিলে তাঁহাদিগের আপত্তি নাই। রাজভক্ত টেনিসন এ সম্মান লইতে অস্বীকৃত হইয়া রাণীর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করেন নাই। ইহার পর লর্ড বীকন্সফীল্ড একবার টেনিসনকে অভিজাতত্ব প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। টেনিসন তাহা লইতে স্বীকৃত হয়েন নাই। ইহার পর একবার টেনিসন, মিষ্টার গ্লাড্‌ষ্টোন প্রভৃতি সার ডোনাল্ড কারীর 'পেম্‌ব্রোক কাস্‌ল্‌' নামক ষ্টীমারে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেই সময় মিষ্টার গ্লাডষ্টোন পিতাকে অভিজাতত্ব প্রদানের ইচ্ছা পুত্রের নিকট প্রকাশ করেন। পুত্রের আশঙ্কা হইল, ইহাতে চিন্তা করিতে হইবে; সুতরাং পিতার আনন্দহানির সম্ভাবনা। মিষ্টার গ্লাডষ্টোন মহারাণীকে লিখিবার জন্য কবির মত জানিতে চাহিলে, পুত্র শেষে পিতার নিকট প্রস্তাব করিতে সম্মত হইলেন; পরিশেষে পুত্র ধূমপানরত পিতাকে এ কথা জানাইয়া চলিয়া গেলেন; কিছুক্ষণ পরে আসিয়া দেখেন, মিষ্টার গ্লাডষ্টোন ও মিষ্টার টেনিসন হোমারের উপমা সম্বন্ধে আলোচনায় মগ্ন। অনেক ভাবিয়া শেষে টেনিসন অভিজাতত্ব লইতে স্বীকৃত হয়েন। টেনিসন বেশবিন্যাসে নিতান্তই অমনোযোগী ছিলেন; মিষ্টার গ্লাড্‌ষ্টোনের আশঙ্কা ছিল, পাছে টেনিসন কোন দিন সেই সাধারণ বেশে লর্ড সভায় যাইয়া উপস্থিত হয়েন।

অভিজাতত্ব।

টেনিসনের জীবনে তাঁহার পত্নীর যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তিনি আপনি অনেক ক্লেশকর কার্য্য করিয়া স্বামীকে বিশ্রামদান করিতেন। স্বামীর পত্রাদির উত্তর স্ত্রীই প্রদান করিতেন। কবিতা ছাপাইবার পূর্ব্বে কবি একবার তাহা পত্নীকে শুনাইতেন। কবির নিকট পত্নীর সমালোচনার বিশেষ আদর ছিল। পত্নীর পবিত্র প্রেমপূর্ণ প্রভাবে টেনিসনের দাম্পত্যজীবন ও পারিবারিক জীবন অত্যন্ত সুখের হইয়াছিল। পত্নীসৌভাগ্যে সৌভাগ্যশালী কবির জীবন যে হতাশার শ্মশানভূমি হইতে পায় নাই, সে কেবল মনোমত বুদ্ধিমতী পত্নীর প্রভাবে।

পত্নীর প্রভাব।

সম্প্রতি অধ্যাপক নাইট 'ব্ল্যাকউডস্ ম্যাগাজিন' পত্রে টেনিসনের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই বিবরণ হইতেও আমরা কয়েকটি কথা সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

কথাবার্ত্তা।

টেনিসনের কবিতা পাঠ করিয়া যেমন মুগ্ধ হইতে হয়, তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়াও তেমনই মুগ্ধ হইতে হইত। কার্লাইলের কথাবার্ত্তায় মধ্যে মধ্যে যে ঔজ্জ্বল্য ও যে স্রোতোবেগ ছিল, টেনিসনের কথাবার্ত্তায় সে সকল ছিল না; তাঁহার কথাবার্ত্তা বিশেষ সংযত ছিল। ব্রাউনিংএর কথাবার্ত্তার সম্বদ্ধভাব বা রাস্কিনের কথাবার্ত্তার পূর্ণতাও টেনিসনের ছিল না—টেনিসনের কথাবার্ত্তা স্ফটিকের মত নির্ম্মল; তাঁহার কথাবার্ত্তা স্থির, গম্ভীর ও উজ্জ্বল—তাহাতে বাহুল্য ছিল না।

টেনিসনের আর এক বিশেষ গুণ ছিল, তিনিই কথা একচেটিয়া করিয়া লইতেন না। অপরের মতামত তিনি জানিতে চাহিতেন, তাই অপরকে কথাবার্ত্তা কহিবার অবসর দিতেন। টেনিসন সহজেই কথার বাহ্যাবরণ ভেদ করিয়া মর্ম্মস্থলে উপনীত হইতে পারিতেন। আবার টেনিসনের এই মর্ম্মভেদী সূক্ষ্মদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে সরলতা ছিল। টেনিসন তাঁহার সমসাময়িক লেখকদিগের প্রশংসার যোগ্য রচনার প্রশংসা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

টেনিসন বলিতেন, পূর্ব্বকাল হইতে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সাত জন কবির স্থান সর্ব্বোচ্চে। সে সাত জন—হোমার, অ্যাস্‌কিলাস, সোফোক্লেস, ভার্জিল, সেক্‌স্‌পিয়ার ও গেটে। ত্রয়োদশ হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে টেনিসন একখানি মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা সে কাব্যখানির প্রশংসা করিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন যে, সেই কাব্যের কবি ভবিষ্যতে ইংরাজী-সাহিত্যে অতি উচ্চ স্থান পাইবেন। কিন্তু শেলীর প্রথম বয়সের কবিতা দেখিয়া, কবি সে কাব্যখানি ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন। পাঠক English Idylls এ কবির সেই কথা স্মরণ করিবেন—

> "These twelve book of mine
> Were faint Homeric echoes, nothing worth,
> Mere chaff and draff, much better burnt."

অজ্ঞাত রাজ্য।

টেনিসন বলিতেন, আমাদিগের চারি দিকে যাহাকে আমরা অজ্ঞের রাজ্য বলি, প্রকৃত পক্ষে তাহা অজ্ঞের রাজ্য নহে। তিনি লেখকের নিকট কয়েকটি ভূতের গল্পও করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, সকল দ্রব্যই একটা সম্পূর্ণতার অংশমাত্র,—কাজেই কোন অংশেরই ধ্বংস অসম্ভব। টেনিসনের In Memoriam গ্রন্থ পাঠ করিলে তাঁহার এই সকল মতের আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। টেনিসন ঈশ্বর, কর্ত্তব্য ও অমরত্ব, এই তিনের প্রতি বিশেষ ভক্তিমান ছিলেন।

টেনিসন আজ আর ইহজগতে নাই, কিন্তু তাঁহার যশঃসৌরভে ইংরাজী-সাহিত্য আমোদিত। যতদিন ইংরাজী-সাহিত্য থাকিবে, ততদিন ইংরাজী পাঠক তাঁহার কবিতা পাঠ করিয়া আনন্দ ও শিক্ষালাভ করিবে। মধুসূদন সত্যই বলিয়াছেন—

> "সেই ধন্য নরকুলে,
> লোকে যারে নাহি ভুলে,
> মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।"

ভ্রমণবৃত্তান্ত।

লাডক।

লাডক ভারতবর্ষের অতি নিকটেই সংস্থাপিত; কিন্তু লাডক সম্বন্ধে আমাদিগের অভিজ্ঞতা অতি সামান্য। লাডকে যাইবার অসুবিধা অল্প নহে। ম্যাডাম্ ইসাবেল মাস্ সম্প্রতি কোন ফরাসী পত্রে তাঁহার লাডক-ভ্রমণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষ, আফগানিস্থান প্রভৃতি পরিভ্রমণের পর কাশ্মীর হইতে রওনা হইয়া পামীর পার হন ও তুর্কিস্থান দিয়া য়ুরোপে প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্কল্প করেন; কিন্তু ভারত গভর্মেণ্টের পররাষ্ট্রবিভাগের কর্ম্মচারীরা নিবৃত্ত করিলে, তিনি ইংরাজাধিকৃত লাডকের রাজধানী লে নগরে গমন করেন।

কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর হইতে গেলে পূর্ব্ব দিকে লাডক পঞ্চদশ দিবসের পথ। চারি জন প্রধান ভৃত্য, অনেকগুলি কুলি প্রভৃতি লইয়া লেখিকা শ্রীনগর হইতে যাত্রা করেন। পথে

লাডকের পথে।

দেখিবার জিনিস, পার্ব্বত্য ছাগদল; ভারত গভর্মেণ্ট বহুকষ্টে এই সকল ছাগের আক্রমণ হইতে পঞ্জাবের বনবিভাগ রক্ষা করেন। ছাগপালগণের গঠন বলিষ্ঠ, চক্ষু উজ্জ্বল, নাসা তীক্ষ্ণাগ্র, শ্মশ্রু ভ্রমরকৃষ্ণ—যেন গ্রীকজাতির মত। তাহাদিগের রমণীরাও রূপলাবণ্যসম্পন্না; প্রায়ই দেখিতে পাইবে, সুন্দর কণ্ঠাভরণশোভিতা, হাস্যময়ী রমণীরা তুষারধবলহস্তে মস্তকে স্থাপিত ভার ধারণ করিয়া যাইতেছে। ভূস্বর্গ কাশ্মীর ত্যাগ করিয়া লেখিকা অমরনাথের গুহা সকলের সন্নিকটে সমুপস্থিত হয়েন;—বহু হিন্দু যোগী ও যোগিনী প্রবল শীতে এই সকল তুষারাবৃতদ্বার গুহামধ্যে যাইয়া সাধনা করেন।

অল্প দূর অগ্রসর হইয়াই লেখিকা নূতন নূতন আচার ব্যবহার লক্ষ্য করিতে আরম্ভ করেন। বল্‌তিস্থানে পুরুষদিগের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত; কিন্তু তিব্বতবাসী ও ভোট-

আচার ব্যবহার।

দিগের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের বহুবিবাহ প্রচলিত; তিন চারি ভ্রাতার একমাত্র পত্নী,—ইহার উপর স্বামীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার অধিকার স্ত্রীর আছে; সে অধিকার বিশেষরূপে ব্যবহৃতও হইয়া থাকে। এরূপ বিবাহের কারণও আছে; অনুর্ব্বর দেশে যাহাদিগের বাস, তাহাদিগের মধ্যে জনসংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়া বড় সুবিধার কথা নহে।

পথে প্রায়ই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৌদ্ধস্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। গোলাকার সেই সকল স্তম্ভ প্রায়ই পল্লীপার্শ্বে জনহীন সঙ্কটসঙ্কুল স্থানে সংস্থাপিত। সে সকল স্মারক স্তম্ভ—সে সকলের

দৃশ্য।

মধ্যে মৃত ব্যক্তির ভস্ম ও মৃত্তিকা মিশাইয়া কতকটা বুদ্ধমূর্ত্তির মত করিয়া নির্ম্মিত একটা একটা মূর্ত্তি সংস্থাপিত। স্তম্ভপ্রাচীরে সংস্কৃত বা তিব্বতীয় ভাষায় প্রার্থনা লিখিত;—যাহারা দক্ষিণে যায়, তাহারা ঐ প্রার্থনা পাঠ করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিয়া যায় বলিয়া গণ্য করা হয়; যাহারা বামে যায়, তাহাদের অশুভ হয়। চীনদেশে একটা চক্রে প্রার্থনা লিখিত হয়, সেই চক্র আবর্ত্তিত করিলেই প্রার্থনার পুণ্যলাভ হয়।

লাডকের মহিলারা আদৌ মুসলমানমহিলার মত নহেন। তাঁহারা উজ্জ্বল বর্ণের বেশ পরিধান করেন। লেখিকা বলেন যে, বৃদ্ধারা দেখিতে শ্রীহীনা—যুবতীরা মোটের উপর চলনই রকমের সুন্দরী। দেশের লোকেরা নৃত্য ভালবাসে। লেখিকা বলেন, মুসলমানধর্ম্ম ক্রমেই বিস্তৃত হইতেছে। তিনি লামাদিগের নিন্দা করিয়াছেন।

বিবিধ।

অতলতলে।

এই যে সাগর—অতল, অকূল, অসীম, অবিরামগতি—ইহার অন্তরে কি অনন্ত রহস্য নিহিত আছে, কে তাহার নির্ণয় করিতে পারে? কখন স্থির গম্ভীর, কখন বীচিবিক্ষুব্ধ, কখন মত্ত "ফেনাময় ফণাময় বৃথা ফণিবর"; যুগযুগান্তরের কত আনন্দ, কত বিষাদ, কত অভ্যুত্থান, কত বিলয়, কত গঠন, কত ধ্বংস, কত কাহিনী যে ইহার দিগন্তবিস্তৃত জলরাশির সহিত বিজড়িত, তাহা কে বলিবে? কে বলিবে, ইহার কলকল নিনাদে কি ভাষা প্রকাশিত হইতেছে? প্রকৃতির উপাসক কবিবর বায়রণ বলিয়াছেন,—

> "কল্লোলে বহিয়া যাও নীল সিন্ধুজল,
> পোতমালা বৃথা তব বক্ষে ভাসি যায়;
> মৃত্তিকায় চিহ্ন রাখে মানবের বল,
> তার ক্ষমতার শেষ তোমার বেলায়।"

এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাতকে জ্ঞাত করিবার ইচ্ছা মানবের হৃদয়ে ক্রমেই প্রবল হইতেছে; সেই ইচ্ছা হইতে নানা চেষ্টা উদ্ভূত হইতেছে। এখন মানবের চেষ্টা—

> "To follow knowledge like a sinking star,
> Beyond the utmost bound of human thought."

এখন অতলতলের অনুসন্ধানেচ্ছু মানব সাগরের তলদেশ পরীক্ষা করিবার যথাসম্ভব চেষ্টা করিতেছে। সে চেষ্টা একেবারে বিফল হয় নাই। সম্প্রতি ডাক্তার ফিপসন 'চেম্বার্স জর্ণাল' নামক পত্রে সিন্ধুতল সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। সেই প্রবন্ধ হইতে বর্ত্তমান প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইল।

সিন্ধুতলে বৈচিত্র্য নাই।

এ পর্য্যন্ত পরীক্ষায় যাহা জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, সিন্ধুতলে ভূভাগের মত বৈচিত্র্য নাই। ভূতলে বৃষ্টি, স্রোতস্বিনী, রৌদ্র, শীত, আতপ, বায়ু, তুষার প্রভৃতির প্রভাবে বৈচিত্র্য উৎপন্ন হয়, সাগরতলে এ সকলের প্রভাব নাই। সাগরতলে সুদূরপ্রসারিত সমতল ভূমি, উপত্যকা, এবং কোথাও কোথাও পর্ব্বতশ্রেণীও লক্ষিত হয়। এই সকল পর্ব্বতের মস্তক সময় সময় সাগরের জলরাশি ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত ও লক্ষিত হয়। যদি বঙ্গোপসাগরের কথাই ধরা যায়, তবে আমরা দেখিতে পাই যে, তাহার তলদেশে বহুদূরবিস্তৃত সমতলভূমি রহিয়াছে। কোথাও কোথাও তাহার পরিসর সহস্র মাইল পর্য্যন্ত দেখা যায়। সেই সমতলভাগে কেবল এক সারি গিরিশ্রেণী সিন্ধুসলিলমধ্যে গর্ব্বোন্নত শির উত্তোলিত করিয়া দণ্ডায়মান—সিন্ধুস্রোত তাহাদিগের প্রতিরোধক্ষম শরীরে আঘাত করিয়া বহিয়া যাইতেছে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ এই গিরিশ্রেণীর উপর সংস্থাপিত। সিন্ধুতলে না আছে শীতাতপবৈচিত্র্য, না আছে বায়ু, না আছে সলিলের আন্দোলন। সলিলের আন্দোলন নাই বলিলে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। এত যে তরঙ্গভঙ্গ, এত যে স্রোত, ইহার কিছুই সাগরের তলদেশ পর্য্যন্ত পৌঁছে না। সকলই উপরে উঠিয়া উপরেই বিলীন হইয়া যায়। সিন্ধুতলে জলজ উদ্ভিদাদিও নাই;—সে সকলের বর্দ্ধনের জন্য সূর্য্যকর আবশ্যক, সিন্ধুতলে সূর্য্যকর পৌঁছে না।

আলোক ও উত্তাপ।

সমুদ্রের জলরাশি সাগরতল হইতে সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ সযত্নে অপসারিত করে। আমরা দেখিতে পাই, আকাশে মেঘোদয় হইলে একটু শীত বোধ হয়—মেঘ জলের রূপান্তরমাত্র। সিন্ধুতল ও সূর্য্যালোক এতদুভয়ের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী মেঘমাত্র নাই; পরন্তু অনন্ত কাল ধরিয়া দুই চারি ক্রোশ গভীর জলরাশি

বিদ্যমান। সাগরের উপরিভাগ হইতে অল্প দূর, এমন কি, ত্রিশ গজ মাত্র নামিলে প্রখর প্রভাকর-কিরণ স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকবৎ প্রতীয়মান হয়। অতি স্বচ্ছজলপূর্ণ হ্রদেও সূর্য্যালোক ৩১০ গজের অপেক্ষা অধিক নিম্নে প্রবেশ করিতে পারে না। অতি গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও তপনকিরণ সাগরসলিলে ৪০০ গজের নিম্নে যাইতে পারে না। তন্নিম্নে কেবল অন্ধকার,—"না সেথায় দিন ভায়, না নিশীথ-তারা!"

ভূপৃষ্ঠে উদ্ভিদের বৈচিত্র্য দেখিয়া বিস্ময় জন্মে, কিন্তু সিন্ধুগর্ভে উদ্ভিদের চিহ্নমাত্র নাই। সূর্য্যালোক ভিন্ন উদ্ভিদ জন্মিতে ও বর্দ্ধিত হইতে পারে না। কাজেই অতলতলে শব্দহীন, আলোকহীন, সীমাহীন প্রান্তর ও উপত্যকায় উদ্ভিদমাত্র নাই। ইহাতে সহজেই মনে হইতে পারে যে, সিন্ধুতলে কোন প্রাণী নাই।

জলতলে জীব।

সে কথা সত্য নহে—প্রকৃতপক্ষে সিন্ধুতলে অসংখ্য জীব বাস করে। আমরা সকলেই অবগত আছি যে, ভূপৃষ্ঠে আমাদিগের প্রতিবর্গইঞ্চ স্থানে বায়ুস্তরের যে চাপ সহ্য করিতে হয়, তাহার পরিমাণ ৭½ সের। বায়ু অপেক্ষা জল গুরুভার, কারণ প্রায় ৪৫ মাইল উচ্চ বায়ুস্তরের চাপ আর কেবল ৩৩ ফিট উচ্চ জলরাশির চাপ সমান। কাজেই প্রায় ৪০০০ গজ গভীর জলতলে প্রতিবর্গইঞ্চের ভার প্রায় ২½ টন। অতলতলবাসী প্রাণিকুল এই গুরুভার বহন করে। আবার তাহাদিগের বাসস্থানে সূর্য্যালোক নাই—সেখানে শীত অত্যন্ত প্রবল, সেখানে আহার্য্য উদ্ভিদের লেশমাত্র নাই। এই সকল জীব মাংসভোজী। ইহাদিগের মধ্যে অনেক প্রাণীর দৃষ্টিশক্তি নাই। আবার কোন কোন জীবের দেহ হইতে আলোক বিকীর্ণ হইয়া থাকে। ভূপৃষ্ঠে আমরা সকলেই খদ্যোতের অঙ্গনিঃসৃত আলোক দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। যে সকল জীবের দেহ হইতে এইরূপে আলোক বিকীর্ণ হয়, তাহাদিগের দৃষ্টিশক্তি উৎপন্ন হয়। বিবর্ত্তনের নিয়মই এইরূপ।

যখন অতলতলে উদ্ভিদ নাই, তখন এই সকল অতলবাসী জীব আহার ও অম্লজান পায় কোথা হইতে? ভূপৃষ্ঠে আমরা দেখিতে পাই, প্রাণিগণ অম্লজানের জন্য (অর্থাৎ গ্রহণোপযোগী বায়ুর জন্য) বৃক্ষলতাদির উপর নির্ভর করে; প্রাণিকুল কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অঙ্গারকায় উদ্ভিদের পক্ষে যেমন অত্যাবশ্যক, উদ্ভিদ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অম্লজান তেমনই প্রাণিকুলের পক্ষে অত্যাবশ্যক। মুখ্যভাবেই হউক আর গৌণভাবেই হউক, সকল প্রাণীরই জীবনধারণের জন্য উদ্ভিদের প্রয়োজন; অনেক প্রাণী আমিষ আহার করে সত্য, কিন্তু তাহারা যে সকল প্রাণীর মাংসে দেহ পরিপুষ্ট করে, তাহারা উদ্ভিদ আহার করে। তবে অতলতলবাসী জীবগণ কিরূপে জীবনধারণ করে?

পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, সিন্ধুর উপরিভাগে উদ্ভিদের অভাব নাই—তথায় বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদপদার্থ বিদ্যমান। সেই সকল সর্ব্বদাই ধারাধর-ধারাপাতের মত সিন্ধুতলে নিপতিত হইতেছে; আবার নদীর স্রোতের সহিত বহু উদ্ভিদপদার্থ সাগরে নীত হয়,—সে সকলও সিন্ধুতলে স্থান প্রাপ্ত হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীরা সেই সকল আহার করিয়া জীবন ধারণ করে; আবার জীবন-সংগ্রামের তাড়নায় বৃহৎ প্রাণীরা সেই সকল প্রাণীর আমিষে দেহ পরিপুষ্ট করে। এইরূপে সিন্ধুতলে, বায়ু, আলোক ও শব্দহীন অতলেও ভূপৃষ্ঠের মত জন্মমৃত্যুর অলঙ্ঘ্য নিয়মে চালিত হইয়া বহু জীব নিত্য বিচরণ করিতেছে। সে কথা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়।

বোধ করি, পাঠকগণ অবগত আছেন,—কোনও কোনও প্রাণীর দেহাবশেষ একত্রিত হইয়া পরিশেষে জীববাসযোগ্য বৃহৎ বৃহৎ দ্বীপের উৎপত্তি হয়।

মলিনমুখী।

২

মরি কি অমৃতময় করুণ বদনখানি ;
অবসন্ন ভুজলতা কোমল যুগল পাণি,
মলিন নয়ন চল—
কিবা নীলে ঢল ঢল,
কমনীয় অঙ্গে যেন মাখা স্বর্ণ-সরলতা ;
লজ্জাময়ী, মধুময়ী, বসন্তের বনলতা !

২

প্রবেশি' বিধাতা যেন লাবণ্য-বিলাসবনে,
প্রফুল্ল কুসুমগুলি অবচয়ি' সযতনে,
কমলের দল দিয়ে,
চম্পকের বর্ণ নিয়ে,
মিশা'য়ে মল্লিকা যূথী আরো কত পুষ্পসনে,—
গড়িল শ্রীঅঙ্গ তব বসি যেন নিরজনে।

৩

উষার চুম্বনে যথা নীল নীরে সরোবরে,
স্ফুট কমলের মধু মৃদু ধীরে ধীরে ঝরে !
তেমতি ও কলেবরে,
কত উষা আলো করে ;
কত পরিমল সহ স্বর্গীয় অমৃতরাশি
ঝরিতেছে তব রূপে কি সুষমা পরকাশি'।

৪

হে বিধাতঃ ! বল দেব কোন্ দুরদৃষ্টফলে,
এমন ফুটন্ত পদ্ম মলিন নীহারজলে ?
কষিত নির্ম্মল হেম,
মলিনতা মাখা কেন,
পূর্ণিমা-চন্দ্রমা কেন মাখান কলঙ্ক-থরে,
সরোজী শৈবালে বুঝি রম্যতর শোভা ধরে ?

৫

এমনি মলিনমুখে থাক লো মলিনমুখী ;
মধুর মলিনে মেলা করে প্রাণ কত সুখী।
লবঙ্গের লতা সম,
অঙ্গ যষ্টি-মনোরম,
মলিনে এলান কিবা আবেশে বিষাদভারে,
শুভ্র যূথীরাশি যেন প্রকৃতির কণ্ঠহারে !

৬

এই বিষাদিনীবেশে থাক তুমি ক্ষীণাঙ্গিনী,
নিন্দির' ত্রিদিবশোভা শতসাজে উল্লাসিনী,
উষার কুন্তলতলে
যথা শুকতারা জ্বলে,
ম্লানজ্যোতিঃ কিন্তু রূপে ধরাদিবি-উজ্বলিনী,—
নীহারে নিষিক্ত কিংবা ম্লানশোভা সরোজিনী।

৭

হেম-অঙ্গে নাহি কাজ হেম-রত্ন-অলঙ্কারে ;
শুভ্র শেফালিকা দেখ পতিত সৌরভভারে ;
আভরণহীন কায়—
পরিপূর্ণ সুষমায় ;
প্রত্যঙ্গে প্রকৃতি কিবা লিখিয়া সৌন্দর্য্যলেখা,
দিয়াছে আদরে চারু চরণে অলক্তরেখা।

৮

সরলতা মধুরতা কোমলতা মাখাইয়ে—
প্রেম-পুষ্পমালা দিয়ে যে বাঁধা বেঁধেছ প্রিয়ে,—
ছিঁড়িতে কি পারি তারে ?—
প্রেমভরে সহকারে—
বাঁধিলে মল্লিকা লতা, কভু কি ছিঁড়িয়া যায় ?
ভুলিব না এ জীবনে,—ভুলিও না কভু হায় !

শ্রীহরিশচন্দ্র নিয়োগী।

কাজির বিচার।

একালের ধর্ম্মাবতারগণ সেকালের "কাজির বিচারের" নাম শুনিলেই নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। ধর্ম্মাবতারদিগের বিশেষ অপরাধ নাই—জনশ্রুতির কল্যাণে "কাজির বিচার" নিতান্তই অশ্রদ্ধার কথা হইয়া উঠিয়াছে। লোকের বিশ্বাস, কাজি সাহেব আইনকানুনের ধার ধারিতেন না, বিদ্যাবুদ্ধিরও সংস্রব রাখিতেন না—যখন যাহা ইচ্ছা হইত, একটা খামখেয়ালি রকমের বিচার-মীমাংসা করিয়া বসিতেন, আর হতভাগ্য জনসাধারণকে তাহাই মাথা পাতিয়া সুবিচার বলিয়া গ্রহণ করিতে হইত! ইহা অবশ্যই ভ্রান্ত বিশ্বাস, কিন্তু এখন আর সহজে ইহা দূর হইবার নহে।

"কাজির বিচারের" কলঙ্কভঞ্জন করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের লক্ষ্য নহে, তাহার একটি মোটামুটি ঐতিহাসিক চিত্র প্রদান করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। যাঁহারা সেকালের গোঁড়া, তাঁহারা ইহাতে স্বমতসমর্থনোপযোগী অনেক তথ্য লাভ করিবেন; যাঁহারা একালের গোলাম, তাঁহারা ইহাতে সেকালের অনেক অপকীর্ত্তির সন্ধান প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু যাঁহারা সেকালের ও একালের সুখদুঃখ তুলনায় সমালোচনা করিয়া বিশেষ কোন পার্থক্য দেখিতে পান না, তাঁহারা "কাজির বিচারের" সহিত একালের সুবিচারের তুলনা করিবামাত্র, হয় ত বলিয়া উঠিবেন, এখানেও পার্থক্য বড় অধিক বলিয়া বোধ হইতেছে না!

মুসলমান-শাসনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অর্থী ও প্রত্যর্থী উভয়েই মুসলমান, অথবা উভয়েই হিন্দু হইলে, "কাজির বিচারে" বড় একটা বিচারবিভ্রাট ঘটিতে পারিত না। কোন কোন ইংরাজ ইতিহাসলেখকও এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অর্থী-প্রত্যর্থীর মধ্যে এক পক্ষ মুসলমান হইলে কোন কোন স্থলে কিছু কিছু গোলযোগ ঘটিয়া উঠিত। কখন বা রাজবিধির কষ্টকল্পিত কদর্থ বাহির হইত, কখন বা রাজবিধি নির্দ্দয়রূপে পদবিদলিত হইত, এবং মোটের উপর কাজি সাহেবের অপরিসীম স্বজাতিবাৎসল্যের খাতিরে হিন্দুপক্ষকে ন্যায় বিচারের নামে কিয়ৎপরিমাণে অন্যায় অত্যাচার সহ্য করিতে হইত! *

* The Hindoos were in many instances exposed to unfair and partial decisions, but more particularly where a Mussulman was con-

কাজির বিচারের ইহাই প্রধান কলঙ্ক। ইহার জন্য মুসলমানশাসনাধীন হিন্দুপ্রজাসাধারণ "কাজির বিচার" উপলক্ষ করিয়া কত কি কুৎসা রটনা করিয়া আসিয়াছেন। নিরপেক্ষ ইতিহাসের বিচারে ইহা অবশ্যই তুরপনেয় কলঙ্ক মধ্যে পরিগণিত হইবে; কিন্তু ইতিহাস বলিবে যে, এই শ্রেণীর কলঙ্ক একরূপ অপরিহার্য্য। ব্রাহ্মণানুশাসিত স্বাধীন ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণশূদ্রে কলহ উপস্থিত হইলে যাহা হইত, মুসলমানাধিষ্ঠিত হিন্দুস্থানে হিন্দুমুসলমানে বিবাদ বাধিলে যাহা হইয়াছে, ইংরাজাধিকৃত বৃটিশ ইণ্ডিয়ায় শ্বেতকৃষ্ণের দ্বন্দ্বে অধিকাংশ স্থলে যাহা হইয়া থাকে, তাহা এই ঐতিহাসিক সত্যের পুনরুক্তি-মাত্র। আজকাল সাময়িক পত্রে, সভামণ্ডপে বা পুস্তকবিশেষে "সিবিলিয়ানী বিচারের" যে সকল দৃষ্টান্ত প্রকটিত হইয়া থাকে, তাহাতে সাহস হয় যে, উত্তর কালে কাজি সাহেবকেই একাকী সমস্ত লোকাপবাদ গলাধঃকরণ করিতে হইবে না, আমাদের সিবিলিয়ান ভ্রাতৃগণও তাহার অংশ লইবার জন্য ছুরি কাঁটা চালাইতে পারিবেন!

হিন্দু, মুসলমান এবং খৃষ্টান, এই তিন ধর্ম্মের উপাসকগণ যথাক্রমে ভারত-বর্ষে আত্মশক্তি বিস্তার করিয়া আসিয়াছেন। হিন্দুর দিন চলিয়া গিয়াছে, মুসলমানের দিনও চলিয়া গিয়াছে, এখন সুসভ্য সুশিক্ষিত খৃষ্টানের আমল চলিতেছে। এই তিন আমলের বিচারপ্রণালীর তুলনায় সমালোচনা করিতে বসিলে, একটি কথা সর্ব্বাগ্রে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়,—ইতিহাসোক্ত এই তিন প্রধান ও পরাক্রান্ত জাতির দণ্ডবিধির মধ্যে ব্যক্তিভেদে শাস্তিভেদের ব্যবস্থা নাই কি? মুসলমান এবং খৃষ্টান উভয়েই গোখাদক, সুতরাং হিন্দুর নিকট অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছ বলিয়া ঘৃণার্হ। কিন্তু এই ঘৃণার্হ ম্লেচ্ছদিগের ব্যবস্থাশাস্ত্রে ব্যক্তিভেদে দণ্ডভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। বিচারে অপরাধ প্রমাণীকৃত হইলে, হিন্দুর একরূপ শাস্তি, আর মুসলমানের অন্যরূপ, অথবা ইংরাজের একরূপ ও "নেটিভের" অন্যরূপ, মুসলমান বা ইংরাজদিগের ব্যবস্থাশাস্ত্রে এরূপ কোনও ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এ বিষয়ে হিন্দুব্যবস্থা-শাস্ত্রের নিয়ম কিছু স্বতন্ত্র। তাহাতে একই অপরাধের জন্য ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের পক্ষে বিভিন্ন দণ্ডের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। যে অপরাধে ব্রাহ্মণের কেবলমাত্র অর্থদণ্ড হইবার ব্যবস্থা আছে, সেই অপরাধে শূদ্রের প্রাণদণ্ড

---

cerned, in which case the Law of MAHAMMED was doubtless often misinterpreted, and wrested to the purposes of injustice.——Hamilton's HEDAYA, Preliminary Discourse, XIV.

পর্য্যন্তও হইতে পারে! কেহ কেহ হয় ত মনে করিবেন যে, ইহারই নাম যথার্থ "কাজির বিচার", অথবা ইহা হয় ত নিতান্তই রচা কথা! যাঁহারা কাজির বিচার অথবা সিবিলিয়ানী বিচার লইয়া সর্ব্বদাই হাস্যকৌতুকে বন্ধুজনকে পরিতুষ্ট করিয়া থাকেন, তাঁহারা মানবধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত অষ্টমাধ্যায়ের নিম্নলিখিত রাজবিধিগুলি পাঠ করুন :—

শতং ব্রাহ্মণমাক্রুশ্য ক্ষত্রিয়ো দণ্ডমর্হতি।
বৈশ্যোঽপ্যর্দ্ধশতং দ্বে বা শূদ্রস্তু বধমর্হতি॥
পঞ্চাশদ্ব্রাহ্মণো দণ্ড্যঃ ক্ষত্রিয়স্যাভিশংসনে।
বৈশ্যে স্যাদর্দ্ধপঞ্চাশচ্ছূদ্রে দ্বাদশকো দমঃ॥
সমবর্ণে দ্বিজাতীনাং দ্বাদশৈব ব্যতিক্রমে।
বাদেষ্ববচনীয়েষু তদেব দ্বিগুণং ভবেৎ॥
একজাতির্দ্বিজাতীংস্তু বাচা দারুণয়া ক্ষিপন্।
জিহ্বায়াঃ প্রাপ্নুয়াচ্ছেদং জঘন্যপ্রভবো হি সঃ॥
মনু। ২৬৭—২৭০।

শূদ্রো গুপ্তমগুপ্তং বা দ্বৈজাতং বর্ণমাবসন্।
অগুপ্তমঙ্গসর্ব্বস্বৈর্গুপ্তং সর্ব্বেণ হীয়তে॥
বৈশ্যঃ সর্ব্বস্বদণ্ডঃ স্যাৎ সংবৎসরনিরোধতঃ।
সহস্রং ক্ষত্রিয়ো দণ্ড্যো মৌণ্ড্যং মূত্রেণ চার্হতি॥

ব্রাহ্মণীং যদ্যগুপ্তাস্তু গচ্ছেতাং বৈশ্যপার্থিবৌ।
বৈশ্যং পঞ্চশতং কুর্য্যাৎ ক্ষত্রিয়ন্তু সহস্রিণঃ॥
উভাবপি তু তাবেব ব্রাহ্মণ্যা গুপ্তয়া সহ।
বিপ্লুতৌ শূদ্রবদ্দণ্ড্যৌ দগ্ধব্যৌ বা কটাগ্নিনা॥
সহস্রং ব্রাহ্মণো দণ্ড্যো গুপ্তাং বিপ্রাং বলাদ্ব্রজন্।
শতানি পঞ্চ দণ্ড্যঃ স্যাদিচ্ছন্ত্যা সহ সঙ্গতঃ॥
মৌণ্ড্যং প্রাণান্তিকো দণ্ডো ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে।
ইতরেষান্তু বর্ণানাং দণ্ডঃ প্রাণান্তিকো ভবেৎ॥
ন জাতু ব্রাহ্মণং হন্যাৎ সর্ব্বপাপেষ্বপি স্থিতং।
রাষ্ট্রাদেনং বহিঃকুর্য্যাৎ সমগ্রধনমক্ষতং॥
ন ব্রাহ্মণবধাদ্ভূয়ানধর্ম্মো বিদ্যতে ভুবি।
তস্মাদস্য বধং রাজা মনসাপি ন চিন্তয়েৎ॥
মনু। ৩৭৪—৩৮১।

মানবধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত এই সকল সনাতন ব্যবস্থাজ্ঞাপক শ্লোকাবলীর "অন্বয়ার্থঃ" প্রদান করা নিষ্প্রয়োজন। কেবল এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, "কাজির বিচারে" বহুবিধ কলঙ্ক থাকিলেও এরূপ কোনও কলঙ্ক ছিল না; মুসলমান ব্যবস্থাশাস্ত্রের বিধানে হিন্দু মুসলমান বলিয়া কোন ইতরবিশেষ ছিল না, আইনের দোহাই দিয়া কেহ বিচারবিভ্রাট উপস্থিত করিতে পারিতেন না; কোন কোন স্থলে অসঙ্গত স্বজাতিবাৎসল্যের জন্য কোন কোন কাজিসাহেব ন্যায়ের নামে অন্যায় করিয়া বসিতেন, এইমাত্র!

সেকালেও আইনকানুনের অভাব ছিল না। পুরাকাল হইতে ধর্ম্মগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া মুসলমান খলিফা ও মনীষিগণ যত কিছু রাজবিধি ও ব্যবস্থাপত্র সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, তাহা পুঞ্জীকৃত হইয়া কালক্রমে একটি পর্ব্বতাকার দপ্তরের সৃষ্টি হইয়াছিল। মুসলমানেরা ভারতবর্ষে আসিয়া তাহারই সাহায্যে বিচারকার্য্য সম্পাদন করিতেন। এক দেশের রাজবিধি অন্য দেশে ব্যবহার করিতে হইলে, এক যুগের রাজবিধির অন্য যুগে প্রয়োগ করিতে হইলে, এক সমাজের রাজবিধি অন্য সমাজে প্রচলিত করিতে হইলে, তাহা সর্ব্বথা সুসঙ্গত হয় না—কোন কোন স্থলে নিতান্তই হাস্যাস্পদ হইয়া উঠে। তজ্জন্য

"কাজির বিচার" কোন কোন স্থলে যথার্থই হাস্তাস্পদ বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু এইরূপ কারণে রাজবিধি কেন, কত সনাতন সামাজিক ব্যবস্থাও আজ কাল হাস্তাস্পদ হইয়া উঠিতেছে!

কাজির বিচার ভাল হউক আর মন্দ হউক, সকল বিষয়ে হিন্দুদিগের স্কন্ধে কাজির বিচার চাপাইয়া দেওয়া হইত না। সামাজিক ব্যাপারে, দায়-বিভাগ কার্য্যে, ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়ে, কেবল মুসলমানদিগকেই কাজির বিচারের অধীন হইতে হইত, হিন্দুদিগের পক্ষে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ইহা মুসলমান শাসনের উদারতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ জন্য মুসলমান বাদশাহেরা ইতিহাসে এখনও সমুচিত প্রশংসালাভ করেন নাই; বরং সর্ব্বরাচর প্রচলিত ইতিহাস পড়িলে মনে হয় যে, "স্বত্ব ও অধিকার" * বলিয়া আজকাল যে ধুয়া উঠিয়াছে, ইহা সম্পূর্ণ নূতন কথা—এমন কথা এ দেশের লোকে ইতিপূর্ব্বে কখনও স্বপ্নেও জানিত কি না সন্দেহ এ দেশের ইতিহাস লিখিত হইলে, সে ইতিহাস এই মতের সমর্থন করি[illegible] পারিবে না।

কেবল ফৌজদারী বিচারে ও ক্রয়বিক্রয়াদিসংক্রান্ত কতকগুলি বিষয়ে হিন্দুদিগকে "কাজির বিচারের" অধীন হইতে হইয়াছিল। এই বিচারপ্রণালী কিরূপ ছিল, তাহা বুঝিতে হইলে কতকগুলি পুরাতন কথা অবগত হইতে হইবে।

ধর্ম্মশীল, সত্যবাদী, পূর্ণবয়স্ক, সুস্থমনা, স্বাধীনচেতা ব্যক্তি ভিন্ন "কাজির বিচারে" অন্য কাহারও সাক্ষ্য দিবার অধিকার ছিল না। মুসলমান ব্যবস্থা-শাস্ত্রপ্রয়োজক ঋষিগণ বলিতেন যে, যিনি সাক্ষী হইবার অযোগ্য, তিনি বিচারক হইবার যোগ্য নহেন। সুতরাং তাঁহাদের মতানুসারে সুস্থমনা, পূর্ণ-বয়স্ক, সত্যবাদী, স্বাধীনচেতা, ধর্ম্মশীল ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহ "কাজি" হইতে পারিতেন না। এই স্থলে সেকাল এবং একালের একটু তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখ। একালে বিচারক বা সাক্ষীর ধর্ম্মবিশ্বাস থাকা না থাকা কেহ অনুসন্ধান করিতে চাহে না। বিচারক নিয়োগ করিবার সময়ে তিনি কোন্ ধর্ম্মে আস্থাবান বা আদৌ কোন ধর্ম্মেই বিশ্বাস আছে কি না, সে কথা কেহ ভুলিয়াও জিজ্ঞাসা করে না। এইখানে কাজির বিচারের সহিত আধুনিক বিচারের একটা প্রধান পার্থক্য।

* Rights and Privileges.

আরও একটি প্রধান পার্থক্য আছে। বিচারনিয়োগসম্বন্ধে সেকাল ও একালের ব্যবস্থায় আকাশ পাতাল প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। একালে কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপনের ঢোল পিটিয়া দিয়া, ঝাঁকে ঝাঁকে উমেদার জড় করিয়া, লাখে লাখে সুপারিশের স্তূপ ঝাড়িয়া, অথবা কোন প্রকাশ্য পরীক্ষার প্রশ্নোত্তরপত্র পরীক্ষা করিয়া, বিচারক নিয়োগ করা হইয়া থাকে। এইরূপ নিয়োগ-প্রণালী অনুসরণ করিতে গিয়া উপরোধে কত ঢেঁকি গিলিতে হয়। প্রশ্নোত্তরপত্রে পরিতুষ্ট হইয়া কত দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিতে হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই! সেকালের কাজি-নিয়োগ-ব্যাপার এরূপ ছিল না। যিনি পদপ্রার্থী নহেন, অথচ সর্ব্বথা লোকসমাজে চরিত্রবল, বংশমর্য্যাদা ও ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য সকলের বিশ্বাসভাজন, বাদশাহ বা নবাব এইরূপ লোককেই ডাকাইয়া আনিয়া সাধ্যসাধনা করিয়া কাজির আসনে বসাইয়া দিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বাদশাহ বা নবাব ধর্ম্মভীরু হইলে, এইরূপ প্রণালীতে যথার্থ ধর্ম্মশীল ন্যায়বিচারকগণ ভিন্ন অন্য কেহ কাজি নিযুক্ত হইতে পারিতেন না। কারণ মুসলমানধর্ম্মসংস্থাপক মহানুভব মহম্মদের ব্যবস্থা এইরূপ যে, "যিনি কাজি হইবার জন্য লালায়িত, তাঁহাকে নিয়োগ করিও না; যিনি বাধ্য হইয়া উক্ত পদ গ্রহণ করিবেন, কেবল তাঁহাকেই দেবদূতগণ বিচারকার্য্যে শুভবুদ্ধি প্রদান করিবেন।" *

যাঁহারা এইরূপে কাজি নির্ব্বাচিত হইতেন, তাঁহারা যে মুসলমান-সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তদ্বিষয়ে অনুমান ভিন্ন আর কোনরূপ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ বর্ত্তমান নাই। মুসলমান বাদশাহগণ স্বধর্ম্মনিরত বলিয়া ইতিহাসে বিখ্যাত; ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থাগুলি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করাই স্বধর্ম্মনিরত বলিয়া পরিচিত হইবার প্রধান প্রমাণ। মুসলমানেরা আত্মজীবনে ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরোধী অন্যায় কার্য্য করিলেও প্রকাশ্য রাজকার্য্যে কখনও ধর্ম্মশাস্ত্র অবহেলা করিতে সাহস করিতেন না। সেই ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, "রাজা প্রজাবর্গের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে বিচারক নির্ব্বাচন না করিলে সর্ব্বথা প্রত্যবায়ভাগী হইবেন।" † ইহা হইতেই মনে হয় যে, মুসলমান বাদশাহ বা

* Whosoever seeks the appointment of Kazee shall be left to himself; but to him who accepts it on compulsion, an angel shall descend and give directions.—The Koran.

† Whoever appoints a person to the discharge of any office, whilst there is another amongst his subjects more qualified for the same than

নবাবগণ সচরাচর এই ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত পুরাতন পদ্ধতি লঙ্ঘন করিতেন না, স্বরাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকেই কাজি মনোনীত করিতেন।

কাজি সাহেব কিন্তু একাকী বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিবার অধিকারী ছিলেন না। কাজি সাহেব দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন বটে, কিন্তু সেই দণ্ড শাস্ত্রানুমোদিত কি না, তাহার ব্যবস্থাপ্রদানের জন্য তাঁহার একজন পার্ষদ থাকিতেন। ইঁহারই নাম "মুফ্‌তি"। কাজা শব্দ হইতে "কাজি", এবং ফতোয়া শব্দ হইতে "মুফ্‌তি" হইয়াছে। যিনি ব্যবস্থা প্রদান করেন, তাঁহার নাম "মুফ্‌তি", আর যিনি তাহার প্রয়োগ করেন, তাঁহার নাম "কাজি"; এইরূপ প্রণালীতে "কাজির বিচার" নিষ্পন্ন হইত; সুতরাং অধিকাংশ স্থলেই কাজির বিচার যে সর্ব্বথা শাস্ত্রসম্মতরূপে নিষ্পন্ন হইত, তাহাই বিশ্বাস হয়। সে বিচারের দোষগুণ কাজির নহে, মুসলমান ব্যবস্থাশাস্ত্রের।

কাজি সাহেবকে কি করিতে হইবে এবং কি করিতে হইবে না, তদ্বিষয়ে মুসলমানব্যবস্থাশাস্ত্রে একটি সুদীর্ঘ তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। প্রত্যেক বিধি ও প্রত্যেক নিষেধ-বাক্যের যুক্তি ও প্রমাণ উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন, মর্ম্মজ্ঞ পাঠক তালিকা হাতে পাইলেই বুঝিতে পারিবেন। তালিকাটি এইরূপ :—

১। কাজি সাহেব রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবামাত্র কাজির দপ্তর জিম্মা লইবেন, এবং আমীন নিযুক্ত করিয়া পূর্ব্ব কাজির প্রদত্ত দপ্তর পরীক্ষা করাইবেন।

২। পূর্ব্ব কাজির আমলে যাহারা কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে, তাহাদের প্রত্যেকের দণ্ডের কারণাদি অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন।

৩। কোন প্রকাশ্য মসজিদে অথবা উন্মুক্ত স্থানে বসিয়া সর্ব্বসমক্ষে বিচার-কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। নিজ বাটীতে বসিয়াও বিচারকার্য্য চলিতে পারে, কিন্তু তাহার দ্বার অবারিত রাখিতে হইবে।

৪। আত্মীয় কুটুম্ব ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট হইতে কোন উপঢৌকন লইতে পারিবেন না। কলা মূলা শাকসবজিই হউক, আর ষোড়শোপচার-পূর্ণ "ডালিই" হউক, কাজির পক্ষে সর্ব্বপ্রকার উপঢৌকনই নিষিদ্ধ।

৫। কাজি সাহেব কাহারও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৬। নিজ অধিকার-মধ্যে যাহারা পীড়িত হইবে, তাহাদের তত্ত্ব লইতে

---

the person so appointed, does surely commit an injury with respect to the rights of God, the Prophet and the Mussulmans.——The Koran.

হইবে, এবং কেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহার সমাধিস্থলে উপস্থিত থাকিতে হইবে।

৭। সাংসারিক আচারব্যবহারে কতকগুলি বিশেষ নিয়ম পালন করিতে হইবে; যথা,—অর্থী-প্রত্যর্থীর মধ্যে উভয় পক্ষ ভিন্ন এক পক্ষকে নিমন্ত্রণ করিতে পারিবেন না।

৮। বিচারাসনে উপবেশন করিয়া কতকগুলি বিশেষ নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে; যথা, উভয়পক্ষকে তুল্যরূপে প্রত্যভিবাদনাদি করিতে হইবে, কোন এক পক্ষের প্রতি সহাস্যমুখ হইতে পারিবেন না, সাক্ষীদিগকে উৎসাহ-সূচক বাক্য বা ভর্ৎসনাদিজ্ঞাপক তিরস্কার প্রয়োগ করিতে পারিবেন না।

৯। বিচারকার্য্যে লিপ্ত থাকিবার সময়ে কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে; যথা,—ক্ষুধার্ত্ত বা তৃষ্ণার্ত্ত বা ক্রোধান্ধ অবস্থায় কদাচ কোন বিচার-মীমাংসা বা দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিতে পারিবেন না।

১০। বিচারকার্য্যে লিপ্ত হইবার পূর্ব্বে অল্পবয়স্ক কাজিদিগকে একটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে;—বিচারসময়ে কোনও যুবতী স্ত্রীলোক পক্ষ বা সাক্ষীরূপে উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, বিচারাসনে উপবেশন করিবার পূর্ব্বে, কাজি সাহেবকে আপন স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতে হইবে। *

এতগুলি বিধি এবং নিষেধবাক্য মানিয়া চলিতে পারিলে, "কাজির বিচারে"ও যে সুবিচার হইতে পারিত, সে কথা সহজেই ধরিয়া লইতে পারা যায়। কিন্তু কোন কোন কারণে এতগুলি বিধি-নিষেধ থাকিতেও কাজির বিচারে লোকে সন্তুষ্ট হইতে পারিত না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, কাজির বিচারে যে ব্যবস্থাশাস্ত্র ব্যবহৃত হইত, তাহার বিধান বড়ই কঠোর ছিল। কখন কখন তাহাতে সত্যসত্যই শিহরিয়া উঠিতে হয়। একালের হিসাবে দেখিতে গেলে, কাজি সাহেবকে অনেক অযথা গঞ্জনা সহ্য করিতে হইবে; কিন্তু সেকালের হিসাবে ইহাতে বিশেষ দোষ দৃষ্ট হইত না।

অপরাধীর চরিত্র-সংশোধন করা অথবা পথভ্রষ্ট নষ্ট মানবসন্তানকে সৎ-পথে পুনরাবর্ত্তিত করিবার সহায়তা করা, সেকালের দণ্ডবিধির উদ্দেশ্য মধ্যে পরিগণিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। একালেও যে তাহা সর্ব্বত্র সম্যক্

---

* এই শেষোক্ত অনুশাসন-বাক্য মূলানুযায়ী অনুবাদিত হইল না, ইহাতে অবশ্যই অর্থগ্রহণ করিতে কাহারও অসুবিধা হইবে না।

প্রচলিত হইয়াছে, তাহাও দেখিতে পাওয়া যায় না। দণ্ডবিধান করিয়া "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল" বিতরণ করাই ধর্ম্মাধিকরণের প্রধান লক্ষ ছিল বলিয়া বোধ হয়। ইহার নাম "প্রতিহিংসা"। এই প্রতিহিংসার সাধনই যে সেকালের সকল দেশের রাজবিধির প্রধান লক্ষ্য ছিল, তাহার পরিচয় সকল দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। সেই জন্য অপরাধ-বিশেষে অপরাধীর নাক কাণ হাত পা কাটিয়া ফেলা হইত। কাজির বিচারেও ইহার অভাব ছিল না।

কেবল তিনটিমাত্র অপরাধের জন্য "কাজির বিচারে" প্রাণদণ্ড হইতে পারিত; যথা,—পরদারাভিগমন, স্বধর্ম্মত্যাগ, নরহত্যা। এতন্মধ্যে নরহত্যা অপরাধে অদ্যাপি প্রাণদণ্ড হইয়া থাকে; পরদারাভিগমনে অর্থদণ্ড বা কারাবাস, বা উভয় দণ্ড, এবং স্বধর্ম্মত্যাগে কোনও দণ্ডই প্রদত্ত হয় না। নরহত্যাপরাধে আমরা এখনও "কাজির বিচার" ছাড়াইয়া বিশেষ উন্নততর সোপানে আরোহণ করিতে পারি নাই; এবং এ বিষয়ে কখন কখন আমাদের বিচারও "কাজির বিচারের" মত উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে।

পরদারাভিগমনে "কাজির বিচারের" কিরূপ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তাহাই আলোচনা করিয়া অদ্য প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এই বিচার-প্রণালী অধ্যয়ন করিলে সহজেই কাজির বিচারের ভালমন্দ বিচার করিতে পারা যাইবে।

দুই কারণে কাজি সাহেব দণ্ডদান করিতে পারিতেন;—অপরাধী অপরাধ স্বীকার করিলে, অথবা তাহার অপরাধ বিশ্বাস্য সাক্ষীর বাক্যে প্রমাণীকৃত হইলে। এ বিষয়ে সেকাল এবং একালের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু একালে যাহাকে অপরাধ-স্বীকার করা বলা যায়, "কাজির বিচারে" তাহাকে অপরাধ-স্বীকার বলা হইত না।

কেহ পরদারাভিগমনাপরাধে অভিযুক্ত হইয়া কাজি সাহেবের নিকট আনীত হইয়া আত্মাপরাধ স্বীকার করিলে, কাজি সাহেব তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাকে বিদায় দিতেন; এবং বলিয়া দিতেন যে, আত্মাপরাধ স্বীকার করা স্বাভাবিক নহে, সুতরাং তিনি উহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন। অপরাধী ব্যক্তি যদি পুনঃপুনঃ ভিন্ন ভিন্ন দিবসে চারি বার ঐরূপ আত্মাপরাধ স্বীকার করিত, তবেই কাজি সাহেব তাহাকে অপরাধী বলিয়া গণ্য করিতেন।

পরদারাভিগমনের অভিযোগ উপস্থিত করা খুব সহজ, অভিযুক্ত ব্যক্তির

পক্ষে তাহা খণ্ডন করা দুরূহ ব্যাপার। সেই জন্য কাজির বিচারে নিতান্তপক্ষে চারি জন সাক্ষীকে অপরাধ প্রমাণ করিতে হইত। এইরূপে অপরাধ প্রমাণ করিতে পারিলে, কাজি সাহেব অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অপরাধী বলিয়া গণ্য করিতেন।

অপরাধী গণ্য করা পর্য্যন্তই কাজি সাহেবের কার্য্য। তাহার পর, "মুফ্‌তি" ব্যবস্থাশাস্ত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দণ্ডের কথা বলিয়া দিতেন, কাজি সাহেব তদনুসারে দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিয়া স্বয়ং দণ্ডবিধানের সময়ে উপস্থিত থাকিতেন। এখানেও সেকালের সহিত একালের অনেক পার্থক্য।

পরদারাভিগমনের অপরাধী বিবাহিত ব্যক্তি হইলে তাহার প্রাণদণ্ড, অবিবাহিত হইলে শত বেত্রাঘাত দণ্ড হইত। কাজি সাহেবকে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া দণ্ডবিধান করিতে হইত। দণ্ডবিধানের প্রণালীও স্বতন্ত্র ছিল। যাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইত, তাহাকে নগরোপকণ্ঠে বিস্তৃত প্রান্তরে আনয়নপূর্ব্বক হস্তপদ দৃঢ়বদ্ধ করিয়া সর্ব্বসমক্ষে দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করাইতে হইত। তৎপরে তাহাকে লোষ্ট্রনিক্ষেপে নিহত করিতে হইত। এই হত্যাপ্রণালীও অদ্ভুত ছিল। সর্ব্বপ্রথমে সাক্ষিগণকে একে একে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে হইত; তাহারা অস্বীকার করিলে বা বধ্যভূমিতে উপস্থিত না হইলে, অপরাধী তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করিত। সাক্ষিগণ লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিতে সম্মত হইয়া সাক্ষীর বাক্যের সত্যতাসম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ প্রদান করিলে, কাজি সাহেবকে স্বয়ং লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিত হইত; তিনি অস্বীকার করিলেও অপরাধী মুক্তিলাভ করিত। কাজি সাহেব স্বীকার করিয়া স্বয়ং লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিলে, উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া লোষ্ট্রনিক্ষেপে বধকার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য আদেশ করা হইত। তাহারা অসম্মত হইলে, হয় কাজি সাহেবকে স্বহস্তে দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিতে হইত, না হয়, অপরাধীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইত।

আমরা "কাজির বিচারের" সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর দণ্ডাজ্ঞা ও দণ্ডবিধানের বিবরণ প্রদান করিলাম। ইহা কঠোর—অতি কঠোর—বর্ব্বরোচিত ব্যবস্থা, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ব্যবস্থার মধ্যেই এমন কতকগুলি কৌশল রহিয়াছে, যাহাতে "কাজির বিচারে" কাহাকেও অবিচারে প্রাণ হারাইতে হইত না! সে কালের জনসাধারণ পরদারাভিগমনে প্রাণদণ্ড প্রদান করা আবশ্যক বলিয়া বুঝিয়া রাখিয়াছিল; সুতরাং জনসাধারণের সম্মতি

ও সহায়তা না লইয়া কাহাকেও উক্ত দণ্ড প্রদান করা হইত না। একালে অনেক সুবিচারের সূত্রপাত হইয়াছে। কিন্তু জনসাধারণের সম্মতি লওয়া দূরে থাকুক, জনসাধারণের হাহাকার উপেক্ষা করিয়া রাজবিধি নির্ম্মমহৃদয়ে কত কঠোর দণ্ডাজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিতেছে! সুতরাং সেকালের ও একালের তুলনায় সমালোচনা করিতে বসিলে, প্রকৃত "কাজির বিচার" কোন্‌টি, তাহার মীমাংসা করা কঠিন হইয়া উঠে।

আঁখি-নীরে।

না শুনিয়া কোন কথা,
না বুঝিয়া কোন ব্যথা,
  তবু প্রাণ চায়।
অতিথির মত এসে
চ'লে যাওয়া ভালবেসে
  আপনার জীবন-সন্ধ্যায়!
থাকি দূরে আঁখি-নীরে
  সে জীবন যায়।

স্নেহেতে হৃদয় বাঁধে,
পরাণ বিনায়ে কাঁদে
ক্ষত-স্মৃতি ল'য়ে বুকে
  তীব্র আকাঙ্ক্ষায়;
প্রতি কাজে, প্রতিপদে
ডুবিয়া নিরাশা-হ্রদে
  সে জীবন যায়।

দু' দিনের পরে আর
কিছুই থাকে না তার,
  শুধু স্মৃতি হৃদয়ে জাগায়;
সেই কথা, সেই ব্যথা,
মুহূর্ত্তের আকুলতা,
  সেই মুখ নীরব নিশায়;
সংসারের সুখে দুখে
  প্রতি পায় পায়।
থাকি দূরে আঁখি-নীরে
  সে জীবন যায়।

শ্রীচুনীলাল গুপ্ত।

ধূমকেতু।

হেলির ধূমকেতু।—এই ধূমকেতুর নাম হইলেই সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ জ্যোতির্বিদ্ হেলি স্বতঃই স্মৃতিক্ষেত্রে উদিত হন। ইনি গণিতরত্ন প্রিন্সিপিয়া নামক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া দেখিলেন যে, ধূমকেতুগণের বৃত্তাভাস কক্ষে পরিভ্রমণ সম্ভাব্য; এই দেখিয়া তিনি বহুসংখ্যক কৃতবেধ ও পত্রারূঢ় ধূমকেতুর কক্ষাদির মূলোপকরণ সকল পরীক্ষণে ব্যাপৃত হইলেন। তাঁহার পরীক্ষার ফল যে কেতুকক্ষার উপকরণ সকল, তাহা ১৭০৫ অব্দে প্রকটিত হইয়াছিল। কেতু-কক্ষার মধ্যে কোন্‌টার সহিত কোন্‌টার মিল আছে, কোন্‌টার সহিত কোন-টার গরমিল, এইরূপ তুলনা করিতে করিতে তিনি দেখিলেন যে, ১৬৮২তে তিনি এবং অন্যান্য জ্যোতিষীরা যে ধূমকেতুর পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহার কক্ষা এবং ১৬০৭ ও ১৫৩১এর ধূমকেতুর কক্ষা প্রায়ই অভিন্ন। ইহাতে তাঁহার অনুমান হইল যে, এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন কেতু নহে, একই কেতু ৭৫, ৭৬ বৎসর অন্তর ভূলোক সম্বন্ধে উদিত হয়, এবং তিনি সমাদেশ করিলেন যে, এই ধূমকেতু আবার ১৭৫৮ কি ৫৯ অব্দে পুনরাগমন করিবে। পরন্তু তিনি উক্ত ধূমকেতুর গতিতে বিক্ষোভের বিশিষ্ট কারণ দেখিয়া, আদিষ্ট সময়ে উহার পুনরুদয়ের সবিশেষ ব্যাঘাতের আশঙ্কা করিলেন। এই ধূমকেতু অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে বার্হস্পত্যমণ্ডলের সন্নিকৃষ্ট হয়, এবং এই মহাবল সুরগুরু দ্বারা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়, অর্থাৎ বৃহস্পতির আকর্ষণপ্রযুক্ত কেতুর বেগ বৃদ্ধি হয়, সুতরাং ভগণ-কাল কথঞ্চিৎ ন্যূন হইয়া পড়ে। অতএব ১৭৫৮ অব্দের অন্তে, বা ১৭৫৯ অব্দের আদিতেই, ধূমকেতুর পুনরাগমনের প্রতীক্ষা করা যাইতে পারে।

হেলির ধূমকেতুর আদিষ্ট পুনরাগমন।—এই আদেশ জ্যোতিষ-ইতিহাসে একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা। গ্রহণ বা সদৃশ ব্যাপারসকল ঠিক গণিত কালে ঘটে, তাহা অতি প্রাচীনকালাবধি লোকে দেখিয়া আসিতেছে, তাহার আর চমৎকারিত্ব নাই। কিন্তু এই অজ্ঞাত লক্ষণ, অজ্ঞাত গতিবিধি, কিম্ভূত-কিমাকার অপশকুনের পুনরাগমন শুনিয়া সকলেই বিস্ময়ান্বিত হইলেন। তাঁহার এই আদেশটি যে কত গুরুতর, তাহা হেলি নিজে বেশ বুঝিয়াছিলেন। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, এই ধূমকেতুর পূর্ণ ভগণ হইবার অনেক পূর্ব্বেই তাঁহাকে

মানবলীলা সম্বরণ করিতে হইবে, এবং তজ্জন্যই এই হৃদিস্পৃশ্ বাক্যটি বলিয়া গিয়াছেন—"অস্মদাদির আদেশ অনুসারে ধূমকেতু যদি ১৭৫৮অব্দে পুনরাগমন করে, তবে অপক্ষপাতী উত্তরপুরুষগণ অবশ্যই অস্বীকার করিবেন না যে, বিষয়টি এক জন ইংরাজের আবিষ্কৃতি।"

ধূমকেতুর পুনরাগমনের কাল যত আসন্ন হইতে লাগিল, জ্যোতির্ব্বিদেরাও তত তদ্দর্শনোপযোগী আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। গণকপ্রধান ক্লেয়ার্ট নবাবিষ্কৃত উৎকৃষ্টতর রীত্যনুসারে ধূমকেতুর প্রতি গ্রহগণের বিক্ষোভক-বলের ফলগণনায় নিযুক্ত হইলেন। অভিপ্রায় এই যে, তদ্দ্বারা কেতুকক্ষা যথাযথরূপে গণিত হইবে, এবং পরিহেলিকে উপনীত হইবার কালও ঠিক পাওয়া যাইবে। অনন্তর ক্লেয়ার্ট স্থির করিলেন যে, ১৭৫৯ অব্দের ১৩ই এপ্রেলে ধূমকেতু অনুহেলিকে আসিবে; কিন্তু তিনি বলিয়াছিলেন য, তাঁহার গণিতে কতিপয় স্বল্পরাশি পরিত্যক্ত হওয়াতে গণিত কিঞ্চিৎ স্থূল হইয়াছে, অতএব গণিত কালের মাসেকের ভুল থাকিতে পারে। ক্লেয়ার্টের বিঘোষিত কালের ঠিক এক মাস পূর্ব্বে ১২ই মার্চ তারিখে ধূমকেতু অনুহেলিকে উপনীত হইল। লাপ্লাস দেখাইয়াছেন যে, এক্ষণে শনির সামগ্রী-পরিমাণ যত ধরা যায়, হেলি যদি তত ধরিতেন, তাহা হইলে সমাদেশে কেবল ১৩ দিনের ভুল থাকিত।

উক্ত ধূমকেতুর পুনরাগমনের কাল ১৮৩৫এর পূর্ব্বে অনেক জ্যোতির্ব্বিদ উহার কক্ষার গণিত করিয়াছিলেন; এবং যাঁহাদিগের গণিত অতি সূক্ষ্ম হইয়াছিল, তাঁহারা ১৮৩৫ অব্দের ১৪ই নবেম্বর পুনরুদয়ের দিন স্থির করিয়াছিলেন; কেতু কিন্তু ঠিক ১৬ই তারিখে অনুহেলিক অতিক্রম করিয়াছিল।

এখান হইতে সূর্য্য যত দূর, সূর্য্য হইতে এই ধূমকেতু তার ১৮ গুণ অন্তর; অর্থাৎ সূর্য্য হইতে বরুণের যে হারাহারি দূরত্ব, তাহার অপেক্ষা কিছু কম। কিন্তু ইহার কক্ষার উৎকেন্দ্রত্ব প্রযুক্ত যখন অপহেলিকে থাকে, তখন ইন্দ্র অপেক্ষা অন্তর অধিক হয়। ১৯১০ অব্দে ২৪শে মে তারিখে হেলির পুনরাগমন হইবে। এবার ভ্রমকাল ২৭৯৩৭ দিন না হইয়া ২৭২১৭ বা ৭৪ বৎসর ৬ মাস হইবে। ১৮৭৩ অব্দে ইহা হিমতিমিরাবগুণ্ঠিত অপহেলিকে উপনীত হইয়া সমুজ্জ্বল সূক্ষ্ণ রবি-পৃথ্বী-প্রদেশ অভিমুখে পুনরাগমন করিতেছে। দীর্ঘকালের পর ইহার পুনঃসমাগমে জ্যোতির্ব্বিদগণ পরমানন্দ লাভ করিবেন।

হেলির ধূমকেতুর শারীরিক লক্ষণ।—এই ধূমকেতু ১৮৩৫ অব্দে যখন আবার উদিত হইল, তখন উহার বাহ্য লক্ষণ সকল এত শীঘ্র শীঘ্র এবং এত অধিক

পরিমাণে পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল যে, ব্যাপার দেখিয়া সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। অনুস্থৈলিক অতিক্রম করিবার এক মাস পূর্ব্ব হইতে পুচ্ছবিরচন ব্যাপার আরম্ভ হইল। উহার সূর্য্যাভিমুখ অঙ্গ হইতে নীহারবৎ পদার্থ বিনির্গত হইতে লাগিল। এই উদ্গত পদার্থনিচয় অন্ধকার গৃহে স্থিত তীক্ষ্ণাগ্র তার হইতে বিনির্গত বৈদ্যুতিক আলোক-তুলিকা-সদৃশ। এই পদার্থ সকল শিরোদেশ হইতে বিনির্গত হইয়া, কিঞ্চিৎ সূর্য্যাভিমুখে সরিবামাত্র যেন সৌরতেজঃ দ্বারা ব্যাহত হইয়া বহুদূর চলিয়া গেল, এবং গর্ভপশ্চাৎ পুচ্ছ বিরচিত হইতে লাগিল। পদার্থ-উদ্গম সবিরামে হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে উদ্গত পদার্থনিচয় সূর্য্যের দিকে দ্বিতীয় পুচ্ছের আকার ধারণ করিতে লাগিল। কোন বার দুইটি, কোন বার তিনটি নীহারবৎ ধারা বাহির হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলিয়া গেল। বিক্রুত পদার্থের ক্রমাগত দিক্ ও উজ্জ্বলতার পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল, এবং কখনও বা খঞ্জনপুচ্ছাকারে প্রতিভাত হইতে লাগিল। পদার্থ-ধারা বিনির্গমনকালে নাভিসমীপে যদিও সমধিক উজ্জ্বল, তথাপি বিস্তৃত হইয়া গর্ভাবরণে পরিণত হইবার সময় অতি শীঘ্র মলিনীভূত হইল।

দেখা গেল, যেন পুচ্ছটি শুদ্ধ মস্তক হইতে বিনিক্রান্ত এবং সৌরতেজঃ দ্বারা ব্যাহত পদার্থনিচয়ে বিরচিত হইতে লাগিল। সূর্য্য হইতে অতিপ্রচণ্ড-বেগে পদার্থধারা বিক্রুত হইতে লাগিল—বেগ ২৪ ঘণ্টায় ২০ লক্ষ মাইল। নাভির আকর্ষণশক্তির স্বল্পতাপ্রযুক্ত শিরোভাগ হইতে অপ্রাকৃত পদার্থ-সংঘাতের অধিকাংশ ইতস্ততঃ বিকীর্ণ, অপচিত এবং শূন্যসাগরে নষ্টীভূত হয়, কেতুর সহিত আর কস্মিন্ কালেও সমাগত হয় না। অতএব ইহা অনুমান-সিদ্ধ যে, ধূমকেতু যতবার সূর্য্যসান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়, ততবার উহার পুচ্ছোপ-করণের অপচিতি ঘটে, সুতরাং উত্তরোত্তর এই উপাঙ্গ খর্ব্বীভূত হয়। এই কেতুর ভিন্ন ভিন্ন কালে অনুস্থৈলিকে আগমনের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা দৃষ্টে নিষ্পন্ন হইয়াছে যে, ১৩০৫ হইতে কেতু ক্রমশঃ ছোট হইতেছে। কিন্তু ১৭৫৯এর পর ১৮৩৫এর উদয়ে, ইহার খর্ব্বতার বিশেষ লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই। অতএব ইহাই অবধার্য্য যে, যদি এই কেতুর বাস্তব ক্ষয় হইতেছে, তবে সে ক্ষয় অতি অল্পে অল্পে হইতেছে।

এঙ্কের ধূমকেতু।

১৮১১ অব্দে মহোত্তমী জ্যোতির্ব্বিদ পন্স মারসেই নগরে একটি ধূমকেতু প্রকাশ করেন। কেতুটি দৌরবীক্ষণিক, দেখিতে যেন হাজার হাজার নীহারি-

কার মধ্যে একটি মিট্‌মিটে জ্যোতিষ্ক—নীহারিকার গতি শত শত বৎসরেও টের পাওয়া যায় না, ধূমকেতুর গতি বেশ বুঝা যায়। ইহার অবস্থান পন্‌স এবং অপরেও স্থির করিলেন। বার্লিননগরনিবাসী জ্যোতিষাধ্যাপক শ্রীমৎ এঙ্ক ১৮১৯ অব্দে এই কেতুর সাময়িকত্ব আবিষ্কার করেন। ধূমকেতুর চিত্রাদি দেখিয়া আহার অনন্যতাস্থাপনের সম্ভাবনা নাই; কারণ ইহা একবার এক বেশে উদিত হয়, অপর বার অপর বেশে আবির্ভূত হয়; আকার পরিবর্ত্তনশীল—আকার দেখিয়া চিনিবার যো নাই। কক্ষা কেবল অপরিবর্ত্তিত থাকে, শারীরিক অনবস্থিতির সহিত কক্ষার কোন সম্বন্ধ নাই। কেতুকক্ষার আকার ও অবস্থান, সৌরজগতের অন্যান্য জ্যোতিষ্কের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, এবং এঙ্কের ধূমকেতু এই মতের একটি উত্তম উদাহরণের স্থল। নিম্ন পরিলেখে
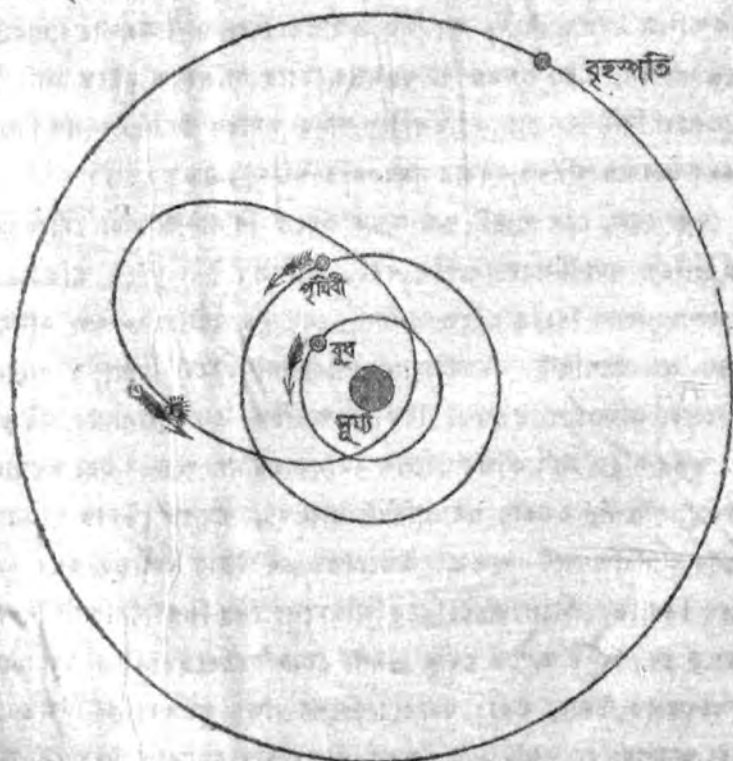
তিনটি গ্রহকক্ষা দেখা যাইতেছে; সকলের ছোটটি বুধকক্ষা, তাহার চেয়ে বড়টি ভূকক্ষা এবং সকলের বড়টি বৃহস্পতিকক্ষা। এই তিন কক্ষা ব্যতীত চতুর্থ যে বৃত্তাভাস দেখা যাইতেছে, সেটি ভূকক্ষার ক্ষেত্রগত এই ধূমকেতুর কক্ষা। কক্ষার অন্যতর অধিশ্রয়ণে সূর্য্য। সূর্য্যাকর্ষণের বশবর্ত্তী হইয়া ধূমকেতু

এই কক্ষায় সাবধাবব তিন বৎসরে এক পূর্ণ ভ্রমণ করে। পরিহৈলিকে সূর্য্যের খুব সমাসন্ন হয়, এবং বুধকক্ষার অন্তর্গত স্থান দিয়া যায়, এবং অপহৈলিকে সুদূরস্থিত বার্হস্পত্যকক্ষার সন্নিকৃষ্ট হয়। এই কক্ষার বৃত্তাভাসত্বের কারণ প্রধানতঃ সৌরাকর্ষণ। ধূমকেতুর আয়তন বা গুরুত্বের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। ধূমকেতু এক সের হউক বা এক মন বা কোটি মণ হউক, আর এক মাইল হউক বা সহস্র মাইল হউক, কক্ষা অপরিবর্ত্তিত থাকিবে। এই কক্ষার আকার, পরিমাণ ও অবস্থান দ্বারা ধূমকেতুর তদাত্মের প্রমাণ হয়।

একবার যদি জানা যায় যে, ইনি সৌরপরিবারভুক্ত, ইনি কাশ্যপেয়, তাহা হইলে এঙ্কনামা ধূমকেতুর নিকট হইতে সৌরজগতের অনেক খবর পাওয়া যায়। ইনি ভ্রমণ করিতে করিতে একবার রবিমণ্ডলের সন্নিহিত বুধকক্ষার আসন্ন হন, আবার একবার বৃহস্পতির কক্ষা-সমীপে উপস্থিত হন; ফের ঘুরিতে ঘুরিতে যখন দূরবীক্ষণের আয়ত্তাধীন হন, তখন স্বীয় ভ্রমণের অনেক পরিচয় দিতে থাকেন। মাধ্যাকর্ষণের পারতন্ত্র্য প্রযুক্ত জ্যোতিষ্কবিষয়ক ব্যাপারাবলি সমাহিত হইবার রীতি, এবংবিধ গতাগতির পর্য্যালোচনা করিলে, প্রগাঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম হয়।

৩২। বুধের ওজন।—সৌর জগতের সমস্ত জ্যোতিষ্ক অপনীত হইলেও এঙ্কের ধূমকেতু অভিন্নবৃত্তাভাসে সমভাবে প্রধাবিত হইতে থাকিবে। এক্ষণে প্রকৃতপ্রস্তাবে উক্ত কেতুকক্ষার সমতা আলোচ্য বিষয় নহে; পরন্তু বুধাদি গ্রহ কর্ত্তৃক উক্ত কক্ষে বিষমতার প্রবেশই বক্তব্য। এই-রূপে ভ্রমণ করিতে করিতে ধূমকেতু অনুহৈলিকে উপনীত হইলে বুধ-কক্ষার সামীপ্য লাভ করে, তখন বুধ প্রায়ই স্বীয় কক্ষার তদংশে না থাকিয়া দূর প্রদেশে পরিভ্রমণ করেন; সুতরাং তৎকালে বুধ কর্ত্তৃক কেতু-কক্ষা যৎসামান্য বিক্ষোভিত হয়। কিন্তু বুধ আর ধূমকেতু মধ্যে মধ্যে পরস্পরের খুব নিকটস্থ হয়। ১৮৪৮ অব্দের ২২ নম্বরে ধূমকেতু বুধের এত সন্নি-কট হইয়াছিল যে, তাহাদের ব্যবধানে ৩০ লক্ষ মাইলের অধিক হয় নাই। এরূপ অবস্থায় বুধপিণ্ড স্বল্প হইলেও, তদীয় গুরুত্বপ্রযুক্ত, কেতু নির্দ্দিষ্ট কক্ষা হইতে বিচলিত হয়, এবং বেগেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। পরে ধূমকেতু বুধ হইতে যত অপসৃত হইতে থাকে, বুধের বিক্ষোভক বলও তত কমিতে থাকে; এবং অচিরে উক্ত বলজনিত ফলের লক্ষণ আর অনুভূত হয় না। কিন্তু বুধের আক-

র্ষণ প্রযুক্ত কেতুকক্ষায় যে বিকৃতি ঘটিল, তাহা আর কোন কালে অপনীত হইবে না। শুদ্ধ সৌরাকর্ষণজনিত ধূমকেতু-কক্ষা যে আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা হইতে এখন এই বিক্ষুব্ধ কক্ষা ভিন্ন হইয়া পড়িল। কেবল সাবিত্রী-শক্তিপ্রভাবে এই কক্ষা যে পরিমাণে যে আকার ধারণ করে, তাহা গণিতায়ত্ত, এবং এই কক্ষার বুধের আকর্ষণজনিত যে বিষমতা ঘটে, বুধের সামগ্রী-পরিমাণ অর্থাৎ ওজন পাওয়া গেলে তাহারও গণিত করা যাইতে পারে।

বুধ একটি ক্ষুদ্র গ্রহ বটে, কিন্তু ইনি সহজে গণকের আয়ত্তাধীন হন না। লে বেরিয়া লিখিয়াছেন—

"Nulleplanete n'a demande` aux astronomers plus de soins et de peines que Mercure, et ne leur a donne en recompense taut d'inquietudes, taut cantrarietes."

স্বীয় কক্ষার সূর্য্যসান্নিধ্যপ্রযুক্ত বুধ সতত দৃষ্টিগোচর হন না ; ইঁহার কক্ষা অত্যন্ত উৎকেন্দ্র, এবং কক্ষায় অপরাপর গ্রহের আকর্ষণ জন্য কি পরিমাণে বিক্ষোভ জন্মে, তাহাও অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হয় নাই, অধিকন্তু ইহাকে তুলাদণ্ডের শিক্যস্থ করিবার প্রয়াসে বহুবিধ ব্যাঘাত পড়ে। পৃথিবীকে ওজন করা যায়, রবিচন্দ্র এবং গ্রহগণকেও ওজন করা যায়, কিন্তু বুধকে দাঁড়িপাল্লায় তুলিতে গেলেই বিপদ। যাহা হউক, শ্রীমৎ লেবিরিয়া বুধের গুরুত্ব-নিরূপণার্থ উপায় আবিষ্কারে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, পৃথিবী বুধ কর্তৃক আকৃষ্ট হন এবং রবির অবস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এই আকর্ষণের পরিমাণও উপলব্ধ হয়। এইরূপে বহুবিধ বেধায়ত ফল পরীক্ষা করিয়া উক্ত জ্যোতির্ব্বিদ্‌ বুধের গুরুত্ব স্থূলমানে পৃথিবীর গুরুত্বের কিঞ্চিদধিক এক আনা ধরিয়াছেন।

লে বেরিয়ার গণিত সন্দেহ হওয়ায় বন আক্সেন এ বিষয়ের পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং দেখিলেন যে, লে বেরিয়া-দর্শিত বুধের সামগ্রী গ্রহণ করিয়া গণিত করিলে এঙ্কের ধূমকেতু দৃক্‌সিদ্ধ হয় না। ইনি বুধ সামগ্রী কিছু কম ধরিয়া হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, গণিত-বুধ দৃষ্ট-বুধের অনেকটা আসন্ন হন। তৃতীয়বার বুধ-সামগ্রী ভূসামগ্রী পঁচিশ ভাগের এক ভাগ ধরিয়া গণিত করায় বুধের দৃগ্‌গণিতৈক হইল।

এ ওজনে যদি সংশয় থাকে, যদি মনে কর যে, কাঁটার দোষ আছে, তবে বৃহস্পতির কক্ষায় চল, এঙ্কের ধূমকেতু মধ্যে মধ্যে বার্হস্পত্য কক্ষার

নিকটস্থ হয়; এরূপ স্থলে ধূমকেতু এই প্রবল গ্রহ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়, এবং ধূমকেতুর কক্ষা সবিশেষরূপে বিকৃত হইয়া পড়ে। এখন দেখা যাউক, ব্যাপারটি কিরূপ দাঁড়াইল। কেতুকক্ষা বুধের আকর্ষণে বিক্ষুব্ধ হইতেছে এবং বৃহস্পতির আকর্ষণেও বিক্ষুব্ধ হইতেছে, আবার এই উভয় আকর্ষণ গ্রহরাজের আকর্ষণের তুলনায় কিছুই নহে, তবেই গণিত বড় জটিল ও গহন হইয়া পড়িল। কিন্তু জ্যোতিষীর গণিত-কৌশলের এবম্ভূত অপূর্ব্ব শক্তি যে, এই ত্রিবিধ আকর্ষণের ফল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র করিয়া দেখাইতে পারেন। তবেই বুধের ওজনে যে সন্দেহ আছে, তাহার নিরাসের জন্য একটা উপায় পাওয়া যাই-তেছে। বৃহস্পতির চন্দ্রচতুষ্টয় দ্বারা তদীয় সামগ্রীর পরিমিতি সিদ্ধ হয় এবং দেখা যায় যে, পাল্লার এক দিকে সূর্য্যকে দিলে, অপর দিকে ১০৪৮ বৃহস্পতি দিতে হয়, তবে কাঁটা ঠিক দাঁড়ায়। এঙ্কের কক্ষাগণিতকে দৃক্‌-সিদ্ধ করিতে হইলে সূর্য্যতে বৃহস্পতির ১০৫০ গুণ সামগ্রী ধরিতে হয়; সুতরাং ১০৪৮ আর আর ১০৫০ কার্য্যতঃ প্রায় একই হইল। মীমাংসা এই হইল যে, বুধকে পৃথিবী অপেক্ষা ২৫ গুণে হালকা আর বৃহস্পতিকে সূর্য্য অপেক্ষা ১০৫০ গুণে হালকা ধরিয়া, এঙ্কের ধূমকেতুর কক্ষার গণিত করিলে, দৃগ্‌গণিতৈক্য হয়—কোন গণ্ডগোল থাকে না।

সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব।—এঙ্কের ধূমকেতুর পর্য্যটন পাঠ করিলে সৌর জগতের অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। এই ধূমকেতু বিশ বার যাতায়াত করি-তেছে; এক বারের গতির সহিত অপর বারের গতির সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে, গণিতের উপকরণীভূত বিষয়সমূহের যথাযথ পরিমাণ ধরিতে হয়। নানাবিধ গ্রহধর্ম্মপ্রযুক্ত এঙ্কের ধূমকেতুর গ্রহবৈগুণ্য জন্মে, সর্ব্বংসহা পৃথিবীও উহাকে উৎপীড়িত করিতে কসুর করেন না। সূর্য্য হইতে পৃথিবীর যে দূরত্ব, তাহা এই ধূমকেতুর আবলীকী দুর্গতির এক বিশিষ্ট কারণ; সুতরাং পৃথিবীর ঠিক দূরত্ব না ধরিতে পারিলে, কেতুকক্ষার গণিতে ভুল হয়; অতএব এই পর্য্যটক-মুখে শুনিতে পাইবে যে, বসুমতী সূর্য্য হইতে কত দূরে আছেন। তাৎপর্য্য এই হইল যে, এঙ্কের ধূমকেতুর গণিত করিলে পৃথিবীর দূরত্ব কত দূর শুদ্ধ, তাহার পরীক্ষা হয়।

প্রতিঘাতী মধ্যক।—এতক্ষণ সন্দেহনিরাসের অভিপ্রায়ে পর্য্যটক এঙ্ককে বুধের সামগ্রী, বৃহস্পতির সামগ্রী ইত্যাদি ন্যূনাধিক বিদিত বিষয়ের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করা যাইতেছিল, এক্ষণে তাঁহা হইতে একটি অপূর্ব্বজ্ঞাত বিষয়ের

জ্ঞানলাভ হইবে। এঙ্ক ১২১০ দিন অন্তর এক এক বার ঘুরিয়া সূর্য্য-সন্নিধানে উপনীত হয়; কিন্তু প্রতিবার ঠিক ১২১০ দিনের পর আসে না। এখনই বলা হইল যে, গতির বিষমতার বিশিষ্ট কারণ বুধ ও বৃহস্পতির আকর্ষণ এবং পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগণ কর্ত্তৃক যে বিক্ষোভ জন্মে, তাহাও ধরিতে হয়। এখন এই নানাবিধ বিক্ষোভের কারণ ধরিয়া হিসাব করিলে কি এঙ্ককে বিশ্বব্যাপী মহাকর্ষণ অত্রুটিত-ভাবে বিরাজিত দেখিব? এঙ্ক কি গণিতাচার্য্যের হুকুম অনুসারে চলিবে? না—এঙ্ক কেবল মহাকর্ষণের পরতন্ত্র হইয়া অব্যাহতরূপে পরিভ্রমণ করিতেছে না, এঙ্ক গণিতাচার্য্যের হুকুম মানিতেছে না। ভগণকাল বারংবার সমভাবে কমিতেছে—এক ভ্রমণকাল পূর্ব্বাপেক্ষা ২½ ঘণ্টা কম।

এঙ্কের প্রকাশিত নিম্নলিখিত পত্র দেখিলে এই ধূমকেতুর ভগণকালের পরিবর্ত্তন উত্তমরূপ বুঝা যাইবে।

বৎসর	ভগণকাল	বৎসর	ভগণকাল	বৎসর	ভগণকাল
১৭৮৯	১২১২,৭৯	১৮১৫	১২১২,৮৯	১৮৩৮	১২১১,১১
১৭৯২	১২১২,৬৭	১৮১৯	১২১১,৭৮	১৮৪২	১২১০,৯৮
১৭৯৫	১২১২,৫৫	১৮২২	১২১১,৬৬	১৮৪৫	১২১০,৮৮
১৭৯৯	১২১২,৪৪	১৮২৫	১২১১,৫৫	১৮৪৮	১২১০,৭৭
১৮০২	১২১২,৩৩	১৮২৯	১২১১,৪৪	১৮৫২	১২১[illegible],৬৬
১৮০৫	১২১২,২২	১৮৩২	১২১১,৩২	১৮৫৫	১২১০,৫৫
১৮০৯	১২১২,১০	১৮৩৫	১২১১,২২	১৮৫৮	১২১০,৪৪

এক ভগণের কালের তুলনায় ২½ ঘণ্টা অকিঞ্চিৎকর, সন্দেহ নাই। কিন্তু নভোমণ্ডলের যে প্রদেশে উপনীত হইলে আমাদের নয়নগোচর হয়, সে প্রদেশে ইহার গতি এত বেগবতী যে, ২½ ঘণ্টায় অনেক দূর চলিয়া যায়। এ বিষমতা অগ্রাহ্য করা যায় না; কারণ এক আধ বার নহে, উপর্য্যুপরি সমভাবে দেখা যাইতেছে। কেহ কেহ মনে করেন, গ্রহগণের আকর্ষণের ফলবিশেষ বুঝিতে না পারায়, হয় ত তাহা হিসাবে ধরা হয় নাই, সেই জন্যই এই তফাৎটুকু হইতেছে।

বন আষ্টেন ১৮৭৫ পর্য্যন্ত বেধগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমালোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অন্তরীক্ষে প্রতিঘাতী মধ্যকের অস্তিত্বপ্রযুক্ত এই বিষমতা ঘটে। যখন বলা হয় যে, জ্যোতিষ্কগণ আকর্ষণের বশবর্ত্তী হইয়া রবিপরিত বৃত্তাভাস-পথে পরিভ্রমণ করে, তখন স্বীকার করা হয় যে, জ্যোতিষ্কগণের গতি অপ্রতিহত, শূন্যমার্গে সংঘর্ষণ বায়ু বা গতিবিরোধী কোন ব্যাপার

নাই। কিন্তু এ মত যদি অসত্য হয়, অন্তরীক্ষে যদি এমন কোন সূক্ষ্ম পদার্থ থাকে, যদ্দ্বারা ধূমকেতু আহত হয়,—যেমন বন্দুকের গতিবিরোধী বায়ু—তবে কি হয়? যদিও আকাশের অধিকাংশ বস্তুতঃই সম্পূর্ণরূপে শূন্য হয়, এবং অসার ছায়াবৎ ধূমকেতু ভ্রমণকালে কোনরূপ প্রতিঘাত অনুভব না করিতে পারে, তথাপি সৌরমণ্ডলসমীপে এমন কোনরূপ মধ্যক থাকিতে পারে, যদ্দ্বারা এরূপ লঘিষ্ঠ প্রেতবৎ পদার্থের অস্তিত্ব কেবল এঙ্কের গতিতে যে ব্যক্ত হইতেছে, এমত নহে; বসন্তে পশ্চিম আকাশে অপবৃত্তীয় আলোক নাম্নী যে অস্পষ্টা শোভা (বরাহমিহিরের দিগ্‌দাহ?) নয়নগোচর হয় এবং পূর্ণসূর্য্যগ্রহণকালে নিরালোক চন্দ্রমণ্ডলপরিতঃ যে আলোকচ্ছটা দেখা যায়, এই উভয়বিধ ব্যাপার সম্পূর্ণ মধ্যক-বিহীন আকাশে ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

বিএলার ধূমকেতু।

১৮২৭ অব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারি তারিখে অষ্ট্রিয়া রাজ্যের বিএলা নামক জনৈক সেনাপতি এই ধূমকেতু আবিষ্কার করেন; দশ দিন পরে মারসেই নগরে জ্যোতিষী গামবার্ট ইহার বেধ করিয়া গণনারম্ভ করেন। ইনি ইহার কক্ষোপকরণ পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, ১৭৭২ ও ১৮০৫ অব্দের যে ধূমকেতু উদিত হইয়াছিল, সে এই-ই। যে কারণে পনসের আবিষ্কৃত ধূমকেতু হাল্লীর নামে বিখ্যাত হইল, সেই কারণে ইহাকে ত গামবর্ট বলা উচিত। ইহার ভগণকাল সাড়ে ছয় বৎসর। ১৮৩২ অব্দে ইহা পুনরাগমন করিবে, এই আদেশ শুনিয়া জনসমাজ সভয় হৃদয়ে ইহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। আদিষ্ট কালে ধূমকেতু ৫ কোটি মাইল অন্তরে থাকিয়া ভূকক্ষার ক্ষেত্র অতিক্রম করিল। এই সমাগমে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা থাকিলে, তাহা কেতুপক্ষে সম্ভাব্য—পৃথ্বীপক্ষে নহে; কারণ এতদ্দ্বারা উহার কক্ষা অত্যন্ত বিকৃত হইয়াছিল। ১৮৩৯ অব্দের জুলাই মাসে যখন এই ধূমকেতু আবার আসিয়াছিল, তখন ইহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিবার বড় সুবিধা ছিল না—একে সূর্য্যসন্নিকর্ষ, তাতে আবার আষাঢ়ে দিন। ফের গণিত স্থানে, গণিত কালে ১৮৪৫ সালে ২৫শে নবেম্বর দিবসে বিএলার ধূমকেতু দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইল; আচার্য্যেরা সতৃষ্ণ ও সযত্ন নয়নে আদরপূর্ব্বক উহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। বেধের কোন ব্যাঘাত নাই, পর্য্যবেক্ষণ সুচারুরূপে চলিতে লাগিল, এমন সময়ে, ১৮৪৬ অব্দের ১৩ই জানুয়ারী তারিখে, অকস্মাৎ

বিএলার ধূমকেতু দ্বিখণ্ড হইয়া পড়িল।—এই অচিন্তিতপূর্ব্ব চমৎকারী

ব্যাপারের কারণ কি হইল? ইহার হৃৎপিণ্ডে কি রোগ হইল? কেন এ বিদারণ? এই ব্যোমচরে এ অদ্ভুত উপপ্লব কোথা হইতে আসিল? জানি না। এক কেতু যুগলরূপে পাশাপাশি হইয়া শূন্যসাগরে ভাসমান হইল। এক ধূমকেতু দুইটি পূর্ণাবয়বসম্পন্ন ধূমকেতু হইল,—দুই শীর্ষ, দুই ভর্গ, দুই গর্ভাবরণ, দুই পুচ্ছ; ১০ই ফেব্রুয়ারীতে দুইয়ের ব্যবধান ১,৪৯,০০০ মাইল। ধূমকেতু-যুগল পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়া অচিরে অকূল শ্যামসাগরে নিমজ্জিত হইল।

পুনঃ ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে ভূলোকের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইল। এবার বিচ্ছেদ বড় বেশী বেশী, ৫০০,০০০ মাইল অন্তর; ১৮৪৬ অব্দে উভয়ের মধ্যে একটা প্রণয়পট্টিকাবৎ দৃষ্ট হইত, এবার সেটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। জ্যোতির্বিদেরা যমজ ধূমধ্বজের এই বিপর্য্যস্ত দশা সচকিত নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, '৪৬সে এক বিগ্রহের দ্বিশরীরপ্রাপ্তি এই বাসনব্যাপার ইহার ভাবী বিনাশের পূর্ব্ব লক্ষণ হইল; কেতুদ্বয় আর নাই,—লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৮৫২তে অনেক অন্বেষণেও ইহাকে কোথাও পাওয়া গেল না। ইহার বৃত্তাভাস-কক্ষ ধরিয়া গণিত করিয়া দেখা গিয়াছিল যে, ইহা ১৮৫৯, ১৮৬৬, ১৮৭২, ১৮৭৭, এবং ১৮৮৫ অব্দে আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবে; কিন্তু ১৮৫৯ গেল ১৮৬৬ গেল, একে একে ঐ সকল নির্দ্দেশিত বৎসর চলিয়া গেল, কেতু দৃষ্টিগোচর হইল না; জ্যোতিষী দূরবীক্ষণ লইয়া কেতুমার্গ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেতু আর নয়নগোচর হইল না। কোথা হইতে হইবে? কেতু নাই—কেতু লয় পাইয়াছে।

ফের ধূমকেতু।

১৮৪৩ অব্দে পারি বেধালয়ের জ্যোতির্ব্বিদ ম, ফে একটি নূতন ধূমকেতু দেখেন। তিনি স্থির করিলেন যে, কেতুর কক্ষা বৃত্তাভাস, এবং ভগণকাল ৭½ বৎসর। লে বেরিয়া অতি যত্নসহকারে ইহার কক্ষার গণিত করিলেন এবং আদেশ করিলেন যে, ১৮৫১ অব্দে ৩রা এপ্রেল তারিখে ইহার পুনরাগমন হইবে। ধূমকেতুটি প্রথমতঃ ১৮৫০ অব্দে ২৮শে নবেম্বরে লে বেরিয়ার আদিষ্ট স্থানের কাছাকাছি দেখা গিয়াছিল, এবং আদিষ্ট কালের ২০।২২ ঘণ্টার মধ্যে পরিহৈলিকে উপনীত হইল। ফের কেতুর পরিহৈলিকে সূর্য্য হইতে ১৬ কোটি মাইল অন্তর এবং অপহৈলিকে অন্তর ৫৬ কোটি মাইলের অধিক হইবে। ইহার কক্ষার উৎকেন্দ্রত্ব গ্রহকক্ষার ন্যায়, ০০০৫৫ মাত্র।

ফের ধূমকেতু দ্বারা প্রতিঘাতী মধ্যকের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়

না। এই ধূমকেতুর প্রথম উদয়কালে ৬ মাস পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ চলিয়াছিল, সুতরাং জ্যোতির্ব্বিদগণ কক্ষাগণনায় অলব্ধপূর্ব্ব সূক্ষ্মতা লাভ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় উদয়ে ৩ মাস পাওয়া গিয়াছিল এবং তৃতীয় উদয়ে মাসাধিক। এই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণের ফল এই দাঁড়াইল যে, কক্ষাটি সুব্যক্ত বৃত্তাভাস। কেতুর গতি যে আকাশবৎ কোন সূক্ষ্ম পদার্থ দ্বারা ব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার লক্ষণ কিছুই দৃষ্ট হইল না। ১৮৬৫ অব্দে চতুর্থ উদয়েও অবস্থান দৃগ্‌গণিতৈক্য হইল। অতএব সিদ্ধ হইল যে, এ কেতুর গতি আকাশবৎ মধ্যক দ্বারা প্রতিহত হয় না।

এ কাল পর্য্যন্ত যত দূর দেখা গেল, তাহাতে বোধ হয় যে, এঙ্কের ধূমকেতুর গণিত করিতে হইলে, প্রতিঘাতী মধ্যকের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। অধ্যাপক এঙ্কের মত এই যে, শুক্রকক্ষার অতীত আকাশে এরূপ ব্যাহতি অনুভূত হয় না; এবং মধ্যকের সান্দ্রত্ব সূর্য্য হইতে দূরত্বের বর্গের বিলোমানুপাতী। কেতুকক্ষার উপরে প্রতিঘাতী মধ্যক যে বলপ্রকাশ করে, তাহা অনেকের আশার অনুরূপ। এরূপ মধ্যক দ্বারা স্পর্শরৈখিক বেগের হ্রাস হয়, অর্থাৎ কেন্দ্রবিমুখী শক্তির অপচয় ঘটে; তজ্জন্য ধূমকেতু সূর্য্যসমীপে আকৃষ্ট হয়, সুতরাং কক্ষা খর্ব্বীভূত হইয়া পড়ে। কিন্তু কক্ষা যখন ছোট হয়, তখন অনন্ত-সম্বন্ধ বেগ বাড়ে। অতএব সিদ্ধান্ত এই হইল যে, প্রতিঘাতী মধ্যকে সমাগত হইলে, কি গ্রহের কি ধূমকেতুর অনন্তসম্বন্ধ বেগের আধিক্য হয়।

ব্রোর্সেনের ধূমকেতু।

১৮৪৬ অব্দে দেনমার্কের সর ব্রোর্সেন কর্তৃক একটি দৌরবীক্ষণিক ধূমকেতু আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এটি রবিপরিতঃ ৫½ বৎসরে পরিভ্রমণ করে। পরিহৈলিকে ইহার দ্বিতীয় আগমনের কাল ১৮৫১ অব্দের সেপ্টেম্বর বলিয়া আদিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু এই সময়ে কেতুর অবস্থান বেধপক্ষে নিতান্ত অননুকূল থাকায় দেখিতে পাওয়া যায় নাই—তাহার পরের বারে ১৮৫৭ অব্দে পরিহৈলিকে দৃষ্ট হইয়াছিল। ১৮৫৭ অব্দের ১৮ই মার্চ তারিখে বার্লিন নগরে প্রকট হয়, এবং ঐ মাসের ২৯শে তারিখে অনুহৈলিকে পৌছে। পরিহৈলিকে ইহার সূর্য্য হইতে দূরত্ব ছয় কোটি ২০ লক্ষ মাইল, অর্থাৎ শুক্রের দূরত্বের কম; অপহৈলিক দূরত্ব ৫৩ কোটি ৮০ লক্ষ মাইল, অর্থাৎ বৃহস্পতির দূরত্ব অপেক্ষা অধিক। ইহার ভগণকাল ২০৩১ দিন। ক্রান্তিবৃত্তের ক্ষেত্রে ইহার কক্ষা অঙ্কিত করিলে, বিএলার কক্ষার অভ্যন্তরে পড়িবে।

পর্য্যবেক্ষণ-পক্ষে প্রতিকূল অবস্থান প্রযুক্ত ব্রোর্সেনের ধূমকেতু ১৮৬২ অব্দে দৃষ্টিগোচর হয় নাই; কিন্তু ১৮৬৪ অব্দে পরিহৈলিকে গণিতাগত অবস্থানের ১০এর মধ্যে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।

ড'আর্‌রেস্তের ধূমকেতু।

লিপজিক নগরের ড'আররেস্তাব ১৮৫১ অব্দে একটি যন্ত্রদ্রষ্টব্য অনুজ্জ্বল ধূমকেতু আবিষ্কার করেন। ইহার গণিতাগত কক্ষা বৃত্তাভাস এবং ভগণকাল ৬০৪ বৎসর। তদনুসারে আদেশ হইয়াছিল যে, ১৮৫৭ অব্দের ৩০ নবেম্বর তারিখে ইহার সূর্য্যসমীপে আসন্ন পুনরাগমন হইবে। ইহার যাম্যক্রান্তির আধিক্যপ্রযুক্ত অর্থাৎ বিযুবন্মণ্ডল হইয়া, অনেক দূর দক্ষিণে থাকায়, উত্তর ভূগোল হইতে ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না; পরন্তু উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে ১৮৫৭ অব্দের ডিসেম্বর মাসে ইহা দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল; এবং জানুয়ারির মাঝামাঝি পর্য্যন্ত বেধকার্য্য চলিয়াছিল। ২৮ নবেম্বরে ইহা পরিহৈলিক অতিক্রম করিয়া ১৮৫১র আদিষ্ট পথে ঠিক চলিতে লাগিল। ইহার পরিহৈলিক অন্তর এগার কোটি দশ লক্ষ মাইল এবং অপহৈলিক অন্তর চুয়ান্ন কোটি ষাট লক্ষ মাইল।

উইনেকের ও তত্তেলের ধূমকেতু।

১৮১৯অব্দে মারসেইল নগরে ম. পনস কর্ত্তৃক একটি ধূমধ্বজ আবিষ্কৃত হয়, এবং উহা ৩৮ দিন পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছিল। এঙ্ক ইহার কক্ষা ও ভগণ কালের গণিত করিয়াছিলেন। কক্ষা—বৃত্তাভাস, ভগণকাল—৫.৬ বৎসর। ইহা ৩৯ বৎসর পর্য্যন্ত অদৃষ্ট থাকিয়া বনন্‌ নগরে ডর উইন্‌নেক দ্বারা পুনরাবিষ্কৃত হইয়াছিল। তখন ১৮১৯এর পর উহার সাত ভগণ হইয়াছিল এবং প্রতিভ্রমে গড়ে ৫.৫৪ বৎসর পড়িয়াছিল। সূর্য্য হইতে ইহার পরিহৈলিক দূরত্ব সাত কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল এবং অপহৈলিক দূরত্ব বাহান্ন কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল। অবস্থানের অসুবিধাবশতঃ ইহাকে ১৮৬৩ অব্দে দেখা যায় নাই, কিন্তু ১৮৬৯এর গ্রীষ্মকালে পুনর্দৃষ্ট হইয়াছিল। এবারও ঠিক আদিষ্ট কক্ষায় ঘুরিয়াছিল।

১৮৫৮ অব্দে আমেরিকার কেম্ব্রিজ নগরে মর তুত্তেল কর্ত্তৃক একটি ক্ষুদ্র ধূমকেতু আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহার কক্ষা বৃত্তাভাস। ১৭৯০ অব্দে যে ধূমধ্বজ পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছিল, তাহার কক্ষোপকরণে এবং ইহার কক্ষোপকরণে সবিশেষ ভেদ দৃষ্ট হয় নাই, এবং আদেশ হইয়াছিল যে, ১৮৭১ অব্দের

৩০শে নবেম্বর তারিখে ইহার পুনরুদয় হইবে। ১৮৭১ অব্দের প্রায় ঠিক আদিষ্ট স্থানে ধূমধ্বজ আবির্ভূত হইল, এবং ইহার সাময়িকত্বের আর সংশয় রহিল না। ইহার অনুহৈলিক দূরত্ব পৃথিবীর দূরত্ব অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক, এবং অপহৈলিক দূরত্ব শনির দূরত্ব অপেক্ষা অধিক। ভগণকাল ১৩.৬৪ বৎসর।

১৭৪৪এর ধূমকেতু।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দের ধূমকেতুর মধ্যে ১৭৪৪এর ধূমকেতু সর্ব্বাপেক্ষা শোভন ও ভাস্বর। ইহার পরিহৈলিক দূরত্ব পৃথিবীর দূরত্বের পঞ্চমাংশমাত্র, অথবা বুধের দূরত্বের কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ। পরিহৈলিক অতিক্রমের তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে ইহার দীপ্তি বৃহস্পতির পরমদীপ্তির সমান হইয়াছিল, এবং পরিহৈলিক উত্তীর্ণ হইবার এক পক্ষ পূর্ব্বে ইহার আলোক শুক্রালোক সদৃশ হইয়াছিল। পরিহৈলিক অতিক্রমের দিবসে মধ্যাহ্নে ইহা দূরবীক্ষণ সাহায্যে নয়নগোচর হইয়াছিল, এবং সূর্য্যোদয়ের পরও কতক্ষণ লোক সুধু চক্ষে দেখিতে পাইয়াছিল।

ইহার ধ্বজা প্রায় দুই কোটি মাইল লম্বা। পরিহৈলিক অতিক্রম করিবার দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে পুচ্ছটি দুই শাখায় বিভক্ত বলিয়া বোধ হইয়াছিল। একটি ৭° অপরটি ২৪° লম্বা। যে দিন পরিহৈলিকে আসিবে, তাহার পূর্ব্ব দিন পুচ্ছটি চাপাকার ধারণ করিল—দেখিতে যেন অর্দ্ধক্ষেপণী হইয়া উঠিল। তাহার পর সপ্তাহকাল মেঘাচ্ছন্ন থাকাতে আর বেধকার্য্য চলিল না। কিন্তু পরিহৈলিক পার হইবার ছয় দিন পরে সূর্য্যোদয়ের দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে যখন ধূমকেতুর শিরঃপ্রদেশ ক্ষিতিজের অনেক নীচে গেল, তখন পুচ্ছটি ক্ষিতিজের উর্দ্ধে পাখার মত বিস্তৃত হইয়া রহিল। এই অংশটি ছয় পুচ্ছে বিভক্ত দেখাইতে লাগিল। মস্তক হইতে ৩০°। ৪৪° পর্য্যন্ত বিস্তার।

১৭৭০এর ধূমকেতু।

এই ধূমকেতু পৃথিবী ও বৃহস্পতির অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল; এবং তন্নিবন্ধন উহার কক্ষায় বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। ইহার কক্ষা বৃত্তাভাস ও ভ্রমকাল ৫½ বৎসর। গণিত-সহায়ে অতীত কালে ইহা যে কক্ষায় গমন করিয়াছিল, তাহা বিলিখিত করিলে দেখা যায় যে, ১৭৬৭ প্রারম্ভে ইহা বৃহস্পতির অত্যন্ত সন্নিকৃষ্ট ছিল। তৎকালে এই ধূমধ্বজ ও বৃহস্পতির যে ব্যবধান, তাহা সূর্য্য হইতে ধূমকেতুর ব্যবধানের ১/৫৮ মাত্র। এ অবস্থায় সৌরাকর্ষণ অপেক্ষা বার্হস্পত্যাকর্ষণের ফল অবশ্যই তিন গুণ অধিক হইয়াছিল।

কক্ষার এই অংশে বৃহস্পতি ও ধূমকেতু প্রায় এক দিকে চলিতেছিল; এবং কতিপয় মাস পর্য্যন্ত ধূমকেতু বৃহস্পতি কর্ত্তৃক অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছিল। এই উত্তেজনা প্রযুক্ত ১৭৭০ অব্দে ধূমকেতুর কক্ষা অত্যন্ত হ্রস্বীভূত হইয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বে ইহার কক্ষা এত বিশাল ছিল যে, এক ভ্রমে ৪৮ বৎসর লাগিত। তখন উহার পরিহৈলিক অন্তর ত্রিশ কোটি মাইল, সুতরাং তখন উহাকে পৃথিবী হইতে দেখা যাইত না।

১৭৭০ হইতে এ কেতুকে আর দেখিতে পাওয়া যায় নাই। পৃথিবী হইতে অত্যন্ত দূরত্ব প্রযুক্ত ১৭৭৬ অব্দে ইহাকে পর্য্যবেক্ষণ করা অসম্ভব হইয়াছিল; এবং আর এক ভ্রমণ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই বৃহস্পতিসমীপে উপস্থিত হইয়াছিল। ১৭৭৯র আগষ্ট মাসে ইহার বৃহস্পতি হইতে দূরত্ব সূর্য্য হইতে দূরত্বের $\frac{১}{৪৯১}$ মাত্র হইয়াছিল; এই অবস্থানে বৃহস্পতির আকর্ষণ সূর্য্যের আকর্ষণ অপেক্ষা ২৩০ গুণে অধিক হইয়াছিল। কারণ,

এই আকর্ষণ জন্য কক্ষা এরূপ হইয়া গেল যে, ভ্রমকাল ১৬ বৎসর হইয়া পড়িল; এবং ইহার পরিহৈলিক অন্তর পুনঃ ত্রিশ কোটি মাইল হইল। এইরূপে এই ধূমকেতু ১৭৭০এর পূর্ব্বে এবং ১৭৭০এর পরে অস্মদাদির দৃষ্টির অবিষয়ীভূত হইয়াছিল। এই ধূমকেতুর

১৭৭০এর কক্ষা ভূকক্ষা ও গুরুকক্ষা সম্বন্ধে তাহার অবস্থান পরিলেখে দ্রষ্টব্য।
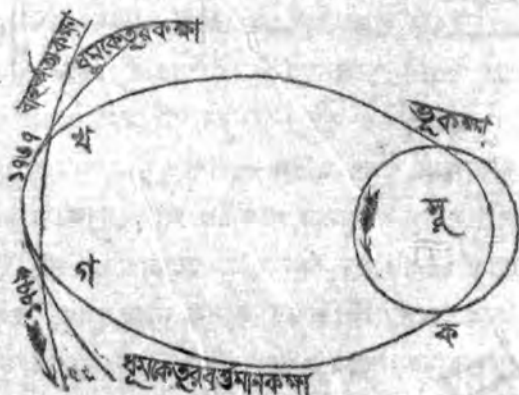
এই ধূমকেতুর সামগ্রী।—যত ধূমকেতুর বিষয় পত্রারূঢ় হইয়াছে, তন্মধ্যে এই ধূমকেতুর তুল্য কোন ধূমকেতু পৃথিবীর এত নিকটস্থ হয় নাই। একবার ১৪ লক্ষ মাইলের মধ্যে আসিয়াছিল। এই অবস্থানে উহার নীহারময় গর্ভাবরণের সম্মুখস্থ কোণ ২° ২৩′ পরিমিত হইয়াছিল, অর্থাৎ চন্দ্রবিম্বের প্রায় ৫ গুণ হইয়াছিল। লাপ্লাস গণনা করিয়াছিলেন যে, যদি এই ধূমকেতুর সামগ্রী পৃথিবীর সামগ্রীর সমান হইত, তবে ইহা দ্বারা ভূকক্ষা এত পরিমাণে বর্দ্ধিত হইত যে, বর্ষপরিমাণ ২ ঘণ্টা ৩৮ মিনিট অধিক হইত। কিন্তু বেধ দ্বারা সপ্রমাণ

হইয়াছে যে, বর্ষপরিমাণ দুই সেকেণ্ডও হয় নাই; অতএব অনেকে অনুমান করেন যে, এই কেতুর সামগ্রী পার্থিব সামগ্রীর ৫০০০ অংশের একাংশ হয় কি না।

এই কেতুর সামগ্রী উক্ত পরিমাণ অপেক্ষা কম হইয়া থাকিবে। কারণ, বৃহস্পতির চতুর্থ চন্দ্রের বৃহস্পতি হইতে যে অন্তর, তাহা অপেক্ষা এই ধূমকেতু বৃহস্পতির নিকটে আসিয়াছিল, তথাপি বার্হস্পত্য চন্দ্রগণের কিছুমাত্র বিক্ষোভ জন্মে নাই।

১৮৪৩এর বৃহৎ ধূমকেতু।

খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দের অত্যন্ত উজ্জ্বল ধূমকেতুগণের মধ্যে ১৮৪৩এর ধূমকেতুর পরিগণনা হইয়া থাকে। এই ভূমণ্ডলের অনেক স্থলে ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে মধ্যাহ্নে রবি-সন্নিধানে লক্ষিত হইয়াছিল; এবং অচিরে প্রদোষ-আলোকে বিশেষ দর্শনীয় পদার্থ বলিয়া উহার প্রতি অনেকের দৃষ্টিপাত হইত। ইহার দৃশ্যমান পুচ্ছ ৫০° হইতে ৭০° পর্য্যন্ত এবং বাস্তব পুচ্ছ ন্যূনাধিক ১২ কোটি মাইল লম্বা হইয়াছিল। পরিহেলিকে ধূমকেতু রবিবিম্বের এত সন্নিকৃষ্ট হইয়াছিল যে, উভয়ের ব্যবধান দৃষ্টিগোচর হয় নাই, এবং গণিতজ্ঞেরা স্থির করিয়াছিলেন যে, তৎকালে ধূমকেতু লোহিত লৌহাপেক্ষা দুই সহস্র গুণে উত্তপ্ত হইয়াছিল। পরিহেলিক অতিক্রম করিবার কতিপয় দিন পর্য্যন্ত পুচ্ছের স্পষ্ট অগ্নিবৎ প্রভা প্রতীয়মান হইয়াছিল। অত্যন্ত সৌরতাপে নিপতনই ইহার পুচ্ছের এবম্ভূত অসাধারণ আকৃতির কারণ;—যেমন ভয়ানক লম্বা, তেমনই বিরচন-ব্যাপারের বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতা!

এই ধূমকেতুর কক্ষা পটোলাকার সুদীর্ঘ বৃত্তাভাস। ১৬৬৮ ও ১৬৬৯এর ধূমকেতুর সহিত ইহার একতা স্থাপনের প্রয়াস করা হইয়াছিল। কিন্তু যত্নসিদ্ধ সূক্ষ্ম গণিত দ্বারা অবগতি হয় যে, ইহারে ভগণ কাল ১৭০ বৎসর।

দোনাতির ১৮৫৪এর ধূমকেতু।

১৮৫৮ অব্দে জুন মাসে ফ্লরেনস নগরে দোনাতির দ্বারা এই ধূমকেতু আবিষ্কৃত হয়। ইহা দুই মাস পর্য্যন্ত অযত্নসহায় নেত্রপক্ষে মলিন পদার্থ-বিশেষবৎ অপ্রত্যক্ষ রহিল। অনন্তর অগষ্টের শেষ কালে পুচ্ছের লক্ষণ লক্ষিত হইতে লাগিল। ২৯ সেপ্টেম্বরে পরিহেলিক পার হইল। পুচ্ছটি ১০ই অক্টোবর পৃথিবীর পরম সন্নিকর্ষে উপনীত হইল। পুচ্ছটি ১০ই অক্টোবর পর্য্যন্ত ক্রমাগত পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল; এবং পুচ্ছ যখন ৫ কোটী মাইল দৈর্ঘ্য

প্রাপ্ত হইল, তখন উহার সম্মুখস্থ কোন ৬০° হইল। কেতুগর্ভ যেমন বিশাল, তেমনই তেজঃপুঞ্জময়। অক্টোবরের পর আর ইহা ইউরোপে দৃষ্ট হয় নাই। দক্ষিণ গোলে ১৮৫৯ এর মার্চ পর্য্যন্ত দেখা যাইত। এই কেতু বৃত্তাভাসে ভ্রমণ করে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ভ্রমণকাল ১৬০০ বৎসর—২১০০ বৎসরও অসম্ভব নহে। ৯ম প্রকরণে কোষের ব্যাখ্যা এবং পরিমাণের পরিবর্ত্তন-সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ করা গিয়াছে তদ্বৎ পরিবর্ত্তন এই কেতুর ঘটিয়াছিল, এবং তজ্জন্যই ইহা এত স্মরণার্হ হইয়াছে।

ধূমকেতু কি পৃথিবীকে সমাঘাত করিতে পারে?—অসীম অন্তরীক্ষে গ্রহগণ যত দূর পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিতেছেন, তত দূর পর্য্যন্ত সকল দিকেই অসংখ্য ধূমকেতু বিচরণ করিতেছে; অতএব সম্পূর্ণ সম্ভব যে, কালক্রমে একদিন পৃথিবীর সহিত ধূমকেতুর সংঘর্ষণ হইতে পারে।

অনেক ধূমকেতুর গর্ভ সসার বলিয়া বোধ হয়। উল্কাপাত অধ্যায়ে অবগতি হইবে যে, সসার পদার্থ পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইয়াছে, মনুষ্যাদি জীব নিহত করিয়াছে, এবং ভবনাদি লোকালয় দগ্ধ করিয়াছে। সত্য বটে যে, সংগৃহীত ব্যোমাশ্ম সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড—ওজনে কয়েক সের মাত্র। এ কেবল বড়র সহিত ছোটর সম্বন্ধ, ইহা তত্ত্ববিরোধী নহে। বহু-মাইল-ব্যাস-বিশিষ্ট অনেক ব্যোমাশ্ম পৃথিবী ছুঁইয়া গিয়াছে।

১৮১১ অব্দের	ধূমকেতুর গর্ভ	৪২৮	মাইল
১৮৪৩ "	"	৪৯৭০	"
১৮৫৮ "	"	৫৫৮০	"
১৭৬৯ "	"	২৭০০০	"

গর্ভ উপকরণের বাস্তবিক প্রকৃতি যাহাই হউক না কেন, পৃথিবী ও ধূমকেতু যদি ঘণ্টায় ৬০ হাজার মাইল বেগে ঘুরিতে থাকে, তবে ধূমকেতুর সহিত পৃথিবীর সমাগম হইলে, আমাদিগকে যে ধাক্কা লাগিবে, তাহার সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, ধূমকেতুর বায়ুমণ্ডলে পৃথিবীর প্রবেশ সহজেই ঘটা সম্ভব। ১৮১১র ধূমকেতুর সসার গর্ভের ব্যাস ৪২৮ মাইল; কিন্তু ইহা ১১ লক্ষ ১৮ হাজার মাইল পরিমিত বায়ুমণ্ডলে পরিবেষ্টিত ছিল। ইহার অধিক বায়ু-মণ্ডলের পরিমাণ কেহ কখন দেখে নাই। রবিবিম্বের ব্যাস ৮৬৬০০০ মাইল; অতএব এই ধূমকেতু রবি অপেক্ষা বড়; রবির ঘনফলের দ্বিগুণ। এই ধূমকেতু

যদি আমাদের ৫০০০০০ মাইল দূর দিয়া যায়, তবে আমরা ইহার মাথায় গিয়া পড়িব। কিন্তু এরূপ ঘটনা ঘটে নাই—অন্ততঃ আমরা জানি না।

অতএব ধূমকেতুতে ও পৃথিবীতে যে একদিন ঠেকাঠেকি হইবে না, তাহার কোন বিশিষ্ট কারণ নাই। তবে এরূপ সমাগমের ফল যে কি হইবে, তাহা এখন বলা সুকঠিন; কারণ সে ফল ধূমকেতুর সমাসন্ন অংশের সামগ্রী ও সান্দ্রত্বের উপর নির্ভর করে। একটা রাসায়নিক সংশ্লেষণ ঘটিতে পারে; এই জগৎ-প্রাণ ভূবায়ুর সহিত কারবলিক আসিড বা অপর কোন প্রাণনাশক গ্যাস মিশ্রিত হইতে পারে; মনুষ্যজাতিমাত্রই বিষদিগ্ধ হইতে পারে; জীবমাত্রেরই শ্বাসক্রিয়ার অবরোধ হইতে পারে; অখিল ভূমণ্ডল অকস্মাৎ বিদীর্ণ হইতে পারে; সমস্ত সহসা তাড়িতাহত হইতে পারে; গতি তাপে পরিণত হইতে পারে; সংঘাতজনিত মহা খণ্ডপ্রলয় ঘটিতে পারে—এতগুলি বিপদের আশঙ্কা। অতএব ধূমকেতুগুলিকে সম্পূর্ণরূপে অনিষ্টকারী নহে বলিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না; অথচ ইহাও বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, যদিও ধূমকেতুর সংখ্যার ইয়ত্তা নাই, এবং রবিপরিতঃ তাহাদিগের গতির বিষমতা ও বিচিত্রতার পরিসীমা নাই, তথাপি যাবৎ না ভগবতী বসুমতী নৈসর্গিক নিয়মের বশবর্ত্তিনী হইয়া লয় প্রাপ্ত হইতেছেন, তাবৎ ধূমকেতুর উপপ্লবজনিত তাঁহার বিনাশের আশঙ্কা দেখি না। এই অখিল বিশ্বসংসারের তুলনায় বসুন্ধরা মৃৎকণামাত্র; ইনি যখন মনোজবার ন্যায় অকূল শূন্যসাগরে ভাসমান হন, তখন ইহাঁকে কে গণনা করে—কে লক্ষ্য করে? জ্যোতিষার্ণবে ইহার অস্তিত্ব কোথায়? *

শ্রীমাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

---

* "ধূমকেতু" প্রবন্ধে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দের ইংরাজী আগামী বারে প্রকাশিত হইবে।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। ভাদ্র। "বাবু" শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ হালদারের প্রণীত একটি ক্ষুদ্র গল্প। গল্পটির আখ্যানবস্তু মন্দ নয়, কিন্তু রচনাপ্রণালী ভাল নহে। "দেশীয় অশান্তি ও বিদেশীয় সমালোচনা" একটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ। ইহাতে কোনও মৌলিক চিন্তা বা বিশেষ দক্ষতার পরিচয় নাই। শ্রীযুক্ত নকুড়চন্দ্র বিশ্বাসের সঙ্কলিত "কলা" প্রবন্ধটি বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সঙ্কলিত "মীর কাসিমের" প্রথম পরিচ্ছেদ এবারে প্রকাশিত হইয়াছে। "সর্ব্বেশিনী" এবার সমাপ্ত হইল। গল্পটি মনোরম। "মসূরী পাহাড়ে তিন দিন" একটি ক্ষুদ্র সঙ্কিপ্ত ভ্রমণবৃত্তান্ত;—বিশেষ চিত্তাকর্ষক কিছু নাই। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "সে আমার" কবিতাটি মন্দ নহে। শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "জ্যোতিষ্ক গ্রহগণ" বেশ হইয়াছে। জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুরাগী ও কৃতবিদ্য চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এ বিভাগে বঙ্গসাহিত্যের প্রভূত উপকার করিতেছেন। এবারকার "স্বরলিপিতে" শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেনের রচিত একটি মধুর সঙ্গীত নিবিষ্ট হইয়াছে। "নিদাঘ দিবসে" একটি গল্প। গল্পটির আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। লেখকের ভাষা অত্যন্ত কাঁচা। এবারকার "ভারতী"র একটি বিজ্ঞাপনে প্রকাশ যে, নব বর্ষের প্রারম্ভ হইতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "ভারতী"র সম্পাদকতা গ্রহণ করিবেন। "ভারতী" অধঃপাতের প্রায় চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে, এ সময়ে রবীন্দ্র বাবু যদি তাহার উদ্ধারসাধন করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি সাধারণের ধন্যবাদভাজন হইবেন।

উৎসাহ। আশ্বিন। এবারকার উৎসাহের প্রবন্ধভাগ্য মন্দ দেখিতেছি। "অজ্ঞেয়বাদ" ও "জগৎশেঠ" এই দুইটি ক্রমশঃপ্রকাশ্য প্রবন্ধ ভিন্ন আর কোনও রচনা উল্লেখযোগ্য নহে।

মুকুল। আশ্বিন। "কুমারী হেলেন কেলার" প্রবন্ধটি পাঠকদের মনোরঞ্জন করিবে। কুমারী কেলারের ছবিখানি সুন্দর হইয়াছে। "ভালুকের লেজ কাটা" গল্পটি মন্দ নয়। "বড় কেও কেটা নয়" একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি বুঝিয়া পড়িলে বালকবালিকারা বায়ুর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে কতকটা অভিজ্ঞতা লাভ করিবে। "ন্যানসেন্" প্রবন্ধটি পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। লেখক ন্যান্‌সেনের মেরুভ্রমণের অদ্ভুত কাহিনী সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

সখা ও সাথী। আশ্বিন। "অপূর্ব্ব প্রতিজ্ঞাপালন" গল্প না সত্য? হিম্মতের [illegible] চিত্রিত করিয়া লেখক বালকপাঠকদের উপকার করিয়াছেন। "থবরের বোতল" গল্পটি নিতান্তই গল্প—প্রশংসাযোগ্য নয়। এরূপ অসার ও অসম্ভব গল্পে "সখা ও সাথীর" একগুলি পত্র ব্যয়িত হইতে দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। এবারকার "শীকার" প্রবন্ধটিও ভাল হয় নাই;—লেখারবাঁধুনি আদৌ নাই। এই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়ের "প্রবন্ধলহরী" এবং "কিটিংসের ছারপোকার পাউডার" একত্র সমালোচিত হইয়াছে। দেখিয়া আমাদের একটি উদ্ভট শ্লোকের কিয়দংশ মনে পড়িতেছে—"অশেষবিৎ পাণিনিরেকসূত্রে শ্বানং যুবানং মঘবানমাহ।"—এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। বালকপাঠ্য পত্রে "প্রবন্ধ-লহরীর" সমালোচনার উপযোগিতা কি, এবং "ছারপোকার" ঔষধের সমালোচনায় বালকেরা কি শিখিবে, তাহা সম্পাদকমহাশয়ই বলিতে পারেন।

রাণী ভবানী।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ;—হিন্দু-রমণী।

রাণী ভবানী বিধবা হিন্দু-রমণী। হিন্দু-রমণী বলিতে অধিকাংশ ইউরোপীয়গণ যেরূপভাবে নাসিকা-কুঞ্চন করিয়া আন্তরিক অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে ইতস্ততঃ করেন না, রাণী ভবানীর কীর্ত্তিকলাপ দেখিয়া অনেকেই তাঁহার প্রতি সেরূপ অবজ্ঞা-প্রদর্শনের অবসর প্রাপ্ত হন নাই। সেকালের ইংরাজ-লেখকেরা বলিতেন যে, "এই হিন্দুরমণীর যশঃপ্রভা বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।" * একালের সহৃদয় ইংরাজ-লেখকেরাও বলিয়া থাকেন যে, প্রতিভা-গুণে রাণী ভবানী বাঙ্গালীর চক্ষে "পূজনীয়া দেবী বলিয়া" প্রতিভাত হইয়াছেন। † যে গুণে অন্তঃপুরবাসিনী বিধবা হিন্দু-রমণী হইয়াও রাণী ভবানী স্বদেশ বিদেশে ইতিহাসলেখকদিগের নিকট এতদূর সমাদর লাভ করিয়াছিলেন, যে গুণে রাণী ভবানী হিন্দুনরনারীর নিকট প্রাতঃস্মরণীয়া, পূজনীয়া দেবী বলিয়া ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া আসিতেছেন, যে গুণে রাণী ভবানী স্বদেশপ্রেমিকদিগের নিকট মূর্ত্তিমতী মহাদেবী বলিয়া জয়মাল্য উপহার প্রাপ্ত হইতেছেন, যে গুণে রাণী ভবানী স্বদেশের প্রতিভাশালী নবীন কবির কল্পনা-প্রবাহে অমৃতধারা সঞ্চারিত করিয়া দিবার শক্তি লাভ করিয়াছেন, মানবসমাজ সকল যুগে, সকল দেশেই সেই সদ্‌গুণরাশির নিকট করযোড়ে প্রণিপাত করিয়া থাকে। যদিও এ দেশের আর সে দিন নাই, যদিও সেকালের পুরাতন আদর্শ অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, যদিও এখনকার লোকের পক্ষে, সেকালের ক্রিয়াকলাপের গূঢ় মর্ম্ম সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া, তাহার দোষ-গুণ নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা করিবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি এখনকার লোকের নিকটেও রাণী ভবানীর পুণ্য নাম প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

---

* Holwell.

† Rani Bhabani is a heroine among the Bengalees.—H. Beveridge. C. S.

এখনও এ দেশের বহুশত নরনারী প্রত্যূষে ভক্তিভরে রাণী ভবানীর পুণ্য নাম স্মরণ করিয়া দিন সফল হইল বলিয়া আনন্দ অনুভব করে!

সকল দেশেই এমন দুই চারিটি ঐতিহাসিক চরিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার সহিত দেশের লোকের হৃদয়-মনের বৈদ্যুতিক আকর্ষণ সংস্থাপিত হইয়া গিয়াছে। কি সিংহাসনারূঢ় রাজাধিরাজ, কি পর্ণকুটীরবাসী দরিদ্র কৃষক, সকলেই সেই পুণ্য নামে সমভাবে সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশের ধারাবাহিক ইতিহাস নাই, বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসচর্চ্চায় আন্তরিক অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি রাণী ভবানী বাঙ্গালীর অলিখিত ইতিহাসের সেইরূপ ঐতিহাসিক চরিত্র! বাঙ্গালী যে দিন স্বদেশ-প্রেমে বাহুতে বাহুতে মিলিত হইয়া দৃঢ়পদে উন্নতি-সোপানে আরোহণ করিতে পারিবে, সে দিনেও তাহার পথ-প্রদর্শক-পতাকাশীর্ষে রাণী ভবানীর পুণ্য নাম উজ্জ্বল অক্ষরে নরনারীর হৃদয়মন আকর্ষণ করিতে নিরস্ত হইবে না!

সাহস, সত্যনিষ্ঠা, পরহিতাকাঙ্ক্ষা ও স্বদেশপ্রেম যেমন জাতিবিশেষের গৌরবের বস্তু, ব্যক্তিগত জীবনেও তাহাদের সেইরূপ গৌরব। যে সাহসী, সত্যপরায়ণ, পরহিতকারী স্বদেশ-প্রেমিক, তাহার নামে সকল দেশেই জয়-ধ্বনি উত্থিত হইয়া থাকে। সে যদি দীন হীন কাঙ্গাল হয়, তথাপি অনেক মুকুটমণিপরিহিত রাজচক্রবর্ত্তী অপেক্ষা উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়া থাকে। তাহাকে চিনিবার জন্য, তাহার দিকে লোক-চিত্ত আকৃষ্ট করিবার জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিবার আবশ্যক হয় না—জনসাধারণ স্বভাবতঃই তাহার দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

রাণী ভবানী রমণী হইয়াও এই সকল চরিত্রগুণে বাঙ্গালীর নিকট চির-স্মরণীয়া হইয়া রহিয়াছেন। তিনি যখন যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাহা পালন করিবার জন্য ক্ষণকালও ইতস্ততঃ করেন নাই। সত্যনিষ্ঠা হেতু তাঁহার জীবনে সৎসাহস এরূপ সুন্দরভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল? সমসাময়িক রাজা, প্রজা, সকলেই তাহার জন্য রাণী ভবানীর নিকট অবনতমস্তকে দণ্ডায়মান হইতেন। সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে এক শ্রেণীর উচ্চাভিমানের নিত্যসংস্রব;—তিনি সেই উচ্চাভিমানের পূর্ণগৌরবে আত্মহৃদয়ের উন্নত মহিমায় আপনাকে আপনি এমন উজ্জ্বলভাবে সমাজের সম্মুখে দেবীমূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান ছিলেন যে, তাঁহাকে হারাইয়া বাঙ্গালীর জাতীয় মন্দির যেন সত্যসত্যই অন্ধকার হইয়া পড়িয়াছে!

বাঙ্গালীর ইতিহাসে রাণী ভবানীর ন্যায় দেবী-চরিত্র বড়ই দুর্লভ। তাঁহার জীবনলীলা যখন শেষ হইয়া আসিতেছিল, সেই সময়ে আর একজন হিন্দু-মহিলা ধীরে ধীরে প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া উঠিতেছিলেন। তীর্থযাত্রী হিন্দু নর-নারী গয়াধামের দেবমন্দিরদ্বারে ভক্তি, বিস্ময়ে প্রণিপাত করিবার সময়ে, এখনও সেই পবিত্রব্রতধারিণী অহল্যারাণীর কথা স্মরণ করিয়া সাধুবাদ প্রদান করিয়া থাকেন। একজন চিন্তাশীল লেখক ইঁহার কীর্ত্তিকলাপ লক্ষ্য করিয়া যে সকল সমালোচনা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, রাণী ভবানীর সম্বন্ধেও তাহার প্রত্যেক কথাই প্রযুক্ত হইতে পারে। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, "এই হিন্দুমহিলা যেরূপ চরিত্রগৌরব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পৃথিবীর সকল যুগ ও সকল দেশকেই গৌরবমণ্ডিত করিতে পারিত। সত্য বটে, সীতা সাবিত্রী অথবা কুন্তী দ্রৌপদী হিন্দুসমাজের সমাদর ও পূজা লাভ করিয়া চিরস্মরণীয়া হইয়াছেন; কিন্তু ইহাও সত্য যে, প্রতিভাশালী অমর কবিকুলতিলকদিগের বর্ণনা-লালিত্যের সহিত অবতারবাদের গুপ্ত বিশ্বাস মিলিত হইয়া, এই সকল হিন্দুরমণীর কীর্ত্তিকাহিনী আরও অমৃতময় করিয়া তুলিয়াছে। মহারাষ্ট্র-কুলমহিলা অহল্যারাণী দেবতা বা দেবাবতার ছিলেন না। তিনি মানুষ হইয়া যেরূপ ভাবে দেবহৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিয়া নীরবে ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার স্বদেশীয়গণ আজিও সেই দেবী-চরিত্রের সমুজ্জ্বল চিত্রপট লোকচক্ষুর নিকট উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য লেখনী ধারণ করেন নাই!" *

রাণী ভবানীও অনেকদিন হইল লোকচক্ষুর অন্তরাল হইয়াছেন। আমা-দিগের নিকট তাঁহার জীবন-কাহিনী ক্রমেই অলৌকিক উপন্যাসের কল্পনা-কুসুমে পরিণত হইতেছে; ইতিহাসের অভাবে অল্প দিনের মধ্যেই কত অদ্ভুত জনশ্রুতি মুখে মুখে পল্লবিত হইয়া উঠিতেছে। এইরূপে এ দেশের অনেক ঐতিহাসিক চরিত্র ধীরে ধীরে জনশ্রুতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইতেছে। এখন আমরা সে সকল ভিত্তিহীন জনশ্রুতিতে আস্থাস্থাপন করিতে সাহস না পাইয়া, ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিকেও স্বকপোল-কল্পিত উপন্যাস মনে করিয়া আশানু-রূপ সমাদর প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হইতেছি। আমাদিগের এইরূপ বিড়ম্বনা দর্শন করিয়া, একজন ইংরাজলেখক লিখিয়া গিয়াছেন, "দুঃখের কথা আর কি বলিব? ইংলণ্ডের প্রত্যেক পল্লীর ইতিহাস আছে, কিন্তু ভারতবর্ষের

* Calcutta Review.

ভাগ্যে সমগ্র ইংলণ্ড অপেক্ষা বৃহত্তর জনপদেরও কোনরূপ ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায় না!" * বাঙ্গালার ইতিহাস নাই বলিয়াই রাণী ভবানীর জীবনী নূতন করিয়া সঙ্কলন করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালীর যদি সুবদ্ধগ্রথিত স্বদেশের ইতিহাস থাকিত, তবে তাহার অর্দ্ধ শতাব্দীর অতীত কাহিনীর প্রত্যেক প্রধান ঘটনার সঙ্গে রাণী ভবানীর পুণ্য নাম জড়িত হইয়া থাকিত; তাঁহার কীর্ত্তিকাহিনী ঘোষণা করিবার জন্ত স্বতন্ত্র জীবনী সঙ্কলন করিবার আবশ্যক হইত না।

রাণী ভবানী যে যুগে জন্মগ্রহণ করেন, সে যুগ মুসলমান নবাবদিগের প্রবল প্রতাপের অলৌকিককাহিনীপরিপূর্ণ রহস্যময় তামস-যুগ বলিয়া ইংরাজের ইতিহাসে সুপরিচিত হইলেও, সেকালে এদেশের সকল স্থানেই হিন্দুজমীদার-দিগের আত্মশাসনগৌরব উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই জন্ত হিন্দু রীতি নীতি, হিন্দু আচার ব্যবহার, হিন্দু পরহিতাকাঙ্ক্ষার পবিত্র নিদর্শনগুলি কিছু-মাত্র বিলুপ্ত হয় নাই। ভবানী আত্মারাম চৌধুরীর একমাত্র স্নেহময়ী দুহিতা—আত্মারামের সৌধ-বিভূষিত সৌভাগ্যসম্পদের একমাত্র আশালতা। সুতরাং আশৈশব পরম স্নেহে লালিত পালিত হইয়া, ভবানী বাল্যজীবনেই পিতার সাধু দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে শিখিয়াছিলেন। পিতৃগৃহে যে সকল অনাহূত পথশ্রান্ত বিপন্ন পথিকগণ প্রতিদিন অকাতরে অন্নপানীয় পাইত, পিতৃগৃহের সুমার্জ্জিত দেবমন্দিরে শঙ্খঘণ্টানিনাদমুখরিত মন্ত্রোচ্চারণে যে সকল দেবদেবীর সেবাপূজা প্রতিদিন পরম সমারোহে নির্ব্বাহিত হইত, তাহা বালিকাহৃদয়ে এমন চিরস্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল যে, উত্তর কালে অতুল সম্পদের অধিকারিণী হইয়া, রাণী ভবানী পিতৃগৃহের ন্যায় সমগ্র বঙ্গভূমিকে সেই মহোৎসবের রসাস্বাদন করাইবার জন্ত দেশে দেশে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া, পূজাব্যপদেশে অকাতরে সর্ব্বজীবে অন্নদানার্থ রাজভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন!

অর্দ্ধবঙ্গাধিকারিণী দীনপালিনী রাণী ভবানী যেরূপ সগৌরবে অর্দ্ধশতাব্দী-কাল রাজ্যশাসন করিয়াছেন, পরহিতাকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া স্বদেশের কল্যাণকামনায় যে সকল সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন, স্বধর্ম্মানু-

* "Every country, almost every parish, in England, has its annals; but in India, vast provinces, greater in extent than the British Islands, have no individual history whatever !"—Sir W. W. Hunter.

রাগের বশবর্ত্তিনী হইয়া দেশে দেশে যে সকল দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, লোকহিতব্রতে অগ্রসর হইয়া মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিয়া যে সকল অক্ষয় কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ কাল সহকারে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে ; কিন্তু এখনও যাহা সংগ্রহ করা সম্ভব, তাহাও এত বহুবিস্তৃত যে, তাহাতেই একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়া যায়।

বাঙ্গালা দেশে নদনদীখালবিলের অভাব নাই। বরং বর্ষাকালের অপরিসীম জলপ্লাবনে অধিকাংশ স্থানেই লোকের বাড়ী ঘর, পথ ঘাট জলমগ্ন হইয়া যায়! কিন্তু এ দেশের এমনই অদৃষ্টবিড়ম্বনা যে, সেই সকল পল্লীতে পল্লীতে গ্রীষ্মকালের নিদারুণ জলকষ্টে পল্লীবাসিগণ হাহাকার করিতে থাকে! বাঙ্গালা দেশ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ ; বাঙ্গালীজাতি কৃষিপ্রধান জাতি ;—জল ভিন্ন বাঙ্গালীর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা যে কত দূর অসম্ভব, তাহা বাঙ্গালী ভিন্ন আর কেহ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে না। বাঙ্গালীর জলদৈন্য দূর করিবার জন্য যাঁহারা মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালীর নিকট তাঁহাদের পুণ্য নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে। রাণী ভবানীর যে সকল পুণ্যকীর্ত্তি এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই, তন্মধ্যে তাঁহার জলাশয়গুলিই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অনেক দেবমন্দিরের উচ্চ চূড়া ধূলি-বিলুণ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহার সংস্থাপিত অনেক অতিথিশালার ভিত্তিমূল পর্য্যন্তও তিরোহিত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার বহুব্যয়নির্ম্মিত অনেক রাজপথ কণ্টকবনে সমাচ্ছন্ন হওয়ায় লোকচলাচল রহিত হইয়া গিয়াছে ;—কিন্তু তিনি যে সকল দীর্ঘিকা ও সরোবর খনন করাইয়া দিয়া দরিদ্রের জলকষ্ট নিবারণ করিয়াছিলেন, তাহার স্বচ্ছ সলিলে তাঁহার পুণ্যকীর্ত্তি এখনও প্রতিবিম্বিত হইতেছে! তিনি কোথায় কত সরোবর খনন করাইয়া দিয়াছিলেন, পরোক্ষভাবে কত স্থানে জলাশয়খননের উৎসাহদান করিয়াছিলেন, এখন আর তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা সহজ নহে। একবার দুর্ভিক্ষসময়ে রাঢ়দেশের দুর্দ্দশার অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শন করিবার জন্য স্বদেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রীষ্মকালের প্রখর রৌদ্রতাপে অশ্বারোহণে দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, যেখানেই এক একটি প্রসন্নসলিলা বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা দেখিয়া জলদাতার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সেখানেই লোকে দুই হাত তুলিয়া রাণী ভবানীর নাম করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছে। কেহ যদি এখনও পুরাতন রাজসাহী-রাজ্যের সকল স্থান পরিভ্রমণ করিতে পারেন, তবে এইরূপ শত

শত জলদানব্রতের কীর্ত্তিস্তম্ভে রাণী ভবানীর সহৃদয় শাসননীতির পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন।

আজকাল এ দেশে গমনাগমনের পথ সহজ হইয়াছে। সেকালে প্রধান প্রধান স্থানে যাতায়াত করিবারও সুবিধা ছিল না। যে দুই চারিটি পথ ঘাট ছিল, তাহাতেও লোকে নিঃশঙ্কচিত্তে গমনাগমন করিতে সাহস পাইত না। দূরদেশে গমন করিতে হইলে হয় পথক্লেশে, না হয় দস্যুহস্তে, শীঘ্রই ভ্রমণকার্য্য সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিত। পথিমধ্যে পথিকদিগের বিশ্রামের জন্য কোনরূপ আশ্রয়স্থান ছিল না। ইহাতে বাণিজ্য-ব্যবসায়ের যেরূপ ক্ষতি হইত, তীর্থযাত্রীদিগকে ততোধিক বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হইত। নবাব মুরশিদকুলী খাঁ বাহাদুর রাজধানী মুরশিদাবাদ হইতে হুগলী পর্য্যন্ত রাজপথপার্শ্বে স্থানে স্থানে অনেকগুলি প্রহরিমন্দির ও পান্থশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। রাণী ভবানীও তদনুরূপ কতকগুলি রাজপথ ও পান্থশালা নির্ম্মাণ করিয়া তীর্থযাত্রী হিন্দুদিগের তীর্থক্লেশ অনেক পরিমাণে দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজসাহী-প্রদেশে রাণী ভবানীর একটি রাজপথ ও সেতু এখনও বর্ত্তমান আছে; তাহার নাম "ভবানী জাঙ্গাল"। এই পথের বিশেষত্ব এই যে, ইহার স্থানে স্থানে জলাশয় এবং জলাশয়তীরে পথিপার্শ্বে প্রস্তরনির্ম্মিত ভোজনপাত্র, পানপাত্র ও রন্ধনস্থান নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে; পথিকগণ অনায়াসে সেখানে আসিয়া স্নানাহার সম্পাদন করিতে পারিতেন। দেখিলেই মনে হয় যে, সেই পুরাতন রাজপথগাত্রে এখনও যেন করুণারূপিণী রাণী ভবানীর সরল সুন্দর সৌম্যমূর্ত্তি চিরাঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

ক্রমশঃ।

শ্রীঅক্ষয় কুমার মৈত্র।

এব্রাহাম লিঙ্কলন।

যাঁহারা ইহজীবনে ধর্ম্মানুগত অর্থকামের অনুসরণে ব্যাপৃত হইয়া উৎকৃষ্ট গুণশালী বলিয়া যশস্বী হইয়াছেন, এব্রাহাম লিঙ্কলন তন্মধ্যে এক জন। এই মহাপুরুষের জন্মে মার্কিনদেশ পবিত্র হইয়াছে। অতি দীনদুঃখীর সন্তান হইয়াও তিনি স্বদেশে সর্ব্বোচ্চ রাজসম্মান পাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি রাজপদ পাইয়াছিলেন বলিয়াই যে আমাদের প্রশংসার পাত্র বা অনুকরণের যোগ্য, তাহা নহে। ধর্ম্মাবিরুদ্ধ অর্থকামের অনুসরণে তিনি যে উৎকৃষ্ট গুণরাশির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি আমাদের একজন শ্রেষ্ঠ আদর্শস্থল বলিয়া চিরস্মরণীয়। তাঁহার দেহে অসুরের বল ও মনোমধ্যে দেবতার শক্তি নিহিত ছিল। সুস্থ দেহে সুস্থ মনের আদর্শ এখন অতি বিরল। তাঁহার পিতা একজন সামান্য সূত্রধর ছিলেন, সুতরাং লিঙ্কলন অতি কষ্টের মধ্যেই লালিত হইয়াছিলেন। শ্রমজীবী লোকের ঘরে জন্মিয়া ও নিজেও বাল্য হইতে শ্রমসহিষ্ণু হইয়া, তিনি অতিশয় দৃঢ় ও বলিষ্ঠকায় পুরুষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। দুই জনের বোঝা একাকী বহন করিতে পারিতেন, কাষ্ঠমধ্যে কেহই তাঁহার ন্যায় গভীর কুঠার বসাইতে পারিত না। জ্ঞানপিপাসা এত অধিক ছিল যে, একটি সামান্য গ্রাম্য পাঠশালায় এক জন সামান্য জ্ঞানবান শিক্ষকের নিকট পাঠ জানিতে তিনি নিত্য সাড়ে বার ক্রোশ পথ পদব্রজে যাতায়াত করিতেন। গৃহে কাগজ কলম নাই, তথাচ কাষ্ঠনির্ম্মিত টুলের উপরিভাগে তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্র দ্বারা অঙ্ক কশিতেন ও প্রবন্ধরচনা করিতেন—কাষ্ঠতল ভরিয়া গেলে আবার তাহা চাঁচিয়া ফেলিতেন। দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার তাঁহার অসহ্য ছিল, কেহ তদ্রূপ আচরণ করিলে তাহাকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করিয়া শাস্তি দিতেন। লোভ কি, তাহা তিনি জানিতেন না। উত্তরকালে এক সময়ে তিনি একটি সামান্য ডাকঘরে ডাকমুন্সীর কার্য্য করিতেন; ঐ পদ পরিত্যাগ করিয়া ওকালতিতে প্রবৃত্ত হইলে, কিয়ৎকাল পরে পোষ্টআফিস বিভাগের একজন কর্ম্মচারী, একদিন তাঁহার নিকটে আসিয়া প্রকাশ করেন যে, তাঁহার নিকট নাদাবি ন্যূনাধিক সপ্তদশ মুদ্রা পোষ্টআফিসের প্রাপ্য আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ একটি পেটিকা উদ্‌ঘাটন করিয়া একখানি নেকড়ায় বাঁধা আনা-পাই-গণ্ডাসমেত ঠিক দাবিকৃত টাকার একটি পোঁটলা বাহির করিয়া বলিলেন, "এই লউন, পরের

টাকা নিজের কার্য্যে ব্যবহার করা আমার স্বভাব নহে।" অর্থোপার্জ্জনের জন্য তিনি নানা কার্যে ব্যাপৃত হয়েন। পৈতৃক ব্যবসায়ে অর্থাগমের সুবিধা না দেখিয়া দিনকতক জরিপ-আমীনের কার্য্য করেন, পরে দিনকতক ডাকঘরের কার্য্য করেন; অবশেষে ওকালতিতে প্রবৃত্ত হয়েন। তাঁহার বক্তৃতাশক্তি ক্রমে সাতিশয় স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। সরল ভাষায় মধুর ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় তিনি শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিতে পারিতেন। ওকালতি-ব্যবসায়ে ক্রমে তিনি সাতিশয় যশস্বী ও অর্থশালী হইয়া উঠিলেন, এবং এইরূপে কৃতী হইয়া বত্রিশ বৎসর বয়সে দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট ভাগ গৃহস্থাশ্রমেই দাম্পত্য প্রেমের বিমল চন্দ্রিকায় অতিবাহিত হইয়াছিল।

ওকালতিতে নিযুক্ত হইয়া তিনি রাজনৈতিক প্রসঙ্গে সমধিক ব্যাপৃত হয়েন। সকল দেশে সকল সমাজেই এক এক সময়ে এক একটি রাজনৈতিক সমস্যা সর্ব্বগ্রাসী প্রাধান্য লাভ করে। লিঙ্কলনের জীবদ্দশায় দাস-সমস্যাই মার্কিন দেশে তাদৃশ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। ইয়ুরোপীয় উপনিবেশিকেরা নিগ্রো দাসগণ দ্বারা শ্রমসাধ্য সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহিত করিতেন, দাসেরা প্রভুর সম্পত্তির মধ্যে গণ্য ছিল, এবং হাটে ক্রীত বিক্রীত হইত। দাসদাসীর সন্তানেরা গর্ভদাস হইত। তাহাদের কোনও প্রকার স্বাধীনতা ছিল না, প্রভুর আদেশে তাহারা কশাঘাত ও বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইত, এবং অশেষ নিগ্রহ, অপমান, এমন কি, প্রাণনাশ পর্য্যন্ত সহ্য করিত। তাহাদের দুর্দ্দশাদর্শনে অনেকের হৃদয় বিদীর্ণ হইত। ক্রমে অনেক ন্যায়পরায়ণ, ধার্ম্মিক ও পরদুঃখকাতর ব্যক্তি এই জঘন্য দাসত্বপ্রথা দেশ হইতে উঠাইয়া দিতে বদ্ধপরিকর হয়েন। লিঙ্কলন তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান, এবং অবশেষে তিনি এই পক্ষের অগ্রণী বলিয়া পরিগণিত হয়েন। তাঁহার কোমল হৃদয়ে যেমন প্রভূত করুণার সঞ্চার হইয়াছিল, তাঁহার বীর হৃদয়ে তেমনই অসীম উৎসাহও স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। পক্ষান্তরে, দাসেরা সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত থাকায়, অনেকেই সম্পত্তিহানি হইবে বলিয়া, সেই দূষণীয় আচারের রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। দাসবন্ধুগণের সংখ্যা মার্কিনদেশের উত্তরাঞ্চলে অধিক ও দক্ষিণাঞ্চলে অল্প ছিল। দেশটি প্রথম কতকগুলি প্রজাতন্ত্র খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত এবং খণ্ডরাজ্যগুলি আবার একটি প্রজাতন্ত্র সাধারণ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সাধারণ সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভার নাম কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের প্রজানির্ব্বাচিত সভাপতি নিয়মিত

সময়ের জন্য সাম্রাজ্যের রাজদণ্ড ধারণ করিতেন। মার্কিনদেশে চিরাগত দাসত্বপ্রথা অক্ষুণ্ণ থাকিবে, কি তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইবে, এই কথা লইয়া তৎকালে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছিল। লিঙ্কলনের বক্তৃতায় লক্ষ লক্ষ লোক উত্তেজিত হইয়া উহা উঠাইয়া দিতেই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে সভাপতি-নির্ব্বাচনের সময় আসিয়া উপস্থিত হইলে, আন্দোলনের একটা না একটা মীমাংসা হইবে, ইহা সকলেই অনুভব করিল। আন্দোলন আরও তুমুল হইয়া উঠিল। একদিকে দাসত্বের স্বপক্ষে, আর একদিকে দাসত্বের বিপক্ষে, বক্তৃতার স্রোতে দেশ প্লাবিত হইতে লাগিল। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ২৭এ ফেব্রুয়ারি তারিখে, নবইয়র্ক নগরে লিঙ্কলন যে এক প্রসিদ্ধ বক্তৃতা করেন, তাহাতে দেশের লোক মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তড়িৎ-প্রবাহের ন্যায় উহা রাষ্ট্রবাসিগণের হৃদয় আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। দাসবন্ধুগণ তাঁহাকেই আপনাদের বিহিত নায়ক বলিয়া বুঝিতে পারিল। কংগ্রেসের সভাপতি-নির্ব্বাচনের সময় আসিয়া উপস্থিত হইলে, এক পক্ষ তাঁহাকেই মনোনীত করিল। প্রচলিত নিয়মানুসারে মনোনীত ব্যক্তি-গণের মধ্য হইতে নির্ব্বাচক-সভা নামক এক সভাতে অধিকাংশের সম্মতি-ক্রমে একজন সভাপতিত্ব নির্ব্বাচিত হয়েন। ঐ সভায়, মনোনীত ব্যক্তিগণের মধ্যে একা লিঙ্কলন ১৩০ জনের সম্মতি এবং অপর সকলে মিলিয়া কেবল ১২৩ জনের সম্মতি পাইলেন। তদনুসারে তিনিই বিশাল এবং পরাক্রান্ত মার্কিন-সাম্রাজ্যের সভাপতিত্ব ও সম্রাটের আসন প্রাপ্ত হইলেন।

যে দেশ এইরূপ সদ্‌গুণের পূজা করিতে জানে, সেই দেশেই মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়া থাকে। যখন দুর্য্যোধনের সেনাপতি হইব বলিয়া কর্ণ ও অশ্বত্থামার মধ্যে বিবাদ হয়, তখন অশ্বত্থামা কর্ণকে সূতপুত্র বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। কিন্তু মার্কিনদেশে সূতপুত্র বলিয়া লিঙ্কলনকে অবজ্ঞা করে নাই—করিলেও তিনি মহাকবি ভট্টনারায়ণের ভাষায় বলিতে পারিতেন,

> সূতো বা সূতপুত্রো বা যো বা সো বা ভবাম্যহম্।
> দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মমায়ত্তং তু পৌরুষম্॥

সূতপুত্র লিঙ্কলন কিরূপে পৌরুষ আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহার কাহিনী অতীব বিচিত্র। তাহা লইয়া মহাভারতের ন্যায় বিস্তীর্ণ এবং মহাভারত অপেক্ষাও হৃদয়গ্রাহী ইতিহাস রচিত হইয়াছে। এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা আমূল বর্ণনা করা যায় না।

বিপদি ধৈর্য্যম্ অথাভ্যুদয়ে ক্ষমা
সদসি বাক্‌পটুতা যুধি বিক্রমঃ।

এই সকল প্রসিদ্ধ সদ্‌গুণ একাধারে দেখাইবার জন্যই বিধাতা এব্রাহাম লিঙ্কলনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ২৩ বৎসর বয়সে যখন লিঙ্কলন পৈতৃক বাসস্থানে দরিদ্র ও হীন অবস্থায় বাস করিতেছিলেন, তখন কৃষ্ণশ্যেন নামক একজন তাম্রত্বক্ ভূমিজ অধিপতির সহিত তত্রত্য সীমান্তবাসীদের যুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধে লিঙ্কলন একজন উপযাচক সৈনিক হইয়া যোগদান করেন। ইহারই মধ্যে স্থানীয় লোক তাঁহাকে একজন উপযুক্ত নায়ক বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল, এবং তদনুসারে তাঁহাকেই তদীয় বিভাগের সেনাপতির পদে নির্ব্বাচিত করিয়াছিল। এই যুদ্ধে লিঙ্কলন যথেষ্ট বিক্রম প্রদর্শন করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পর যদিও তিনি আর সশরীরে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়েন নাই, কিন্তু তিনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেই মার্কিনদেশে ঘোর ভীষণ সংগ্রাম বাধিয়া উঠে। এই সময়ে কুরুপাণ্ডবের অক্ষৌহিণীর ন্যায় লক্ষ লক্ষ সেনা এবং ভীষ্মার্জ্জুনের ন্যায় বীরগণ পঞ্চবর্ষব্যাপী মহাহবে ব্যাপৃত হইয়াছিল; এবং স্বয়ং অস্ত্র ধারণ না করিয়াও এব্রাহাম লিঙ্কলন বাসুদেবের ন্যায় এই যুদ্ধের প্রধান নায়ক ছিলেন। বিপক্ষপক্ষের সেনানী জেনারেল রবার্ট লী বাস্তবিকই এ যুগের ভীষ্ম। তাঁহার সম্মুখে লিঙ্কলনের সেনাপতিগণ সকলেই উত্তরোত্তর পরাভূত হইয়াছিলেন। ম্যাক্‌ক্লীনাম, বরণসাইড, হুকার, রোজক্রান্স, মীড প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ মহারথিগণ লক্ষ লক্ষ সেনা সহ যখন একে একে লীর সম্মুখে পরাভূত হইতে লাগিলেন, তখন দাসবন্ধুগণ একবারে হতাশার সমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন। কিন্তু এক এব্রাহাম লিঙ্কলন অচল ও অটল থাকিলেন। উপর্য্যুপরি পরাভব-সঙ্কটে এইরূপ অমানুষ ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও উদ্যমের পরিচয় ইতিহাসে বড়ই বিরল। উত্তালতরঙ্গময় বিপদ্-সমুদ্রে তিনি শৈলশিখরের ন্যায় গ্রীবা উত্তোলন করিয়া থাকিতেন। বিপদে কেবল তাঁহাকে অধিক পরিমাণে নির্ভীক ও অসঙ্কোচ করিয়া তুলিল। যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই, তখন শোণিতপাতনিবারণাকাঙ্ক্ষায় তিনি দাসাধিকারিগণকে ক্ষতিপূরণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন—যদি তাহাতেও তাহারা নিরস্ত হইয়া যুদ্ধ না করে। কিন্তু যখন তিনি পরাজিত হইতে লাগিলেন, তখন মন্ত্রিগণের সহিত বিনা পরামর্শে নিজের মনে তিনি এক কঠিন সঙ্কল্প করিলেন। তদনুসারে এই ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল যে, ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারি

ও সমুদয় বিদ্রোহী খণ্ডরাজ্যে দাসগণ মুক্তিলাভ
। জগতের লোক তাঁহার সাহসদর্শনে অবাক্
ত্র নিগ্রোদাসকে সৈনিকশ্রেণীতে গ্রহণ করিলেন,
...ন্তের জন্য অকাতরে জীবন উৎসর্গ করিতে ত্রুটি
। অবশেষে জেনারেল ইউলিসিস গ্রান্ট লিঙ্কলনের সেনাপতি হইয়া
...নের ন্যায় সমরে অগ্রসর ... ঘোরতর সংগ্রামের পর লী পরাভূত
হইলেন। শত্রুপক্ষের রিচ্‌মণ্ড ... নের হস্তগত হইল। বিদ্রোহবহ্নি
ধূমায়মান হইতে হইতে ক্রমে ... । "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ"—এই
কুরুক্ষেত্রেও উক্ত মহাবাক্য ... প্রমাণিত হইল। ফলতঃ, ব্যাসের
কুরুক্ষেত্রও যেমন জাতিকল... ফল, মার্কিনদের কুরুক্ষেত্রও তাদৃশ
জাতি-কলহেরই ফল; কিন্তু ব্যাসের কুরুক্ষেত্র এক সামান্য হস্তিনার
রাজসিংহাসন লইয়া, এ কুরুক্ষেত্র একটি অক্ষয় নীতিতত্ত্ব লইয়া।

এব্রাহাম লিঙ্কলনের ক্ষমা...গুণের কথা শুনিবে? যাহাদের অন্যায় নৃশংসতা, অর্থগৃধ্নুতা এবং নীচ প্রবৃত্তিতে মার্কিন-সাম্রাজ্য ছারখার করিতে বসিয়াছিল, যাহারা অর্থের লোভে দয়ামায়াতে জলাঞ্জলি দিয়া এবং শোণিতসম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া, জাতিবধরূপ মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছিল, যুদ্ধে পরাভূত হইলে লিঙ্কলন তাহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে আদেশ দেন?—তখন তাঁহার মূর্ত্তি বড়ই রহস্যকর হইয়াছিল। হৃদয়ে অগাধ ক্ষমা ও করুণা, কিন্তু মুখে দারুণ ভ্রূকুটী। শত্রুপক্ষীয় নরাধমগণ তাঁহাকে কালান্তক যমের ন্যায় দেখিল, কিন্তু যাঁহারা ভিতরের সংবাদ পাইবার অধিকারী, তাঁহারা এক অদ্ভুত সন্দেশ প্রাপ্ত হইলেন। তাহা লিঙ্কলনের নিজ ভাষাতেই চিরদিন লিখিত হওয়া উচিত। তিনি বলিয়া বসিলেন, 'No one need expect he would take any part in hanging or killing these men, even the worst of them. Frighten them out of the country, open the gate, let down the bars, scare them off. Enough lives have been sacrificed. We must extinguish our resentment, if we expect harmony and union.

লিঙ্কলন জয়ী হইলেন। জয়লাভ হেতু মহোৎসবের দিন নির্দ্ধারিত হইল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ১৪ই এপ্রেল গুডফ্রাইডের পর্ব্বাহে, অনাথবন্ধু ঈশ্বরকে দাসগণের শৃঙ্খলমোচনের জন্য ধন্যবাদ দিয়া ফোর্ডের নাট্যশালা নামক নাট্য-

মন্দিরে লিঙ্কন নাট্যাভিনয় সন্দর্শনার্থ গমন ক
দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে নরাধম বুথ রা
অলক্ষিতভাবে গুলি করিয়া তাঁহার প্রাণসংহা
তখন হাহাকার করিতে লাগিল। বাস্তবিক সে
কারময় পৃথিবী হইতে এক অপূর্ব্ব স্বর্গের ত নিবিয়া গেল।

ঈদৃশ জীবনের ঈদৃশ পরিমাণ র বিষয়! কিন্তু মহাপুরু
জীবনেও যেমন উপকার হয়, নি উপকার হইয়া থাকে।
নৃশংস ঘাতকের হস্তে যখন এব্রা শোণিত নির্গত হইল, তখন
যে সকল বীরপুরুষেরা চিরন্তন প্র তাঁহার বিপক্ষে অস্ত্রধারণ
করিয়া সম্মুখ সমরে অগ্রসর হইয়াছিল, পরাভূত হইয়াও যাহাদের
হৃদয়ে বিদ্বেষ-বহ্নি প্রধূমিত হইতেছিল, তাঁহারাও শোকে গলিয়া গেল।
তিনি ঘাতকের হস্তে প্রাণসমর্পণ করিয়া শত্রুরও হৃদয় অধিকার করিয়া
বসিলেন। যে জন্য পৃথিবীতে তাঁহার আগমন তাহাও সুসিদ্ধ হইল, তিনিও
সংসারের মলসম্পর্ক ছাড়িয়া অন্তর্ধান করিলেন। ব্যাসের কুরুক্ষেত্রে ভারতবর্ষ
চিরকালের জন্য উপক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু এই কুরুক্ষেত্রে মার্কিন-
সাম্রাজ্য নবীকৃত হইয়া একতামূলক স্বাধীন পরাক্রমে পৃথিবীতে অদ্বিতীয়
হইয়া উঠিয়াছে। এব্রাহাম লিঙ্কলন মার্কিনদেশে উন্নতিমূলক নূতন সাম্রাজ্য
স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

গঙ্গোত্রীর পথে।

আমার শেষ প্রবন্ধে * বলিয়াছি, বেলা এগারটার সময়ে এক ছায়াযুক্ত শিলা-
শয্যায় স্বামীজির নিদ্রাভঙ্গ হইল;—আমি তাঁহার নিদ্রাভঙ্গের অপেক্ষায়
একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষের ছায়ায় উপবিষ্ট ছিলাম। দুই জনে কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে
'ধারাসু' নামক স্থানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। 'ধারাসু' সে
স্থান হইতে প্রায় ৪ মাইল। একে প্রখর রৌদ্রের উত্তাপ, তাহার পর স্বামীজির
কঠোর উপদেশরাশি আমাকে একেবারে মরার দাখিল করিয়া ফেলিল!
সূর্য্যের উত্তাপ অনেক সহ্য করা গিয়াছে, তাহাতে কষ্ট হইলেও সে কষ্ট
সহ্য করিবার মত শরীরের অবস্থা ছিল; কিন্তু স্বামীজির সন্ন্যাসধর্ম্মসম্বন্ধে

মায়ামমতাপরিশূন্য উপদেশ আমাকে বড়ই কাতর করিয়া ফেলিল। আমি কেন তাঁহার জন্য বসিয়াছিলাম, আমি কেন চলিয়া গেলাম না, এই তাঁহার অভিযোগ। সে সময়ে সামান্য দুই একটা জবাব করিয়াছিলাম, কিন্তু আজ যদি সেই গৈরিকবাস প্রকাণ্ডউষ্ণীষধারী দীর্ঘশ্মশ্রু স্বামীজিকে সম্মুখে পাইতাম, তাহা হইলে তাঁহার চরণপ্রান্তে বসিয়া বলিতাম, "সন্ন্যাসী, আপনাকে আমি ফেলিয়া যাইতে পারি না; এই প্রকৃতি মাতা সে শিক্ষা কাহাকেও ত দেন না—দিতে পারেন না; সর্ব্বনিয়ন্তা সে বিধান করেন নাই; এমন উদ্দাম বিধানে জগৎ থাকিত না; কেহ কাহাকেও যাইতে দিতে চায় না—কেহ কাহারও নিকট হইতে দূরে যাইতে চাহি না। যে দিন কেহ কাহারও মুখ না চাহিয়া যে দিকে সে দিকে চলিয়া যাইতে চাহিবে, সে দিন মনুষ্যনাম উড়িয়া যাইবে, সে দিন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া কোথায় কিসে পরিণত হইবে। চাহি না আপনার প্রেমহীন সন্ন্যাস; প্রেমময় পরমদেবতাকে লাভ করিতে হইলে কি এমনই করিয়া কাহারও দিকে না চাহিয়া সুধু আপনাকে লইয়াই অগ্রসর হইতে হইবে? আমি ত তাহা বুঝি না, প্রেমের রাজ্য দিয়াই প্রেমময়ে পঁহুছিতে হইবে। অসীম ধরিত্রী, নিশিদিন এই জগৎ-ময় কত প্রেম, কত স্নেহ, কত সুধা ঢালিতেছেন;—তাই চাঁদের আলো এত মিষ্ট, এত মধুর; তাই বৃক্ষে পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, ফল ধরে; তাই নদী বহিয়া যায়; পাখীতে গান গায়। সন্ন্যাসীর নির্ম্মম উপদেশে চলিলে এ সব যে কোথায় বিলীন হইয়া যাইত! আমি এমন সন্ন্যাস চাহি না।" সে দিন সে সময়ে এত কথা বলিতে পারি নাই—বলিবার অবস্থাও ছিল না; কিন্তু তিনি আমাকে যাহা করিতে বলেন, তাহা আমি কি করিয়া করি? তাঁহার মত আমি কোন দিনই গ্রহণ করি নাই, তাঁহার উপদেশ আমার নিকট সর্ব্বদাই বৃদ্ধ সংসার-ত্যাগী সাধুর অতিসাবধানতা বলিয়া বোধ হইত। আর সে কথাও বলিয়া রাখি, স্বামীজির কথায় কাজে মিল হইত না। তিনি বলিতেন এক, করিতেন আর; অনেক স্থলে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছি। এ দিকে আমাকে বলেন, "কেন তুমি আপন মনে চলিয়া গেলে না?" অথচ কোন দিন যদি কোন কারণে আমি পথের মধ্যে পশ্চাতে পড়িয়াছি, তাহা হইলে তিনি আমার অপেক্ষায় পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন। এ সব ব্যাপার উল্লেখ করিয়া কিছু বলিলে, তাঁহার সেই একই কথা,—"তাঁহার কথা স্বতন্ত্র।" তিনি আমাকে কি বুঝাইতে চান, তাহা তিনি নিজেই বুঝেন না।

এই ভাবে বেলা প্রায় একটার সময়ে আমরা 'ধারাসু'তে উপস্থিত হইলাম। এখানে আর আমাদের দরিদ্রের কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় নাই। ধারাসুতে তিহরির রাজার Forest Bunglow আছে। এত বড় একটা মহাকায় হিমালয় অগণিত তরুগুল্মলতা বক্ষে ধারণ করিয়া এতকাল নিরাপদে বাস করিতেছিলেন, তাহার সে সব গগনস্পর্শী বৃক্ষমূলে কখনও যে কুঠারের আঘাতে পড়িবে, তাহা কখনও চিন্তার বিষয় হয় নাই। পর্ব্বত বা জঙ্গল প্রদেশ যে সমস্ত রাজগণের রাজ্যভুক্ত ছিল, তাঁহারা উহা হইতে কোন প্রকার আয় করিবার ইচ্ছা কখনও করেন নাই; যাহার দরকার হইত, সেই পাহাড় হইতে কাঠ কাটিয়া আনিত—কেহ নিষেধ করিত না। তিহরীর রাজার রাজস্বই জঙ্গলের উপর; গড়োয়াল রাজ্যের মধ্যে মনুষ্য অধিবাসী অপেক্ষা বৃক্ষ-বনস্পতি অধিবাসীই অধিক। ইংরেজের দেখাদেখি এখন তিহরি-রাজ যথারীতি জঙ্গলবিভাগ স্থাপন করিয়াছেন; অভিজ্ঞ Conservator, Ranger, forestor নিযুক্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বে এ সমস্ত সুবন্দোবস্ত ছিল না, এমন একটা বহুদূরবিস্তৃত ভূভাগ হইতে কোন প্রকারই আয়ই হইত না। এখন একজন কৃতকর্ম্মা বঙ্গদেশবাসীর সুবন্দোবস্ত ও শাসনের গুণে তিহরী রাজ্যের যথেষ্ট আয় হইয়াছে। এই বঙ্গদেশবাসী আমাদের পরম-শ্রদ্ধাস্পদ দেশবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য। কোথায় সুদূর বঙ্গদেশের একটি গ্রাম হইতে চাকুরীর উদ্দেশে একজন বাঙ্গালী পশ্চিমে গিয়াছিলেন, আজ তিনি স্বীয় বুদ্ধি ও কর্ম্মকুশলতায় একটি পার্ব্বত্য রাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছেন। জঙ্গলবিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী রাজমাতুল মিঞা হরি সিংও একজন দক্ষ ব্যক্তি। তাঁহারই চেষ্টায় আমরা তিহরীরাজ্যের মধ্যে কোথাও কোনও অসুবিধা ভোগ করি নাই।

তিহরী রাজ্যের মধ্যে স্থানে স্থানে অতি সুন্দর বাঙ্গলা সকল নির্ম্মিত হইয়াছে। কতকগুলি বাঙ্গলায় যথারীতি আফিস আছে এবং কতকগুলি পরিদর্শক কর্ম্মচারিগণের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহারই একটি বাঙ্গলায় আমরা অতিথি হইলাম। বাঙ্গলাটি একটি সুন্দর টিলার উপরে নির্ম্মিত; রাস্তা হইতে অনেকখানি চড়াই ভাঙ্গিয়া তবে বাঙ্গলায় যাইতে হয়। অতি সুন্দর অনতিদীর্ঘ দ্বিতল অট্টালিকায় আমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আমাদের সঙ্গী পেয়াদা মহাশয় বহুপূর্ব্বে আসিয়া সমস্ত আয়োজন করিয়া

রাখিয়াছিলেন। শুধু আয়োজন নহে, আমাদের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া সে তাহার বিবেচনামত আমাদের জন্য খাদ্যাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল; আমাদের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিলে সেদিন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে আর আমাদের আহার হইত না।

এই অট্টালিকার পার্শ্বেই গৃহরক্ষকের বাড়ী। সে এ স্থানের অধিবাসী নহে; তাহার বাড়ী পূর্ব্বে তিহরীতে ছিল, রাজার এই বাঙ্গলায় প্রহরীর কাজ পাইয়া সে সপরিবারে এখানে উঠিয়া আসিয়াছে। রাজসরকার হইতে তাহার বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, বেতনস্বরূপ কিছু জমি দেওয়া হইয়াছে; তিনটি পুত্র ও একটি কন্যা লইয়া সে সেই নিভৃত স্থানে পরম সুখে দিনপাত করিতেছে। পাহাড়ের গায়ে দুই তিন খানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে; অপরাহ্নে সেই সমস্ত গ্রাম হইতে লোকেরা আসিয়া এই বাঙ্গলায় আড্ডা দেয়, এবং তাহাদের সেই ক্ষুদ্র পৃথিবীর সুখদুঃখের আশা আকাঙ্ক্ষার কথায় অনেক সময় কাটাইয়া যায়।

আমাদের সহযাত্রী পেয়াদা বলিলেন, আজ আর আমাদের রসদের জন্য গ্রামের লোকের বাড়ীতে যাইতে হয় নাই। বাঙ্গলাতে সর্ব্বদাই সমস্ত দ্রব্য মজুদ থাকে এবং যাহা অকুলান হয়, অথবা দীর্ঘকাল থাকিয়া নষ্ট হইয়া যায়, গৃহরক্ষক মধ্যে মধ্যে তাহা ক্রয় করিয়া সঞ্চিত রাখে; এ প্রকার না করিলে সেই নির্জ্জন স্থানে কর্ম্মচারিগণ হঠাৎ আসিলে নানা প্রকার অসুবিধা হইতে পারে। বিশেষতঃ আমরা আজ যে বাঙ্গলায় অতিথি, তিহরী-রাজ্যের ফরেষ্ট-বাঙ্গলার মধ্যে এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম স্থানে নির্ম্মিত; এই জন্য প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ প্রায়ই এখানে আসিয়া পাঁচ সাত দিন বাস করিয়া যান।

রাজ-অট্টালিকায় রাজভোগে আমরা পরিতৃপ্ত হইলাম। স্বামীজি গৃহরক্ষকের পুত্রকন্যাগণের সহিত বিস্তৃত বারান্দায় বসিয়া গল্প জুড়িয়া দিলেন। আমি আজ পথশ্রমে বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাই ঘরের মধ্যে এক পার্শ্বে আমার কম্বল পাতিয়া একটু শয়নের ব্যবস্থা করিলাম। পর্ব্বত-প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া আর কিছু না হউক, নিদ্রাদেবীর সঙ্গে বিশেষ সম্প্রীতি হইয়াছিল; কোন প্রকারে একবার শয়ন করিতে পারিলেই হয়, অমনি নিদ্রাদেবী শিয়রে উপস্থিত। আমার এই পর্ব্বতভ্রমণে দুই এক দিন বিশেষ অসুখের সময় ব্যতীত কখনও নিদ্রার আরাধনা করিতে হয় নাই; বিছানা নাই, উপাধান

নাই, কঠিন পাষাণ-কঙ্কর-শয্যায় কোন দিক্ দিয়া রাত্রি চলিয়া গিয়াছে, তাহা কখনও বুঝিতে পারি নাই।

স্বামীজি মনে করিয়াছিলেন, আমি হয় ত পাশে পাশে ঘুরিতে গিয়াছি; আমি এ দিকে ঘরের এক কোণে পরম সুখে নাসিকাগর্জ্জন সহকারে নিদ্রা দিতেছি। কতক্ষণ পরে ঠিক বলিতে পারি না, আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল; উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দেখি, স্বামীজি বারান্দায় নাই। এ দিক ও দিক দেখিতে দেখিতে তাঁহার সন্ধান পাইলাম, তিনি গৃহরক্ষকের কুটীর-সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া হাত-মুখ নাড়িয়া কি বক্তৃতা করিতেছেন, এবং কতকগুলি লোক হাঁ করিয়া তাঁহার কথা শুনিতেছে, কেহ কেহ বা মাথা নাড়িয়া তাঁহার কথায় সায় দিতেছে। স্বামীজি যখনই কোথাও এই প্রকার মণ্ডলী করিয়াছেন, তখনই বুঝিয়াছি, সে দিন আর সে স্থান হইতে একপদ অগ্রসর হইবার তাঁহার ইচ্ছা নাই। সেদিনে বিপদ আমারই অধিক; তাঁহার সেই সুমধুর উপদেশ, তাঁহার সেই তুলসীদাস, কবীরের শ্লোক শুনিয়া আমাদের মত পাষণ্ডের হৃদয়ই ক্ষণ-কালের জন্য কোমল হইত, আর এ সব ত ধর্ম্মপ্রাণ সরলহৃদয় পবিত্রচেতা পর্ব্বতবাসী। অনেক দিন দেখিয়াছি, স্বামীজির উপদেশ শুনিতে শুনিতে কত-জন অশ্রুবর্ষণ করিয়াছে। স্বামীজি এ ব্যবসায়ে নূতন ব্রতী নহেন; তাঁহার বাক্‌পটুতা অসাধারণ—বাল্যকাল্ হইতে আমি তাঁহার বাক্যে মুগ্ধ। সম্প্রদায়-বিশেষের ধর্ম্মোপদেষ্টা হইয়া যখন তিনি বাঙ্গালা দেশের গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেন, তখন তাঁহার বক্তৃতা, তাঁহার প্রাণস্পর্শী উপদেশ শুনিবার জন্য আমরা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছুটিয়া যাইতাম; তিনি তখন গ্রাম্য বালক রেজিমেণ্টের কম্যান্‌ডার-ইন্‌-চিফ রূপে বেড়াইতেন। আমাম কুলীর অত্যাচার-কাহিনী যখন তিনি বলিতেন—তখন আমরা সভয়ে সেই সব কথা শুনিতাম, প্রতিমুহূর্ত্তে নয়ন-সমক্ষে অসহায়া সতী রমণীর জীবনান্ত দৃশ্য দেখিতাম। বৃদ্ধ স্বামীজি এখনও সে তেজ ভুলিয়া যান নাই, এখনও কথা কহিতে কহিতে এক এক সময়ে বিশেষ উত্তেজিত হইতেন; কিন্তু হায়, বৃদ্ধ স্বামীজি এখন লোকালয় ছাড়িয়া এই বনভূমি আশ্রয় করিয়াছেন; তাঁহার ন্যায় একজন স্বদেশপ্রেমিক দেশহিতব্রত সন্তানকে বনে বিসর্জ্জন দিয়া আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। এখন ইচ্ছা করে, তিনি আবার তেমনি করিয়া বাঙ্গলা দেশের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া, তেমনি করিয়া আমাদের দুর্নীতি, ভগবানে অবিশ্বাস দূর করিবার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি আজ জীবিত

বাঙ্গালীর তালিকা হইতে নিজের নাম খারিজ করিয়া লইয়াছেন ; তিনি বাঁচিয়া থাকিলেও আমাদের নিকট মৃত।

পর্ব্বতপ্রদেশে স্বামীজি যখন মণ্ডলীমধ্যে বসিয়া উপদেশ দিতেন, আমি তখন সে দিকে বড় ঘেঁসিতাম না ; কারণ সে সময়ে আমার মনের যে প্রকার অবস্থা, তাহাতে নীরব উপদেশই আমার কাছে ভাল লাগিত ; স্বামীজি তাহা জানিতেন, সেই জন্যই এতদিন তাঁহার সঙ্গে ছিলাম, কোন দিন বিশ্রাম-সময়ে আমাকে তিনি কোন উপদেশ দেন নাই। যদি কখনও কোন কথা হইয়াছে, তাহা তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রতের কথা—সেই আসামের কুলী-কাহিনী।

স্বামীজির নিকটে যাইয়া গমন প্রস্তাব করা আমার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। এতগুলি লোক একাগ্র মনে তাঁহার উপদেশ শুনিতেছে, এ সুখের ব্যাঘাত করা সঙ্গত মনে করিলাম না ; অথচ আজ রাত্রিটা এখানে বাস করিতেও তেমন মন যাইতেছিল না। আমি অনন্যোপায় হইয়া সেই দীর্ঘ বারান্দার পাদচারণা করিতে লাগিলাম। বোধ হয়, স্বামীজি আমার চলিবার ভঙ্গীতেই আমার অধীরতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন ; তাই তিনি সে স্থান ত্যাগ করিয়া দ্বিতলে উঠিয়া আসিলেন, এবং তখনই বাহির হইবার প্রস্তাব করিলেন। বেলা তখন প্রায় ছয়টা, কিন্তু গ্রীষ্মকালের বেলা, তখনও দুই ঘণ্টা দিন থাকিবে। আমরা ধারাসু ত্যাগ করিয়া পথে নামিলাম। অপরাহ্ণ দেখিয়া সঙ্গী পেয়াদা আমাদিগকে ছাড়িয়া অগ্রসর হইতে অস্বীকার করিল ; কারণ অপরিচিত পথ, কি জানি আমরা যদি পথ হারাইয়া যাই, তাহা হইলে এই অন্ধকার রাত্রিতে জঙ্গলে বিশেষ কষ্ট পাইব, প্রাণও যাইতে পারে। সে অঞ্চলের পথ ঘাট তাহার বিশেষ পরিচিত, সে গভীর রজনীতে সে পথে অনায়াসে চলিতে পারে।

ধারাসু হইতে একটু অগ্রসর হইয়াই মসূরী যাইবার একটা রাস্তা দেখিলাম ; এ পথে পর্ব্বতবাসী পথিক ব্যতীত অন্য কেহ যাইতে সাহস করে না, কারণ পথ অতি দুর্গম ; যে সমস্ত ইংরেজ গঙ্গোত্রী-দর্শনে আসিয়া থাকেন, তাঁহারা কেহই এ পথে কখনও যান নাই ; তবে পাহাড়ী লোক সর্ব্বদাই এই পথে মসূরী যায়, রাস্তাও কম। এখান হইতে দুই দিনে মসূরী যাওয়া যায়, আর রাজপথ ধরিয়া তিহরী হইয়া গেলে, পাঁচ দিনের কমে আর কিছুতেই যাওয়া যায় না। মনে মনে স্থির করিলাম, যদি এ পথে

ফিরিয়া আসি, তাহা হইলে এই সোজা রাস্তায় যাইতে হইবে। এই ফিরিবার চিন্তাই আমার কাল হইয়াছিল। গঙ্গোত্রীর পথে যে আমি বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারি নাই, গঙ্গোত্রীতে যে আমি পঁহুছিতে পারি নাই, এই ফিরিবার চিন্তাই তাহার কারণ। কোন বন্ধন ছিল না, কোন টান ছিল না, তবুও এই পথে চলিবার সময়ে এক একদিন ফিরিবার বাসনা মনে প্রবল হইত। কোথায় ফিরিয়া কাহার কাছে যাইব, তাহা ভাবিয়া পাইতাম না, কিন্তু ফিরিয়া লোকালয়ে যাই, এই ইচ্ছা মধ্যে মধ্যে আমার মনে হইত। আজ যখন সঙ্গী পেয়াদা মসূরীর সোজা পথ দেখাইয়া দিল, তখনই ইচ্ছা হইল, সেই পথে মসূরী ফিরিয়া যাই। অন্য কোন পথে চলিতে আমার এমন মনের ভাব হয় নাই। আমি যে অনিচ্ছায় গঙ্গোত্রীর পথে গিয়াছিলাম, তাহা নহে; কিন্তু সে ইচ্ছার মধ্যেও সময়ে সময়ে ফিরিবার বাসনা প্রবল হইত। যখন সেই বাসনার সঙ্গে তর্ক করিতে বসিতাম—কেন আমি লোকালয়ে সহরে ফিরিয়া যাইব, সেখানে আমার কে আছে, সেখানে না গেলে কেহ কেহ দুঃখিত হইতে পারেন বা কাহারও মনে কষ্ট হইতে পারে; কিন্তু আমার প্রতিগমন অপেক্ষায় প্রাণটি রাস্তায় কি কেহ বসাইয়া রাখিয়াছে, আমার অভাবে কি কাহারও জীবন একেবারে অন্ধকারে ডুবিয়া যাইবে, আমার জন্য কি জগতের কোন কাজ আটকাইয়া আছে? যখন এমনই করিয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া আমার বাসনাকে বিরক্ত করিয়া তুলিতাম, তখন সে বেচারী নীরব হইত; আবার কোন সুযোগে কোন দৃশ্য-সম্মুখে আমাকে উপস্থিত করিয়া, মসূরী দেরাদুন কেন, তাহা অপেক্ষাও বহুদূরে ক্ষুদ্র গ্রামে আমার পর্ণকুটীরের কথা মনে করিয়া দিত—সেই স্নেহশীতল আশ্রয়বৃক্ষের দিকে আমার হৃদয়ের গতি ফিরাইয়া দিত। এই জন্যই গঙ্গোত্রীর পথে আমার বেশী দূর যাওয়া হয় নাই। যার পশ্চাদ্দিকে টান আছে, সে পর্ব্বতে উঠিতে পারে না।

এই সব চিন্তা ঠিক তখন আমার মনে উঠিয়াছিল কি না, কেমন করিয়া বলিব? কিন্তু আমাদের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া পেয়াদা পথের বামপার্শ্বস্থ একটি পরিত্যক্ত গ্রাম দেখাইয়া দিল। এ গ্রামের কথা আর একদিন বলিব।

শ্রীজলধর সেন।

দেবব্রত।

১

ছেড়েছি বিষয়-সুখ বিলাস-বাসনা,
হৈমপুরী হস্তিনার রাজসিংহাসন ;
ধরেছি কৌমার-ব্রত কঠোর সাধনা,
শুভ্র বাক্যে, দেহে, মনে শুভ্র আচরণ ;
ভীষণ তরঙ্গ 'পরি
ভাসায়ে জীবন-তরী
ভীষ্ম নাম করেছি গ্রহণ।

২

চারি পাশে সুগভীর রহস্য অকূল,
সৌন্দর্য্যের উচ্ছ্বসিত অসীম বিকাশ ;
ফুটিছে টুটিছে কত কিরণের ফুল,
জ্বলিছে নিবিছে কত জ্যোতিষ্কের হাস ;
কত কণ্ঠে কত গান
সুখের দুখের তান
উঠিছে পড়িছে বারো মাস।

৩

তারি মাঝে ভাসমান ভীষ্মের তরণী
ফেনিল সলিল-ভঙ্গে দুলিছে হেলায়,
কভু হেরি' উর্ম্মিবরে উল্লাসে অমনি
আপার ক্ষেপণীভরে নাচিতেছে তায়!
কভু দ্রুত কভু ধীর,
উন্নত আনত শির,
উৎসাহের প্রতিমার প্রায়।

৪

গুরু গরজনে আসে জলদ সজল,
ঝম্ ঝম্ বারিরাশি ঝরে অনিবার ;
আসে পুনঃ শুভ্র হাস্তে শরৎ বিমল,
মধুনিশি পৌর্ণমাসী-পূর্ণ সুষমায় ;
ছয় ঋতু আসে যায়,
কত মৌন ছবি তায়
জেগে উঠে মনের মাঝার।

৫

প্রভাতে পূরবে যবে করি দরশন
রঞ্জিত মেঘের মাঝে দিগন্তের গায়
জবা-কুসুমের কান্তি গলিত কাঞ্চন
নবোদিত তপনের বরণ-বিভায়,
হেরি কার প্রেম-মুখ
পুলকিয়া উঠে বুক,
কোথা বীণা বেজে উঠে, হায়!

৬

মধ্যাহ্নে মগন ধ্যানে স্তম্ভিত ভূতল ;—
কভু অতি দূরাগত পাপিয়ার তান,
কভু বা কপোত-কণ্ঠে করুণ তরল
উঠি' সুর সুমধুর বিকলে পরাণ,
তারি সাথে কার কথা
জাগায়ে বিজন ব্যথা,
ভেসে যায় সজল নয়ান।

৭

সন্ধ্যায় বিমুগ্ধ নেত্রে নিশ্চল নীরব
দিবসের শ্রান্তি যবে ভুলিবারে চাই,
কোথা হ'তে আসে কানে ঘণ্টা-ঘনরব,
কার সে আরতি-শঙ্খ শুনিবারে পাই ;
কেমন মন্দির, হায়!
কেমন সে মূর্ত্তি তা'র,
শূন্য মনে ভাবি আমি তাই।

৮

নিশীথে নিদ্রায় যবে মগ্ন চরাচর,
শুধু মোর নেত্র 'পরে জাগে জাগরণ,
হেরি আমি,—অহো আমি কিবা ভাগ্যধর!
যা' দেখিনু সে ত নহে নিশার স্বপন!
নিশ্চয় নিশ্চয় মোর
ছিঁড়িবে মরণ-ডোর,
ধন্য হবে মানব-জীবন!

৯

হেরি আমি দেবসভা অপূর্ব্ব সুন্দর,
তারি মাঝে স্বর্ণাসনে মূরতি-যুগল ;—
একের বঙ্কিমঠাম বাঁশরী-অধর,
অন্যের আননে হাসি প্রসন্ন সরল!
একের বরণ কালো,
অন্যের সকলি আলো,
মুগ্ধরূপে চোখে আসে জল।

১০

কভু হেরি রত্নরথ গরুড়কেতন,
আলো পাশে কালো শশী সম্মুখে আমার!
ধাই আমি ধরিবারে,—হারাই চেতন,—
দূরে—বহু দূরে তারে নিরখি আবার!
নিরখি নক্ষত্রপ্রায়
নীরবে মিশিয়া যায়
নব নীল নীলিমা মাঝার।

১১

হে সুন্দর! দেখা দিয়ে লুকালে কোথায়?
হের আজি তোমা বিনা আঁধার ধরণী;
এ অকূল সিন্ধুনীরে তরঙ্গ-দোলায়
বৃথা কি ভাসায়ু তবে যৌবন-তরণী?
সহসা নিশার প্রাণ
কেটে হয় শতখান,
কর্ণে মোর বরষে অশনি!

১২

"যা'হ তরী, ভক্ত মোর, না হও নিরাশ;
অদূরে অদৃষ্ট তব সমুজ্জ্বল ভায়;
একদিন শুভক্ষণে সম্মুখে প্রকাশ
এই মূর্ত্তি পুনর্ব্বার দেখাব তোমায়:
বিচিত্র সাধন ডোরে
তুমি বাঁধিয়াছ মোরে,
তাই কৃষ্ণ জন্মিব ধরায়।"

১৩

কৃষ্ণ তুমি? কৃষ্ণ তবে দেবতা আমার?
কৃষ্ণ নামে করিব কি তব আরাধন?
দীন আমি,—মোর লাগি কৃষ্ণ-অবতার?
হবে কৃষ্ণ?-হবে কালো? কালিন্দী-বরণ?
হে বাঞ্ছিত! যে বা হও,
যেথা বা জনম লও,
দেবব্রতে দিও শ্রীচরণ।

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ।

নূতন মুদ্রাযন্ত্র।

আধুনিক বিজ্ঞানের কীর্ত্তিকাহিনী শুনিলে বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয়। নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সহিত উন্নত যন্ত্রশিল্পিগণের কৌশল মিলিত হইয়া, জড়বিজ্ঞানের মহিমা ক্রমেই অতি উচ্চ করিয়া তুলিতেছে। জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এডিসনের কীর্ত্তির কথা পাঠক পাঠিকাগণ অবশ্যই শুনিয়াছেন—তাঁহার ফোনোগ্রাফ্ ও বিদ্যুদুৎপাদক যন্ত্রের ন্যায় সংসারের দৈনিক কার্য্যের ব্যবহারোপযোগী অনেক যন্ত্র আজ কাল উদ্ভাবিত হইতেছে। ইহাদের প্রত্যেকেই অতি সূক্ষ্মভাবে নির্ম্মিত; এ প্রকার সুব্যবস্থিত এবং শিল্পচাতুর্য্যপূর্ণ যন্ত্র যে মানববুদ্ধিসাধ্য হইতে পারে, বোধ হয়, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, কেহ কল্পনাই করিতে পারিতেন না। বৃহৎ বৃহৎ রাশির গুণন ও ভাগকরণ প্রভৃতি গণিতের প্রক্রিয়াও, অতি অল্প সময়ে এবং নির্ভুলরূপে যন্ত্র দ্বারা সাধিত হইতেছে,—ইহা অপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর কার্য্য আর কি হইতে পারে? সম্প্রতি এই প্রকার আশ্চর্য্যজনক আর একটি যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে,—ইহা দ্বারা সংবাদপত্র ও গ্রন্থাদির মুদ্রনকার্য্য অতি শীঘ্র সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রচলিত মুদ্রাঙ্কনকার্য্যে, যে প্রকার ধাতুময় অক্ষরগুলি এক একটি করিয়া বাছিয়া সাজাইতে হয়, উক্ত নবোদ্ভাবিত যন্ত্রে তাহার কিছুই আবশ্যক হয় না, এবং প্রচলিত প্রথায় সুচারুরূপে অক্ষরবিন্যাস করিতে যে কৌশল ও অভ্যাসের প্রয়োজন হয়, নূতন প্রথায় তাহারও আবশ্যকতা নাই,—যে কোনও পরিচিতাক্ষর অনভ্যস্ত ব্যক্তি দ্বারাও সুন্দররূপে মুদ্রাঙ্কন সম্পন্ন হইতে পারে।

এই নূতন মুদ্রাযন্ত্র, দুই অংশে বিভক্ত;—প্রথম অংশ দ্বারা অক্ষরবিন্যাস, এবং দ্বিতীয়টির সাহায্যে অক্ষরগঠন হইয়া থাকে। আধুনিক মুদ্রন-ব্যাপারে, যে প্রকার পূর্ব্বপ্রস্তুত অক্ষর

লইয়া কার্য্য করিতে হয়, ইহাতে তাহার কোনও আবশ্যকতা হয় না।—কোন হস্তলিপি মুদ্রিত করিতে হইলে, তাহার সমস্ত অক্ষরগুলি, অতি সহজে পৌর্ব্বাপর্য্যরূপে যন্ত্র দ্বারা ঢালাই হইয়া থাকে। এই মুদ্রাযন্ত্রের প্রথমোক্ত অংশটি, অর্থাৎ অক্ষরবিন্যাসযন্ত্র, অতি সুব্যবস্থিত;—হার্ম্মোনিয়ম্ বা পিয়ানোর চাবির ন্যায়, ইহাতে বর্ণমালার সমগ্র অক্ষরাঙ্কিত কতকগুলি চাবি আছে—দেখিতে কতকটা আধুনিক টাইপ্-রাইটারের ন্যায়; কিন্তু টাইপ্-রাইটারে যে প্রকার অক্ষরাঙ্কিত চাবিটি টিপিলেই অক্ষরটি যন্ত্রসংলগ্ন কাগজে মুদ্রিত হইয়া যায়, ইহার ব্যবস্থা সেরূপ নয়। এক খণ্ড অনতিপ্রসর দীর্ঘ কাগজ এই কলে আবদ্ধ থাকে; হস্তলিপি দেখিয়া অক্ষরাঙ্কিত চাবি টিপিলেই সূচ্যগ্র-উৎপন্ন চিহ্নের ন্যায় কতকগুলি ছিদ্র উক্ত কাগজ খণ্ডে অঙ্কিত হইয়া যায়। এই প্রকারে সমস্ত হস্তলিপির অক্ষরব্যঞ্জক চিহ্নগুলি অঙ্কিত হইলে, কেবল উক্ত কাগজখানি দ্বারা যন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে অক্ষরগঠন হইয়া থাকে। প্রচলিত অক্ষরবিন্যাস-প্রথায় বাক্যগুলির মধ্যে নির্দ্দিষ্ট অন্তর, এবং ছত্রগুলির মধ্যে নিয়মিত ব্যবধান রাখা বড়ই কঠিন,—নূতন যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কনের সৌষ্ঠবসাধক এই কার্য্যগুলি, অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ছত্রের কতদূর অক্ষরবিন্যাস হইল, তাহা বাহির হইতে জানিবার উপায় আছে; আবার প্রত্যেক ছত্রের এবং প্রত্যেক পৃষ্ঠার অক্ষরবিন্যাস শেষ হইলে, যন্ত্র হইতে স্বতঃই এক শব্দ উৎপন্ন হইয়া, মুদ্রাকরকে সতর্ক করিয়া দেয়, এবং তৎপরে [illegible]ন ছত্র বা নূতন পৃষ্ঠার বিন্যাস-আরম্ভে যে যে চাবি টিপিতে হইবে, সেগুলি নিতান্ত অজ্ঞ ব্যক্তিরাও যাহাতে সহজে বুঝিতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা আছে। যন্ত্রের দ্বিতীয়াংশ অর্থাৎ ঢালাই যন্ত্রটির গঠন কিঞ্চিৎ জটিল,—পূর্ব্ববর্ণিত ছিদ্রাঙ্কিত কাগজখণ্ড ইহাতে প্রবেশিত করিয়া, যন্ত্রস্থ অপর এক ছিদ্রপথ দ্বারা গলিত ধাতু নীত করিলেই, হস্তলিপির অক্ষরগুলি যথাযথ স্থানে গঠিত হইয়া যায়। পাঠকপাঠিকাগণ মনে করিতে পারেন, এই অক্ষরগঠন-প্রথা অধিক সময়সাপেক্ষ, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়। গলিত ধাতু কঠিন হইতে যে সময় আবশ্যক হয়, সেই কালমধ্যেই সুসজ্জিত ও সুন্দর অক্ষরপূর্ণ মুদ্রাফলক প্রস্তুত হইয়া যায়। তার পর সাধারণ উপায়ে মসী দ্বারা গ্রন্থাদি মুদ্রিত হইয়া থাকে। এই প্রকারে মুদ্রনকার্য্য শেষ হইলে, সেই অক্ষরগুলি পুনরায় গলাইয়া, তাহাই আবার অপর হস্তলিপির অক্ষরগঠনে প্রযুক্ত হয়। এই যন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়াগুলি এত শীঘ্র সম্পাদিত হয় যে, তাহা প্রত্যক্ষ করিলে বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয়। সংবাদপত্র-মুদ্রাঙ্কনকার্য্যে এই প্রথা বিশেষ সুবিধাজনক হইয়াছে। গ্রন্থাদি-মুদ্রনেও সুবিধা বড় অল্প নয়,—কোন গ্রন্থ, এই যন্ত্রে একবার মুদ্রিত করিয়া, উক্ত অক্ষরফলকগুলি না গলাইয়া রাখিয়া দিলে, গ্রন্থের পুনর্মুদ্রন-কার্য্য অতি অল্পব্যয়েই সম্পন্ন হইতে পারিবে।

ইতিমধ্যেই য়ুরোপের অনেক সংবাদপত্র-প্রচারক, এই যন্ত্র দ্বারা মুদ্রনকার্য্য করিয়া, একবাক্যে ইহার উৎকর্ষ স্বীকার করিতেছেন। আমাদের দেশেও অনেক সম্পাদক ও গ্রন্থকারকে মুদ্রন-বিভ্রাটে প্রায়ই ব্যতিব্যস্ত হইতে দেখা যায়, এই নূতন যন্ত্রটির কল্যাণে এ দেশের কিছু উপকার হইবে কি?

বৃহত্তম দূরবীক্ষণ।

আজ কাল যে সকল জ্যোতিষিক আবিষ্কার হইতেছে, আধুনিক উন্নত যন্ত্রই তাহার মূল কারণ বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমান শতাব্দীতে গণিতশাস্ত্রের মূলগত কোন বিশেষ উন্নতি হয় নাই; সেই কেপ্লারপ্রমুখ প্রাচীন মনীষিগণের প্রকটিত নিয়মাবলী নাড়াচাড়া করিয়া, আকাশপরিদর্শনোপযোগী উন্নত যন্ত্রের সাহায্যেই, আজকাল জ্যোতির্বিদ্যার কলেবর পুষ্ট হইতেছে। রশ্মিনির্ব্বাচনযন্ত্র (Spectroscope) উদ্ভাবিত না হইলে,

গ্রীন্‌উইচের মানমন্দিরে বসিয়া, কোটিযোজনদূরস্থিত জ্যোতিষ্কপুঞ্জের গঠনোপাদানের আবিষ্কার সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া পড়িত; আর দূরবীক্ষণের ক্রমোন্নতি সাধিত না হইলে, গ্যালিলিওর অসম্পূর্ণ যন্ত্র দ্বারা, বৃহস্পতির পঞ্চম উপগ্রহ আবিষ্কার কত দূর সহজসাধ্য হইত, পাঠকপাঠিকাগণ বিবেচনা করুন। যন্ত্রবিদ্যার সেই দীন অবস্থায়, বোধ হয়, অসাধারণ গণিতজ্ঞ লেভেরিয়ারও, বরুণগ্রহ আবিষ্কার করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইবার সুযোগ পাইতেন না।

জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতি বৃহৎ দূরবীক্ষণের উপরই নির্ভর করিতেছে দেখিয়া, য়ুরোপ ও আমেরিকার প্রধান প্রধান মানমন্দিরে যাহাতে উন্নত দূরবীক্ষণ ব্যবহৃত হয়, তাহার ব্যবস্থার জন্য, জ্যোতিষিগণ অনেক দিন অবধি বহু আয়োজন করিতেছেন। বৃহৎ দূরবীক্ষণ-নির্ম্মাণ, অতীব কষ্টসাধ্য ব্যাপার; ইহার সুদীর্ঘ নলিকা নির্ম্মাণ বিশেষ কঠিন নয়; এই নলের মধ্যে যে বৃহৎ কাচখণ্ডগুলি আবদ্ধ থাকে, তৎগঠনেই নির্ম্মাতৃগণকে বিশেষ গোলযোগে পড়িতে হয়; একটি নাতিবৃহৎ দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ করিতে হইলেও, কাচ ঢালাই করিয়া, তদ্দ্বারা একেবারেই দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ করা অতি সুচতুর শিল্পীরও অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না। এই সকল নানা প্রতিকূল কারণে, প্রচুর অর্থব্যয়েও একটি বৃহৎ দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ বড় সহজ নয়। পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন, দূরবীক্ষণের বস্তুখণ্ড * যতই বৃহত্তর, যন্ত্রের শক্তিও ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত নানা কারণে জগতে বৃহৎবস্তুখণ্ডযুক্ত দূরবীক্ষণ প্রায়ই দেখা যায় না। সুবিখ্যাত লিক্ মানমন্দিরের দূরবীক্ষণে বস্তুখণ্ডের ব্যাস ৩৬ ইঞ্চি, এবং রুসিয়ার রাজকীয় দূরবীক্ষণের ব্যাস কেবল ৩০ ইঞ্চি মাত্র; বহুকাল এই দুইটি যন্ত্রই পৃথিবীর বৃহৎ দূরবীক্ষণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ইংলণ্ডের গ্রীন্‌উইচ্ মানমন্দিরে, অনেক দিন অবধি দ্বাদশ-ইঞ্চি-ব্যাসযুক্ত দূরবীক্ষণ দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ-কার্য্য সাধিত হইয়া আসিতেছিল; কয়েক বৎসর হইল, তথায় একটি ২৮ ইঞ্চি দূরবীক্ষণ স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু পরিদর্শনাগারের যথাস্থানে যন্ত্রটি স্থাপিত না হওয়ায়, সেটি এখন এক প্রকার অব্যবহার্য্য অবস্থাতেই রহিয়াছে। আমেরিকার লিক্ মানমন্দিরের পূর্ব্বোক্ত দূরবীক্ষণ অপেক্ষা বৃহত্তর যন্ত্রের নির্ম্মাণ, একরূপ অসম্ভব বলিয়াই বিশ্বাস ছিল; সম্প্রতি আমেরিকার চিকাগো নগরে ৪০-ইঞ্চি-ব্যাসযুক্ত একটি দূরবীক্ষণ নির্ম্মিত হওয়ায়, উক্ত বিশ্বাস সম্পূর্ণ অপনীত হইয়াছে।

চিকাগোর উক্ত দূরবীক্ষণ কেবল সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নয়; এই জাতীয় যন্ত্র দ্বারা আকাশ-পরিদর্শনকালে, স্বতঃই যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, নির্ম্মাতার শিল্পনৈপুণ্যে, তাহার কিছুই ভোগ করিতে হয় না।—রশ্মিনির্ব্বাচনযন্ত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কপর্য্যবেক্ষণের অত্যাবশ্যক যন্ত্রগুলিও দূরবীক্ষণে সংলগ্ন আছে। য়ার্কিস্ নামক জনৈক বিজ্ঞানোৎসাহী মার্কিন্ ভদ্রলোক, এই অসাধারণ যন্ত্রনির্ম্মাণের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা সর্ব্বাংশে অপকৃষ্ট লিক্ মানমন্দিরের দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ করিতে ২১ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল; সেই অনুপাতে য়ার্কিসের যন্ত্রনির্ম্মাণে কত ব্যয় হইয়াছে, পাঠকপাঠিকাগণ অনুমান করুন। যন্ত্রটির দৈর্ঘ্য প্রায় পঞ্চাশ হাত, ইহার ভারও বড় অল্প নয়, তৎসংলগ্ন নানা যন্ত্রের সহিত, সমবেত ভার ৫৬০ মণেরও অধিক হইবে। পাঠক মনে করিতে পারেন, এই প্রকার একটা বৃহৎ যন্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহার বড় কঠিন, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়। ইহা এমন সুকৌশলে স্থাপিত হইয়াছে যে, একটি চাবি টিপিলেই, দূরবীক্ষণকে যদৃচ্ছ চালিত করা যায়; এতদ্ব্যতীত পর্য্যবেক্ষণ-প্রাঙ্গণটি এমন সুকৌশলে নির্ম্মিত যে, সমগ্র প্রাঙ্গণটিই পরি-

---

* অর্থাৎ Object glass,—যে কাচখণ্ড যন্ত্রের পুরোভাগে সংলগ্ন থাকে, পরিদর্শনকালে ইহা দর্শনীয় বস্তুর অভিমুখে উন্মুক্ত রাখা হয়।

দর্শকের ইচ্ছানুরূপ উন্নত বা অবনত করা যাইতে পারে। জ্যোতিষ্কগণ পৃথিবীর আহ্নিক গতি হেতু আকাশে চঞ্চল অবস্থায় বিচরণ করে; এজন্য কোন নক্ষত্র অধিক কাল ব্যাপিয়া পরিদর্শন করিতে হইলে, নক্ষত্রের গতির সহিত দূরবীক্ষণের অপসরণও আবশ্যক হইয়া পড়ে;—জার্কিসের দূরবীক্ষণে এই কার্য্য যন্ত্র দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। কোন এক জ্যোতিষ্ক লক্ষ্য করিয়া দূরবীক্ষণটি একবার স্থাপিত করিলে, একঘণ্টাকাল মধ্যে তাহার আর পুনঃস্থাপন আবশ্যক হয় না।

জার্কিস্ এই দূরবীক্ষণনির্ম্মাণে অনেক সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, নচেৎ পূর্ব্বোক্ত-প্রকার একটি নূতন যন্ত্রের আমূলনির্ম্মাণ আরও ব্যয়সাধ্য হইত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কালি-ফর্ণিয়া প্রদেশে একটি বৃহৎ দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণের প্রস্তাব হয়,—নির্ম্মাণকার্য্যও কতকটা অগ্রসর হইয়াছিল; কিন্তু ইতিমধ্যে কোন বিশেষ কারণে কালিফর্ণিয়াবাসিগণ দূরবীক্ষণ-নির্ম্মাণসংকল্প ত্যাগ করেন। জার্কিস্ এই সুযোগে কল্পিত যন্ত্রটির দৃষ্টিখণ্ডের কাচখানি হস্তগত করিয়াছিলেন; এতদ্দ্বারা যন্ত্রনির্ম্মাতৃগণকে কাচ ঢালাইয়ের অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই;—কিন্তু এই সুযোগ সত্ত্বেও কাচখানি নিয়মিত আকারে গঠন করিতে, সুবিখ্যাত আলোকতত্ত্ববিদ্ ক্লার্ক সাহেবের চারি বৎসর সময় কঠোর পরিশ্রমে ব্যয়িত হইয়াছিল। উক্ত কাচখণ্ড এত সূক্ষ্মভাবে গঠিত হইয়াছে যে, তদুপরি কিয়ৎকাল অঙ্গুলি ঘর্ষণ করিলে কাচের যে ক্ষয় সাধিত হয়, তদ্দ্বারাও দূরবীক্ষণটি একবারে অব্যবহার্য্য হইয়া যাইতে পারে। নানাদেশীয় পণ্ডিতগণ বলিতেছেন, কোটি মুদ্রা ব্যয়েও, কেহই এ প্রকার বৃহৎ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন না,—ইহার বস্তুখণ্ডের কাচখানি নিশ্চয়ই কোনও দৈব অনুকম্পায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া পড়িয়াছে।

বৃহৎ দূরবীক্ষণ নির্ম্মিত হইলেই, তাহার ক্ষমতার অনেক "আজগবি" সংবাদ প্রকাশিত হয়; ফরাসী যন্ত্রশিল্পিগণ আগামী ১৯০০ খৃষ্টাব্দীয় মহাপ্রদর্শনীতে, দূরবীক্ষণ দ্বারা চন্দ্রদেবকে ভূপৃষ্ঠ হইতে দুই মাইল ব্যবধানে আনয়ন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন!—ইঁহাদের আয়োজনের কি ফল ফলিবে, পাঠকপাঠিকাগণ তাহা বিবেচনা করুন। বলা বাহুল্য, জার্কিসের দূরবীক্ষণ দ্বারা পূর্ব্বোক্তপ্রকার অলস স্বপ্নের সার্থকতা হইবে না। যাট মাইল ব্যবধানে চন্দ্র যত বৃহৎ দেখায়, ইহা দ্বারা চন্দ্রদেবকে তদনুরূপ দেখা যাইবে। নিকৃষ্ট লিক্ দূরবীক্ষণ দ্বারা অনেক জ্যোতিষিক আবিষ্কার হইয়াছে,—বৃহস্পতির পঞ্চম উপগ্রহের অস্তিত্বও ইহার সাহায্যেই প্রথম দৃষ্ট হইয়াছিল; তদপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট জার্কিসের দূরবীক্ষণ দ্বারা যে কোন আবিষ্কার হইবে না, এ কথা বলা যায় না।

নির্ধূম অগ্নি।

তাপ ও আলোক অগ্নির প্রধান ধর্ম্ম,—এই শক্তি প্রাত্যহিক কার্য্যে প্রযুক্ত করিবার জন্য, মানুষ অগ্নির সাহায্য গ্রহণ করে। শুষ্ক কাষ্ঠ, কয়লা ও তৈল প্রভৃতি দাহ্য পদার্থে যে অগ্নি-জননী শক্তি নিহিত থাকে, তদ্দ্বারা অগ্নির উৎপাদন করিলে উক্ত শক্তির সম্পূর্ণ সদ্ব্যয় হয় না; অপর কোন সুব্যবস্থা না থাকিলে তাহার অধিকাংশই ধূম, বাষ্প ও ভস্মাদির উৎপাদনে অপব্যয়িত হয়। দাহ্যপদার্থমাত্রই অঙ্গার-(Carbon)-বহুল; যখন এই অঙ্গার, বায়ুস্থিত অম্লজান (Oxygen) বাষ্পের সহিত মিলিত হইয়া অম্লাঙ্গারক বাষ্পের (Carbonic acid gas) উৎপাদন করে, তখন যে রাসায়নিক তাপ উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারাই অগ্নি উদ্দীপিত হইয়া থাকে। দাহ্যপদার্থস্থ সমস্ত অঙ্গারকেই এই প্রকারে অম্লাঙ্গারে পরিণত করা বড় কঠিন। কাষ্ঠাদি সাধারণ উপায়ে প্রজ্বলিত হইলে, তাহার অঙ্গারের অনেক অংশই ভস্মে ও ধূমাকারে পরিবর্ত্তিত হয়; কাজেই যথেষ্ট তাপ ও আলোক উৎপন্ন হয় না। পাঠকপাঠিকাগণ দেখিয়া

থাকিবেন, চঞ্চল বায়ুতে দীপশিখা উন্মুক্ত রাখিলে, শিখা হইতে অত্যন্ত ধূম নির্গত হইয়া আলোক ম্লান হইয়া পড়ে, এবং তৈলও অধিক দগ্ধ হইয়া যায়। আজ কাল কেরোসিন দীপশিখার উপরে যে কাচনির্ম্মিত চিম্‌নি দেখা যায়, তাহা কেবল তৈলস্থ সমগ্র অঙ্গারকে দ্ব্যঙ্গারে পরিণত করিবার জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে; এই কারণে দীপশিখা চিম্‌নি-আবৃত হইবামাত্রই, তৈলস্থ যে সকল অঙ্গার পূর্ব্বে রাসায়নিক কার্য্যে যুক্ত না হইয়া ধূমাকারে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছিল, সেগুলি সম্পূর্ণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রযুক্ত হওয়ায়, দীপ-শিখা নির্ধূম ও পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকে। আজকাল নানা দেশে রন্ধনাদি কার্য্যের জন্য উক্ত প্রথায় নানা প্রকার চুল্লী নির্ম্মিত হইতেছে; যে সকল উনানের গঠনকৌশলে ইন্ধনস্থ অঙ্গার ধূমোৎপাদন না করিয়া কেবল পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তাপ উৎপাদিত করে, তাহাই জনসমাজে বিশেষ আদৃত হইয়া থাকে।

সাধারণ চুল্লীতে ধূমোৎপাদনজনিত ইন্ধনের অপব্যবহার দেখিয়া, বহুকাল হইতে বিজ্ঞানবিদ্‌গণ নির্ধূম অগ্নি উৎপাদনের জন্য সচেষ্ট রহিয়াছেন। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে নির্ধূম অগ্নি প্রজ্বালনের উপযোগী দুই একটি চুল্লীও নির্ম্মিত হইয়াছে; কিন্তু তাহার নির্ম্মাণব্যয় অত্যন্ত অধিক বলিয়া প্রাত্যহিক গৃহকার্য্যের জন্য সেগুলি এত দিন কোন দেশেই ব্যবহৃত হয় নাই। সম্প্রতি মেয়ার (Fritz Maier) নামক জনৈক অষ্ট্রীয়ান্ বিজ্ঞানবিদ্ নির্ধূম অগ্নির জন্য এক প্রকার সুলভ ও সুন্দর চুল্লী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, সাধারণ উনানে যে পরিমাণ ইন্ধন ব্যয় হয়, এই চুল্লীতে তাহার এক তৃতীয়াংশ অল্প ব্যয়িত হইবে। দুঃখের বিষয়, ইহা আজও গার্হস্থ্য ব্যবহারের উপযোগী করিয়া নির্ম্মিত হয় নাই; বাষ্পীয়যান ও কলকারখানায় যাহাতে ইহার ব্যবহার হয়, এখন নির্ম্মাতা তাহারই জন্য সচেষ্ট রহিয়াছেন। অগ্নি নির্ধূম করিতে হইলে, অগ্নি-সংশ্লিষ্ট বায়ু সর্ব্বদা নিয়মিত রাখা আবশ্যক; উক্ত চুল্লীতে এই কার্য্য অতি সুকৌশলে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সাধারণ বাষ্পীয় যন্ত্রে যে প্রকার চুল্লীদ্বার থাকে, ইহাতে তাহা নাই; ইন্ধনাদি নিয়মিতরূপে অপর পথ দিয়া অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং দগ্ধাবশিষ্ট পদার্থ স্থানান্তরিত করা ও অগ্নি-উদ্দীপন প্রভৃতি কার্য্যও কলে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

অষ্ট্রিয়ার রাজকীয় বাষ্পীয়পোতাদি আজকাল এই চুল্লী দ্বারা চালিত হইতেছে, এবং তত্রত্য কলকারখানাতেও এই নূতন চুল্লী গৃহীত হইয়াছে। মেয়ারস্ সাহেব যে সকল সুবিধার কথা বলিয়াছেন, তাহা সত্য হইলে সকল দেশেই যে তাঁহার আবিষ্কৃত অভিনব চুল্লীর বহুল প্রচলন হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য, সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা প্রভৃতির ন্যায় কারখানা-বহুল নগরের অধিবাসিগণও একটু নির্ধূম স্নিগ্ধ বায়ু সেবন করিয়া শান্তিলাভ করিবেন।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

বহুবিবাহ।

বহুবিবাহের আর এক কারণ, পুরুষের উপর স্ত্রীলোকের রূপ ও যৌবনের আকর্ষণ। রূপ অবশ্যই মোহের জন্যই হইয়াছিল ; কিন্তু স্ত্রীলোকের রূপ বুঝি পাগল করিবার জন্য হইয়াছিল। পুরুষজাতি, যত কেন সভ্য হউক না, স্ত্রীলোকের রূপের অনল জ্বলিতে দেখিলে, তাহাতে ঝাঁপ দিবার জন্য বহির্মুখ-বিবিক্ষু পতঙ্গের ন্যায় ব্যাকুল হয়, দগ্ধ হইতে হইবে কি না, তাহা পর্য্যন্ত ভাবিবার মত ধৈর্য্য রাখিতে পারে না। অনেক সময় পুড়িতে হইবে জানিয়াও ঝাঁপ দেয়। এই আকর্ষণের প্রভাব যে কিরূপ দুরতিক্রম্য, তাহা আমাদের পুরাণাদিতে বর্ণিত ঋষিদিগের বৃত্তান্তে অতি জাজ্বল্যমানরূপে দেখা যায়। সংসারত্যাগী, ভোগলালসারহিত, চিরসংযত, তপোনিরত, ব্রহ্মনিষ্ঠ ঋষি একাগ্রচিত্তে তপস্যা করিতেছেন ; অমরাবতী হইতে প্রেরিতা কোন অপ্সরার একটু বিভ্রম-বিলাস দেখিলেন, আর অমনি একেবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া একটা কাণ্ড করিয়া ফেলিলেন! অন্যের কথা কি, স্বয়ং মহাদেব এক দিন এই আকর্ষণের প্রভাবে বিচলিত হইয়াছিলেন। রূপ-যৌবনের আকর্ষণ কি ভয়ঙ্কর মনে কর দেখি! সুসভ্য সমাজে মানুষকে এই আকর্ষণের প্রভাব হইতে রক্ষা করিবার জন্য কত না প্রয়াস, কত না অনুষ্ঠান, কত না শাসন —ধর্ম্মের শাসন, নীতির শাসন, সমাজের শাসন, রাজবিধির শাসন,—সংযম-শিক্ষার জন্য একনিষ্ঠার মাহাত্ম্য, ইন্দ্রিয়দমনের মাহাত্ম্য, শতরূপে ঘোষিত হইতেছে ; অথচ প্রকৃতির স্ব[illegible]ত এই [illegible]দ মানুষ প্রতিনিয়তই ঝাঁকে ঝাঁকে পড়িতেছে। অনেক [illegible] সমাজে [illegible]ক পত্নীগ্রহণ একেবারেই নিষিদ্ধ ; যে সকল সভ্য স[illegible] তাহা নহে [illegible]নেও বহুবিবাহ অর্থসাপেক্ষ এবং বহুবিধ পারিবারিক অ[illegible]ান্তি ও বি[illegible]র আকর ; সুতরাং সুসভ্য মনুষ্য এই আকর্ষণের প্রভাবে বহুবিবাহ [illegible]রে না বটে, কিন্তু ব্যভিচারাদি সামাজিক পাপে সচরাচরই পতিত হয়। অসভ্য সমাজে, যেখানে আত্মসংযম-শিক্ষা নাই বলিলেই হয়, যৌননী[illegible] যারপরনাই শিথিল, স্ত্রীলোক সম্পত্তি-মাত্র, বহু স্ত্রী নিন্দনীয় হওয়া দূরে থাক, বরং গৌরবের বিষয় ; ভাষায় 'প্রেম' বা 'ভালবাসা' বলিয়া কোন শব্দ পর্য্যন্ত নাই, সেখানে লোকে এই অনভিভবনীয় আকর্ষণের বশবর্ত্তী হইয়া যে বহু স্ত্রী আত্মসাৎ করিবে, ইহা সহজেই অনুমেয়।

আর, অসভ্যদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের রূপযৌবন বড় স্বল্পকালস্থায়ী। অতিশ্রম-নিবন্ধনই হউক, অপরিণত বয়সে পুরুষ-সহবাস-নিবন্ধনই হউক, দীর্ঘ কাল স্তন্যের দ্বারা সন্তান পালন করিতে হয় বলিয়াই হউক, বা এই সকল কারণের সমবায়েই হউক, অসভ্য রমণীর রূপ ও যৌবন অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প বয়সে লয়প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, তাপাধিক্যও অকালবার্দ্ধক্যের একটা কারণ;—শীতপ্রধান দেশ অপেক্ষা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে স্ত্রীলোকের যৌবনের শীঘ্র অবসান হয়। সে যাহা হউক, অসভ্য জাতির মধ্যে এবং তাপপ্রধান দেশে স্ত্রীলোক যে অতি অল্পকালের মধ্যে বিগতযৌবনা হয়, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। পাউয়ার্স সাহেব বলেন যে, কালিফর্ণিয়ার স্ত্রীলোকেরা বিবাহের পূর্ব্বে দেখিতে বেশ সুশ্রী থাকে, কিন্তু পঁচিশ বা ত্রিশ বৎসর বয়সেই অতিশ্রমে ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং কুৎসিত হইয়া উঠে। মণ্ডল জাতির স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য বিবাহের পর [illegible] দিনের মধ্যেই তিরোহিত হয়। ওয়ারাউ জাতির স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে [illegible]শাম্বর্গ লিখিয়াছেন যে, কুড়ি বৎসর বয়স হইতে ইহাদের যৌবনের [illegible] বিলুপ্ত হয়। মিসর দেশের স্ত্রীলোকেরা চতুর্দ্দশ হইতে বিংশতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নারীসুলভ অঙ্গসৌষ্ঠব ও সৌকুমার্য্য বিষয়ে স্ত্রীজাতির আদর্শস্থানীয়া, কিন্তু বিংশতি বৎসর অতিক্রম করিলেই তাহার কিছুই আর থাকে না। সাহারা-প্রদেশের আরব স্ত্রীলোকদিগের যৌবনের নবীনতা ও প্রফুল্লতা ষোড়শ বৎসর বয়সের অধিক থাকে না; এবং বাথিলে জাতির স্ত্রীলোকের পঞ্চবিংশতি বৎসরে সৌন্দর্য্যের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়। কু[illegible] জাতির [illegible]কেরা বিংশতি বৎসর বয়সের ঊর্দ্ধে কচিৎ গর্ভধারণ ক[illegible]; এবং এমিন [illegible] বলেন যে, উনিওরো-প্রদেশে তিনি পঁচিশ বৎসর বয়[illegible] স্ত্রীলোকের [illegible]লের ছেলে' কখন দেখেন নাই। এই সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, অসভ্য জাতির পুরুষেরা প্রাপ্তযৌবনে প্রায় নিজের সম[illegible]স্কা স্ত্রী গ্রহণ করে। সুতরাং ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, পুরুষের যৌবনান্ত [illegible]ার ব[illegible] পূর্ব্বে তাহার স্ত্রী যৌবনের শেষ সীমা অতিক্রম করে, এবং সৌন্দর্য্য[illegible]াছে চিরবিদায় লয়। এমত স্থলে যাহা হইবার, তাহাই হয়,—অসভ্যেরা আবার কোন নবীনাকে বিবাহ করে।

বহুবিবাহের আর একটি প্রবল কারণ, অপত্যাকাঙ্ক্ষা, বিশেষতঃ পুত্রাকাঙ্ক্ষা। সভ্য, অর্দ্ধ-সভ্য, অসভ্য, অনেক জাতির মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষার অস্তিত্ব ও প্রবলতা পরিলক্ষিত হয়, এবং সেই জন্যই পূর্ব্বপরিণীতা পত্নীর

বন্ধ্যাত্ব অনেক স্থলে বহুবিবাহের একটি প্রধান কারণ। গ্রীনলণ্ডবাসীরা সন্তান না হইলে, বিশেষতঃ পুত্র না হইলে, সমাজে অপদস্থ হয়, সুতরাং প্রথমা স্ত্রী হইতে এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হইলে তাহারা অন্য স্ত্রী গ্রহণ করে। লাদাখের বোটি জাতির সম্বন্ধে কনিংহাম সাহেব ঠিক এই কথা লিখিয়াছেন। ইণ্ডো-চীনের মুংসা জাতির পুরুষেরা কেবল স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব স্থলেই দারান্তর গ্রহণ করিতে পায়। তুর্কি জাতির নিয়ম এই যে, যতদিন না পুত্রসন্তান জন্মে, ততদিন পুরুষ পুনঃ পুনঃ দারপরিগ্রহ করে; পুত্র জন্মিলে আর করে না। চীনে, টঙ্কুইনে এবং ছোটনাগপুরের মুণ্ডা কোলদিগের মধ্যে বন্ধ্যা স্ত্রী নিজেই অনেক স্থলে স্বামীকে দারান্তর গ্রহণ করিতে অনুরোধ করে। কিছু কাল পূর্ব্বে আমাদের দেশেও এ দৃশ্য সচরাচরই দৃষ্ট হইত; যে সকল স্থানে বিলাতি শিক্ষা ও সভ্যতা প্রবেশ করে নাই, সে সকল স্থানে আজিও দেখা যায়। পুত্রলাভই যে বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য, এই আর্য্য সংস্কার হিন্দুসমাজ হইতে বিলাতি ভাবের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে লোপ হইতেছে—'প্রেম' বলিয়া একটা কথার কথা ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যের স্থান অধিকার করিতেছে। কথার কথা বলিতেছি, কেন না যাঁহারা এই কথাটা প্রায় নিজস্ব করিয়া তুলিয়াছেন, এবং অত্যন্ত আড়ম্বর করিয়া ইহার দোহাই দিয়া থাকেন, তাঁহাদের 'প্রেমের' প্রকৃত অর্থ—রূপজ মোহ, যৌবনসুলভ কল্পনার খেয়াল, অথবা নির্জ্জলা এবং নির্লজ্জ স্বার্থপরতা। ভোগলালসাকে প্রেম বলিলে, 'প্রেম' কথাটার অপব্যবহার ও অবমাননা করা হয়। সে যাহা হউক, প্রাচী ভারতবর্ষে বন্ধ্যাত্ব অধিবেদনের একটা প্রধান কারণ ছিল, এখনও কতকটা আছে। চীনে, মিসরে এবং ইহুদীদিগের মধ্যেও এই রীতির অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

শুধু বন্ধ্যাত্ব কেন, ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা আরও কতকগুলি কারণে দারান্তরপরিগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

মদ্যপাসাধুবৃত্তা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ।
ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্যা হিংস্রার্থঘ্নী চ সর্ব্বদা॥

মনুসংহিতা।

ইহার অর্থ,—স্ত্রী যদি সুরাপায়িনী, ব্যভিচারিণী, সতত স্বামীর অভিপ্রায়ের বিপরীতকারিণী, চিররোগিণী, হিংস্রস্বভাবা ও অর্থনাশিনী হয়, তাহা হইলে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবে।

এতদ্ব্যতীত, স্ত্রী মৃতপ্রজা হইলে, কন্যামাত্রপ্রসবিনী হইলে, বা অপ্রিয়-

বাদিনী হইলে, দারান্তর-পরিগ্রহ শাস্ত্রানুসারে কর্ত্তব্য। এই সকল কারণের মধ্যে স্ত্রীর অপ্রিয়বাদিতাই শাস্ত্রকারগণ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন—

বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী॥
মনুসংহিতা।

অর্থাৎ, স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অষ্টম বর্ষে, মৃতপ্রজা হইলে দশম বর্ষে, কন্যামাত্র প্রসবিনী হইলে একাদশ বর্ষে, এবং অপ্রিয়বাদিনী হইলে কালবিলম্ব না করিয়া, অধিবেদন করিবে। আজকালকার 'পবিত্র প্রেমের' দিনে এই সকল ব্যবস্থা, বিশেষতঃ শেষোক্ত কারণে দারান্তরগ্রহণের ব্যবস্থা যে অতিমাত্র অশ্রদ্ধেয় ও নিষ্ঠুর ব্যবস্থা বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু স্বামীর প্রতি দুঃশ্রবকটূক্তিপরায়ণা স্ত্রী লইয়া যাহাকে ঘর করিতে হয়, তাহার জীবন যে জীবনব্যাপী নরক, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু আর্য্য-বিবাহ-ব্যবস্থার বিস্তৃত আলোচনা এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে।

অসভ্য ও কিঞ্চিদুন্নত সমাজে বহুবিবাহের আর একটা কারণ,—বহুবিবাহকারীর স্বসমাজে সম্মান, প্রতিপত্তি ও প্রভুত্বলাভ। এই সম্মান, মর্য্যাদা ও প্রভুত্বলাভ নানারকমে ঘটে।

এই প্রবন্ধের প্রথমাংশে বলিয়াছি যে, অসভ্যদিগের মধ্যে বহু স্ত্রী ক্ষমতা বা সঙ্গতির পরিচায়ক। ইহা হইবারই কথা। বহুসংখ্যক স্ত্রী এবং তাহাদের গর্ভজাত বহুতর সন্তানের ভার যে ব্যক্তি লইতে পারে, সে যে ক্ষমতাশালী বা সঙ্গতিসম্পন্ন, তাহা অসভ্যেরাও সহজেই বুঝিতে পারে। বিশেষতঃ বহুবিবাহপরায়ণ অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে দেখা যায় যে, পুরুষের পদমর্য্যাদা অনুসারে—সে পদমর্য্যাদা বংশমূলকই হউক, ক্ষমতামূলকই হউক, আর সঙ্গতিমূলকই হউক—স্ত্রীসংখ্যার ন্যূনাধিক্য হয়। আলুৎ জাতির মধ্যে যাহারা মৃগয়া-বিষয়ে দক্ষতম, স্ত্রীসংখ্যা তাহাদেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ব্রেজিলের আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে যাহারা প্রধান, তাহারাই কেবল বহুবিবাহ করে। ডেহমি প্রদেশ সম্বন্ধে ফর্ব্‌স্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, রাজার পত্নীসংখ্যা সহস্র সহস্র, অভিজাতবর্গের শত শত, মধ্যবিত্ত লোকের দশ কুড়িটা, এবং সৈনিক শ্রেণীর পুরুষের হয় ত একটাও না। এইরূপ সকল সমাজে বহুবিবাহের সহিত মর্য্যাদার ভাব, এবং একপত্নীত্বের সহিত হীনতা

ও নীচতার ভাব যে সংযুক্ত হইবে, ইহা ত পড়িয়াই আছে। সমাজ যাহাকে অভিজাত, সম্পত্তিশালী বা ক্ষমতাপন্ন বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহার সম্মান না করিবে কেন—না করিয়া কি থাকিতে পারে? সভ্য সমাজও ত এ দায় হইতে মুক্ত নহে। অসভ্য বা কিঞ্চিদুন্নত সমাজ যে এই সকল লোককে বিশেষ সম্মান করিবে, ইহা ত স্বতঃসিদ্ধের মধ্যে। ব্যানক্রফ্ট সাহেব আপাচি জাতির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, ইহাদের মধ্যে যাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক স্ত্রী, সেই সমাজ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গৌরবান্বিত ও সম্মানিত।

বহুবিবাহ সম্পত্তির পরিচায়ক ত বটেই, অনেক স্থলে সম্পত্তি অর্জ্জনের উপায়ও বটে। যে সকল অসভ্য জাতি এতটা উন্নত হইয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে কৃষিকার্য্য প্রচলিত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে বহু স্ত্রীর অর্থ—বহু উপার্জ্জন; কেন না, অসভ্যদিগের মধ্যে বীজবপন, ভূমিকর্ষণ, শস্যলালন ও কর্ত্তন প্রভৃতি কার্য্য স্ত্রীলোকেই করিয়া থাকে। তাহারাই শস্যোৎপাদন করে, তাহারাই গো-সেবা ও গো-দোহন করে, তাহারাই রন্ধন করে—তাহারাই প্রায় সব করে। মার্কো পোলো বলেন—তাতারদিগের মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্য পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের দ্বারা পরিচালিত হইত। সুতরাং, এ হিসাবে, যাহার যত অধিক স্ত্রী, সে তত সমৃদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবার কথা।

অসভ্য বা কিঞ্চিদুন্নত সমাজে বহুবিবাহকারীর প্রভুত্বলাভের একটা বিশিষ্ট কারণ আছে—সেইটাই বোধ হয় প্রধান কারণ। নিকটবর্ত্তী জাতির সহিত যুদ্ধই অনেক অসভ্য জাতির স্বাভাবিক অবস্থা। যুদ্ধই নিয়ম; শান্তি তাহার ব্যভিচার মাত্র। অনেক অসভ্যের মধ্যে, যে আপনার নহে, সেই শত্রু। এরূপ স্থলে, যাহার আপনার লোক অধিক, সেই যে শক্তিশালী হইবে, ইহা ত সহজেই বুঝা যায়। এখন বুঝিতে হইবে যে, যাহার স্ত্রীসংখ্যা অধিক, তাহার বংশজাত পুরুষের সংখ্যা অধিক ত হইবেই, জ্ঞাতি এবং আত্মীয়ের সংখ্যাও অধিক হইবে। সুতরাং অসভ্য সমাজে তাহার প্রাধান্য ও প্রভুত্ব অবশ্যম্ভাবী। বিশেষতঃ, যাহার স্বজন, জ্ঞাতি ও কুটুম্বের সংখ্যা অধিক, সে যে সমাজের রক্ষা ও উন্নতির জন্য অন্যের অপেক্ষা অধিক যত্নবান হইবে, ইহা সহজেই অনুমেয়। সমাজের অমঙ্গলে তাহার যত ক্ষতি, তত ক্ষতি অপরের হইতে পারে না। সুতরাং জাতীয়হিতসাধনে সে যে অন্যের অপেক্ষা অধিক যত্নবান হইবে, এ বিশ্বাস লোকের থাকে; এবং সেই জন্য

অকুণ্ঠিত ও বিশ্বস্ত চিত্তে তাহার হস্তে ক্ষমতা প্রদান করে। হিরিয়ট্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, উত্তর আমেরিকার কতকগুলি জাতির মধ্যে নেতৃত্ব-পদপ্রাপ্তি সাধারণের নির্ব্বাচনসাপেক্ষ, এবং এই নির্ব্বাচন, যাহার সন্তান-সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহারই অনুকূলেই হইয়া থাকে। চিপিওয়া জাতির সম্বন্ধে কিটিং সাহেব লিখিয়াছেন যে, পিতামাতার মর্য্যাদা তাহাদের অপত্যসংখ্যার উপর নির্ভর করে। এরূপ হইবার যে যথেষ্ট কারণ আছে, তদ্বিষয়ে একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। বস্‌মান্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, ফিদা প্রদেশের নিগ্রো নৃপতির অধীন একজন রাজপ্রতিনিধি, কেবলমাত্র আপন পুত্রপৌত্রাদি ও ক্রীতদাসদিগের সাহায্যে, এক জন পরাক্রান্ত শত্রুকে বিধ্বস্ত ও সমরক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল। বহুবিবাহকারীর ক্ষমতা ও প্রভুত্ব সমাজ মধ্যে কত হইবে, মনে কর দেখি।

এই সকল কারণে বহুবিবাহ-প্রথা প্রচলিত হয়। কিন্তু ইহাও দেখা যায় যে, নিতান্ত অসভ্যদিগের মধ্যে, অর্থাৎ মনুষ্য-জীবনের প্রাথমিক অবস্থায়, বহুবিবাহ নাই। মানুষ কথঞ্চিৎ উন্নত না হইলে বহুবিবাহপরায়ণ হয় না। আবার, মানুষ সমধিক উন্নত হইলে, বহুবিবাহপ্রথা ত্যাগ করিয়া পুনরায় একপত্নীমূলক বিবাহ-প্রণালী অবলম্বন করে। বিবাহপ্রণালীর এইরূপ পরিবর্ত্তন ও পরিণতি কিরূপে হয়, সে কথা প্রবন্ধান্তরে বলিব।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

পরাধীনতা।

হিন্দুজাতির পরাধীনতা কেন ঘটিল, এই প্রশ্নের নানাবিধ উত্তর ইতিহাস-গ্রন্থে প্রচলিত আছে।

কেহ বলেন, হিন্দুরাজারা এজন্য দায়ী। জয়চন্দ্র মুসলমানকে ডাকিয়া আনিয়া প্রথম কীর্ত্তি রাখিয়া যান। লক্ষ্মণ সেন মুসলমানের সঙ্গে লড়াই কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন নাই, ইত্যাদি।

এই উত্তরে সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। দুই একটা লোকের দোষে এত বড় একটা ঐতিহাসিক বিপ্লব সংঘটিত হওয়া সম্ভব নহে। প্রকৃত কারণ নির্ণয়

করিতে হইলে আরও মূলে গিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে। বড় বড় ঐতিহাসিক ঘটনার তথ্যনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে জাতীয় প্রকৃতির সম্বন্ধে আলোচনা আসিয়া পড়ে। অবশ্যই সেই সময়ে হিন্দুগণের জাতীয় প্রকৃতিতে এমন একটা কিছু ঘটিয়াছিল, যাহাতে পরাধীনতার পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল। জাতীয় প্রকৃতির শোচনীয় অবনতি না ঘটিলে সহজে পরাধীনতা ঘটে না। নিশ্চয়ই কোন আভ্যন্তরীণ মূল কারণে সেই সময়ে ভারতবাসীর জাতীয় চরিত্র অধঃপতিত হইয়াছিল। পরের আক্রমণে বাধা দিবার বা পরের আক্রমণ সহিয়া লইবার শক্তি তখন হিন্দুজাতির ছিল না। তাহাতেই মুসলমান এত সহজে ভারতবাসীকে পদানত করিয়া ফেলিয়াছিল।

বস্তুতই জাতীয় চরিত্রের ভয়াবহ অবনতি ব্যতীত এরূপ পরাজয় বা পরাধীনতা ঘটে না। সে পরাজয়ই বা আবার কেমন! জয়চন্দ্র কর্তৃক নিমন্ত্রণ-ব্যাপারের পূর্ব্বেই হিন্দুর সহিত মুসলমানের যথেষ্ট পরিচয় ছিল। তাহারও তিন শত বৎসর পূর্ব্বে মুসলমানেরা কিছু দিন সিন্ধুদেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছিল। হিন্দুদিগের দেবতার উপর ও হিন্দু গৃহস্থের স্ত্রীকন্যার উপর মুসলমান কিরূপ সদয় ব্যবহার করিতেন, তাহা হিন্দুগণ সেই কয়-দিনেই জানিতে পারিয়াছিলেন। ঠাণ্ডা রক্ত গরম করিবার জন্য যে সকল ইন্ধন আবশ্যক, মুসলমান-কৃত ব্যবহারে তাহার কিছুরই অভাব ছিল না। অথচ তাহাতেও হিন্দুর রক্ত গরম হয় নাই, একবারে তুষারের মত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। সিন্ধুদেশ হইতে মুসলমান বিদূরিত হইবার পরও গজনীপতি কয়েকবার ভারতবর্ষে আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই অভ্যাগত মহোদয়ের এক একবার সৎকার-ব্যাপারে যে ব্যয়-বিধানের ঘটা ইতিহাসে বর্ণিত দেখা যায়, তাহাতে অদ্যাপি বাঙ্গালী-হৃদয় দুরু দুরু কম্পিত হইয়া থাকে; এবং যখন শোনা যায়, এ হেন অতিথিকে দলবলে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে একজন হিন্দু রাজা সঙ্কোচ বোধ করেন নাই, এবং আর একজন হিন্দু রাজা আপনার রাজ্যভার ও অধীন প্রজাবর্গের মানসম্ভ্রম ও ধনপ্রাণ তাঁহাদের হস্তে বিনা বাক্যব্যয়েই সমর্পণ করিয়া আপনার জরাজীর্ণ অস্থি কয়খানির ও ভুক্তাবশিষ্ট প্রাণটুকুর কল্যাণপ্রার্থী হইয়াছিলেন, তখন জাতীয় অবনতি যে নিম্নতম সোপানে উপস্থিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণমাত্র জন্মে না।

সুতরাং এই তত্ত্বনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইতে হইলে জাতীয় দুর্গতিরই কারণ-

নির্দ্দেশ আবশ্যক হইয়া পড়ে, এবং তত্ত্বান্বেষী ঐতিহাসিকমাত্রেই এই জাতীয় প্রকৃতির অধোগতির একটা না একটা মৌলিক কারণ দেখাইয়াছেন।

বলা বাহুল্য, ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন কারণ দেখাইয়া দিলেও সেই সমস্ত একটা খাঁটি কথাতে শেষ পর্য্যন্ত গিয়া দাঁড়ায়, এবং আমাদের বৈদেশিক ও স্বদেশীয় সমুদয় ঐতিহাসিকগণ প্রায় একবাক্যেই সেই কথার সমর্থন করেন। কথাটা পাঁচ জনে পাঁচ রকমে সাজাইয়া বলেন, এবং আপন আপন বুদ্ধির হাপরে বিবিধ মর্ম্মভেদী যুক্তির হাতিয়ার বানাইয়া লইয়া তৎপ্রয়োগে ইতিহাসের শরীরকে ছিন্দন, ভিন্দন, কৃন্তন ও বিশ্লেষণ করিয়া অভ্যন্তর হইতে মূল সত্যকে টানিয়া বাহির করেন। এক কথায়, হিন্দুর যত দুর্গতির মূল—হিঁদুয়ানি ও হিঁদুয়ানীর প্রতিষ্ঠাতা ও রক্ষাকর্ত্তা ব্রাহ্মণঠাকুর।

ফলে, ঋগ্বেদের বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের দ্বন্দ্বের সময় হইতে পুনার র‍্যাণ্ড সাহেবের হত্যাকাণ্ডের দিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ যে একটা প্রকাণ্ড ও গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া আছে, অনাদি অনন্ত মহাকালের আদি ও অন্ত থাকিতে পারে, কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের আদি আবিষ্কার করিতে পারা যায় না ও অন্তেরও কোন উপস্থিত সম্ভাবনা নাই, ইহা বৈদেশিকগণের এবং আমাদের স্বদেশীয় শিক্ষিতগণের নির্দ্ধারিত অবিসংবাদিত সত্য; এবং এই ষড়যন্ত্র হইতেই ভারতবর্ষে হিন্দুজাতির যত কিছু দুর্গতি, দুঃখ ও যন্ত্রণা। এক কালে হিন্দুজাতি অত্যন্ত উন্নতি লাভ করিয়াছিল, এবং সেই উন্নতি আবহমান-কাল চলিতে পারিত, কিন্তু দুষ্ট ব্রাহ্মণের কূট চেষ্টা পদে পদে সেই উন্নতির গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে ও অবশেষে হিন্দুজাতিকে কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখর হইতে নেপালের তরাইভূমিতে নামাইয়া আনিয়া হাঁফ ছাড়িয়া প্রসাদ লাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণই প্রাচীন ভারতের যত দুর্দ্দশার মূল।

এতগুলি বুদ্ধিমান্ লোকে একবাক্যে যাহা বলেন, তাহা মানিতে আমরা বাধ্য; তবে ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে ব্রাহ্মণকে পুঁছিয়া ফেলিলে কি অবশিষ্ট থাকে, তাহার কোন ঠাহর পাই না; এবং বাকী যাহা থাকে, তাহার উন্নতিই বা কি আর অবনতিই বা কি, তাহাও বুঝিতে পারি না।

বুঝি আর না বুঝি, ব্রাহ্মণের দুরন্ত শাসননীতিতে ভারতের জাতীয় জীবন যে একবারে কণ্ঠে আসিয়া পড়িয়া কেবল উড্ডয়নের অপেক্ষামাত্র করিতেছিল, তাহা যুক্তিপ্রয়োগে তন্ন তন্ন বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে

পারা যায়ঃ এবং যে পণ্ডিতই দুর্ভাগ্য ভারতের অধঃপতনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে বসেন, তিনিই এই ঐতিহাসিক ঘটনার মুখ্য কারণগুলি একে একে গণিয়া দিতে সঙ্কোচ করেন না।

কিন্তু এইখানে একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিতে হইতেছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে পুনঃপুনঃ অধঃপতন ও অবনতির কথা উল্লেখ করাটা ঠিক হইতেছে কি না, তাহা লইয়াই তর্ক উঠিতে পারে। কেন না, বিলাতের "টাইমস্" পত্র সম্প্রতি বলিয়াছেন, আমরা এক কালে উন্নত ছিলাম, এখন অবনত হইয়াছি, ইহা মনে করাও আমাদের পক্ষে ঐতিহাসিক ভ্রম ও মহাপাপ। কিন্তু বর্ত্তমান প্রস্তাবে একালের কোনও কথা আলোচিত হইতেছে না। একালে আমরা হিমালয়ের শিখরদেশে কেন, রাজা হরিশ্চন্দ্রের মত একবারে বিমানমার্গে উন্নীত হইয়াছি, সে বিষয়ে যেমন কোনও সংশয় নাই, মুসলমানের সময়েও সেইরূপ আমাদের দুর্দ্দশার পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল, ইহাও তেমনি স্বতঃসিদ্ধ বাক্য।

প্রাচীন ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণের শাসননীতির বিশ্লেষণ করিয়া আমাদের অবনতির কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কারণ পাওয়া যায়। এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর আরম্ভে সেই কারণগুলি পুঞ্জীভূত হইয়া হিন্দুস্থানের অবস্থা ঠিক্ এইরূপ করিয়া তুলিয়াছিল যে, তখন মুসলমানের আগমন ও তৎকর্তৃক আমাদের পরাজয় অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রথম—ব্রাহ্মণেরা সমুদয় বিদ্যা একটা সিন্ধুকের মধ্যে পুরিয়া তাহার চাবি আপন হস্তে রাখিয়াছিলেন। জনসাধারণ বিদ্যার আলোকে বঞ্চিত হইয়া মূর্খতার আঁধারে হাবুডুবু খাইতেছিল।

দ্বিতীয়—মূর্খতা হইতে কুসংস্কারের উৎপত্তি হয়। ব্রাহ্মণেরা আপনাদের চালকলার সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য সেই কুসংস্কারগুলির প্রশ্রয় দিতেছিলেন, এবং নানাবিধ কুপ্রথার ও উপধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া জনসাধারণের সমবেত আত্মাকে জড়ীভূত ও নিশ্চেষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন।

তৃতীয়—ব্রাহ্মণেরা জনসাধারণের পায়ে যে অধীনতার শিকল পরাইয়া দিয়াছিলেন, এবং তাহাদের প্রতি যে অত্যাচার ও নির্য্যাতনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, বিধর্ম্মীর অধীনতা ও অত্যাচারও তাহার নিকট সুখের বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।

চতুর্থ—ব্রাহ্মণেরা জাতিভেদের সৃষ্টি করিয়া বিবিধ জাতির মধ্যে পরস্পর

বিবাদ লাগাইয়া দিয়াছিলেন ও তাহাদের পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষের বহ্নিতে কেবলই ইন্ধনপ্রয়োগ করিয়া আমোদ দেখিতেছিলেন। গৃহবিবাদে হীনবল সমাজের পরের আক্রমণ সহিবার ক্ষমতা থাকে না।

পঞ্চম—ব্রাহ্মণের অনুমোদিত কন্যাবিবাহাদি সামাজিক কুপ্রথায় সমগ্র জাতি হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিল।

এইরূপে ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ইত্যাদিক্রমে কারণের সংখ্যা ক্রমেই বাড়াইতে পারা যায়, এবং সকলেরই মূলে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণপ্রবর্তিত সর্ব্বনাশকর জাতিভেদ।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এততেও মনের তৃপ্তি জন্মে না। যেন আরও একটা কিছু অভাব রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

মুসলমান কর্ত্তৃক হিন্দুস্থান-জয় ব্যাপারের ঐতিহাসিক বিবরণ দেখিলে একটা মোটা ঘটনা সহজে ধরা পড়ে। হিন্দুস্থানে সে সময়ে বড় রাজা কেহ ছিল না, এবং দিল্লীপতি কতকটা ছোটখাট সাম্রাজ্য-স্থাপনে যত্নপর হইয়াছিলেন, এবং তিনিই মুসলমানের সঙ্গে কিছু দিন লড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারই সাম্রাজ্যস্থাপনের চেষ্টাতেই সর্ব্বনাশের বীজ অঙ্কুরিত হয়।

ভারতবর্ষ তখন কতকগুলি রাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ইহারা একত্র দল বাঁধিয়া মুসলমানের বিরুদ্ধে দাঁড়ান নাই; যিনি একা দাঁড়াইতে সাহস করিয়াছিলেন, তিনি সেই প্রচণ্ড প্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছিলেন।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য এই, হিন্দু রাজার সহিত স্থানবিশেষে মুসলমানের লড়াই ঘটিয়া থাকিলেও হিন্দু প্রজা সেই লড়াইয়ে একবারে যোগ দেয় নাই। তাহারা নীরবে ও নির্ব্বিবাদে এই রাজনৈতিক বিপ্লব চক্ষুর সম্মুখে ঘটিতে দেখিল। স্বয়ং মুখ ফুটিয়া একটা উচ্চ কথা কহিল না। মুসলমান হিন্দুর রাজসিংহাসন দখল করিয়া তাহাদের দেবমন্দির ভাঙ্গিল, তাহাদের জাতি ধর্ম্ম লইয়া টানাটানি করিল, তাহাদের ধনমান অপহরণ করিতে লাগিল;—রাজা তাহাদের রক্ষণে সমর্থ হইলেন না। কিন্তু তাহারা স্বয়ং একটা দল বাঁধিয়া এ বিষয়ে কোনরূপ বাধা দেওয়া বা আপত্তি করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিল না।

হিন্দু প্রজার প্রকৃতিতে এ বিষয়ে একটু অসাধারণত্ব আছে। অন্য দেশে

জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রজা স্বয়ং সচেষ্ট থাকে, বিদেশী শত্রু উপস্থিত হইলে কেবল রাজার মুখাপেক্ষা করিয়া থাকে না। রাজাকে যথাসাধ্য শত্রু-দমনে সাহায্য করে; এবং রাজা যখন নিজে পরাস্ত হয়েন, তখন প্রজা স্বয়ং কোমর বাঁধিয়া অবতীর্ণ হইয়া অন্ততঃ একবার শেষ চেষ্টা করিয়া লয়। আমাদের দেশের ইতিহাস অন্যরূপ। এখানে রাজনৈতিক বিপ্লবের সময় প্রজা নির্ব্বিকারচিত্ত। সে সময়ে তাহার নিজের যে একটা কর্ত্তব্য আছে, তাহা সে অনুভবই করিতে পারে না। যুদ্ধ করিয়া দেশ রক্ষা রাজারই কর্ত্তব্য, তাহাতে আমাদের যে কোন দায়িত্ব আছে, তাহা আমরা বুঝি না। রাজা আপন সিংহাসন রাখিতে পারেন ভাল, তিনি সুখে থাকুন। অপরে আসিয়া যদি তাঁহার রাজছত্র কাড়িয়া লয়, ভাল, তাহাই হউক, আমরা নূতন রাজাকে খাজানা দিব, এবং তাঁহার বিধিব্যবস্থা পালন করিব। ভাবটা এইরূপ।

ভারতবাসীর নিকট রাজনৈতিক বিপ্লব কতকটা দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প ও ঝড়ের মত সম্পূর্ণ দৈবনির্দ্দিষ্ট ঘটনা। দৈব উৎপাত উপস্থিত হইলে মরিতে হয় ও সহিতে হয়, তাহার প্রতিবিধান মনুষ্যের সাধ্য নয়। রাজার পরিবর্ত্তনও কতকটা সেইরূপ। রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইলে তাহাও সহিতে হইবে ও স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। তাহাতে ধন প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়ে, নাচার। দৈব ঘটনার আবার প্রতিবিধান কি? যাহাকে আধুনিক ভাষায় রাজনৈতিক জীবন বলে, স্বদেশভক্তি জাতীয় ভাব প্রভৃতি যাহার লক্ষণ, ভারতবাসীর সেই জীবনটা একেবারে নাই।

আর সেকাল হইতে আজি পর্য্যন্ত ভারতবাসীর প্রকৃতি ঠিক সেইরূপই রহিয়াছে। ভারতের প্রজা ভারতের রাজাকে খাজানা দেয়, সম্মান করে ও তাঁহার আজ্ঞামতে চলে। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যবিপর্য্যয়ে সে সম্পূর্ণ উদাসীন। মুসলমানের হাত হইতে যখন রাজশক্তি ইংরাজের হাতে গেল, তখনও ভারতীয় প্রজা তাহাতে অণুমাত্র বিচলিত হয় নাই; তাহার মনে তজ্জন্য কোন দুঃখের উদয় বা আনন্দের উদয় হয় নাই। দেশের মধ্যে যে একটা ওলট-পালট ঘটিয়া গেল, বিশ কোটির মধ্যে উনিশ কোটি লোক, বোধ হয়, তাহার কোন সংবাদ রাখাও দরকার বোধ করে নাই। মুসলমানের কর্ম্মচারী খাজানা আদায় করিতে আসিত আমরা আপত্তি না করিয়া খাজানা দিতাম; এখন ইংরাজের কর্ম্মচারী খাজনা আদায় করিতে আসে, আমরা তাহার

হাতে খাজানা দিই। তাহার খাজানাগ্রহণের অধিকার আছে কি না, জিজ্ঞাসার দরকার হয় না।

এই রাজনৈতিক জীবনের অভাবের কতকগুলা স্থূল লক্ষণ দেখা যায়। এ দেশে রাজায় প্রজায় কখনও বিরোধ নাই; আবার রাজায় প্রজায় সহানুভূতি বা স্বার্থের টানও নাই। রাজা যিনিই হউন, তাঁহাকে খাজানা দিতে আপত্তি করিতে নাই—তাঁহার আদেশ মানিয়া চলা উচিত। তিনি সুখে রাখেন—সুখের বিষয়; তিনি নিগ্রহ করেন—তথাস্তু। দুঃখের বিষয় বটে, কিন্তু রাজকৃত অত্যাচারের আবার প্রতিবাদ কি? তাহা হইলে ত ভূমিকম্প ও মারীভয়েও প্রতিবাদ আবশ্যক হইতে পারে। উভয়েরই পক্ষে কোন যুক্তি নাই। ইংরাজ নূতন রাজা হইয়া আমাদিগকে আরামে রাখিয়াছেন, পরম সৌভাগ্য; আমরা ইংরাজকে আশীর্ব্বাদ করিব। ইংরাজ যদি অত্যাচারই করিতেন, তাহা হইলেও আমরা তাহা সহিতাম। বিধাতার বিধান,—মানুষে কি করিবে?

আর একটা লক্ষণ এই। আসমুদ্র হিমাচল আমাদের স্বদেশ। হিমাচলের ও পারে ও সমুদ্রের পারে ম্লেচ্ছভূমি; সেখানে আমাদের যাইতে নাই ও সে দেশের সংবাদগ্রহণের কৌতূহলও অস্বাভাবিক। সে সকল দেশে ম্লেচ্ছ বাস করে ও হয় ত গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধরাদিও লীলাখেলা করিয়া থাকে। তাহাদের কাজকর্ম্ম আহারব্যবহার জানিয়া আমাদের কোন ফল নাই। কিন্তু হিমাচল হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত এই দেশ টুকু আমাদের। কামরূপ হইতে সিন্ধুতট পর্য্যন্ত এবং হরিদ্বার হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত আমাদের ধর্ম্মকর্ম্মের স্থান, এই দেশে আমাদের দেবমন্দির, আমাদের তীর্থস্থল সমস্ত ছড়াইয়া রহিয়াছে।

আমাদের স্বজাতি স্বধর্ম্ম আত্মীয় সজ্জন সকলেই এই পরিধির মধ্যে বাস করে। কিন্তু তাই বলিয়া বিধর্ম্মী আসিয়া পঞ্জাব আক্রমণ করিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালীর মাথাব্যথার প্রয়োজন কি? অথবা বাঙ্গালী বিধর্ম্মীর পদানত হইল, তাহাতে মহারাষ্ট্রের কি আসে যায়?

জাতীয়তার ও রাজনৈতিক জীবনের যে সমস্ত লক্ষণ, এ দেশে তাহার কিছুই নাই। কোন কালে যে ছিল, তাহারও প্রমাণ বর্ত্তমান নাই। রাজা নিগ্রহ করিলে তাহার প্রতিবাদ করা যেমন আমরা আবশ্যক বোধ করি না, রাজার বিপদ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে সাহায্যদানও তেমনি অনাবশ্যক বোধ করি। রাজা প্রজা হইতে অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থিত। রাজলোক কতকটা দেবলোকের

মত পুণ্যস্থানীয়। সেখানে কি যায় কি আসে, তাহা আমাদের কৌতূহলের বা অনুসন্ধিৎসার বিষয় হইতে পারে না। সেখানকার ব্যবহারের উপর আমাদের কোন হাত নাই। সত্য বটে, আমাদের শুভাশুভ রাজলোক হইতে অনেক সময় নির্দ্ধারিত ও নিয়মিত হইয়া থাকে; কিন্তু আকাশে গ্রহগণের গতায়াত বা দেবলোকে দেবগণের গতিবিধিও আমাদের শুভাশুভের নিয়ামক। গ্রহের ফের ও দেবতার ইচ্ছা যেমন আমরা নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিতে বাধা, রাজলোকে বিহিত ব্যবস্থাও তেমনি মানিয়া লইতে ও গ্রহণ করিতে বাধ্য রহিয়াছি।

কিন্তু অন্য দেশের ইতিহাস ঠিক এমন নহে। সেখানে রাজা প্রজার সম্বন্ধ অন্যরূপ। রাজায় প্রজায় এমন সখ্যসৌহার্দ্য নাই। কথায় কথায় প্রজা রাজার কৈফিয়ৎ চাহিয়া থাকে। রাজা ঘাড় নাড়িলে প্রজা শিং নাড়া দেয়, রাজা ভ্রূভঙ্গী করিলে প্রজা দাঁত দেখায়। সময়ে সময়ে রাজাকে জেলে দেয়, অথবা রাজার উত্তমাঙ্গের সহিত নিম্নদেহের যোগাকর্ষণ পরীক্ষা করিয়া দেখে। কিন্তু আবার বৈদেশিক আসিয়া রাজাকে আক্রমণ করিলে তখন তাহারা রাজ্যের বিপদ বা নিজের বিপদ ভাবে; তখন তাহারা দল বাঁধিয়া অস্ত্র হাতে রাজাকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়, রাজার ও তাঁহার বেতনভুক সৈন্যের বাহুবলের অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে না। বৈদেশিককে রাজার সহিত লড়াই করিতে হয় না, তাঁহার লড়াই প্রজার সহিত। রাজা সেখানে প্রজার সহায়মাত্র, অথবা প্রজার নির্দ্দিষ্ট বিশ্বস্ত সেনাপতিমাত্র।

তাহার সেই জাতীয়ভাবের লক্ষণ কি? যতদিন বহিঃশত্রুর আশঙ্কা না থাকে, সে ততদিন রাজ্যের মধ্যে অহর্নিশ রাজার সঙ্গে দ্বন্দ্বে নিযুক্ত থাকে। অহর্নিশ দ্বন্দ্ব—উৎকট কলরব। রাজায় প্রজায় নিয়ত অবিশ্রান্ত মল্লযুদ্ধ—কে কাহাকে হঠায়? ইউরোপের ইতিহাসই এই। রাজা সময়ে সময়ে প্রজাকে দলিত করেন; প্রজা কখন দলিত সর্পের মত গর্জ্জাইয়া রাজাকে দংশন করে। যাহারা সামাজিক ও শান্ত, তাহারা রাজাকে বুঝাইতেছে, থামাইতেছে, শাসাইতেছে; যাহারা সমাজদ্রোহী ও দুরন্ত, তাহারা রাজার ও রাজমন্ত্রীর মুণ্ডপাতের জন্য গভীর রাত্রে ষড়যন্ত্র করিতেছে। ভারতের প্রজা সর্ব্বব্যাপী দুর্ভিক্ষ ঘটিলে লক্ষ হিসাবে ও কোটি হিসাবে নির্ব্বাক্‌ভাবে মরিতে থাকে, ইউরোপের প্রজা এক বেলা উদর তৃপ্ত না হইলে রাজার অভ্যর্থনার জন্য ডাইনামাইট সংগ্রহ করে। এই গেল এক দিক। অন্য দিকে যখন আবার

বাহিরের শত্রু আসিয়া রাজ্য আক্রমন করে, প্রজা তখন দলে দলে রাজার পাশে আসিয়া দাঁড়ায়, এবং রাজা যদি পরাস্ত হয়েন, তখন তাঁহার হস্ত হইতে শাসনদণ্ড স্বয়ং গ্রহণ করিয়া তাহা শত্রুর বিরুদ্ধে পরিচালিত করে। ভারতের প্রজা শান্তির সময় রাজাজ্ঞা অবহিতভাবে পালন করে, কিন্তু রাজার নাম পর্য্যন্ত জানিবার আগ্রহ দেখায় না; আবার এক রাজার হাত হইতে যখন রাজদণ্ড স্খলিত হইয়া অপরের হাতে যায়, তখন নির্ব্বাক নিস্পন্দভাবে চাহিয়া দেখে। ইউরোপের প্রজা শান্তির সময় রাজার প্রত্যেক কথার ও প্রত্যেক কার্য্যের কৈফিয়ৎ না লইয়া চলে না, কিন্তু বিগ্রহের সময় ও বিপ্লবের সময় সে স্বয়ং রাজার আসনে আসিয়া দাঁড়ায়।

কেন এমন হইল? ইতিহাস কি এ কথার উত্তর দিতে সমর্থ নহে? কেবল দুষ্ট ব্রাহ্মণের উপর দোষ চাপাইয়া দিলে প্রশ্নটার প্রতি সুবিচার হইল, বোধ হয় না।

আমার সময়ে সময়ে মনে হয়, এই প্রশ্নের কতকটা এইরূপ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। ইউরোপে ও ভারতবর্ষে এই পার্থক্যের প্রধান কারণ, ইউরোপে প্রজা চিরকাল ধরিয়া পরাধীন ও ভারতবর্ষের প্রজা চিরকাল ধরিয়া স্বাধীন।

উত্তরটা নিতান্তই হেঁয়ালিগোছের হইয়া পড়িল। সাধারণতঃ শুনা যায়, ইউরোপের প্রজা স্বাধীন ও ভারতের প্রজাই চিরপরাধীন। ইউরোপে এক হিসাবে আবহমান কাল হইতে প্রজাতন্ত্র-শাসননীতি চলিতেছে; ভারতে হিন্দুরাজার সময়েও রাজশক্তি যথেচ্ছাচারপদ্ধতিক্রমে চালিত হইত। ইহাই ইতিহাসের সর্ব্ববাদিসম্মত কথা। কিন্তু এই প্রচলিত মীমাংসার বিরুদ্ধ একটা কথা যখন বলিয়া ফেলিয়াছি, তখন তাহার সমর্থন আবশ্যক; ভাষাশাস্ত্র ও যুক্তিশাস্ত্রকে টানিয়া বুনিয়া যেমন করিয়া হউক সমর্থন করিতে হইবে।

পরাধীন ও স্বাধীন শব্দ দুইটা একটু বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করিয়াছি। আমি হিন্দুর রাজ্যে বা মুসলমানের রাজ্যে কি খৃষ্টানের রাজ্যে বাস করি, তাহা দেখিয়া আমার স্বাধীনতার পরিমাপ হইবে না। আমার নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনের কতখানি রাজার অধীন ও কতখানি আমার নিজের অধীন; জীবনের কতগুলা কাজ রাজার হুকুমে সম্পাদন করিতে হয়, আর কতগুলা কাজই বা আমার ইচ্ছামত সম্পাদন করিতে পারি, তাহা দেখিয়াই আমার

স্বাধীনতার মাত্রা স্থির করিতে হইবে। আমি বলিতে চাহি যে, এই হিসাবে সেকালের ভারতবাসী একালের ইউরোপীয়ের অপেক্ষাও অধিকতর স্বাতন্ত্র্য সম্ভোগ করিয়াছে।

ইউরোপের ইতিহাস ধারাবাহিক সূত্রে আলোচনা করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? রোম নগরীর সম্প্রসারণ হইতে ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাসের আরম্ভ। গ্রীস অন্যান্য বিষয়ে ইউরোপীয় সভ্যতার জননী হইলেও রাজনীতিবিষয়ে গ্রীসের সহিত আধুনিক ইউরোপের তেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। রোমে রাজা ছিল না, কিন্তু প্রজার সমবেতশক্তি রাজার স্থানে কার্য্য করিত। রোম ক্রমে দেশের পর দেশ গ্রাস করিয়া আপনার কলেবর সম্প্রসারিত করিতে লাগিল, এবং যেখানে যাহাকে পাইল, সকলকেই এক আইনের অধীন করিয়া, সকলকেই সমান রাজনৈতিক ক্ষমতা দিয়া, সমান অর্থে রোমান করিয়া ফেলিল। ইউরোপের সমগ্র দক্ষিণ ভাগে, আফ্রিকার উত্তর ভাগে ও এসিয়ার পশ্চিম ভাগে যে যেখানে ছিল, সকলেই বিভিন্ন বর্ণ, বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন আচার লইয়াও খাঁটি রোমক হইয়া উঠিল, এবং অবশেষে এক জন বা বহু জন সেনানীর হাতে প্রভুশক্তি অর্পণ করিয়া রোমের বিশাল কলেবর পার্শ্বস্থ শত্রুগণের গ্রাস হইতে রক্ষায় প্রয়াসী থাকিল। মহাসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল বটে; কিন্তু একটা মহাজাতির সৃষ্টি হইল না। রোমের অভ্যুদয়-কালে যে জাতীয় ভাবের, রাষ্ট্রের হিতের জন্য ব্যক্তিগত হিত-পরিহারের জন্য ব্যগ্রতার যেমন উদাহরণ মিলে, রোম যখন প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যে পরিণত হইল, তখন আর তেমন উদাহরণ পাওয়া যায় না। সাম্রাজ্য জমাট বাঁধিল না। ব্যক্তিমাত্রেই রোমক, কিন্তু মহারোমক জাতির প্রতিষ্ঠা হইল না। উত্তরদেশীয় বর্ব্বরগণ সাম্রাজ্য-মধ্যে প্রবেশ করিয়া সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল। যেমন উন্নতি, তদুপযোগী পতন! সেই ভয়ানক বিপ্লবে ইউরোপের ইতিহাসের প্রাচীন পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইয়া নূতন পরিচ্ছেদ আরব্ধ হইল। এই নূতন পরিচ্ছেদের আরম্ভে আমরা কি দেখিতে পাই? এক এক সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ ভূখণ্ডে এক একটা নূতন সঙ্কীর্ণ জাতির প্রতিষ্ঠা হইতেছে। নূতনে পুরাতনে মিশিয়া গিয়া পুরাতন ভাঙ্গিয়া নূতন মশলায় পুরাতন ইটের বাঁধন দিয়া নূতন ঘর নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই নূতন পরিচ্ছেদে দুইটি নূতন ঘটনার অবতারণা দেখা যায়।

প্রথম, পূর্ব্বে যে একটা বিশাল সাম্রাজ্য ছিল, তাহার মধ্যে কাহারও পর-

স্পর বিবাদ বিসংবাদের উপায় ছিল না। রোমক তাহার অসংখ্য শত্রুর সহিত লড়াই করিতে বাধ্য হইত, রোমক সেনানী রোমক সেনানীর সহিত লড়াই করিত; কিন্তু রোমক প্রজা কথনও রোমক প্রজার সহিত লড়াই করে নাই। কিন্তু এই নূতন অধ্যায়ের সূচনায় ইউরোপ কতিপয় খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইল; তাহাদের পরস্পরের মধ্যে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ; সেই যে রণকোলাহলের আরম্ভ হইয়াছে, আজ পর্য্যন্ত তাহা থামে নাই; নবম শতাব্দীর আরম্ভে পশ্চিম ইউরোপে রোমসাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; কিন্তু সে কেবল নামে সেই নূতন প্রতিষ্ঠায় আভ্যন্তরীণ বিগ্রহ-ব্যাপার, রাজার সহিত রাজার, রাজ্যের সহিত রাজ্যের, জাতির সহিত জাতির ভীষণ জীবনদ্বন্দ্ব-নিবারণে সমর্থ হয় নাই, এবং সহস্রবৎসরব্যাপী প্রযত্নের বিফলতার ফলে এই উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভেই রোমের শেষ সম্রাট্ রোম-সাম্রাজ্যের নাম পৃথিবীর ইতিহাস হইতে তুলিয়া দিতে সম্মত হইলেন।

দ্বিতীয়,—রোমে রাজা ছিল না; খ্রীষ্টজন্মের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে রোমের শেষ রাজা তার্কুইন সিংহাসন হইতে তাড়িত হয়েন; এবং খ্রীষ্টজন্মের আট শত বৎসর পরে জর্ম্মনির রাজা পোপের হস্ত হইতে সাম্রাজ্যের মুকুট গ্রহণ করিয়া ভাঙ্গা ইট জুড়িয়া নূতন অট্টালিকানির্ম্মাণের চেষ্টা করেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘকালমধ্যে রোমে রাজা ছিল না। যিনি সম্রাটের মুকুট ধারণ করিতেন, তিনি রোমক জনসাধারণের বিশ্বস্ত ও মনোনীত ভৃত্য ও সেনানীমাত্র ছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের এই নূতন পরিচ্ছেদে প্রত্যেক রাজ্যে এক একজন স্বতন্ত্র দণ্ডধর রাজার অভ্যুদয় দেখিতে পাই। তিনি রাজা বলিয়া রাজা নহেন;—তিনি বৈদেশিক, বিধর্ম্মী, বিজেতা, অস্ত্রধারী, শাসক, পালক, প্রজার বাহুজীবন ও অন্তর্জীবনের নিয়ামক রাজা। রাজার প্রথম কাজ, প্রতিবেশী রাজার সহিত যুদ্ধ;—প্রজার অর্থব্যয়ে ও প্রজার শোণিতব্যয়ে, আপন স্বার্থের জন্য। রাজার দ্বিতীয় কাজ, প্রজার নিপীড়ন, প্রজার ভৌতিক ও আত্মিকজীবনের স্বাতন্ত্র্যের সম্পূর্ণ বিলোপসাধন করিয়া আপনার সর্ব্বতোমুখী প্রভুশক্তির স্থাপনার জন্য, আরম্ভে কিছুদিন ধরিয়া শৃঙ্খলমুক্ত বর্ব্বরতা; তখন প্রাচীন রোমসাম্রাজ্যের অট্টালিকা ভাঙ্গিতেছে। ইউরোপের সেই তামস যুগ। পরে নূতন ইতিহাসের নূতন পরিচ্ছেদের আরম্ভ—নূতন নূতন খণ্ডরাজ্য তখন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইউরোপের এই মধ্যযুগ। এই সময়ে সুবিখ্যাত ফিউডাল তন্ত্রের উৎপত্তি।

ফিউডাল তন্ত্রের অর্থ কি? নবাগত বিজেতা বৈদেশিক রাজা আসিয়া প্রজার সমস্ত ভূসম্পত্তি একবারে আত্মসাৎ করিলেন। তার পর সেই ভূসম্পত্তি আপনার আশ্রিত ও অনুগতগণকে বণ্টন করিয়া দিলেন। রাজা দাতা ও প্রজা গ্রহীতা। দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে একটা চুক্তি নির্দ্দিষ্ট হইল। দাতা প্রতিবেশীর সঙ্গে চিরদিন যুদ্ধ করিবেন। গ্রহীতা আপনার জীবন ও আপনার শোণিত দিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে দাতার সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত থাকিবেন। যাঁহারা জমির বড় বড় টুক্‌রা ভাগে পাইলেন, তাঁহারা আবার সেইরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ করিয়া আপন অধীন ভৃত্যবর্গকে জমি বাঁটিয়া দিলেন। শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইল এই, যাহার এক টুক্‌রা জমি আছে, তাহার জীবনের প্রধান কার্য্য যুদ্ধ; নিজের জন্য নহে, পরের জন্য; শেষ পর্য্যন্ত রাজার স্বার্থসাধনের জন্য। ইউরোপ একটা বিশাল সমরক্ষেত্রে পরিণত হইল। রাজায় রাজায় যুদ্ধ—তাঁহাদের খেয়ালের মর্য্যাদা রাখিবার জন্য যুদ্ধ। প্রজাসাধারণ অস্ত্রধারী বৃত্তিভুক সৈনিক ও ভৃত্য; তাহাদের প্রধান কার্য্য রাজাজ্ঞায় দেহপাত ও জীবনদান।

ইউরোপের মধ্যযুগে মনুষ্যজীবনের প্রধান কার্য্য যুদ্ধ। মনুষ্যমাত্রেই তখন যোদ্ধা ও অস্ত্রধারী সৈনিক। যে যুদ্ধ করিতে জানে না, সে মানুষের ? গণ্য হইত না।

রাজায় প্রজায় আর এক অভিনব সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। কেবল যুদ্ধের সময় রাজার আদেশে দেহপাতে প্রতিশ্রুত থাকিয়াই প্রজা মুক্তি পাইল না। রাজা তাহার পদদ্বয়ে শিকলের উপর শিকল পরাইয়া ক্ষান্ত থাকিলেন না; তাহার অন্তঃশরীরেও বন্ধনের উপর বন্ধন কসিলেন। রাজা শাস্তা, রাজা বিচারক, রাজা ব্যবস্থাপক, রাজার আদেশের নাম আইন। কেবল তাহাই নহে—রাজা গুরু, রাজা শিক্ষক, রাজা উপদেষ্টা। রাজা জ্ঞানের পন্থা দেখাইয়া দিবেন, রাজা ধর্ম্মের পন্থা দেখাইয়া দিবেন, রাজা মুক্তির পন্থা দেখাইয়া দিবেন। প্রজাকে সেই পথে চলিতে হইবে—নতুবা মঙ্গল নাই। ধর্ম্মযাজক রাজশক্তির সহকারী পোপ এবং কৈসার উভয়েই পরদেবতার নরদেহে অবতার। শাস্ত্রের ব্যাখ্যা রাজা করিবেন, ধর্ম্মের ব্যাখ্যা রাজা করিবেন। নীতির পথ রাজার আদেশে নিরূপিত হইবে। প্রজা যদি মানিয়া চলে, তাহার পক্ষে মঙ্গল, নতুবা তাহার নশ্বর জীবনের সার্থকতা নাই। তাহাকে পোড়াইয়া ফেলাই যুক্তিসিদ্ধ। আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস এইরূপে আরম্ভ

হইয়াছে। এবং ইহাকে যদি স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বলিতে চাও, শব্দশাস্ত্রের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

আরম্ভ এইরূপ, কিন্তু এই আরম্ভের পরিণতি কোথায়? রাজা মনুষ্যের আত্মাকে লুপ্ত করিতে চাহেন, কিন্তু মানুষের আত্মা লুপ্ত হইবার পদার্থ নহে। মানুষের আত্মা এক অপরূপ জিনিস।

মানুষের আত্মাকে স্বাতন্ত্র্যের মুক্ত বায়ুমার্গে বিচরণ করিতে দাও। সে মুক্ত বায়ু ত্যাগ করিয়া কারাগারে আরামে নিদ্রা যাইতে থাকিবে। তাহাকে দলিত ও পীড়িত কর, সে ভুজঙ্গের মত গর্জ্জিয়া উঠিবে। ইউরোপে তাহাই ঘটিয়াছে। সেখানে রাজায় প্রজায় সনাতন বিরোধ; ফলে প্রজার জয়। রাজা স্বার্থের উদ্দেশ্যে প্রজার হস্তে হাতিয়ার দিয়াছিলেন। প্রজা সেই হাতিয়ার শেষ পর্য্যন্ত রাজারই বিরুদ্ধে চালনা করিয়াছে, ধীরে ধীরে রাজার হস্ত হইতে প্রভুশক্তি কাড়িয়া লইয়াছে। এবং এক দিকে বহিঃশত্রুর নিকট ও এক দিকে রাজার নিকট হইতে আত্মরক্ষণে কৃতকর্ম্মা হইয়াছে।

মধ্যযুগে ইউরোপের প্রজামাত্রকেই বাধ্য হইয়া অস্ত্র ধরিতে হইত। তাহাদেরই উপর দেশরক্ষার ও রাজ্যরক্ষার ভার ছিল। বহিঃশত্রুর সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হইলে তাহারাই রাজার পার্শ্বে দাঁড়াইত। প্রত্যেকেই এইরূপ সৈনিকবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য থাকায় ইউরোপ কতকগুলি সামরি[ক] জাতির বাসস্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পরবর্ত্তী ইতিহাসে প্রভূত পরিবর্ত[্ত]ন ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু ইউরোপের প্রজাসাধারণ আজি পর্য্যন্ত এক হিসাবে সৈনিকবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। মধ্যযুগ অতীত হইলে পর রাজা আর প্রজার উপর ভরসা স্থাপন করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তখন রাজায় প্রজায় রীতিমত বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। রাজা প্রজার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেন না। তার পর আবার বারুদের আবিষ্কারে পুরাতন সামরিক পদ্ধতিই একবারে উল্টাইয়া গিয়াছে। রাজা তখন বেতনভুক্ বাঁধা সৈন্য নিযুক্ত করিলেন। প্রজারা আপন আপন গৃহকর্ম্মসম্পাদনের অনুমতি পাইল। কিন্তু রাজার এই বেতনভোগী সৈন্য প্রজার অর্থে পুষ্ট হইত ও যখন বাহিরের শত্রু উপস্থিত না থাকিত, তখন প্রজারই শাসন ও দমনে নিয়োজিত হইত। প্রজাও কাজেই আত্মরক্ষণের অনুরোধে অস্ত্র ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় নাই। এখনও ইউরোপের প্রত্যেক রাজা বেতন দিয়া বিরাট্ বাহিনী পোষণ করিতেছেন। রাজার নিকট প্রজার ততটা ভয় নাই,

কিন্তু রাজায় রাজায় যুদ্ধের, রাজ্যে রাজ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা পূর্ব্বের অপেক্ষাও বাড়িয়াছে বই কমে নাই। জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, লোলুপ ঈর্ষাপর প্রতিবেশীর গ্রাস হইতে রক্ষার জন্য, অদ্যাপি ইউরোপের প্রত্যেক প্রজা অস্ত্রধারণ করিয়া থাকে। জর্ম্মাণি প্রভৃতি রাজ্যে প্রজামাত্রেই সৈনিক; আবশ্যক মতে সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে নামিতে প্রস্তুত। ইংলণ্ডে প্রজার অধিক মাত্রায় এ বিষয়ে স্বাধীনতা থাকিতে পারে বটে, কিন্তু সেখানেও ইংরাজের রণপোত ও ইংরাজের বলণ্টিয়ার উভয়েই রাষ্ট্রের পক্ষে সমান মূল্যবান।

প্রজার পারিবারিক, সামাজিক, নৈতিক, সমস্ত কার্য্যেই ইউরোপের রাজা হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন; বজ্রবন্ধনে বাঁধিয়া তাহার দেহ ও মন উভয়কেই অভিভূত করিতে চাহেন। এই হেতু উভয়ের মধ্যে সনাতন দ্বন্দ্ব। এই সনাতন দ্বন্দ্বের ফলে সেখানে মুহুর্মুহু রাষ্ট্রবিপ্লব। ফরাসী বিপ্লবে যে ভীষণ ভূমিকম্প আরব্ধ হইয়াছে, অদ্যাপি তাহার ধাক্কা মধ্যে মধ্যে চলিতেছে। রাজায় প্রজায় বিবাদ অদ্যাপি থামে নাই। কখনও যে থামিবে, তাহার ভরসাও নাই।

ঠিক এই কারণেই ইউরোপের খণ্ড জাতিগুলির মধ্যে জাতীয়ভাব এত উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। বাহিরে জাতির সহিত জাতির, রাজ্যের সহিত রাজ্যের চিরন্তন বিসংবাদ; ভিতরে রাজার সহিত প্রজার সনাতন বিরোধ; ফলে প্রজামাত্র তৎপর, কর্ম্মঠ, অস্ত্রধারী সৈনিকে পরিণত।

এই অংশে ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে সমগ্র জাতি কখন এক হইয়া জমাট বাঁধে নাই; এক মহা সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে সকলেই কখনও স্থান লাভ করে নাই। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সমগ্র মহাদেশকে বিভক্ত রাখিয়াছিল। কিন্তু এই একটি রাজ্যের অধিবাসীরা কখন একজাতীয়ত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। ইউরোপে যেমন ফরাসী, জর্ম্মান, ইতালীয় প্রভৃতি কয়েকটি দৃঢ়বদ্ধ জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, যাহাদের স্বার্থ পরস্পরের প্রতিকূল, যাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ সহানুভূতির বন্ধন নাই, ভারতবর্ষে সেরূপ কয়েকটি খণ্ড জাতি গঠিত হইতে পারে নাই। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থা কতকটা ইহার জন্য দায়ী। ইতালীর একটা ভৌগোলিক সীমানা আছে, স্পেনের আছে, গ্রীসের আছে, ইংলণ্ডের আছে, ফ্রান্স ও জর্ম্মানির মধ্যেও একটা সীমানা খুঁজিলে মিলিতে পারে। বাঙ্গলায় কোন নির্দ্দিষ্ট সীমানা নাই, পঞ্জাবেরও সীমানা নাই, মধ্যদেশেরও নির্দ্দিষ্ট সীমানা নাই।

এক বিশাল সমতল প্রান্তরের এক এক অংশ লইয়া এক এক জাতি বাস করে। সেইরূপ, কর্ণাট ও দ্রাবিড়ের মধ্যে, দ্রাবিড় ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে কোন ভৌগোলিক সীমারেখা প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিয়া দেন নাই। উৎকলের ভাষাকে বাঙ্গালী পরিহাস করিয়া থাকে বটে, কিন্তু কোন্ স্থানে বাঙ্গলার শেষ, আর কোথায় উৎকলের আরম্ভ, তাহার নির্দ্দেশ একবারে অসাধ্য। কাজেই প্রজাগণের মধ্যে জাতিবিভাগ ও জাতিবিদ্বেষ স্থাপিত হয় নাই। বাঙ্গালী তাহার প্রতিবেশী হিন্দুস্থানীকে বিশেষ প্রেমের চক্ষে দেখে না, কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোন ধর্ম্মগত বিদ্বেষও বর্ত্তমান নাই। এইরূপ সর্ব্বত্র।

প্রাচীন ভারতবর্ষে একই সময়ে অনেকগুলি রাজা থাকিতেন। কিন্তু কোন রাজারই রাজ্যের স্থায়ী সীমাচিহ্ন ছিল না। যিনি যতটা অধিকার করিয়া থাকিতে পারিতেন, তাহাই তাঁহার রাজ্য। রাজায় রাজায় লড়াই হইত বটে, যিনি যখন একটু প্রবল হইতেন, তিনিই একবার করিয়া দিগ্বিজয়েও বাহির হইতেন। কিন্তু আবহমান কাল ধরিয়া উভয়ের মধ্যে বদ্ধমূল বিদ্বেষের উদাহরণ প্রায় ঘটিত না। ইউরোপের ইতিহাসে কালের সৃষ্টি হইতে আজি পর্য্যন্ত ফরাসীর সহিত ইংরাজের বা জর্ম্মানের সহিত ফরাসীর যে সম্বন্ধের উল্লেখ করে, সেইরূপ সম্বন্ধের উদাহরণ ভারতবর্ষের মধ্যে নাই।

ভারতবর্ষে জাতিভেদের উল্লেখ করিয়া যাঁহারা একটা প্রকাণ্ড অনর্থের কারণ আবিষ্কার করিয়া থাকেন, তাঁহারা ঠিক বুঝাইয়া দেন না, জাতিভেদ-সূত্রে রাজনৈতিক দুর্ব্বলতা কিরূপে উৎপন্ন হইতে পারে। জাতিভেদ একটা বৈষম্য বটে, কিন্তু তাহা রাজনৈতিক অধিকার লইয়া নহে, তাহা সামাজিক অধিকার লইয়া। খুব সম্ভব, ইতিহাসের পুরাতন পাতা উল্টাইলে এই বৈষম্যের মূলে রাজনৈতিক কারণ আবিষ্কৃত হইতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসের যে অংশের সহিত আমাদের পরিচয়, তাহার মধ্যে কোন রাজনৈতিক বিবাদের অস্তিত্ব দেখা যায় না। এই কাল মধ্যে ব্রাহ্মণ কখনও অস্ত্র ধরিয়া শূদ্রদমনে প্রবৃত্ত হয় নাই, শূদ্রও কখনও অস্ত্র লইয়া ব্রাহ্মণের কণ্ঠচ্ছেদে উদ্যত হয় নাই। ব্রাহ্মণের প্রতি প্রেম শূদ্রের না থাকিতে পারে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে নিদারুণ বিদ্বেষ ও ঈর্ষ্যার অস্তিত্বের ঐতিহাসিক প্রমাণ বর্ত্তমান নাই।

বিদ্বেষ ও ঈর্ষ্যার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইলেও মূল বিচারে কিছু আসে

যায় না। ব্রাহ্মণও ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রব্যাপী, শূদ্রও ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রব্যাপী। উভয়ে কিছু স্বতন্ত্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন ভূখণ্ড অধিকার করিয়া বাস করে না। কোন রাষ্ট্রীয় বিপ্লব উপস্থিত হইলে উভয়েরই লাভ বা উভয়েরই ক্ষতি সম্ভব।

কাজেই দেখা যাইতেছে, ইউরোপে একটা যাহা বিদ্যমান আছে, ভারতবর্ষে তাহা নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড রাজ্য উভয়েই বর্ত্তমান, কিন্তু ইউরোপে যেমন ফরাসী জর্ম্মান প্রভৃতি পরস্পরবিরোধী, পরস্পরপ্রতিকূল, দৃঢ়বদ্ধ, সুগঠিত জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, ভারতবর্ষে সেই অর্থে তেমন ভিন্ন ভিন্ন বিরোধী জাতির বা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় নাই। ভারতবর্ষে যে কিছু বর্ণগত বা ধর্ম্মগত বা সম্প্রদায়গত বিরোধ আছে, তাহা রাজনৈতিক বিরোধ নহে, তাহা সামাজিক বিরোধ; তাহা প্রত্যেক প্রদেশের, প্রত্যেক ভূখণ্ডের অভ্যন্তরেই বর্ত্তমান। তাহা জমাট বাঁধিয়া এক একটা নির্দ্দিষ্ট সীমাবিশিষ্ট ভূখণ্ড অধিকৃত করিয়া রাখে নাই। ফলে ভারতবর্ষে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইয়াছে, রাজবংশে রাজবংশে বহুদিন ধরিয়া বিবাদ চলিয়াছে, কিন্তু জাতিতে জাতিতে, সমাজে সমাজে মর্ম্মঘাতী যুদ্ধ কখনও ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। এক প্রদেশের লোক দল বাঁধিয়া অন্য প্রদেশের লোকের উপর রাজনৈতিক প্রভুত্বস্থাপনে উদ্যত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। *

আমার বিবেচনায় ভারতবাসী প্রজার এই প্রকৃতিগত অসম্পূর্ণতাই তাহার পরাধীনতার প্রকৃত কারণ। ভারতবাসী পরাধীন, কেন না, বাহির শত্রু আসিয়া স্বদেশ আক্রমণ করিলে তাহাতে যে আপত্তি করিতে হয়, সে তাহা জানে না; রাজলোকে কোন অঘটন ঘটনা হইলে তাহাতে যে হস্তক্ষেপ করিতে হয়, তাহা তাহার মনের মধ্যে স্থান পায় না। ইংরাজিতে যাহাকে প্যাটরিয়টিজম্ বলে, সে ভাবটা তাহার মনে কখনও অঙ্কুরিত হয় নাই। ভারতবর্ষে কখনও জাতীয়তার বিকাশ হয় নাই। কেন হয় নাই, তাহা আলোচ্য বিষয়; এবং দুষ্ট ব্রাহ্মণের ঘাড়ে সমস্ত নিক্ষেপ করিলেও যে উত্তরটা সম্যক্ হইল, তাহা বিবেচনা করিতে পারি না।

মনে করিও না যে, ভারতবাসীর প্রাণের ভয় অন্যের অপেক্ষা বেশী, বা

---

* মধ্যে মুসলমানের আমলে মরাঠাগণ ও শিখগণ দুইটা জাতির প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছিল; তাহার মধ্যে মরাঠা প্রতিবেশীর উপর উৎপাত করিতেও ছাড়িত না। এইখানে ইউরোপীয় ইতিহাসের কতকটা অনুকৃতি দেখা যায়।

ভারতবাসী সাহসবিষয়ে অন্যের অপেক্ষা হীন। এ কথা যে বলিবে, সে ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন করে নাই।

জাতীয় ভাব কেন যে এ দেশে বিস্তার লাভ করে নাই, তাহার একটু অনুসন্ধান দরকার। সমুদায় হিন্দুজাতি কেন যে একটা মহাজাতিতে পরিণত হয় নাই, তাহা বুঝিয়া দেখা আবশ্যক।

এক রাজার অধীনতা জাতীয় ভাবের বিকাশে সহায়তা করে। রাজনৈতিক বন্ধনের মত বন্ধন খুব কম আছে। আজ কাল এ দেশে যে একটু সুর ফিরিবার রকম দেখা যাইতেছে, যেন জাতীয় ভাবের অতি সামান্য একটু বিকাশ হইতেছে বলিয়া কখন কখন সন্দেহ জন্মিতেছে, এক দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজছত্রের অধীনতা তাহার কারণ। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে এ ঘটনা বোধ হয় কখনই ঘটে নাই। চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি নরপতি এক একবার বিস্তৃতসাম্রাজ্যস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কাহারও সাম্রাজ্য বোধ হয় অধিকদিন স্থায়িত্ব লাভ করে নাই। সমগ্র ভারতকে বহুদিন ধরিয়া একছত্র করিয়া রাখিতে কোন রাজবংশই বোধ হয় সমর্থ হন নাই। তৎপূর্ব্বে সমগ্র দেশ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বস্বপ্রধান রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই ব্যাপারটা জাতীয় ভাবের অবিকাশের একটা কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

আরও কয়েকটা কথা আছে। ভারতবর্ষ অতি বৃহৎ দেশ। ইহার ভিতর নানাজাতীয় নানা বর্ণের লোক বাস করে। প্রথমেই ত আর্য্য ও অনার্য্য ও তদুভয়ের মিশ্রণে উৎপন্ন বিবিধ সঙ্কর বর্ণ। আবার অনার্য্যগণের মধ্যে ছত্রিশ কোটি শাখা।

এই বর্ণভেদ ও জাতিভেদের সহিত আবার ভাষাগত ভেদ। আর্য্যভাষা অনার্য্য ভাষাকে একবারে লুপ্ত করিতে পারে নাই। দক্ষিণাপথের অধিকাংশ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী লোকেও অনার্য্য ভাষায় কথা কহে। সেই ভাষার মধ্যেও আবার তামিল তেলুগু প্রভৃতি নানা ভাষা। আরণ্য ও পার্ব্বত্য অনার্য্যদিগের সহস্র ভাষার কথা ছাড়িয়া দাও। এক আর্য্য ভাষাই আবার প্রদেশভেদে কত রূপ গ্রহণ করিয়াছে। পঞ্জাব মহারাষ্ট্র বাঙ্গলা, এক প্রদেশের লোকে অন্য প্রদেশের ভাষা বুঝেন না। ভাষাগত ঐক্য না থাকিলে সামাজিক বন্ধন কোন কাজের হয় না। সমস্ত ভারতবর্ষকে এক দেশ বলাই কঠিন। বরং সমগ্র ইউরোপকে এক দেশ বলা যাইতে পারে, সমগ্র ইউ-

রোপীয়কে একজাতিভুক্ত বলা যাইতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষকে একটা দেশ ও সমস্ত ভারতবাসীকে একজাতিভুক্ত বলিতে যাওয়া একরকম বিড়ম্বনা।

বন্ধনের মধ্যে কেবল একটা বন্ধন ছিল। বন্য ও পার্ব্বত্যগণকে ছাড়িয়া দিলে প্রায় সমস্ত ভারতবাসী এক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। আর্য্যজাতির বেদমূল পন্থায় প্রায় সকলেই চলিতে শিখিয়াছিল ও বেদমূলক আচার গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার মধ্যেও বিবিধ সম্প্রদায়ভেদ, বিবিধ আচারভেদ ঘটিয়া সমস্ত জাতিকে কখনও জমাট বাঁধিতে দেয় নাই।

জাতীয়তার অভাব বুঝাইবার জন্য এইরূপ কতকগুলা কথা বলা যাইতে পারে; এবং সচরাচর এইরূপ [illegible]ই অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সবগুলা জড়াইলে এক[illegible] দাঁড়ায়। ভারতবাসী এক জাতিতে পরিণত হয় নাই; কেন না, ভারতবর্ষ দেশটা অতি প্রকাণ্ড। ইহা একটা দেশ নহে, একটা মহাদেশ; ইহা এক জাতির আবাসভূমি নহে, এক বর্ণের লোক ইহাতে বাস করে না। ইহা নানা জাতি নানা বর্ণের মনুষ্যের বিহারক্ষেত্র। ইহাতে নানা ভাষা, নানা আচার, নানা ধর্ম্ম। রাজনৈতিক বা সামাজিক, ধর্ম্মগত বা ভাষাগত বা আচারগত, কোন একটা সাধারণ সম্বন্ধ এই বিংশ কোটি মনুকুলকে একটা বাঁধনে আবদ্ধ রাখে নাই। এই সাধারণ বন্ধনের অভাবে ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তির এমন আকর্ষণ ঘটিতে পায় নাই, যাহাতে উভয়ে একত্র হইয়া সাধারণ উদ্দেশ্যে আপনার জীবনের গতি পরিচালিত করিতে পারে।

কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিলেই কি মনের তৃপ্তি হয়? ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যত্র দৃষ্টিপাত করিলে কি দেখা যায়? অন্যত্রও কি ঠিক এই সকল কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও অন্যবিধ ফলের উৎপত্তি হয় নাই?

মনে কর ইউরোপ। ইউরোপ একটা মহাদেশ। কিন্তু রুসিয়া খণ্ড ছাড়িয়া দিলে এই মহাদেশের যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা আয়তনে ভারতবর্ষ অপেক্ষা অধিক বড় হইবে না। সেখানেও ঠিক জাতিভেদ, বর্ণভেদ, আচারভেদ আমাদের মতই বিভিন্ন। ইউরোপীয়েরা সকলেই আর্য্যবংশীয় বলিয়া যতই আস্ফালন করুন না, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই রক্তে বার আনা অনার্য্য রক্ত বহিয়াছে, ইহা প্রকৃত কথা। তবে ইউরোপে আর্য্যে ও অনার্য্যে যতটা মিশিয়া গিয়াছে, আমাদের দেশে ততটা মিশিতে পায় নাই, ইহা সত্য বটে। আর্য্য-অনার্য্য-বিভেদ ততটা পরিস্ফুট না থাকিলেও এক আর্য্য জাতিরই

বিবিধ শাখা ইউরোপের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। এবং তাহাদের মধ্যে পরস্পর অসাদৃশ্য, এমন কি বিদ্বেষের ভাবও নিতান্ত কম নহে। তার পর ভাষাভেদ, সেও নিতান্ত ফেলিবার নহে। ইউরোপে যতগুলা দেশ, ততগুলা ভাষা; এমন কি, একটা দেশের মধ্যেও পাঁচটা ভাষার অস্তিত্ব নিতান্ত বিরল নহে। একটা ধর্ম্মের বন্ধন উপর উপর দেখা যায় বটে, তুর্কি ছাড়িয়া দিলে ইউরোপের সকলেই খৃষ্টান। কিন্তু সে বন্ধনটা কেবল নামমাত্র, কাজে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কেন না, খৃষ্টানের সঙ্গে খৃষ্টানের যেমন বিবাদ, অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীর সঙ্গে তত নহে। খৃষ্টান খৃষ্টানকে পোড়াইতে যেমন আনন্দ লাভ করিয়া থাকে, অন্য কোন কার্য্যে তাহার তেমন আনন্দ নাই বা আগ্রহ নাই। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মগত বিদ্বেষ কত দূর ভীষণ আকার ধারণ করিতে পারে, ইউরোপের ইতিহাস আগুনের অক্ষরে তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছে।

ফলে ভারতবর্ষও যেমন কখনও একছত্র হয় নাই, ইউরোপও তেমনি কখনও একছত্রাধীনতায় আসে নাই। ভারতবাসী একত্র হইয়া যেমন মহাজাতিতে পরিণত হয় নাই, ইউরোপবাসীও সেইরূপ মহাজাতিতে পরিণতি লাভ করে নাই। উভয়ত্র একই কারণ। ভারতবর্ষ একটা দেশ নহে, একটা মহাদেশ। ইউরোপও তেমনি একটা দেশ নহে, একটা মহাদেশ। ভারতবর্ষে যেমন একটা জাতি নাই, অনেক জাতি, ইউরোপেও তেমনি একটা জাতি নাই, অনেক জাতি। ভারতবাসীর যেমন ভারতের জন্য প্রাণ কাঁদে না, ইউরোপবাসীরও সেইরূপ ইউরোপের জন্য প্রাণ কাঁদে না।

একই কারণে একই ফল উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষ ও ইউরোপ দুই মহাদেশে একই কারণে একই ফল উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু উভয়ে সাদৃশ্য এই পর্য্যন্ত। ইহার পর আর সাদৃশ্য নাই। ইউরোপবাসীর ইউরোপের জন্য প্রাণ কাঁদে না বটে, কিন্তু ফরাসীর প্রাণ ফ্রান্সের জন্য কাঁদে; জর্ম্মানের প্রাণ জর্ম্মানির জন্য আবেগের সহিত কাঁদিতেছে; ইতালীয়ের প্রাণ ইতালীর জন্য কাঁদিয়া উঠিয়া ইতালীকে এক মহারাজ্যে পরিণত করিয়াছে; ইংরাজের প্রাণ হোমের জন্য কাঁদিয়া থাকে, গ্রীসের প্রাণের অবরুদ্ধ প্রবাহ বাহির হইতে না পারিয়া অন্তঃসলিল বহিতে থাকে। আধুনিক ইতিহাস তাহার প্রমাণ। কিন্তু বাঙ্গালীর প্রাণ বাঙ্গলার জন্য কখনও কাঁদে নাই, পঞ্জাবীর প্রাণ পঞ্জাবের জন্য কাঁদে নাই—সে একবার কাঁদিয়াছিল অত্যাচারী ধর্ম্মদ্বেষী মুসলমানের রক্তপানের অবসর না পাইয়া। মরাঠা মহারাষ্ট্রের জন্য কাঁদিয়াছিল বলিলে

বোধ করি ভুল হয়, সে যে একবার অশ্রু ফেলিয়াছিল. সে বোধ হয় আনন্দের অশ্রু ও উল্লাসের অশ্রু। আনন্দ—মোগল সেনাপতির গলার মুক্তা জড়াটার জন্য, উল্লাস—যবন রাজার টুপি কাড়িয়া ও দাড়ি মুড়াইয়া আপন উৎকট পরিহাসরসিক বৃত্তির চরিতার্থতায়। ভারতবাসী কেহ কখনও স্বদেশের জন্য বা স্বজাতির জন্য কাঁদে নাই, ইহাই সাধারণ নিয়ম; সাধারণ নিয়মের ব্যভিচারের কেবল একটা মাত্র উদাহরণ ইতিহাসে দেখে,—তেমন উদাহরণ জগতের ইতিহাসেও বোধ করি দুর্লভ; সে উদাহরণ মেওয়ারের রাজপুত।

এইখানে ইউরোপীয় ও ভারতবাসীতে তফাৎ। ইউরোপবাসী মহাদেশের ভাবনা ভাবে না ও মহাজাতিপ্রতিষ্ঠায় তাহার আগ্রহ নাই, কিন্তু সে তাহার খণ্ডদেশমধ্যে খণ্ডজাতির প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনাকে সেই জাতি-শরীরের অঙ্গীভূত করিয়া স্পন্দিত হয়। সমগ্র ইউরোপ মহাদেশ কতকগুলি খণ্ড খণ্ড ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছে, এবং এক একটা রাজ্যে এক একটা দুর্দম দৃঢ়বদ্ধ সবল জাতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ফরাসী জর্ম্মানির শোণিতপানের তৃষ্ণায় ব্যাকুল; কিন্তু ফরাসী আবার ফ্রান্সের জন্য আপন শরীরের শেষ শোণিত বিন্দু প্রদান করিতে প্রস্তুত। তেমনি জর্মান, তেমনি ইংরাজ। ইউরোপে এই অর্থে জাতীয় ভাবের স্ফুরণ ও বিকাশ হইয়াছে, ইউরোপে এই অর্থে প্যাটরিয়টিজম উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

তার পর রাজায় প্রজায় সম্বন্ধ। আমাদের দেশে এই সম্বন্ধও ইউরোপ হইতে সম্পূর্ণ বিসদৃশ। অনেক ঐতিহাসিক ভারতের প্রাচীন শাসনপ্রণালীকে রাজতন্ত্র বা যথেচ্ছাচারপ্রণালী বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু আমার বিবেচনায় সেকালের শাসনপ্রণালী সম্পূর্ণ প্রজাতান্ত্রিক ছিল; প্রজা যে পরিমাণে স্বাধীনতাভোগের আপনা হইতে অধিকার পাইয়াছিল, সহস্র বৎসরের বিবাদের ফলে আধুনিক ইউরোপীয় প্রজা তাহা পাইয়াছেন কি না সন্দেহ। প্রাচীন হিন্দু রাজা পুরাণপ্রথিত রামচন্দ্র বা যুধিষ্ঠিরের সদৃশ ছিলেন, এরূপ আমার বিশ্বাস নাই। তাঁহারা দোষের গুণের মানুষ ছিলেন; এবং রাজজাতীয় মনুষ্যের স্বাভাবিক নিয়মমত, বোধ হয়, গুণের ভাগ অপেক্ষা দোষের ভাগই অধিক ছিল। স্বার্থের জন্য বা রাজ্যের জন্য, বন্ধু বন্ধুকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে, পুত্র পিতাকে, ভৃত্য প্রভুকে হত্যা পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না; এরূপ উদাহরণ ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসেও বিরল নহে। কিন্তু অন্যত্র প্রজার সহিত রাজার যে একটা বিরোধ দেখা যায়, এখানে

সেটা তেমন প্রবলমাত্রায় ছিল না। রাজার ও প্রজার মধ্যে তেমন দৃঢ় বন্ধনই বোধ হয় ছিল না। প্রজা খুব সামান্য ভাবেই রাজার প্রভুশক্তির অধীন ছিল। প্রজার রাজার নিকট নিপীড়িত হইবারও বিশেষ অবসর ঘটে নাই, রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিবারও তেমন দরকার হয় নাই। অত্যাচারী প্রজা-পীড়ক রাজা কেহ ছিল না, এমন কথা নহে। কথাটা হইতেছে সাধারণ নিয়ম লইয়া। কয়েকটা বিষয় আলোচনা করিলে এ বিষয়টা বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইতে পারে।

সেকালের রাজার কেবল একটা কাজ। তিনি দণ্ডধর। তিনি সৈন্য-পরিবৃত হইয়া শত্রু হইতে রাজ্য রক্ষা করেন ও রাজসিংহাসন রক্ষা করেন। এবং তিনি রাজ্যের মধ্যে দুষ্টের শাসন-দ্বারা শান্তি রক্ষা করিতেন। সর্ব্বত্র না হউক, অনেক স্থলে মন্ত্রণাদান ও বিচারের ভার ব্রাহ্মণের হাতে ছিল; এবং ব্রাহ্মণকে, যেমনই প্রবল রাজা হউন, ভয় করিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। শাসনবিষয়ে ও বিচারবিষয়ে রাজার খেয়াল ততটা কাজ করিতে পারিত না। কিন্তু এই স্থলেই বোধ করি প্রজার সহিত রাজার সম্বন্ধের শেষ। রাজা কর আদায় করিতেন, করের ভার দুর্ব্বহ ছিল কি না, সে বিষয়ে ইতিহাস কিছু বলে না। করসংস্থাপনে রাজা ইচ্ছার উপর ও খেয়ালের উপর চলিতেন কি না, সে বিষয়েও ইতিহাস নিরুত্তর। রাজা যাহাই করুন, শাস্ত্রকার ব্রাহ্মণ কিন্তু এ বিষয়েও রাজার শক্তি সংযত করিয়া দিতে অন্ততঃ চেষ্টার ত্রুটী করিতেন না। রাজা কর আদায় করিতেন, তাহার দ্বারা আপন সেনা পোষণ করিতেন, শান্তি রক্ষা করিতেন, বাবুয়ানা করিতেন, এবং ইচ্ছা হইলে হয় ত সাধারণের হিতের জন্যও কতক খরচ করিয়া ফেলি-তেন। কিন্তু প্রজার স্বাধীনতাসংহারের জন্য এক কপর্দ্দক ব্যয় করিতেন, এরূপ প্রমাণ নাই।

ব্যবস্থাপ্রণয়ন অর্থাৎ আইনকানুনের প্রণয়ন রাজার হাতে ছিল না। প্রজা আপন চিরাগত প্রথানুসারে আপনার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। আইনের ব্যাখ্যাটা ব্রাহ্মণ ঠাকুরের হাতে ছিল বটে, এবং তিনি দায়ভাগ হইতে ডাক্তারী উপদেশ পর্য্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দিতে ছাড়িতেন না; এবং অপরাধীর সংখ্যা ক্রমে বাড়াইয়া একবারে গণনার বাহির করিয়া তুলিয়া-ছিলেন। কিন্তু এই সকল অপরাধের অধিকাংশ স্থলেই স্বকৃত প্রায়শ্চিত্ত, জোর এক আধটু সামাজিক নিগ্রহের বিধান ছিল। রাজদ্বারে অধিকাংশ

ক্ষেত্রেই খবর পঁহুছিত না। বিচারাদি কার্য্যও অনেক স্থলে মধ্যস্থের দ্বারা ও সমাজের মুরব্বিদের দ্বারা সম্পাদিত হইত। গ্রামের ভিতর পল্লীর ভিতর প্রজার দৈনন্দিন ও নিত্য নৈমিত্তিক জীবনব্যাপার গ্রামের লোকের পরস্পর সাহায্যে সম্পাদিত হইত। রাজার সহিত কোন বিষয়ে কোন সম্বন্ধ ছিল না, বা সংঘর্ষ ঘটিত না। ফলে শান্তিরক্ষা ও শত্রুর সহিত লড়াই ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত কাজই প্রজারা আপনা-আপনি আপনাদের মধ্যেই গোছা-ইয়া লইত। গ্রামের পাঁচ জনে মিলিয়া গ্রামের কাজ সম্পাদন করিত। সমা-জের পাঁচ জনে কর্ত্তা হইয়া সমাজের কাজ সম্পাদন করিত। রাজার নিকট উপস্থিত হইতে হইত না, রাজাও কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না। আভ্যন্তরীণ রাজনীতি রাজার অধিকারবহির্ভূত ছিল। হইতে পারে, এই সকল ব্যাপারে ব্রাহ্মণ অন্যান্য জাতির উপর অবৈধ ভাবে ও অন্যায্য উপায়ে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিবিস্তারের চেষ্টা করিতেন; হয় ত এই সূত্রে ব্রাহ্মণের সঙ্গে অপরের বিরোধ ঘটিত, বা বিদ্বেষ ঘটিত। কিন্তু সে বিরোধ প্রজায় প্রজায়; রাজার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক ছিল না।

আর একটা প্রকাণ্ড স্বাধীনতা ভারতের প্রজার স্বাভাবিক ছিল,—ভার-তের বাহিরে অন্যত্র মনুষ্য যাহার রসাস্বাদে আজি পর্য্যন্ত বঞ্চিত রহিয়াছে।

ভারতবর্ষে রাজা কখনও প্রজার চিন্তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। ইউরোপে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে যাজকসম্প্রদায় জনসাধা-রণের জন্য ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন। রাজা সেই যাজকসম্প্রদায়ের সহায় ও পৃষ্ঠপোষক থাকিতেন। যে ব্যক্তি প্রচলিত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে রসনা-স্ফালনে সাহসী হইত, সমগ্র রাজশক্তি বজ্রের মত তাহার মস্তকের উপর নিপতিত হইত।

কেহ যদি জ্ঞানবিজ্ঞানের একটা নূতন কথা প্রচার করিলেন, তৎ-ক্ষণাৎ রাজাদেশে প্রজ্বলিত চিতানলে তাঁহার শরীরকে ভস্মীভূত করিয়া আত্মার সদ্গতির ব্যবস্থা হইল। ফলে অজ্ঞানের তমোময় অন্ধকার সমগ্র মহাদেশকে সহস্র বৎসর ধরিয়া আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বপ্রান্তে যে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রদীপ্ত শিখা জ্বলিয়া উঠিয়া সমগ্র জগৎকে আলোকিত করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, বর্ব্বর খৃষ্টানের বর্ব্বর রাজশক্তি ও বর্ব্বর যাজকশক্তি একত্র সম্মিলিত হইয়া তাহাতে শীতল বারিধারা নিক্ষেপ করিয়া অচিরে নির্ব্বাণ করিয়া ফেলিল। জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, গণিত, পদার্থবিদ্যা

ও মনোবিদ্যা ও নীতিবিদ্যা, অঙ্কুরিত হইয়া সতেজে শাখাপ্রশাখা সৃষ্টি করিতেছিল; তাহারা একবারে উন্মুলিত ও উৎপাটিত হইল। সুকুমার কলাবিদ্যা মানবের দুঃখময় জীবনে সুখের ও শান্তির প্রতিষ্ঠার জন্য নানা উপায়ে নিযুক্ত হইতেছিল; বর্ব্বরগণের প্রবল কুঠারাঘাতে তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল। জ্ঞানের পন্থা কণ্টকিত হইল, স্বাধীন চিন্তার দ্বার আবদ্ধ হইল; ইউরোপের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে চিতার অনলে দার্শনিকের ও তত্ত্বানুসন্ধায়ীর নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইতে লাগিল।

রাজসম্প্রদায়ের ও যাজকসম্প্রদায়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই। মানবাত্মার সম্প্রসারণের পথরোধে সমবেত যাজকশক্তি ও রাজশক্তি কৃতকার্য্য হয় নাই। মনুষ্য আপন স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়াছে। খড়্গহস্তে আপনার ন্যায্য সম্পত্তি ফিরাইয়া আনিয়াছে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর এই অন্তিমকালে, বিজ্ঞান যখন দর্পের সহিত অগ্রসর হইতেছে, দর্শন যখন অজ্ঞানের তিমিররাশি ভেদ করিয়া সত্যের রাজ্যপ্রতিষ্ঠার জন্য চলিয়াছে, এখনও কি সেই পুরাতন জরাজীর্ণ রাজশক্তি ও যাজকশক্তি পৈশাচিক কুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া নাই?

ভারতবর্ষে বিধান অন্যরূপ। এখানে যে মানবসম্প্রদায়ের হস্তে জ্ঞানালোচনার ভার অর্পিত ছিল, রাজশক্তি সভয়ে তাহার নিকট প্রণত থাকিত। মনুষ্যের ধীশক্তি অপ্রতিহতপ্রভাবে সহস্র দ্বার উন্মুক্ত করিয়া সহস্র দিকে প্রধাবিত হইয়াছিল; কেহ বলিতে সাহস করে নাই, ঐ পন্থায় তুমি চলিও না। যিনি বলিতে চাহেন, ভারতের ব্রাহ্মণ মনুষ্যের চিন্তাশক্তিকে শৃঙ্খলিত ও নিগড়বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি হয় অন্ধ, নতুবা মিথ্যাবাদী। তাঁহার সহিত বিচারের অবতারণা বিড়ম্বনা।

সামাজিক, নৈতিক, ভৌতিক ও মানসিক, সকল ব্যাপারেই ভারতীয় প্রজা সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন ছিল; ঠিক এই কারণে রাজার সহিত কখনই তাহার বিরোধের আশঙ্কা ঘটে নাই। এই জন্যই সে কখন অস্ত্রধারী সৈনিকের ব্যবসায়-অবলম্বনে বাধ্য হয় নাই। রাজার সহিত রাজার যুদ্ধ হইত; এক রাজার হস্ত হইতে রাজদণ্ড অন্যে কাড়িয়া লইতেন; কিন্তু প্রজার রাজদ্রোহ:বিরুদ্ধে কেহই দণ্ডায়মান হইতেন না। প্রজাও সেই জন্য রাজপরিবারের ও রাজবংশের ভাগ্যপরিবর্ত্তনে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। রাজার সহিত বিরোধ করিতে হয়, রাজার নিকট আপনার পাওনা গণ্ডা বুঝিয়া

লইতে হয়; কথায় কথায় রাজায় কৈফিয়ত চাহিতে হয়, ভারতের প্রজার এই শিক্ষালাভের অবসরই ঘটিয়া উঠে নাই। যে শিক্ষা ও যে পরীক্ষা, যে বিরোধ ও দ্বন্দ্ব হইতে জাতীয় ভাব ও রাজনৈতিক ভাব বিকশিত হয়, এ দেশে তাহার সম্পূর্ণ অভাব ছিল। কারণের অভাব, ফলেও সেইরূপ।

ভারতের প্রজা জানিত না, রাজার সহিত বিরোধ করিতে হয়; সে জানিত না, রাজার ছত্রদণ্ড লইয়া অপরে টানাটানি করিলে রাজার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইতে হয়; সে জানিত না, রাজবিপ্লবের ফলের সহিত প্রজার সামাজিক জীবনের শুভাশুভ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইতে পারে। অতি প্রাচীন কালে যুদ্ধ ব্যবসায় চালাইবার জন্য একটা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহাদের নাম ছিল ক্ষত্রিয়। রাজার সিংহাসনরক্ষার জন্য, শত্রুর হস্ত হইতে দেশরক্ষার জন্য এই ক্ষত্রিয় জাতিই প্রয়োজনমত অস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইত। বৌদ্ধবিপ্লবের সময় প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতির উচ্ছেদ হইয়াছিল। ভারতবর্ষে যুদ্ধব্যবসায়ী মনুষ্যসম্প্রদায় বর্ত্তমান ছিল না; যাহারা বেতন গ্রহণ করিয়া যুদ্ধের ব্যবসায় চালাইত, তাহাদের কোনরূপ নৈতিক দায়িত্ববোধ ছিল না। প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতির লোপ হইয়াছিল। প্রাচীন সমাজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, নূতন সমাজগঠনের কার্য্য আরম্ভ হইতেছিল মাত্র। এই সময়ে পশ্চিমদেশ হইতে যবন, শক, হূনাদি বিবিধ সমরপ্রিয় বর্ব্বর জাতি হিন্দুস্থানে দলে দলে প্রবেশ লাভ করিতে থাকে; অনেকে বড় বড় রাজ্যস্থাপনেও কৃতকার্য্য হয়। কিন্তু অল্পদিনেই তাহারা হিন্দুস্থানের সামাজিক আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়া হিন্দুসমাজের অন্তর্গত ও অঙ্গীভূত হইয়া পড়িল। এই সকল নবাগত সমরপ্রিয় জাতিগণকে লইয়া ভারতবর্ষের নূতন ক্ষত্রিয় রাজপুতের অভ্যুত্থান হইল। যখন মুসলমান আসিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিল, ভারতবর্ষের প্রজাসাধারণ তাহাতে শঙ্কিত ও ত্রস্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা আত্মরক্ষণে সমর্থ হয় নাই। আত্মরক্ষার জন্য যে রাজনৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন, সে শিক্ষা কখনও তাহারা পায় নাই। তাহারা দল বাঁধিয়া সাধারণ শত্রুর বিপক্ষে দাঁড়াইতে সমর্থ হয় নাই, অথবা ঐ কার্য্যের আবশ্যকতার উপলব্ধি করে নাই। নূতন ক্ষত্রিয় রাজপুত একা সেই দুরন্ত শত্রুর প্রতিকূলে দাঁড়াইয়াছিল। বেগবতী প্রবাহিনীর গতিরোধ তাহাদের অসাধ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু মুসলমানের মত প্রচণ্ড শত্রুর সঙ্গে তাহারাও যেরূপ লড়িয়াছিল, তাহার বিবরণ পৃথিবীর ইতিহাসে চিরকাল লিপিবদ্ধ থাকিবে।

মুসলমান আমাদের দেশের রাজা হইয়া রাজসিংহাসনে বসিয়াছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রজার উপর উৎপীড়ন অত্যাচারও যথেষ্ট করিতেন; কিন্তু মোটের উপর প্রজার পারিবারিক ও সামাজিক, দৈহিক ও মানসিক স্বাতন্ত্র্যের দিকে তাঁহাদেরও লোলুপদৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয় নাই। কিছু দিনের মধ্যেই হিন্দু ও মুসলমান ভারতবর্ষের অধিবাসী হইয়া ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন; একই ভারতমাতা উভয়েরই জননীস্বরূপা হইয়া উঠিয়াছিলেন। সম্প্রতি বৈদেশিকের অধিকারে যেন উভয়ের সেই ভ্রাতৃভাবের ও সখ্যভাবের বন্ধন ছিন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে সামাজিক আচারগত বন্ধন অসম্ভব; কিন্তু ভরসা যে, বিশালচ্ছায় ব্রিটিশ রাজছত্রের তলে দণ্ডায়মান উভয় জাতি এক ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সখ্যসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া পরস্পরকে বর্দ্ধিত ও পোষিত করিতে থাকিবে।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

সুহৃদ।

"সে মরে গেলে আমার এত কষ্ট হইত না। আমি অন্যের অপেক্ষা কাপুরুষ নহি, কিন্তু এ যন্ত্রণা অসহ্য। আমি তাকে এত ভালবাসিতাম। এই এক বৎসর বিবাহ হয়েছে, আমি ভাবিতেছিলাম বুঝি জগতে আমার আর কিছু চাহিবার নাই। কিন্তু কি নির্ব্বোধ! সে অনায়াসে চলে গেল। কার সঙ্গে গেল? ভাই! দেবতার দিব্য, যদি জান, বল, সে লোকটা কে?"

দুই জনের অনেক দিনের সৌহার্দ্য। কম্পিতহস্তে বিশ্বাসঘাতিনী পত্নীর পত্র লইয়া শোকাকুল স্বামী তাহার প্রিয়তম সুহৃদের নিকট আসিয়াছিল। সে সরল লোক, সাংসারিক বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তাহার বন্ধুটি কিন্তু পাকা সংসারী—পৃথিবীর ছল চাতুরী বেশ বুঝিত, এবং আবশ্যক মত তীক্ষ্ণবুদ্ধির দ্বারা তাহা ব্যর্থ করিতেও সমর্থ।

"আমি যদি শুধু জানিতাম,—কে আমার কাছ হইতে তাহাকে চুরি করিয়া লইয়াছে।"

"তা হ'লে কি হ'ত?"

"প্রথমে বাড়ী যাইয়া ঘুমাইতাম। বলের দরকার—দেখ আমার হাতটা কি রকম কাঁপছে। তার পর আমি—"

"তার পর তুমি কি ?"

"তার পর কুকুরের মত তাকে গুলি ক'রে মারিতাম। পৃথিবী আমাদের উভয়ের বসতির জন্য নিতান্ত ক্ষুদ্র।"

"তা হ'লে আমার ইচ্ছা, জ্যাক, যেন তাহার সহিত তোমার কখনও দেখা না হয়।"

"তুমি আমার সুহৃদ!"

"তোমার বন্ধু বলিয়াই এই প্রকার কামনা করি।"

"তুমি আমার অপেক্ষা বুদ্ধিমান। যখন কোনও বিপদে পড়েছি, তুমি আমাকে উদ্ধার করেছ; সেই জন্য আজ তোমার নিকট এসেছি।"

তাহার বন্ধু ধীরে ধীরে বলিল, "হাঁ।"

"কিন্তু তুমি ত কোন পরামর্শ দিতেছ না। তুমিও যেন আমার মত হতবুদ্ধি হয়েছ।"

"হাঁ।"

"আমার সমস্ত শরীর জ্বলে যাচ্ছে, তুমি কি না আমাকে চুপ করে থাকতে বল ?"

"তোমার ধৈর্য্য অবলম্বন করাই উচিত। তাহা ভিন্ন আর উপায় কি ? বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি হয়,—এ কথা আমার চেয়ে জ্ঞানী লোকেরা বলিয়া গিয়াছেন।"

"তুমি কি মনে কর, আমার স্ত্রীর সঙ্গে আবার দেখা হবে ?"

"আমি—আমাকে ক্ষমা কর। আজ রাত্রে আমার শরীরটা বড় ভাল নয়। তোমার খবরটা শুনে একবারে আত্মহারা হয়ে পড়েছি। তোমাকে সান্ত্বনা করিবার ক্ষমতা নাই। আজ বাড়ী যাইয়া ঘুমাও। কাল সকালে যাহা ভাল হয় বলিব।"

"তবে আসি।"

উভয়ে করমর্দ্দন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। জ্যাকের হস্তে তখনও তাহার স্ত্রীর পত্রখানি। সে শূন্যদৃষ্টিতে পত্রখানি দেখিতেছিল। তাহার বন্ধুর মূর্চ্ছার উপক্রম দেখিয়া জ্যাক একটু আশ্চর্য্য হইয়াছিল। তাহার হৃদয়ে বিষম ব্যথা, কিন্তু তথাপি সে ত দাঁড়াইয়া আছে।

নক্ষত্ররাজিত রাত্রে শস্যক্ষেত্রের ভিতর দিয়া সে জনশূন্য গৃহে উপস্থিত হইল। তাহার কণ্ঠস্বরে নৈশনিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইতেছিল।

জ্যাক স্ত্রীর নাম ধরিয়া ডাকিল, কিন্তু কোনও উত্তর নাই।

বাড়ী পৌঁছিলে স্ত্রীর ছোট কুকুরটি কাছে আসিল। জ্যাক তাহাকে আদর করিল। তাহার পর টেবিলের উপর স্ত্রীর সূচীকার্য্যের বাক্সটি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। এক দিন এ সমস্তই তাহার প্রিয়তমার ছিল। কিন্তু সে মধুর দিন যেন বহুকাল গত হইয়াছে।

সে বলিল, "বন্ধুর কথাই ঠিক। আমি অপেক্ষা করিয়া দেখি। এক দিন না এক দিন তাহার সহিত দেখা হইবে। প্রতিশোধের জন্য অপেক্ষা করাই ভাল। ধৈর্য্য ধরিলে সমস্তই মিলে।"

* * * * *

দশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। আবার গ্রীষ্মকালে সোনার রঙ্গের শস্য হইয়াছে। সান্ধ্যবায়ুভরে শস্যের শিষগুলি পরস্পরের দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িতেছিল। বহুবর্ষ প্রবাস হইতে শ্রীভ্রষ্ট কাতর মুখে জ্যাক বন্ধুর গৃহে উপস্থিত হইল।

ইয়র্ক বলিল, "ফিরে এসেছ? তোমাকে দেখে বাঁচলাম।"

"আমি প্যারিসে গিয়াছিলাম। সেখান হইতে একটা খবর লইয়া আসিতেছি।"

"কাহার নিকট হইতে?"

"আমার স্ত্রীর কাছ থেকে।"

ইয়র্কের মুখ শুকাইয়া গেল, তবুও সাহসে ভর করিয়া বলিল, "তা হ'লে সে এখনো বেঁচে আছে?"

"এত দিন বাঁচিয়া ছিল, তাহা না হইলে কে এ খবর পাঠাইবে? এখন সে মরিয়াছে।"

অনেকক্ষণ দু'জনে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল; জ্যাক ক্যারিংটন বন্ধুর কুঞ্চিত অবয়বের দিকে চাহিয়াছিল।

ইয়র্ককে যেন কে জোর করিয়া বলাইল, "কোথায় এবং কি প্রকার অবস্থায় তাহাকে দেখিলে?"

"প্যারিসের একটা গলিতে উপরতলার এক অতি ক্ষুদ্র গৃহে। গৃহ সূর্য্যালোকে পরিপূর্ণ। সে আলার কাছ হইতে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছিল। পরমেশ্বর তাহাকে আমার নিকট হইতে রক্ষা করুন! হয় ত আমি তাহাকে

চিনিতে পারিতাম না। মৃত্যুর বা তদপেক্ষা কোনও ভয়ানক পদার্থের ছায়া তাহার মুখে পড়িয়াছিল।"

"সে কথা কহিতে পারিয়াছিল?"

"পারিয়াছিল,—কিন্তু এত আস্তে যে আমি তাহার মুখের কাছে কান পাতিয়া অনেক কষ্টে শুনিয়াছিলাম। সে এত শত বার আমার ক্ষমা চাহিতেছিল যে, তাহাতে আমার কেমন কষ্ট বোধ হইতেছিল।"

"তুমি তাহাকে ক্ষমা করিয়াছ?"

"বহুদিন পূর্ব্বে।"

"সে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল?"

"সে বলিল, কি মোহিনীশক্তিপ্রভাবে উন্মত্তের ন্যায় তাহার জ্ঞান লুপ্ত হইয়াছিল। সে শক্তিকে বাধা দিবার তাহার দুর্ব্বল হৃদয়ে ক্ষমতা ছিল না। তাহার পলায়নের বৃত্তান্তও বলিল, সে কথা শুনিলে অতি কঠিন হৃদয়ও গলিয়া যায়। ছোট কুকুরটির জন্য, যে গাছগুলিতে জল সেচন করিত, সেই বৃক্ষগুলির জন্য, কত কাঁদিয়াছিল। কিন্তু যাহার সমস্ত জীবনটা এমন করিয়া নষ্ট করিয়াছে, তাহার জন্য একবিন্দুও অশ্রু পড়িল না।"

"স্ত্রীলোকের এই ধরণ"—কথা কয়েকটি যেন যন্ত্রের মধ্য হইতে বাহির হইল।

"যদিও তুমি বিবাহ কর নাই, কিন্তু স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে দু'কথা জোর করিয়া বলিতে পার। মন্দভাগিনী নিজেকেও শতবার ধিক্কার দিতেছিল। সে বলিল, তাহার বয়সের দোষ নহে, দোষ তাহার নিজের। যে তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া কুকুরের মত মরিবার জন্য পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তাহার শাস্তিও সে প্রার্থনা করিল না। সৌন্দর্য্যহ্রাস হইলে বা অন্য কোনও রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া হতভাগা বহুবৎসর হইল তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে।"

ইয়র্ক পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "সে তোমাকে সমস্ত বলিয়া গিয়াছে?"

"সুধু যে তাহাকে শান্তিময় গৃহ হইতে ছিন্ন করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহার নাম বলে নাই।"

"ভালই করিয়াছে। হলাহল রাখিয়া যাওয়ায় লাভ কি?"

ইয়র্ক অতি তাড়াতাড়ি কথাগুলি বলিল। তাহার পাণ্ডুর কপোলে পুনর্ব্বার রক্তের সঞ্চার হইতেছিল।

"সে না বলুক, আমি তাহার নাম জানি।"

জ্যাকের স্বরে তিরস্কার বা ক্রোধের লক্ষণমাত্র নাই। তাহার স্থির অচল দেহ দেখিলে প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া ভ্রম হয়।

জ্যাক ধীরে ধীরে স্পষ্ট করিয়া বলিল, "দশ বৎসর পূর্ব্বে একদিন আমার সমস্ত যন্ত্রণা তোমার কাছে বলিতে আসিয়াছিলাম। অনেক দিন হইয়া গিয়াছে। তথাপি আমার কথা বোধ হয় তোমার মনে আছে?"

কিয়ৎক্ষণ ইয়র্কের সম্মতির অপেক্ষা করিয়া জ্যাক আবার বলিল, "তোমাকে বলিয়াছিলাম, আমার প্রিয়তমাকে যে চুরি করিয়াছে, তাহার ও আমার জন্য এই পৃথিবী অতি ক্ষুদ্র।"

"হাঁ", ইয়র্কের কথা অতি অস্পষ্ট।

ক্যারিংটনের স্থির দেহ একবার স্পন্দিত হইল। সে জামার পকেটে হাত দিল। সেই স্থানে হাত রাখিয়া আর একবার বলিল, "আমার সেই মত এখনও আছে। আমি তোমাকে বাঁচিতে দিলাম, কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্ট জগতে তোমার ও আমার দু' জনের স্থান নাই। সেই জন্য—"

তাহার পরমুহূর্ত্তে সেই গোধূলিধূসর গৃহে অগ্নি স্ফুরিত হইল। গুরুপদার্থের পতনশব্দের সঙ্গে সঙ্গে অনেক ভয়বিহ্বল লোক ছুটিয়া আসিল। এই কোলাহলের মধ্যে ইয়র্ক স্থাণুবৎ নির্ব্বাক ও নিশ্চল হইয়া বসিয়াছিল। যখন লোকে আসিয়া তাহার বাহুস্পর্শ করিল, তখন সে শুধু মৃত ব্যক্তির মুখের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঈশ্বরের দোহাই! তোমরা মুখটা ঢাকিয়া দাও।"

উন্মাদগ্রস্ত হইবার পূর্ব্বে ইয়র্কের এই শেষ প্রকৃতিস্থ কথা। *

শ্রীনলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

ইংলণ্ডের সংবাদপত্র।

প্রবন্ধারম্ভেই মনে একটা খট্‌কা উপস্থিত হয়,—সংবাদপত্রকে সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বলিব কি না। সংবাদপত্র সাহিত্যের একাংশ হউক বা না হউক, ইহা কিন্তু নিশ্চিত যে, সংবাদ-পত্রের এক প্রধান অংশ সাহিত্য। সুতরাং আমরা সংবাদপত্রকে সাহিত্যের বিভাগেই

* ইংরাজী হইতে অনুবাদিত।

ধরিয়া লইলাম। "মান্দ্রাজ ষ্ট্যাণ্ডার্ড" পত্রের সম্পাদক মিষ্টার জি. পরমেশ্বরন পিল্লে সম্প্রতি ইংলণ্ডপ্রবাস হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন ;—সেদিন তিনি মান্দ্রাজের কোন সভার অধিবেশনে ইংলণ্ডের সংবাদপত্রের যে কৌতূহলাবহ বিবরণ দিয়াছেন, এবং এ দেশের সংবাদ কিরূপ বিকৃত হইয়া ইংলণ্ডে পৌছায়, তাহার যে বর্ণনা করিয়াছেন,—তাহারই সার নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বিগত বিংশতি বৎসরে এ দেশে দেশীয় কর্তৃক পরিচালিত ও বিদেশীয় কর্তৃক পরিচালিত (অর্থাৎ অ্যাংলোইণ্ডিয়ান) সংবাদপত্রের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে; কিন্তু ইংলণ্ডে

স্বদেশে বিদেশে।

সংবাদপত্রের প্রভাব ও ক্ষমতার সহিত তুলনায়, এ দেশে সংবাদপত্রের প্রভাব ও ক্ষমতা কিছুই নহে। সেথানে ক্ষৌরকার, শকটচালক, এমন কি মজুর পর্য্যন্ত, সকলেই নিয়মমত সংবাদপত্র পাঠ করে ; আবার কেহ কাহারও নিকট সংবাদপত্র চাহিয়া লইয়া কাজ সারে না।—কাজেই অনুমান করুন, বিলাতে সংবাদপত্রের কিরূপ প্রচলন। এ দেশে যাহারা সংবাদপত্র পড়িতে চাহে, তাহারা লয় না ; যাহারা লয়, তাহারা মূল্য দেয় না ; যাহারা মূল্য দেয়, তাহারা পড়ে না ; যাহারা মূল্য দিয়া লইতে পারে, তাহারা চাহিয়া পড়ে। আবার এ দেশে সংবাদপত্রও তত সুলভ নহে ;—কাজেই সংবাদপত্রের প্রচলন অল্প ও তাহার প্রভাবও সামান্য।

এ দেশে দেশীয়পরিচালিত ও অ্যাংলোইণ্ডিয়ান উভয়বিধ সংবাদপত্রেরই শক্তি অল্প। তাহার মধ্যে আবার দেশীয় সংবাদপত্রের প্রভাব আরও অল্প। দেশীয় সংবাদপত্রের যাহা

দেশীয় ও অ্যাংলোইণ্ডিয়ান।

কিছু প্রভাব কেবল শিক্ষিত দেশীয়দিগের উপর—এইখানে পাঠক মনে রাখিবেন, এ দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা অতি সামান্য—দেশীয় সংবাদপত্রের ক্ষীণস্বর ভারতসীমায় যাইতে যাইতেই মিলাইয়া যায়—সাগরপারে সে স্বর আর শ্রুত হয় না। অ্যাংলোইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র সম্বন্ধে এ কথা প্রযোজ্য নহে। ভারতসম্বন্ধীয় যে সকল সংবাদ ইংলণ্ডে যায়, সে সকলই অ্যাংলোইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রের মত। প্রথমতঃ Reuter যে সকল সংবাদ তারযোগে প্রেরণ করেন, সে সকলই অ্যাংলোইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রের সংগ্রহ ; তাহার পর টাইমস্ পত্রের একজন সংবাদদাতা কলিকাতায় ও সিমলায় থাকেন—তিনি অবশ্য অ্যাংলোইণ্ডিয়ান—কাজেই তাঁহার মতও সেই সম্প্রদায়েরই মত। ইহা ভিন্ন রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের অন্যান্য সংবাদপত্রেরও এ দেশে জন ছয়েক সংবাদদাতা আছেন ;—বলা বাহুল্য, ইঁহারাও অ্যাংলোইণ্ডিয়ান। কাজেই দেশীয়দিগের মত আর দেশের বাহিরে যায় না। এইরূপ ব্যাপার যতদিন চলিবে, ততদিন আমাদের কোনও নূতন অধিকারপ্রাপ্তি অসম্ভব ; বরং এবার মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতায় ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের যেরূপ দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে, তাহার পুনরাবৃত্তি হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব।

এবার এই যে সম্পাদকদিগকে গবর্মেণ্টের খরচে আহার দিবার এত হুড়াহুড়ি পড়িয়াছে—ইহার মূলে রক্ষণশীলদলের সংবাদপত্র। অ্যাংলোইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র হইতে

ইংলণ্ডে।

বিকৃত সংবাদ লইয়া, তাহাই প্রকাশ করিয়া, এই সকল সংবাদপত্র ইংলণ্ডের লোককে উত্তেজিত করিয়াছে। এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, ইংলণ্ডের লোক ভারতবর্ষের সংবাদ কেবল টেলিগ্রামেই পাঠ করে ; কিছু দিন পরে যখন ডাকে সম্পূর্ণ সংবাদ যায়, তখন আর সে সংবাদে কাহারও আগ্রহ থাকে না—তাহা তখন 'বাসী' হইয়া পড়ে—তাহা সকল সংবাদপত্রে প্রকাশিতও হয় না। র‍্যাণ্ডের হত্যা, প্লেগসম্বন্ধীয় নিয়ম, চিৎপুরের দাঙ্গা, এই সকল বিষয়ের সংবাদ বিলাতের লোকে তারের স্তম্ভ হইতেই সংগ্রহ করিয়াছে। বলা বাহুল্য, সে সকল সংবাদ আবার অ্যাংলোইণ্ডিয়ান

সংবাদপত্রের বিকৃত সংবাদ হইতে সংগৃহীত। রক্ষণশীলদলের সংবাদপত্র এই সকল সংবাদের উপর চোকাল চোকাল সমালোচনা ঝাড়িতে লাগিলেন;—'একে মনসা, তাহাতে আবার ধুনার গন্ধ' হইল। ইংলণ্ডে রক্ষণশীলদলের সংবাদপত্র সকলের ক্ষমতা অসাধারণ—তাহাদের সংখ্যাও অনেক। একখানি উদারনৈতিক সংবাদপত্রের স্থানে প্রায় তিনখানি রক্ষণশীল সংবাদপত্র। আবার সকল উদারনৈতিক সংবাদপত্র ভারতবাসীদিগের পক্ষসমর্থন করে না; কিন্তু সকল রক্ষণশীল সংবাদপত্রই আমাদের বিপক্ষতাচরণ করিয়া থাকে।

অসত্য সংবাদ ও ভ্রান্ত ধারণা।

বোম্বাইয়ের গোলমালের সময় ইংলণ্ডের সংবাদপত্রে যে সকল সংবাদ প্রকাশিত হইত, তাহার কথা শুনিলে হাস্যসংবরণ করা দুষ্কর হইয়া উঠে। কিন্তু পাঠক মনে রাখিবেন, সেই সকল সংবাদপত্রের ছেলেখেলা আমাদিগের পক্ষে বড় সুবিধাজনক নহে। ইংলণ্ডে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইত, "ভারতবর্ষে সিডিশন", "বিদ্রোহের সূচনা", "আরও ইংরাজ নৃশংসভাবে নিহত"—ইত্যাদি। সেখানে সংবাদপত্র সকল ভারতবাসীদিগকে অতি তীব্রভাবে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সেই সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দেশের লোকের মনে ভ্রান্ত ধারণা স্থান পাইত, আবার এই সকল সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল সংবাদপত্রে সিপাহীবিদ্রোহের ভীষণ চিত্র চিত্রিত হইত; ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের ইতিহাসের সেই রক্তাপ্লুত পৃষ্ঠা দেখিয়া ইংরাজ শিহরিয়া উঠিত। ভারতবর্ষে অ্যাংলোইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রে অসত্য সংবাদ প্রকাশিত হইত; এ দেশ হইতে অ্যাংলোইণ্ডিয়ান সংবাদদাতারা সেই সকল অসত্য সংবাদ প্রেরণ করিতেন; আর রক্ষণশীলদলের সংবাদপত্রে সেই সকল অসত্য সংবাদ স্থান পাইত;—ইহাতেই ইংলণ্ডের লোকের মনে ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল হইয়া যাইত।

ইংলণ্ডের সংবাদপত্রে ভারতবর্ষসম্বন্ধে কিরূপ অসত্য সংবাদ প্রকাশিত হয়, তাহার একটা নমুনা দেখুন। চিৎপুরের দাঙ্গার সময় ৫ই জুলাই টাইম্‌সের সংবাদদাতা টেলিগ্রাফ করিলেন যে, কলিকাতার মুসলমান কশাইরা কতকগুলি ইংরাজের গৃহ-আক্রমণের জল্পনা করিতেছে ও ইংরাজ মহিলাদিগকে প্রহার করিতেছে, দেশীয় সংবাদপত্র সকল ইহাতে আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, আর দেশীয়গণ সহরের সর্ব্বত্র য়ুরোপীয়দিগের অপমান করিতেছে; ইহার পর তিনি সংবাদ দেন যে, চিৎপুরের দাঙ্গায় অন্ততঃ ৬০০ জীবননাশ হইয়াছে! বলা বাহুল্য, এ সংবাদে ইংলণ্ডে হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। সংবাদদাতা যদি ভুল সংবাদ পাইয়া টেলিগ্রাফ করিতেন, তবে তিনি পর দিবস তাহার সংশোধন করিতেন; কিন্তু ভ্রম দুই প্রকার—ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত। সংবাদপ্রেরণের এক মাস পরে সংবাদদাতা টেলিগ্রাফ করিলেন যে, চিৎপুরের দাঙ্গায় গুলি লাগিয়া এগার জন হত ও কুড়ি জন আহত হইয়াছে! ৬০০ হইতে একেবারে ১১! কিন্তু এ সংবাদ যখন বিলাতে গেল, তখন যে অনিষ্ট হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে। এক মাস পরে এ সংবাদ সকল সংবাদপত্রে প্রকাশিতও হইল না,—আর এই এক মাসকাল সংবাদপত্রে '৬০০ জীবননাশ' বলিয়াই প্রবন্ধ চলিয়াছিল। এই এক মাসের মধ্যে একখানা সংবাদপত্রে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ,—"১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এই সকল কৃষ্ণকায়, ভারতবাসীরা আমাদিগকে (ইংরাজদিগকে) ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহারা কত দূর সফলকাম হইয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন। সোজা কথায় বলি, তাহারা কি আবার সেই কাণ্ড করিবে? তাহারা কি কানপুরের স্ত্রীহত্যা ও শিশুহত্যার পুনরভিনয় করিবে? লক্ষ্ণৌ সহরে ইংরাজগণকে সেবার যে যন্ত্রণা দিয়াছিল, তাহারা কি এবার ইংরাজদিগকে আবার তেমনি যাতনা দিবে?"

পাঠক বুঝুন, লেখকের রজ্জুতে কিরূপ সর্পভ্রম হইয়াছে।

আমরা দেখাইয়াছি, যে মিথ্যা সংবাদের বিদ্যুৎ এ দেশে অ্যাংলোইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাই অ্যাংলোইণ্ডিয়ান সংবাদদাতৃগণের দ্বারা ইংলণ্ডে পরিচালিত হইয়া

আমাদিগের কর্ত্তব্য।

সেখানে রক্ষণশীলদলের সংবাদপত্রসমূহের সাহায্যে জনগণের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার নিবারণের উপায় কি? যদি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদদাতাদিগের সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে বিলাতে 'সত্য' সংবাদপ্রেরণের বন্দোবস্ত করা যায়, তবেই এই অনিষ্ট নিবারিত হইতে পারে,—নতুবা নহে। বাস্তবিক এই গোলো-যোগের সময় যদি অ্যাংলোইণ্ডিয়ানদিগের সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে যথার্থ সংবাদ ইংলণ্ডে প্রেরিত ও প্রকাশিত হইত, তবে বোধ হয় আজ তিলককে জেলে পচিতে হইত না, নাটুদ্বয়কে স্বদেশ ও স্বজনগণের নিকট হইতে দূরে যাইতে হইত না, আর নাটুজননীকে বৃদ্ধবয়সে পুত্রদিগের দুরবস্থা দেখিয়া মর্ম্মব্যথায় জীবনত্যাগ করিতে হইত না। যাহা হইবার, তাহা হইয়াছে;—গবর্মেণ্ট ইচ্ছা করিলে এখনও তিলককে ও নাটুদ্বয়কে মুক্তি দিতে পারেন। কিন্তু যাহাতে এইরূপ ব্যাপার আর সংঘটিত হইতে না পারে, তাহার উপায় করা আবশ্যক। ইংলণ্ডের লোক ভারতবর্ষীয় সংবাদ টেলিগ্রাফে ভিন্ন পাঠ করিবেন না; কাজেই যাহাতে সর্ব্বদা ভারতীয় সকল ব্যাপারের সংবাদ তারযোগে ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জাতীয় মহাসমিতির মুখপত্র India আগামী বর্ষ হইতে সাপ্তাহিক হইবে। মোলায়েম মাসিক অপেক্ষা সতেজ সাপ্তাহিকে যে অধিক কাজ হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু India সাপ্তাহিক হউক আর দৈনিকই হউক, ইংলণ্ডে তাহার পাঠকসংখ্যা বড় অধিক হইবে না; কাজেই আমাদিগকে এ দেশের সকল সংবাদ তারযোগে ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে প্রেরণ করিতে হইবে। জাতীয় মহাসমিতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা ও ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক সভা হইতে ইহার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত আবশ্যক।

সংবাদপত্রে এইরূপ সংবাদপ্রেরণ ভিন্ন মিষ্টার পিলে আর একটি প্রস্তাব করিয়াছেন। ইংলণ্ডের জনসাধারণের মধ্যে কোন কথা, বিশেষতঃ রাজনৈতিক কথার প্রচারের দুই মুখ্য

শেষ কথা।

উপায়,—সংবাদপত্র ও বক্তৃতা। কাজেই সংবাদপত্রে সংবাদ প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেও চলিবে না। বৎসরে অন্ততঃ দুই জন রাজ-নীতিবিশারদ দেশীয়কে ইংলণ্ডে পাঠাইতে হইবে; তাঁহারা কতকগুলি সভায় বক্তৃতা করিয়া ইংলণ্ডের জনসাধারণকে ভারতবর্ষের অবস্থা বুঝাইবেন। এইখানে বলিয়া রাখি, এই প্রস্তাব নূতন নহে; ইতিপূর্ব্বেও জাতীয় মহাসমিতি হইতে এইরূপ প্রতিনিধি প্রেরণ করা হইয়াছে। এখন সেই প্রথার পুনঃপ্রচলন আবশ্যক।

সমাজ-তত্ত্ব।

আমেরিকান ও নরওয়েজিয়ান রমণীসমাজ।

সাধারণতঃ লোকের এই একটা বিশ্বাস আছে যে, আমেরিকা স্ত্রীস্বাধীনতার দেশ; সেখানে সকল বিষয়েই স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকার। "ওম্যান অ্যাট্ হোম্" পত্রে শ্রীমতী গার্টরুড

আমেরিকায়।

আথার্টন বলেন, এ বিশ্বাসের মূলে কোনও সত্য নাই। আমেরিকায় বালিকারা বালকদিগের সহিত সমান শিক্ষা পায়, এবং আপনি পতি পছন্দ করে, এই পর্য্যন্ত। যে সকল পুংবৎপ্রগল্‌ভা, শালীনত্ববিবর্জ্জিতা আমেরিকান বালিকা

দেখিয়া বিদেশীয়গণ মনে করেন, আমেরিকায় স্ত্রীস্বাধীনতার অসাধারণ আধিক্য,—তাহারা সে দেশে ভদ্রসমাজে মিশিতে পায় না। আমেরিকায় যে যুবতী অভিভাবকহীন অবস্থায় কোন অপরিচিত পুরুষের সহিত বেড়াইতে বাহির হয়েন, তাঁহার পক্ষে ভদ্রসমাজের দ্বার রুদ্ধ। আমেরিকায় বালিকার পক্ষে যাহার তাহার নিকট কোন উপহারগ্রহণও নিষিদ্ধ।

প্রমাণস্বরূপ লেখিকা বলিয়াছেন যে, একবার তাঁহার স্বামীর অনুপস্থিতিকালে তিনি ষোড়শবর্ষের অনধিকবয়স্ক কতকগুলি বালক বালিকাকে সান্‌ফ্রান্সিস্কোতে মেলা দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলেন ও রাত্রের ট্রেনে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। এই অপরাধে ছয় মাস ধরিয়া তাঁহাকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল।

কাজেই দেখা যাইতেছে, আমেরিকায় স্ত্রীস্বাধীনতা বিশেষরূপ সীমাবদ্ধ। কেবল আমেরিকায় বালিকারা যাহাতে নানা বিষয়ে কোন মত স্থির করে ও তাহা প্রকাশ করিতে পারে, তাহারই চেষ্টা হয়—ইংলণ্ডে তাহা হয় না।

"হিউম্যানিটেরিয়ান" পত্রে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া মনে হয়, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়াই প্রকৃত স্ত্রীস্বাধীনতার দেশ। যাঁহারা সে দেশের লোকের আচার, ব্যবহার ও ভাষা জানেন না, তাঁহারা রমণীগণের স্বাধীনতার মাত্রাধিক্য দেখিয়াই বড় ভুল বিশ্বাস লইয়া আইসেন। সেখানে যুবতীরা একাকিনী পথে ভ্রমণে বাহির হয়েন এবং নাট্যালয়েও গমন করেন। নিশীথে কোন সমিতি হইতে গৃহপ্রত্যাবর্ত্তনকালে যুবতীদিগের সহিত কোন ভৃত্য থাকিবারও প্রয়োজন নাই; তাঁহারা একাকিনীই ফিরিয়া আইসেন। যে সকল রমণীকে খাটিয়া খাইতে হয়, তাহাদের স্বাধীনতা অবশ্যই অধিক—অপরে সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করে। সেখানে

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায়।

মহিলারা স্বচ্ছন্দে একাকী হোটেলে গিয়া আহারাদি করেন। সেখানে কোন হোটেলে চা-বা-কফি-পান-রত কৌতুকহাস্যে ব্যাপৃত যুবক যুবতীকে দেখিলেই কেহ যেন এমন মনে না করেন যে, তাহারা প্রেমিক প্রেমিকা, হয় ত তাহারা বন্ধুমাত্র।

এ কথা বলাই বাহুল্য যে, রমণীদিগের স্বাধীনতার এই আতিশয্যের ঔচিত্য বিষয়ে বিশেষ মতভেদ লক্ষিত হয়। এ মতভেদ প্রায় সর্ব্বদেশেই দেখা যায়।

অবাধ স্ত্রীস্বাধীনতার সর্ব্বপ্রধান অনিষ্টকারিতা এই যে, এই অতিরিক্ত স্বাধীনতায় মহিলাদিগের শালীনতা ও কোমলতা নিতান্তই অল্প হইয়া দাঁড়ায়। তবে প্রবন্ধলেখিকা বলেন যে, নরওয়েজিয়ান রমণীদিগের ব্যবহার যেরূপই হউক, তাহাদিগের হৃদয় অত্যন্ত নির্ম্মল ও জ্ঞানপিপাসা অত্যন্ত প্রবল।

বিবিধ।

ম্যাক্সমূলারের পূর্ব্বস্মৃতি।

অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের মত একজন সর্ব্বত্রপূজিত পণ্ডিতের জীবনে অতি উচ্চ হইতে অতি নগণ্য বহুবিধ লোকের কথা জানিবার সুবিধা হয়। অধ্যাপক এখন জীবনের শেষ সীমায় উপস্থিত। বহুপ্রকার অভিজ্ঞতাপূর্ণ কর্ম্মবহুল জীবনের স্তূপাকার স্মৃতি এখন তাঁহার চারিদিকে ব্যাপ্ত। সেই সকল স্মৃতির মধ্যে তিনি এখন কিছু কিছু "কস্‌মোপলিস্‌" পত্রে প্রকাশিত করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে একবার আমরা বহু বিদ্বজ্জন সম্বন্ধে তাঁহার স্মৃতির সারসংগ্রহ দিয়াছিলাম। * এবার অধ্যাপক জ্ঞানবান ছাড়িয়া ধনবানদিগের সম্বন্ধীয় স্মৃতি প্রকাশিত করিয়াছেন। সেই মনোরম প্রবন্ধ হইতে আমরা কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

---

* ১৩০৩ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসের 'সহযোগী সাহিত্য' দ্রষ্টব্য।

জার্ম্মানীতে "ঋগ্বেদ" প্রকাশমানসে অধ্যাপক বার্লিনে ছিলেন। তিনি সেখানকার পুস্তকাগারে অধ্যায়নরত ছিলেন। তৎকালে অ্যালেক্‌জ্যাণ্ডার ভন্ হাম্‌বোল্ট, নৃপতিকে তাঁহার কথা

নৃপতির নিমন্ত্রণ ও পুলিশের কুব্যবহার।

বলিয়া তাঁহার সঙ্কল্পিত মহদনুষ্ঠানে নৃপতির সাহায্যদানের চেষ্টায় ছিলেন। পরিশেষে রাজা একদিন অধ্যাপককে আহারের নিমন্ত্রণ করেন। নিমন্ত্রণের দিন পুলিশের একজন কর্ম্মচারী অধ্যাপকের সহিত সাক্ষাৎ করিল, এবং নানা প্রশ্নের পর তাঁহাকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বার্লিন পরিত্যাগ করিতে হুকুম করিল। কি সন্দেহে যে পুলিশ অধ্যাপকের উপর সহসা এই হুকুম জারি করিল, তাহা পুলিশই জানে; কিন্তু এই অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত হুকুমে অধ্যাপক কিছু বিপদে পড়িলেন। অধ্যাপক তাঁহার Passport দেখাইলেন, বলিলেন, আর এক সপ্তাহ হইলেই তাঁহার কার্য্য শেষ হয়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; হাকিম নড়ে, তবু হুকুম নড়ে না।—পুলিশের হুকুম বজায় রহিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া শেষে অধ্যাপক পুলিশের কর্ম্মচারীকে বলিলেন—"আচ্ছা, পুলিশের কর্ত্তাদের বলিবেন, আমি তাঁহাদিগের হুকুম তামিল করিব,—এখনই বার্লিন ছাড়িয়া যাইব, কিন্তু তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া মহারাজকে জানান যে, আজ রাত্রে আমি তাঁহার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিব না।" পুলিশের কর্ম্মচারী প্রথমে ভাবিল, বুঝি অধ্যাপক চালাকি করিতেছেন; কিন্তু যখন দেখিল, ইহা চালাকি নহে, তখন সে যেন বজ্রাহত হইল। সে অধ্যাপককে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। বলা বাহুল্য, অধ্যাপককে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বার্লিন ত্যাগ করিতে হয় নাই।

মহারাণী বিক্টোরিয়ার বিবাহকালে কোন কোন অপরিমিতদূরদর্শী আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, পতির উপদেশানুবর্ত্তিনী হইয়া মহারাণী হয় ত কাজ করিবেন। সেই কথা লইয়া

রাজনৈতিক সংবাদ-প্রকাশের আতঙ্ক।

অধ্যাপক আর একটা তদ্রূপ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। যখন লর্ড জন রাসেলকে পররাষ্ট্রসচিব করিবার কথা হয়, তখন ক্যাবিনেটের কোন কোন সভ্য তাহাতে আপত্তি করেন। তাঁহাদিগের আপত্তির দুই কারণ,—প্রথমতঃ, লর্ড জনের উপর তাঁহার পত্নীর প্রভাব অত্যন্ত অধিক; দ্বিতীয়তঃ, লর্ড জনের পত্নীর অসাবধানতায় রাজনৈতিক গোপনীয়-সংবাদাদি প্রকাশিত হইয়া যাইতে পারে;—স্ত্রীলোকের পেটে কথা থাকে না। লর্ড পামারষ্টোন এই সকল কথা নীরবে শুনিলেন, তাহার পর বক্তাদিগের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ইহার নিবারণের একমাত্র উপায় এই যে, আমাদের মধ্যে একজন সর্ব্বদা রাসেল-দম্পতীর সহিত একত্র শয়ন করিব।" তাহার পর সকলের বিস্ময়বিস্ফারিত নয়ন দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, আমরা পালা করিয়া লইব।"

মহারাণী বিক্টোরিয়ার উইণ্ডসর প্রাসাদে নিমন্ত্রিত হইয়া অধ্যাপক একবার বিষম বিপদে পড়িয়াছিলেন। নিয়মিত সময়ে উপস্থিত হইয়া অধ্যাপক দেখিলেন,—সর্ব্বনাশ!—

প্রাসাদে অতিথি।

তাঁহার পোর্টম্যাণ্টো আসে নাই। তিনি ক্রমাগত টেলিগ্রাফ করিতে লাগিলেন। শেষে সংবাদ পাইলেন, পোর্টম্যাণ্টো অক্সফোর্ড ষ্টেশনে পড়িয়া আছে। কিন্তু রাত্রি সাড়ে আটটার পূর্ব্বে অক্সফোর্ড হইতে কোন ট্রেন আসিয়া পৌঁছায় না। প্রিন্স লিয়োপোল্ড তখন উইণ্ডসরে থাকিতেন। বিপন্ন অধ্যাপক তাঁহাকে সকল কথা জানাইলেন। অধ্যাপক বলিলেন, তিনি লিখিয়া পাঠাইবেন যে, কোনও বিশেষ কারণে তিনি আহারে যোগদান করিতে পারিবেন না। প্রিন্স লিওপোল্ড বলিলেন—"তাহা হইবে না; রাণী যখন আপনাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তখন আপনাকে আহারে যোগদান করিতেই হইবে।" প্রিন্সের কথা শুনিয়া অধ্যাপকের চক্ষুঃস্থির।

প্রিন্স তখন বাটীর সকলের নিকট হইতে পোশাক যোগাড় করিতে লাগিলেন। কাহারও কোট, কাহারও ওয়েষ্টকোট, কাহারও জুতা, এইরূপে পোশাকের যোগাড় হইল। কিন্তু সেই বিচিত্র সম্মিলনে এরূপ দাঁড়াইল যে, অধ্যাপক স্পষ্টই বলিলেন,—সেরূপে সং সাজিয়া রাণীর নিকট যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। হতাশ হইয়া তিনি যখন আহারে যোগদান করিতে পারিবেন না বলিয়া পত্র লিখিতে বসিলেন, তখন সাড়ে আটটার গাড়ী আসিল। সেই গাড়ীতে অধ্যাপকের পোর্টম্যাণ্টোও পৌঁছিল। তাড়াতাড়ি পোর্টম্যাণ্টো খুলিয়া পোশাক বাহির করিয়া পোশাক পরিয়া অধ্যাপক নিশ্চিন্তভাবে আহারে যোগদান করিলেন। সুখের বিষয়, মহারাণীর সেদিন ফিরিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল; তাই আহারেও কিছু বিলম্ব ঘটিয়াছিল।

অধ্যাপক বলেন, ব্যাবিলোনীয়, পারসীয়, ম্যাসিডোনীয় ও রোমক সাম্রাজ্য সকলের সহিত তুলনা করিলেও এ কথা বলা যায় যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মত সাম্রাজ্য আর হয় নাই। আবার ইংলণ্ডের মত স্বাধীনদেশ আর কোথায় আছে? (দুঃখের বিষয়, ইংলণ্ডের অধীন দেশ সকলের সহিত ব্যবহারকালে এই প্রশংসিত স্বাধীনতা সময় সময় নিতান্তই সঙ্কুচিত হইয়া আইসে।) এখন লোকে বলিবে, বহুশতাব্দীর পরীক্ষার পর এখন এ কথা বলা যাইতে পারে, একজন রাজা বা রাণীর অধীনে Constitutional গবর্মেণ্টই সর্ব্বোৎকৃষ্ট গবর্মেণ্ট।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। আশ্বিন। শ্রীমতী হিরন্ময়ী দেবীর "আগমনী" নামক কবিতাটি এত আন্তরিকতাপূর্ণ ও করুণ সমবেদনায় এমন অভিষিক্তি যে, মুগ্ধহৃদয়ে পাঠ করিয়া কবিত্ব-বিচারে আর প্রবৃত্তি থাকে না। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'জনপ্রবাদমূলক' গল্প—"আমাইজাঙ্গাল" কৌতূহলোদ্দীপক ও সুখপাঠ্য। লেখকের ভাষা অপেক্ষাকৃত পরিমার্জ্জিত ও রচনাকৌশল সুসংস্কৃত হইলে গল্পটি অত্যন্ত মনোরম হইত। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "দীপান্বিতা"র আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। ক্রমে ক্রমে তাঁহার পল্লীচিত্রগুলি নিতান্ত 'একঘেয়ে' ও কষ্টকল্পিত পুনরাবৃত্তিমাত্রে পরিণত হইতেছে। হিন্দুবিধবা যেমন পঞ্জিকার আদেশ অনুসারে অমাবস্যা প্রভৃতি তিথির পালন ও একাদশীর উপবাস করেন, দীনেন্দ্র বাবুও যেন তেমনই পাঁজী খুলিয়া বসিয়া আছেন;—পর্ব্ব দেখিলেই হিন্দু বিধবার একাদশীর মত অবশ্যকর্ত্তব্যজ্ঞানে তাহার চিত্র অঙ্কিত করিতেছেন। অনবরত কচলাইলে লেবু তিক্ত হইয়া যায়,—দীনেন্দ্র বাবুর মত একজন পল্লীচিত্রকর যে এই গ্রাম্য বচনটির যাথার্থ্য অবগত নহেন,—ইহা বিচিত্র বলিয়া বোধ হয়। এই সংখ্যায় "কাহাকে" সমাপ্ত হইল।—"যথা পূর্ব্বং তথা পরং।" শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "সূর্য্য" প্রবন্ধটি উৎকৃষ্ট। একে বিষয়গুণে জ্যোতির্বিষয়ক প্রবন্ধগুলি সাধারণতঃ সাধারণের অনধিগম্য; তদুপরি মাধব বাবুর ভাষাও সাধারণ পাঠকের পক্ষে দুরূহ। অবশ্য, তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধগুলি সর্ব্বসাধারণের জন্য কল্পিত নহে। কবে মাধব বাবু সর্ব্বসাধারণের জন্য লিখিতে আরম্ভ করিবেন? বিলাতে যাহাকে "Popular Science" বলে, আমাদের সাহিত্যে কি বিশেষ-বিৎ মাধব বাবুই জ্যোতিষে তাহার পথপ্রদর্শক হইবেন না?

উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি।

ইতিপূর্ব্বে ইতিহাসে দীর্ঘতমার স্থান নির্ণয় করিতে যত্ন করিয়াছি। এক্ষণে ঋগ্বেদে তাঁহার স্থান কিরূপ, দেখা যাউক।

যে ঋগ্বেদসংহিতা সম্প্রতি প্রচলিত, ইহা শাকল শাখার ঋক্‌সংহিতা বলিয়া বিখ্যাত। ইহা দশ মণ্ডলে বিভক্ত। এই দশ মণ্ডলের মধ্যে দ্বিতীয় হইতে অষ্টম পর্য্যন্ত সাতটি মণ্ডল সাত জন বিখ্যাত ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। যথা:—

২য় মণ্ডল—ঋষি গৃৎসমদকর্তৃক দৃষ্ট।
৩য় „ „ বিশ্বামিত্র „
৪র্থ „ „ বামদেব „
৫ম „ „ ভরদ্বাজ „
৬ষ্ঠ „ „ অত্রি „
৭ম „ „ বসিষ্ঠ „
৮ম „ „ কণ্ব „

ইহা একটি স্থূল মত। বাস্তবিক ঐ কয়েকটি মণ্ডল যে প্রত্যেকেই কেবল এক এক জন ঋষির রচিত, তাহা নহে। পণ্ডিতসমাজে ঐ কয়েকটি মণ্ডল প্রত্যেকে তত্তৎ ঋষিবংশের ঋক্‌সংহিতা বলিয়া পরিগণিত। কোন এক সময়ে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সাতটি বিখ্যাত ঋষিবংশ বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহারা উপরি-উক্ত সাত জন ঋষিকে আপনাদের আদিপুরুষ বলিয়া পরিচয় দিতেন। সেই সাত ঋষিবংশের অধ্যাপকেরা নিজ নিজ পরিষদে পূর্ব্বপুরুষগণের রচিত এক একটি ঋক্‌সংহিতা সংগ্রহ করিয়া রক্ষা করেন। তাহাই কালক্রমে সমগ্র ঋক্‌সংহিতার দ্বিতীয় হইতে অষ্টম পর্য্যন্ত সাতটি মণ্ডলে পরিণত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত সোমযাগে বহিষ্পবমান স্তোত্রের জন্য সোমের প্রশংসাপূর্ব্বক যে সকল সামসংগীত রচিত হইয়াছিল, সামগায়কেরা সেই সকল সংগীতের ঋক্ একত্র করিয়া একটি পৃথক সংহিতা প্রণয়ন করেন; তাহাতে উল্লিখিত সাত ঋষির রচিত পবমান স্তোত্র সকলও নিবিষ্ট হইয়াছিল। এই সংহিতা উত্তরকালে সমগ্র সংহিতার নবম মণ্ডলে পরিণত হইয়াছে।

ইহার পর যে সকল ঋষির ঋক্ অবশিষ্ট রহিল, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত হইল। যে সকল ঋষি শতাধিক ঋক্ রচনা করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের রচনা এক ভাগে,—এবং অবশিষ্ট ঋষিগণের ঋক্ দ্বিতীয় ভাগে নিবদ্ধ হইল। প্রাতরনুবাকে এক শত ঋক্পাঠের ব্যবস্থা ছিল। বোধ হয়, যে সকল ঋত্বিকেরা প্রাতরনুবাকপাঠে নিযুক্ত হইতেন—তাঁহারা শতাধিকঋক্রচনাকারী এক এক ঋষির ঋক্ কণ্ঠস্থ করিতে পারিলেই স্ব স্ব কার্য্যের যোগ্য বলিয়া পরিগণিত হইতেন। এই সকল শতাধিকঋক্রচনাকারী ঋষিরা 'শতর্ষি' নামে বিখ্যাত। ইঁহাদের প্রত্যেকের রচনা একদা এক একটি ক্ষুদ্র সংহিতার আকার ধারণ করিয়াছিল, এবং সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংহিতা একত্র করিয়া বর্ত্তমান ঋক্সংহিতার প্রথম মণ্ডল সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহা তজ্জন্য 'শতর্ষিগণের মণ্ডল' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

এ স্থলে বলা উচিত যে, এই শতসংখ্যাগণনার এক একটি চরণ এক একটি ঋক্ বলিয়া গণিত হইয়াছে। যথা :—

"গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণো অর্চন্তি অর্কমার্কিণঃ।
ব্রহ্মাণস্ত্বা শতক্রতো উদ্বংশমিব যেমিরে॥"

ইহা এক্ষণে একটি ঋক্ বলিয়া গণ্য,—কিন্তু উল্লিখিত গণনায় ইহা দুইটি ঋক্ বলিয়া গণ্য। এই কথা স্মরণ রাখিলে দেখা যাইবে, প্রথম মণ্ডলের সকল ঋষিই শতাধিক চরণ বা ঋক্ রচনা করিয়া গিয়াছেন; কেবল মধুচ্ছন্দার পুত্র জেত এই নিয়ম রক্ষা না করিয়াও 'শতর্ষিগণের মণ্ডলে' স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই একটিমাত্র ব্যতিক্রমে নিয়মের যে ব্যভিচার ঘটিয়াছে—তাহার কারণ ইহাই বোধ হয় যে, কোনও সময়ে জেতার রচনা তদীয় পিতা মধুচ্ছন্দার রচনা বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল, পরে সেই ভ্রম ধরা পড়ে; কিন্তু তখন আর সংহিতার জেতার স্থান পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।

শতর্ষিগণকে বাদ দিয়া অন্য ঋষিদের যে ঋক্সূক্ত অবশিষ্ট রহিল, তাহাই ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল হইল। পূর্ব্বকালে প্রয়োগের জন্য ঋক্মাত্রেরই ঋষি, ছন্দ ও দেবতার জ্ঞান বিশেষ আবশ্যক ছিল। যজমানের গোত্র ও প্রবর অনুসারে বিশেষ বিশেষ ঋষির রচিত ঋক্ই প্রশস্ত বলিয়া গণ্য হইত। তজ্জন্য কোন্ ঋক্ কোন্ ঋষির রচনা, ইহা জানা নিতান্ত অপরিহার্য্য ছিল। অধিকন্তু উচ্চারণের জন্য ছন্দঃজ্ঞানের আবশ্যকতা, এবং এক দেবতার প্রশংসা অন্য দেবতার উপাসনাস্থলে অনুপযোগী বিধায়ে দেবতাজ্ঞানের আবশ্যকতাও অপরিহার্য্য

ছিল। সুতরাং প্রথম হইতেই ঋক্‌রচনাকারী ঋষিদের নাম স্মরণ করিয়া রাখা হইত। তথাপি স্থলবিশেষে কোনও কোনও ঋষির নাম একবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে,—কোনও কোনও ঋক্‌সূক্তের রচনাকারী ঋষি সম্বন্ধে মতভেদ দাঁড়াইয়াছে; এবং স্থলবিশেষে একের রচনা অন্যের রচনা বলিয়া পরিগৃহীত যে না হইয়াছে, তাহাও দৃঢ়তার সহিত বলা যায় না। যে সকল ঋক্‌সূক্তের ঋষির নাম অজ্ঞাত, তাঁহাদের এক এক জন ঋষি কল্পিত হইয়াছেন;—অথবা, ঋষির অনির্দ্দেশ্যতাবশতঃ 'প্রজাপতি'ই ঋষি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। দশম মণ্ডলেই এই শ্রেণীর ঋক্‌সূক্তের সংখ্যা অধিক।

ফলতঃ ইহা নিশ্চিত যে, কালের পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসারে বর্ত্তমান ঋক্‌বেদ-সংহিতায় সূক্ত বা মণ্ডলের স্থাননির্দ্দেশ হয় নাই। সুতরাং, ঋগ্বেদ-সংহিতায় দীর্ঘতমার স্থান দর্শনে অন্য অন্য ঋষির সহিত তাঁহার পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণীত হইবার নহে।

ঋগ্বেদসংহিতায় দীর্ঘতমা এক জন 'শতর্ষি' ঋষি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। বাস্তবিকও তাঁহার রচিত ঋক্ এক শতের অনেক অধিক। এই জন্য সংহিতার প্রথম মণ্ডলেই আমরা দীর্ঘতমার দর্শন পাই। তিনি সর্ব্বশুদ্ধ ২৫টি ঋক্‌সূক্ত রচনা করেন; অথবা তদ্রচিত ২৫টিমাত্র ঋক্‌সূক্ত কালের প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে আমাদের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহা ঋক্‌বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ১৪০ হইতে ১৬৪ সূক্ত বলিয়া পরিগণিত। উহা ১ হইতে ২৫ পর্য্যন্ত গণিত হইল না কেন, তাহার কারণনির্দ্দেশ করা বড়ই কঠিন। প্রথম মণ্ডলের সর্ব্বপ্রথমেই মধুচ্ছন্দা ঋষির সূক্ত। মধুচ্ছন্দা দীর্ঘতমা হইতে অনেক অর্ব্বাচীন। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ ঋষির ঋক্‌সূক্তও দীর্ঘতমার পূর্ব্বেই প্রথম মণ্ডলে স্থান পাইয়াছে। সুতরাং শতর্ষি ঋষিগণকেও যে সময়ের পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসারে প্রথম মণ্ডলে সাজানো হইয়াছে, তাহা নহে।

দীর্ঘতমার পিতা উচথ্য এক জন ঋক্‌রচনাকারী ঋষি ছিলেন; কিন্তু তাঁহার রচিত কয়েকটি পবমান সোমের অর্চ্চনাবিষয়ক ঋক্‌মাত্র সংরক্ষিত হইয়াছে। ইহাতে অনুমান হয়, তিনি এক জন সামগায়ক ছিলেন। দীর্ঘতমার উশিক্ বা উশিজ নামে এক পত্নী ছিলেন;—তাঁহার গর্ভে দীর্ঘতমার ঔরসে বিখ্যাত ঋষি কক্ষীবানের জন্ম হয়। 'শতর্ষি'গণের মধ্যে কক্ষীবান অন্যতম। কক্ষীবানের কন্যা ঘোষা এক জন ব্রহ্মবাদিনী ঋষিকন্যা ছিলেন। তাঁহার শরীরে কোন রোগ উপস্থিত হওয়ায় পরিণত বয়সেও তাঁহার বিবাহ হয় নাই; কিন্তু

অবশেষে তিনিও দেবতাদের অনুগ্রহে পতিলাভ করিয়া সুহস্ত্যের জননী হয়েন।—সুহস্ত্যও এক জন ঋক্‌রচনাকারী ঋষি। কিন্তু ঘোষা ও সুহস্ত্যের ঋক্‌ সংখ্যার অল্পতাবশতঃ দশম মণ্ডলে স্থানলাভ করিয়াছে।

ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, দীর্ঘতমার বংশ একটি ঋষিবংশ। এই বংশে উত্তরোত্তর আমরা পাঁচ জন ঋষি দেখিতে পাইলাম;—তন্মধ্যে চার জন পুরুষ, এবং এক জন স্ত্রী।

দীর্ঘতমার পৌত্রী ঘোষার ঋক্‌সূক্তে অবগত হওয়া যায়, তাৎকালিক রীতি অনুসারে বিধবা স্ত্রীলোকেরা দেবরের সহিত সহবাস করিতেন। দীর্ঘতমা সম্বন্ধে এইরূপ উপাখ্যান শ্রুত হওয়া যায় যে, বৃহস্পতি নামে তাঁহার এক পিতৃব্য ছিলেন। তদীয় মাতা মমতা দেবীর গর্ভে বৃহস্পতির ঔরসে বিখ্যাত ঋষি ভরদ্বাজ জন্মগ্রহণ করেন। যে আকারে এই উপাখ্যান পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সুরুচির অনুরোধে এ স্থলে উদ্ধৃত হইল না; অধিকন্তু তাহা অতিপ্রাকৃত, সুতরাং মিথ্যা। সেই গল্পের সারাংশ অবলম্বন করিয়া ইহাই অনুমান হয় যে, মমতা দেবী বিধবা হইলে, বৃহস্পতির সহবাসে গর্ভবতী হইয়া ভরদ্বাজের জননী হইয়াছিলেন। এই অনুমান সত্য হইলে, দীর্ঘতমা ও ভরদ্বাজ সমসাময়িক ঋষি ছিলেন। মহাভারতের ইতিহাসেও ভরদ্বাজ ঋষি দুষ্মন্তপুত্র ভরতের সমকালীন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

দীর্ঘতমার রচনায় মহারাজ ভরতের সুস্পষ্ট উল্লেখ কোনও স্থানেও দেখা যায় না, কিন্তু দুই এক স্থানে তিনি আপন এক যজমানের যে প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে যেন দিগ্বিজয়ী ভরতেরই ছায়াপাত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এক স্থানে তিনি অগ্নির নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিতেছেন,—

"রথায় নাবং উত নো গৃহায় নিত্যারিত্রাং পদ্বতীং রাসি অগ্নে।
অস্মাকং বীরান্‌ উত নো মঘোনো জনাংশ্চ যা পারয়াৎ শর্ম যাব॥"

হে অগ্নে! নঃ অস্মাকং রথায় রথসদৃশায়, গৃহায় গৃহসদৃশায় চ, যজমানায় নিত্যারিত্রাং পদ্বতীং নাবং যজ্ঞফলরূপাং রাসি দেহি। যা নৌঃ অস্মাকং বীরান্‌ উত অপিচ অস্মাকং মঘোনঃ ব্রাহ্মণান্‌ জনাংশ্চ সংসারসমুদ্রং পারয়াৎ পারয়েৎ যাব ব্রহ্মসমাগমরূপং শর্ম মঙ্গলং লম্ভয়েৎ॥

"যিনি আমাদের রথের স্বরূপ,—যিনি আমাদের গৃহের স্বরূপ, সেই যজমানকে, হে অগ্নি! তুমি নিত্যকাল অরিত্রসম্পন্না এবং অবাধে গমনশীলা যাগফলরূপিণী নৌকা দান কর। সেই নৌকা আমাদের ঋত্বিগ্‌গণকে,

আমাদের ব্রাহ্মণগণকে এবং আমাদের বৈশ্যগণকে যেন সংসারসমুদ্র হইতে উদ্ধার করে, এবং তাহা যেন আমাদের ব্রহ্মসমাগমরূপ পরম মঙ্গল বিধান করে।”

যাঁহার যজ্ঞে ঋত্বিকের বরণ প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘতমা এই অপূর্ব্ব প্রার্থনা রচনা করিয়াছিলেন, সেই যজমানকে ঋষি কিরূপে বর্ণনা করিতেছেন, তাহা পাঠকবৃন্দ মনোযোগপূর্ব্বক দেখুন। যিনি আমাদের গৃহের স্বরূপ, অর্থাৎ যিনি আমাদের আশ্রয়দাতা ;—যাঁহার আশ্রয়ে দীর্ঘতমার ন্যায় মহর্ষি বাস করিতেছিলেন, তিনিই এ স্থলে সুস্পষ্ট উল্লিখিত হইতেছেন। তিনি আবার আমাদের রথের ন্যায়। সে কিরূপ? তাহা বুঝিতে গেলে আমাদিগকে ৩৬০০ বৎসর অতিক্রম করিয়া তৎকালীন সামাজিক অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবেক। আমরা পূর্ব্বে উদাহরণ দিয়া দেখাইয়াছি, দীর্ঘতমার সময়ে আমাদের পিতামহগণ একটি প্রকাণ্ড নদীর প্রবাহ অনুসরণ করিয়া উপনিবেশ বিস্তার করিতেছিলেন। সে নদী সম্ভবতঃ গঙ্গা ;—কেন না, গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগেই আমরা ঐতিহাসিক পৌরব রাজগণকে দেখিতে পাই। ফলতঃ, এই সময়ে মানব ক্ষত্রিয়গণ পঞ্জাব প্রদেশ পার হইয়া দেশ হইতে দেশান্তরে আপনাদের আধিপত্যবিস্তার ও উপনিবেশস্থাপন করিতেছিলেন। যে দিগ্বিজয়ী সর্ব্বদমন ভরতরাজা দেশ হইতে দেশান্তরে আপন অনুচরবর্গকে লইয়া যাইতেছিলেন, তাঁহাকেই দীর্ঘতমা, 'যিনি আমাদের রথের স্বরূপ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,—আমার এইরূপ উপলব্ধি হয়।

প্রার্থনার ভঙ্গীও বিচিত্র। যে যজমানের জন্য ঋষি সংসার-সাগর হইতে পার হইবার জন্য নৌকা প্রার্থনা করিতেছেন, তিনি স্পষ্টই তৎকালীন সমাজের অধিনায়ক। সেই নৌকা যে কেবল তাঁহাকেই পার করিবে, এমন নহে ; তাঁহার রাজ্যের সমুদায় ক্ষত্রিয়গণকে, সমুদায় ব্রাহ্মণগণকে, সমুদায় বৈশ্যগণকেও উদ্ধার করিবে। এ অতি উচ্চ প্রার্থনা, যাহা কেবল রাজার যজ্ঞে রাজপুরোহিতের মুখেই শোভা পায়। ইংলণ্ডের কোন রাজকীয় মহোৎসবে আর্কবিশপ অব্ কেণ্টরবরী—যেন রাজার জন্য এবং সমগ্র প্রজাপুঞ্জের জন্য ঈশ্বরের নিকট অলৌকিক মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন। মহর্ষি এখানে আপনার জন্য কিছু ভিক্ষা করিতেছেন না। কোনও ক্ষুদ্র যজমানের জন্যও কোনও ক্ষুদ্র বর মাগিতেছেন না ; সম্রাটের যজ্ঞে সম্রাটের পুরোহিতের মুখে যেরূপ প্রার্থনা সাজে, এখানে অবিকল তাহাই তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে।

যাঁহারা বিবেচনা করেন, ঋগ্বেদরচনার সময়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য নামক শ্রেণীবিভাগের অস্তিত্ব ছিল না, তাঁহারা হয় ত চমকিয়া উঠিয়া বলিবেন যে, মূলে ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের কোন উল্লেখ নাই, অনুবাদক কোথা হইতে তাহা পাইলেন? তাঁহারা প্রণিধান করিলে দেখিতে পাইবেন যে, 'অস্মাকং বীরান্' শব্দে ঋষি তৎকালীন ক্ষত্রিয়গণের, 'উত নো মঘোনঃ' শব্দে তৎকালীন ব্রাহ্মণগণের, এবং 'জনাংশ্চ' শব্দে সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জ বা বৈশ্যগণের উল্লেখ করিয়াছেন। সমগ্র দ্বিজাতিসমাজ উত্তরকালের ন্যায় দীর্ঘতমার সময়েও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর লোকেরা 'জনাঃ' বা সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জ বলিয়া গণ্য ছিল। তাহাদের উভয়ের এক শ্রেণীর লোকেরা 'বীরাঃ' অর্থাৎ যোদ্ধা ও যুদ্ধব্যবসায়ী ছিলেন, এবং আর এক শ্রেণীর লোকেরা 'মঘোনঃ' বা বিদ্বান ও বিদ্যাব্যবসায়ী ছিলেন। এই 'মঘোনঃ' শব্দের ইতিহাস বড় বিচিত্র। এই শব্দের প্রথমার এক-বচন 'মঘবা।' আধুনিক সংস্কৃতে 'মঘবা' শব্দে প্রায়ই ইন্দ্রকে বুঝায়; কিন্তু বৈদিক সংস্কৃতে ইহার অর্থ ভিন্ন। ফলতঃ, শব্দটি অতীব প্রাচীন; ভারতবর্ষে অস্মৎপিতামহগণের আগমনের বহু পূর্ব্বেও তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এবং তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের জ্ঞাতিস্থানীয় ইরানীগণ 'মঘবা' শব্দ তুল্যার্থে ব্যবহার করিতেন। ইরানী সমাজের ব্রাহ্মণেরা বহুকাল এই 'মঘবা' নামেই বিখ্যাত ছিলেন; এবং ঐ নাম হইতে ইংরেজী maji এবং majie শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। আমাদের সমাজের ব্রাহ্মণেরা দীর্ঘতমার সময় পর্য্যন্ত 'মঘবা' এই নামে কীর্ত্তিত হইতেন, দেখা যায়; কিন্তু উত্তরকালে উক্ত শব্দের তাদৃশ প্রয়োগ অপ্রচলিত হইয়া পড়ে, এবং যে শ্রেণীর লোকেরা একদা 'মঘবা' বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেন, ব্রাহ্মণ তাঁহাদের প্রশস্ত নাম বলিয়া গৃহীত হয়। তাঁহারা 'ব্রহ্ম' বা বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাতে জীবন উৎসর্গ করিতেন বলিয়া 'ব্রাহ্মণ' এই নূতন উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। আর্য্যসমাজ যে ঋগ্বেদরচনার সময়ে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, তাহার আর এক প্রধান নিদর্শন নিবিদের ভাষা। নিবিদ্ সকল ঋক্ অপেক্ষাও অনেক প্রাচীন; কেন না, ঋগ্বেদেই অনেক স্থলে 'পূর্ব্বয়া নিবিদা' বলিয়া নিবিদ্ সকলের প্রাচীনতার উল্লেখ দৃষ্টিগোচর হয়। এই নিবিদ্ সকলের অবসানে একই প্রকার প্রার্থনা সন্নিবিষ্ট হইত; যথা:—

"প্রেদং ব্রহ্ম
"প্রেদং ক্ষত্রং
"প্রেদং সুম্বন্তং যজমানমবতু"॥

"ইহা প্রকৃষ্টরূপে ব্রহ্মসম্প্রদায়কে ও ক্ষত্রসম্প্রদায়কে রক্ষা করুক, এবং সোমাভিষবকারী যজমানকে রক্ষা করুক।" প্রণিধানের বিষয় এই যে, নিবিদের সময়ে কুত্রাবরব সমাজে বৈশ্য-নামক বা 'জনাঃ'-নামক শ্রেণীর আবির্ভাব হয় নাই। তখন সমাজের সকলেই হয় 'ক্ষত্র', না হয় 'ব্রহ্ম'-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিল। 'ব্রাহ্মণগণ' দেবার্চ্চক ছিলেন, ক্ষত্রগণ যোদ্ধা ছিলেন। ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্ত আর সকল স্বাধীন ব্যক্তিকেই যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে হইত। ইহা অপেক্ষাকৃত আদিম অবস্থা। ক্রমে ক্রমে সমাজের আয়তনবৃদ্ধি ও কৃষি-বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 'বিশঃ' বা 'জনাঃ' নামক একটি নূতন শ্রেণী ধীরে ধীরে গঠিত হইল; ক্ষত্রগণের ন্যায় ইহাদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করা হইত না; ইহারা নিশ্চিন্ত হইয়া কৃষিবাণিজ্যের অনুসরণ করিত। নিবিদের ভাষায় ইহাদের উল্লেখ নাই, কিন্তু মহারাজাধিরাজ ভরতের সময়ে তাঁহার রাজপুরোহিত দীর্ঘতমা ইহাদিগের স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

আমাদের প্রাচীন ইতিহাসও ঠিক এই কথাই বলে। সেই ইতিহাসে লিখিত আছে যে, গৃৎসমদ শৌনক অস্মৎসমাজের চাতুর্বর্ণ্যের ব্যবস্থা করেন। অর্থাৎ, 'দাস' নামক বর্ণ চিরকালই ছিল। দাসগণ গবাদির ন্যায় সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত ছিল। ঋষিগণ যজ্ঞস্থলে যেমন গবাশ্বাদি দক্ষিণা পাইতেন, তেমনই দক্ষিণাস্বরূপ দাসীও পাইতেন; বিশেষ, রথ দক্ষিণা দিলে তৎসঙ্গে দাসী দক্ষিণা দেওয়া একপ্রকার প্রচলিত ব্যবস্থা ছিল, দেখা যায়। দাস-দাসীগণ এইরূপ হীনাবস্থাপন্ন থাকায় তাহাদের মঙ্গলের জন্য বিশেষ কোনও প্রকার প্রার্থনা করা হইত না। সুতরাং নিবিদ্‌রচনার সময়ে, সমাজ, ব্রহ্ম, ক্ষত্র ও দাস, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, বিবেচনা করিতে হইবেক। গৃৎসমদ ঋষি মহারাজ ভরতের অনেক পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। তাহা স্থানান্তরে দেখাইয়াছি।—সুতরাং ইতিহাসের স্পষ্ট উল্লেখ অনুসারে ও ভরতরাজার প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বেই গৃৎসমদ শৌনক কর্ত্তৃক চাতুর্বর্ণ্য ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, দেখা যায়। চাতুর্বর্ণ্য প্রথা প্রচলিত হইলে আর্য্য সমা-জের অবস্থা যে দিন দিন হীন হইতে আরম্ভ হয়, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ পাই না। বরঞ্চ এই প্রথা প্রচলিত হইবার পরেও বহুকাল সমাজ উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়াছিল, তাহারই সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ফলতঃ, বহুকালব্যাপিনী উন্নতির হেতু বলিয়াই চাতুর্বর্ণ্য প্রথা এদেশে এতাদৃশ সুবদ্ধমূল হইয়াছে। মনুষ্যসমাজ এতাদৃশ কাণ্ডজ্ঞানশূন্য নহে যে, কুফল-

দর্শনেও দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া কুপ্রথার অনুসরণ করিবে। এই চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থাই অদ্যাবধি আমাদের সমাজকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের বীরগণ অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে সমাজের অবশিষ্ট অংশের পতন হয় নাই। বীরগণই বা একবারে অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন কই? অদ্যাপি রাজপুত, শিখ ও গুর্খা প্রাচীন ক্ষত্রের স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। তবে রাজপদ ও রাজসিংহাসন কিছু দিন মুসলমানজাতীয় ক্ষত্রগণের, এবং সম্প্রতি ইংলণ্ডীয় ক্ষত্রগণের অধিকৃত হইয়াছিল ও হইয়াছে। শূদ্রগণের অবস্থা উন্নীত হইয়া তাহারা বৈশ্যগণের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে, এবং ব্রাহ্মণগণ রাজসম্মান হারাইয়া মলিনভাবাপন্ন হইয়াছেন, কিন্তু এখনও বিনষ্ট হয়েন নাই। চাতুর্ব্বর্ণ্যের নঙ্গরে বাঁধা না থাকিলে আমাদের সমাজরূপিণী নৌকা প্রবল রাজবিপ্লবের বাত্যায় এতদিন কালসমুদ্রের গর্ভে বিলীন হইয়া যাইত, সন্দেহ নাই।

দীর্ঘতমার যে প্রার্থনাটি উপরে উদাহৃত হইল, তাহা প্রথম মণ্ডলের ১৪০ সূক্ত। ঐ সূক্তে এবং পরবর্ত্তী ১৪১ সূক্তে একটি প্রশস্ত যজ্ঞের বর্ণনা দেখা যায়। সেই যজ্ঞের যে যজমানের কথা উপরে কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইল, তিনি আর এক স্থানে 'পরম যজমান' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তদ্দ্বারাও তিনি এক জন উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তি বলিয়া স্পষ্টই সূচিত হইতেছে। ফলতঃ আমার বিবেচনা হয়, মহাভারতে ও বিষ্ণুপুরাণে মহারাজ ভরতের যে পুত্রেষ্টিযজ্ঞানুষ্ঠানের কথা শুনা যায়, ১৪০। ১৪১ সূক্ত সেই যজ্ঞে ব্যবহারের জন্যই রচিত হইয়াছিল। কথিত আছে, মহারাজ ভরত একাধিক মহিষীতে অনেকগুলি পুত্রসন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন, কিন্তু সন্তানেরা কেহই পিতার অনুরূপ হয় নাই বলিয়া মহিষীগণ তাহাদিগকে বধ করেন! এই লোমহর্ষণ ব্যাপার শুনিয়া এক্ষণে আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, কিন্তু যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন গ্রীসদেশীয় স্পার্টানগণের ন্যায় আমাদের ক্ষত্রিয়গণের গৃহে ক্ষীণজীবী সন্তান জন্মিলে তাহারা নিহত হইত। সেকালে বীরপ্রসবিনী হওয়াই ক্ষত্রিয়রমণীগণের প্রধান গৌরব ছিল; ক্ষীণ সন্তান জন্মিলে তাঁহারা মর্ম্মাহত হইয়া স্বহস্তে তাহাদিগকে বধ করিতেন। এইরূপে ভরতের পুত্রোৎপাদন নিষ্ফল হইলে তিনি এক পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ১৪০।১৪১ সূক্তে যে যজ্ঞের বর্ণনা আছে, তাহাতে যজ্ঞস্থলে যজমানপত্নীকেও বিদ্যমান দেখা যায়। ঋষি তাঁহাকে 'মাতা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ১৪১ সূক্তে স্পষ্টাক্ষরে পুত্রের প্রার্থনা রহিয়াছে, তাহা এই :—

"অগ্নে রয়িং ন স্বর্থং দমূনসং ভগং ন দক্ষং পপৃচাসি ধর্ণসিং।
রশ্মীরিব যো যমতি জন্মনী উভে দেবানাং যজ্ঞং ক্রতে আচ সুক্রতুঃ॥"

"হে অগ্নে! যজমানায় ধর্ণসিং রাজ্যস্য ধারকং পুত্রং পপৃচাসি দেহি। কিম্ভূতং পুত্রং অগ্নে অস্মভ্যং স্বর্থং ন শোভনং অর্থমিব রয়িং ধনং দমূনসং দাতারং। পুনঃ কিম্ভূতং? ভগং ন রাজানম্ ইব দক্ষং উৎসাহশীলং। কোঽয়ং রাজা? যো রাজা সুক্রতুঃ শোভনক্রিয়াবান্ ক্রতে দেবানাং যজ্ঞং আচ আচরংশ্চ রশ্মীরিব উভে জন্মনী দেবান্ মনুষ্যাংশ্চ যমতি নিয়ময়তি।"

"হে অগ্নি! যজমানকে রাজ্যভারধারণক্ষম একটি পুত্র দান কর। যে পুত্র মাদৃশ ঋষিগণকে প্রার্থনীয় ধন দান করিবেন। যিনি রাজার ন্যায় উৎসাহশীল হইবেন—যে রাজা শোভন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া এবং অবিচলিত নিয়মরক্ষার জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দেবলোকের সহিত মনুষ্যলোককে আবদ্ধ করিয়াছেন।"

তাৎপর্য্য এই যে, মনুষ্যেরা দেবতাদিগকে যজ্ঞে আহুতি অর্পণ করেন, এবং দেবতারা প্রীত হইয়া বৃষ্টি দান করেন; তাহাতে মনুষ্যগণের অন্ন উৎপন্ন হয়। মনুষ্য অধার্ম্মিক ও অযাজ্ঞিক হইলে দেবতারা অনাবৃষ্টি দ্বারা তাহাদের দণ্ডবিধান করেন। ঋষির বিবেচনায় ইহা একটি অবিচলিত নিয়ম। যে রাজা এই অবিচলিত নিয়ম প্রতিপালন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা দেবলোকের সহিত মনুষ্যলোকের সৌহার্দ্য রক্ষা করিতেছেন, যাঁহার রাজ্যে প্রজাগণ সুবৃষ্টি পাইয়া সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে, যিনি অনেক শোভন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় উৎসাহসম্পন্ন এক পুত্র তাঁহাকে দান কর,—যিনি তাঁহার রাজ্যরক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন;—ইহাই প্রার্থনা ইহার সহিত ইতিহাস পুরাণের আখ্যায়িকার এতই মিল যে, দৃষ্টান্ত রাজাকে ভরতরাজা না ভাবিয়া থাকা যায় না।

অবশেষে ঋষি উপসংহারে বলিতেছেন—

"অস্তাবি অগ্নিঃ শিমীবদ্ভিরর্কৈঃ সাম্রাজ্যায় প্রতরং দধানঃ।"

"যিনি সাম্রাজ্যকে প্রকৃষ্টরূপে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, সেই অগ্নিকে আমি শক্তিসম্পন্ন অর্চ্চনামন্ত্রের দ্বারা স্তব করিলাম।"

দীর্ঘতমা মহারাজ ভরতকে যে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, এখানে স্পষ্টই সেই সাম্রাজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া গেল। অগ্নিই এই সাম্রাজ্যে

রক্ষাকর্ত্তা; ঋষি তাঁহাকে শক্তিসমন্বিত অর্চ্চনামন্ত্রের দ্বারা স্তব করিলেন। অভিনিবেশসহকারে প্রস্তাবিত ঋক্‌সূক্ত দুইটি পাঠ করিলে এইরূপ এক দৃঢ় বিশ্বাসের উৎপত্তি হয় যে, সম্রাট ভরতের পুত্রেষ্টি যজ্ঞেই উহা রচিত ও ব্যবহৃত হইয়াছিল।

ইদানীন্তন রাজপরিবারে কোনও সমারোহ হইলে Poet Laureate যেমন তৎসম্পর্কে অভিনব কাব্য রচনা করিয়া পাঠ করেন, তখনকার রাজ-পরিবারে তেমনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞের ন্যায় সমারোহের কার্য্য উপস্থিত হইলে রাজসভার 'ব্রহ্মা' বা প্রধান ঋত্বিক্ নূতন ঋক্‌সূক্ত রচনা করিয়া উপাসনাকালে পাঠ করিতেন। আমরা তাহারই একটি উদাহরণ এ স্থলে দেখিতেছি। এই অতীতের চিত্র অসাধারণ কৌতূহলোদ্দীপক। পাঠকগণ মহারাজাধিরাজ ভরতের সাময়িক চিত্র যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিবার কামনা করেন, তবে দীর্ঘতমার ঋক্‌সূক্তমালা আদ্যন্ত যত্নের সহিত পাঠ করিতে হয়। কিন্তু তাহা নিতান্ত সহজ কার্য্য নহে। সায়ণাচার্য্য,—যিনি এই সূক্তমালার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তিনি অনেক স্থলে ঋষির মর্ম্মার্থ স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। তবে সায়ণের অসাধারণপাণ্ডিত্যপূর্ণ শব্দব্যাখ্যা প্রায়ই প্রকৃত অর্থ-পরিগ্রহের পক্ষে বিস্তর সাহায্য করে। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় দীর্ঘ-তমার ঋক্‌সূক্তের সহিত সমগ্র ঋকবেদসংহিতার যে বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এক দিকে অশুদ্ধ, অপর দিকে অস্পষ্ট। সায়ণ নিজে যেথানে ভুলিয়াছেন, সেথানে দত্ত মহাশয়ের বিশেষ অপরাধ নাই। অনুবাদকার্য্যের পথপ্রদর্শক বলিয়াও দত্ত মহাশয় যশোভাজন, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, দীর্ঘতমার ঋক্‌সূক্তের নূতন অনুবাদের বিশেষ আবশ্যকতা লক্ষিত হয়। দীর্ঘ-তমার ন্যায় একজন ঋষির রচনা আদ্যোপান্ত অভিনিবেশসহকারে পাঠ করিলে, বেদ কি পদার্থ, তাহা বুঝিতে পারা যায়। একটি সম্পূর্ণ মনুষ্যের পূর্ণ মানসিক চিত্র হৃদয়ঙ্গম করিলে তৎকালের ইতিহাসই আয়ত্ত হইয়া পড়ে। অতঃ যাঁহারা বলেন, আমাদের প্রাচীন ইতিহাস নাই, তাঁহারা অনভিজ্ঞ। ৩৬০০ বৎসরের প্রাচীন অস্মদীয় ইতিহাস যাঁহারা পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, দীর্ঘতমার সূক্তমালা উদ্‌ঘাটন করিলেই তাঁহাদের মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারে।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

দোষ কাহার ?

১

চার বৎসর ইংলণ্ডে কিছু আইন ও মহিলাসমাজে মিশিবার অনেকটা আদব কায়দা শিক্ষা করিয়া, মসৃণ আননে প্রাপ্তবয়স্কের চিহ্ন লইয়া, যামিনী-মোহন কর যখন দেশে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার নিতান্ত অন্তরঙ্গ আত্মীয় স্বজনগণ ভিন্ন আর কেহই তাহাকে পূর্ব্বপরিচিত যামিনী নামে সম্বোধন করা সঙ্গত মনে করিলেন না। শ্রীমান্ যামিনীমোহন ইঙ্গবঙ্গদলে "মিষ্টার কর" হইয়া দাঁড়াইলেন। আবার শতাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদব কায়-দার বাহাদুরীতে মহিলাসমাজে যামিনীমোহন শীঘ্রই সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া দাঁড়াইল।

কোন মহিলাকে দেখিলে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিতে, মহিলাদিগের অনুরোধে অতি সলজ্জভাবে মধুরকণ্ঠে দুই একটি গান গাহিতে ও তাঁহা-দিগের একাধিকসহস্র ছোট খাট আবশ্যকে অনাহূত মনোযোগ দিতে, যামিনীমোহনের সমকক্ষ বড় কেহ ছিল না। অল্পদিনের মধ্যেই মহিলা-দিগের প্রশংসালাভ ও তাঁহাদিগের স্বেচ্ছায় নিক্ষিপ্ত পাখা ও রুমাল কুড়াইবার ভার যামিনীমোহনের প্রায় একচেটিয়া হইয়া উঠিল। মিষ্টার করের প্রখর-করে সমাজের (অর্থাৎ "সোসাইটী"র) বহু উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক নিতান্ত ম্লান দেখাইতে লাগিল।

যামিনীমোহনকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য পদার্পিতমাত্রযৌবনা হইতে বিগতপ্রায়যৌবনা কুমারীসমাজে কিরূপ ব্যগ্রতা লক্ষিত হইয়াছিল, কোনও সান্ধ্যসমিতি হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনকালে নিষ্ফল প্রয়াসে কত ব্যথিত কোমল হৃদয় হইতে দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইত, এবং নিশীথে কত বেদনা-ব্যঞ্জক অশ্রু নীরবে কত উপাধান সিক্ত করিত, তাহা সহজেই অনুমেয়।

এরূপ অবস্থায় যে প্রাপ্তবয়স্কা কন্যার জননীরা যামিনীমোহনকে জামাতৃ-রূপে পাইবার জন্য চেষ্টা করিবেন, ইহা অবশ্যই স্বাভাবিক।

বস্তুতঃ, যামিনীমোহনের আগমনে ইঙ্গবঙ্গসমাজে বেশ একটু সজীবতা ও পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইতে লাগিল।

২

অল্প দিনের মধ্যেই সকলে বুঝিতে পারিল যে, মহিলাসমাজে মিশিয়া যামিনীমোহন হৃদয়টাকে পদ্মপত্রে জলের মত নিতান্ত নির্লিপ্ত রাখিতে পারে নাই। কুমারীদিগের মধ্যে কুমারী বিমলা বসুর প্রতি তাহার কিছু অতিরিক্ত মনোযোগ লক্ষিত হইতে লাগিল। মিস্ বসু পিয়ানোর নিকট গেলেই যেন কোনও অলক্ষিত আকর্ষণে যামিনীমোহনও সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইত, এবং কখন্ তাঁহার পুস্তকের পাতা উল্টাইতে হইবে, তৎপ্রতি এত অধিক মনোযোগ দিত যে, তাহার আর সেই সুধাময় সঙ্গীত উপভোগ করিবার অবসর হইত না। সেই সময় তাহার চেয়ারের পশ্চাতেই যে ব্যর্থ আশার বেদনা লুকাইয়া সামান্ত প্রাণহীন হাসি হাসিয়া কুমারীগণ পরস্পরের মধ্যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টির বিনিময় করিতেন, তাহা সে দেখিতেও পাইত না। প্রেম মানবকে এমনই অন্ধ করে! প্রেমিক কল্পনা-জগতে বাস করে; সেখানে বাস্তবের কঠোর সত্য তাহার স্বপ্নভঙ্গ করিতে পারে না। সেই জগতে বাস করিয়া ভ্রান্ত প্রেমিক প্রেমিকাকে আপনার জীবনের সার্থক সাধন বলিয়া মনে করে; প্রেমিকা তাহার নিকট তদীয় মানসকল্পিত আদর্শ—তাহার কোথাও কোন দৈন্য, কোন অসম্পূর্ণতা নাই।

এখন আর যামিনীমোহন কেবল বিদেশীয় কবিদিগের মধুর প্রেমের কবিতা আবৃত্তি করিয়াই সন্তুষ্ট হয় না; এখন সে আপনিও কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে। হৃদয়ের পূর্ণতায় কবিতা আপনি আইসে। আকাঙ্ক্ষার বেদনা থাকিলে অন্তরের অন্তর হইতে গীতধ্বনি আপনি ধ্বনিত হইয়া উঠে। হিমাবসানে নব-বসন্ত-সমাগমে যেমন কুসুমসুষমাসম্পন্ন বনভূমিতে কোকিলকাকলি আপনি আত্ম-প্রকাশ করে, তেমনই নবপ্রেমসমাগমে মানব-হৃদয়ে কবিতা আপনা-আপনি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। কেহ তাহা প্রকাশ করিতে পারে, কেহ পারে না।

যামিনীমোহন বিমলায় যাহাই অভিপ্রায় থাকুক, কর্ম্মহীনা মহিলাগণ সে বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ না দিয়া প্রচার করিলেন যে, শীঘ্রই তাহাদের বিবাহ হইবে। আবার সেই বিবাহের যোগ্যতা অযোগ্যতা লইয়া তর্ক-বিতর্ক, বিচার, আন্দোলন চলিতে লাগিল। পরচর্চ্চার কি একটা আকর্ষণ আছে, জানি না; কিন্তু সসঙ্কোচে এ কথা বলিতে হয় যে, কেবল মহিলা-

সমাজে নহে—পুরুষসমাজেও পর-চর্চ্চা-প্রিয়তা প্রায় সর্ব্বদাই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

এইরূপে কয় মাস কাটিয়া গেল।

৩

কয় মাস পরেই সহসা একটা বড় পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইল। যেমন শরতের আকাশে সহসা খানকতক মেঘ আসিয়া প্রকৃতির হাস্যোজ্জ্বল আনন মলিন করিয়া দেয়—তাহারা কোথা হইতে আইসে, কেন আইসে,—কোথায় উৎপন্ন হয়, কেহ তাহা বলিতে পারে না, তেমনই সহসা এই প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে যেন পূর্ব্বতন আকর্ষণের স্থলে উপেক্ষার ভাব আসিল;—কেন যে এ ভাব আসিল, কোথা হইতে যে এ ভাব আসিল, তাহা বাহিরের লোক কেহ জানিতে পারিল না। সে কথা বাহিরের লোক কেহ জানিতে পারিল না বলিয়াই সে রহস্যের উদ্ঘাটন-চেষ্টা যেন অতি প্রবল হইয়া উঠিল। যাহা অজ্ঞাত,তাহাই জানিবার জন্য ঔৎসুক্য বুঝি সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই মানব-চরিত্রের একটা বিষম দুর্ব্বলতা; তাই জন্ম মৃত্যুর রহস্য-উদ্ঘাটনের বৃথা চেষ্টায়, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-তত্ত্বের মূলে কোন বুদ্ধিসম্পন্ন মহাশক্তির অস্তিত্ব-বিচারে, মানবের মানসিক পরিবর্ত্তনের ইতিহাসে বহু পৃষ্ঠা পূর্ণ।

কেন যে এ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল, তাহার কারণ বাহিরের কেহ জানিতে পারিল না বটে, কিন্তু যখন একটা সমিতিতে দৃষ্ট হইল যে, মিস্ বসুর সহিত যামিনীমোহনের সাক্ষাৎ হইলে কেবল পরিচয়জ্ঞাপক সামান্য অভিবাদনমাত্র বিনিময়ের পর দুই জনে দুই দিকে চলিয়া গেল ও তাহার পর আর তাহারা দেখা করিল না, তখন সকলেই স্থির করিলেন যে, একটা কিছু বিশেষ ব্যাপার হইয়া গিয়াছে—বিনা মেঘে কি কখনও বজ্রপাত হইতে পারে?

কথায় বলে,—"যার বিয়ে তার মনে নাই; পাড়াপড়সীর ঘুম নাই।" এ ক্ষেত্রেও ব্যাপার সেইরূপ দাঁড়াইল। যখন বিমলার সহিত যামিনী-মোহনের বিবাহের কথা প্রচারিত হইয়াছিল, তখনও তাহাদের দুই জনের অপেক্ষা মহিলাসমাজের ভাবনাটাই অধিক হইয়াছিল; এখনও যেন তাহা-দিগের অপেক্ষা সেই ক্লান্ত মহিলাসমাজেরই ভাবনাটা অধিক হইল। কোথাও দুই চারি জন মহিলা একত্র হইলেই কেবল সেই এক কথা। গৃহের এক পার্শ্বে কোন জোড়া চার পাঁচ জন শ্রোতার নিকট অতি মৃদুস্বরে

বলিতেছেন যে, নিশ্চয়ই ইংলণ্ডপ্রবাসকালে যামিনীমোহন কোন মহিলার সহিত বিবাহের প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়াছিল; আর এক পার্শ্বে এক জন কৌতুকপরায়ণা যুবতী সেই কথা লইয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছেন যে, যাহাই হউক, সহজে যে বিমলার মত বুদ্ধিমতী মেয়ে অমন শিকার ছাড়ে, ইহা বিশ্বাস হয় না—নিশ্চয়ই ভিতরে কিছু বিশেষ গলদ আছে; কেহ বলিতে লাগিলেন, যামিনীমোহনের দোষেই বিবাহসম্বন্ধ ভঙ্গ হইয়াছে; কেহ বলিতে লাগিলেন,—বিমলার দোষেই বিবাহসম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আসল ব্যাপার যে কি, তাহা কেহই বলিতে পারিলেন না।

যাহা হউক, ক্রমে মহিলাসমাজে এই আন্দোলন এমনই প্রবল হইয়া উঠিল যে, তাহার মধ্যে অবস্থান করা বিমলার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হইয়া উঠিল। শিলাপাততাড়িতা ভয়চকিতা হরিণী যেমন প্রান্তর-প্রান্তে ভগ্ন জীর্ণ দেবালয়ের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে, বিমলা তেমনই বহুদূরে—বোম্বাই সহরে এক খুল্লতাতের নিকট চলিয়া গেল। কলিকাতার মহিলাসমাজে দিন কতক অনেকে তাহার পরিচিত মধুর কণ্ঠ, সরস মধুর সুরুচি-সম্পন্ন কথাবার্ত্তা ও পরিচিত গোলাপী পোষাকের অভাব অনুভব করিলেন। অবশ্য এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, কেহ কেহ তাহার কলিকাতা-ত্যাগে আনন্দিতাও হইল;—কারণ, "সোসাইটী"তে সর্ব্ব বিষয়ে তাহার মত প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বড় সচরাচর দেখা যায় না। যাহা হউক, ক্রমে ক্রমে সকলে সে অভাব ভুলিয়া গেল;—অপেক্ষাকৃত ক্ষীণজ্যোতিঃ জ্যোতিষ্কগণই সকলের নয়নানন্দ হইয়া উঠিল।

৪

বিমলা কলিকাতা হইতে চলিয়া যাইবার কয় দিন পরে যামিনীমোহনও সমাজে মেশামিশি ছাড়িয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত,—"সব লোকের দৃষ্টির বাণ আর সহিতে পারি না।—'সোসাইটী'র পক্ষে আমি মৃত।" বন্ধুরা হাসিয়া বলিতেন, "মনে রাখিও মরা হাতী লাখ টাকা।"

যামিনীমোহন কি করিত, কিরূপে সময় কাটাইত, ইত্যাদি—তাহার দুই চারি জন বন্ধু ব্যতীত বাহিরের বড় কেহ জানিতে পারিত না। পর-নিন্দা-পরায়ণা মহিলাগণ সে কথা লইয়া দিন কতক আপন আপন মতামত ব্যক্ত করিলেন; তাহার পর নূতন কথায় নূতন কুৎসায় সকলে সে আলোচনা ত্যাগ করিলেন।

যামিনীমোহনের বন্ধুগণ তাহাকে বলিতে লাগিলেন যে, সকল মানবের জীবনেই নানা অপ্রীতিকর ঘটনার ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া যায়; জীবনের একটা সামান্য ঘটনা লইয়া একেবারে গৃহ-কোণবাসী হইয়া সকল কার্য্যে অবহেলা করা উচিত নহে;—তিলকে তাল করাটা সুবুদ্ধির কাজ নহে। বন্ধুদিগের এইরূপ কথায় যামিনীমোহন কোন উত্তর দিত না,—কেবল একটু হাসিত। কাহারও কাহারও হাসিবার বিশেষ এক প্রকার কৌশল থাকে; যে কোন বিষয়ই হউক, তাহারা একটু হাসিয়াই সব শেষ করিতে পারে। যামিনী-মোহনেরও সেইরূপ হাসিবার কৌশল ছিল। বন্ধুদিগের এত যে গুরু-গম্ভীর উপদেশ, যামিনীমোহন কেবল একটু হাসিয়াই সে সব উড়াইয়া দিত; কোনও উত্তরই দিত না। বলিয়া বলিয়া বন্ধুদিগের উৎসাহও ক্রমে কমিয়া যাইতে লাগিল।

যামিনীমোহনের কাজ ছিল কেবল—দুই তিন খানা দৈনিক সংবাদ-পত্রের আদ্যোপান্ত ও রাশি রাশি নূতন উপন্যাস পাঠ করা। যামিনীমোহনের বন্ধুরা আশা করিতেন যে, এই একঘেয়ে জীবন শীঘ্রই তাহার বিরক্তিকর হইয়া দাঁড়াইবে; তখন সে আবার সকলের সহিত মিশিতে আরম্ভ করিবে, আবার ব্যবসায়ে মনোযোগ দিবে। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে যামিনীমোহনের কোন পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা দৃষ্ট হইল না। সে কিছুতেই আপনার নিভৃত গৃহকোণ পরিত্যাগ করিল না।

৫

কলিকাতার মহিলাসমাজ হইতে দূরে তালীবনশ্যাম সমুদ্রকূলে বিমলা কেমন করিয়া দিন কাটাইত, তাহার সংবাদও সর্ব্বদা কলিকাতায় আসিত না। মধ্যে মধ্যে সে তাহার পরিচিতদিগকে দুই একখানা পত্র লিখিত। কোন পত্রে মৃদু-সমীরসঞ্চারে ক্ষুদ্রক্ষুদ্রবীচিবহুল বারিধিবক্ষে তরী ভাসাইয়া "হস্তী গুহায়" গমনের কথা,—প্রত্যাবর্ত্তনকালে অস্তগামী তপনের মরণাহত করজালে লোহিতাভ গগনপটে অঙ্কিতবৎ বোম্বাই সহরের সৌন্দর্য্যের বর্ণনা থাকিত; কোন পত্রে এক দিন মধুর সন্ধ্যাকালে কোনও মধুরহাসিনী পার্শী যুবতীর পরিণয়ের বর্ণনা থাকিত; কোনও পত্রে বর্ণবৈচিত্র্যবহুলবেশপরিহিতা সুন্দরী-কুলে পরিপূর্ণ সাগরানিলসেবিত সিন্ধুকূলে ভ্রমণের বর্ণনা থাকিত। কিন্তু সে সকল পত্রে পরিচিত কলিকাতা "সোসাইটী"তে ফিরিবার জন্য আকুলতা ও সে "সোসাইটী" পরিত্যাগ করাতে কোন প্রকার দুঃখ প্রকাশ পাইত না।

সেই সকল পত্র লইয়া কলিকাতার মহিলাসমাজে মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু আন্দোলন হইত। মহিলারা আশা করিতেন যে, অল্প দিনের মধ্যেই বিমলা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবে। তাঁহারা বলিতেন যে, বিমলা নিতান্তই "সেণ্টিমেণ্ট"-প্রবণা বালিকা; নহিলে এই একটা সামান্য ঘটনা লইয়া সে অতটা করিত না;—এমন প্রেম-পরিচয়, এমন বিবাহ-সম্বন্ধ, এমন বিবাহ-সম্বন্ধ-ভঙ্গ, এ ত নিত্যই হইয়া থাকে; ইহা লইয়া এতটা করা কোন বুদ্ধিমতী রমণীরই উচিত নহে।

যিনি যে মতামত ব্যক্ত করুন,—তাহাতে কাহারও কোন ক্ষতি বৃদ্ধি ছিল না। প্রায় ছয় মাস কাটিয়া গেল;—বিমলা ফিরিয়া আসিল না; তাহার কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের কোনও সূচনাও লক্ষিত হইল না। উদ্যানে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর কুসুমটি ঝরিয়া গেলে যে সমগ্র উদ্যান নষ্ট হয়, তাহা নহে; একা বিমলা ছিল না বলিয়া যে মহিলাসমাজে সমিতি, নিমন্ত্রণ, কুৎসা ও পরচর্চ্চার অভাব ছিল, তাহা নহে।

৬

বিমলা বোম্বাই যাইবার পর প্রায় ছয় মাস চলিয়া গিয়াছে।

যামিনীমোহনের গৃহে কয় জন বন্ধু আহার করিতে বসিয়াছেন।

প্রস্ফুটিত কুসুমে সুসজ্জিত টেবিল হইতে কুসুমের মৃদু সৌরভ, আহারীয়ের গন্ধ ও কাঁটা চামচের ঠুন্‌ঠুন শব্দ উঠিতেছে। সরস কথাবার্ত্তায়, তদপেক্ষাও সরস আহারীয়ে, "পার্টী" বেশ জমিয়াছে। মধ্যে মধ্যে উচ্চ হাস্য উঠিতেছে। কতকগুলি যুবক একত্রিত হইয়া আহারে বসিলে যাহা হয়, তাহার কিছুরই অভাব নাই।

এক জন বলিল, "তবে যামিনীমোহন, তুমি এখন সেই প্রেম-ব্যাপারের স্মৃতিটা বেশ ভুলিতে পারিয়াছ!"

কাঁটা ও ছুরী রাখিয়া চেয়ারে হেলান দিয়া যামিনীমোহন হাসিতে হাসিতে বলিল, "প্রথম বয়সের সে পাগলামীর কথা আর বলিও না। তবে এইবার আমি তিনটি জিনিস বেশ বুঝিয়াছি।"

কয় জনে সমস্বরে বলিল, "কি?"

যামিনীমোহন বলিল, "জগতে তিনটি কাজ স্ত্রীলোক কখন করিতে পারে না;—রাত্রিকালে খাটের তলে কোন শব্দ শুনিলে স্ত্রীলোক কখনও সাহস করিয়া খাটের তলে চাহিয়া দেখিতে পারে না; স্ত্রীলোক কখনও কোন

কথা গোপন রাখিতে পারে না; স্ত্রীলোক কখনও ভালবাসিতে পারে না।"

সকলে হাসিয়া উঠিল।

এক জন বলিল, "তবুও ভাল যে তুমি এ ধাক্কা কাটাইয়া উঠিয়াছ। আবার শীঘ্র ফাঁদে না পড়িলে হয়!"

যামিনীমোহন বলিল, "সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে পার; এ নয়ন আর কখনও রমণীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইবে না।"

এক জন বলিল, "সেটা বড় ভরসার কথা নহে; জান ত—

'আঁখিতে চাহে না প্রেম মন দিয়া চায়,
দৃষ্টি-হীন স্মর তাই বিদিত ধরায়।'

মনটা সাবধানে রাখিও।"

আর একবার গৃহমধ্যে উচ্চহাস্য-ধ্বনি ধ্বনিত হইল।

এক জন বলিল,—"সে কি কথা!—আমি ত বুঝি, আঁখি মেলিয়া যাহাকে ভাল লাগে, তাহাকেই ভাল বলিয়া জানি। যাহা হউক যামিনীমোহন, এবার য়ুরোপ ঘুরিয়া আসিয়া ভাল করিয়া কাজে মন দাও। ইংলণ্ডের কথা ভাবিলে আর এই ঘাম ও ঘামাচির দেশে থাকিতে ইচ্ছা হয় না। ইংলণ্ডের কাছে ভারতবর্ষ!"

আর এক জন বলিল, "তুমি কি দেশদ্রোহী নাকি? ভারতবর্ষে কি নাই বল ত? আর ভাল হউক মন্দ হউক, এই আমাদের দেশ। আমরা যদি কাক হই—কাক থাকাই আমাদের ভাল,—ময়ূরপুচ্ছ চুরি করিয়া ময়ূরের দলে মিশিবার দুরাকাঙ্ক্ষা না করাই কি ভাল নহে?"

পূর্ব্ব বক্তা বলিল, "যাহা বলিতে হয় বল, ভারতবর্ষ অপেক্ষা ইংলণ্ডই আমার বেশী ভাল লাগে।"

যামিনীমোহন বলিল, "আমাকে একবার ঘুরিয়া আসিতে দাও; তাহার পর দেখিবে, সুপ্ত সিংহ আবার জাগিয়াছে;—দেখিবে, রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে সমাজ-সংস্কার পর্য্যন্ত সবই এক জনে কেমন করিয়া করে। আমি জুতা সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত সবই করিব।"

আবার একবার হাস্য-ধ্বনি উঠিল।

আহারান্তে কিঞ্চিৎ মদ্যপানানন্তর সকলে পার্শ্বের একটা ঘরে উঠিয়া গেলেন। সেখানে চুরুট-টানা ও গল্প গুজব চলিতে লাগিল।

এক জন বলিল, "দেখ যামিনীমোহন, তুমি বোম্বাই না গিয়া এখান

হইতেই জাহাজে রওনা হও। বোম্বাই গেলে তুমি একবার বিমলার খুড়া মহাশয়ের নিমন্ত্রণ এড়াইতে পারিবে না। সেখানে তোমার সহিত বিমলার সাক্ষাৎ হইবে। আপনার উপর বড় অধিক বিশ্বাস-স্থাপন করাটা যুক্তি-সঙ্গত নহে।"

যামিনীমোহন বলিল, "সে ভয় আর করিও না। আমার অগ্নি-পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে—আর কোন আশঙ্কা নাই।"

ইহার পর কিছুক্ষণ গল্পগুজবান্তে স্ব স্ব টুপি ও যষ্টি লইয়া একে একে নিমন্ত্রিতগণ স্বস্বগৃহাভিমুখগামী হইলেন।

যামিনীমোহন মনস্থ করিয়াছে,—আর একবার য়ুরোপ ভ্রমণ করিয়া আসিবে। য়ুরোপ ঘুরিয়া আপনার প্রেমস্মৃতির শেষ চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া সে আবার নূতন হইয়া দেশে ফিরিবে। দুই দিন পরে যামিনীমোহন রওনা হইবে—আয়োজন সব ঠিক্ ঠাক্ হইয়া গিয়াছে।

৭

প্রভাত-পবনে শেষ ফাল্গুনের অপেক্ষাকৃত ক্ষীণাঙ্গী জাহ্নবীর বক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ খেলা করিতেছে। উপরে অনন্তপ্রসারিত নীলাম্বর; দক্ষিণে হাবড়ার পুল;—আজ পুল খোলা; বামে নদীবক্ষে বহুসংখ্যক বাষ্পীয় জলযান, পান্‌সী ও ভাউলে; উভয় তীরেই স্নানের ঘাটে নরনারীগণ স্নান করিতেছেন। একখানা মধ্যায়তন পান্‌সী কলিকাতার পার হইতে হাবড়ার পারে লাগিল। পান্‌সী হইতে কয় জন নিরবচ্ছিন্ন-ইংরাজবেশধারী ও কয় জন নিরবচ্ছিন্ন-বাঙ্গালীবেশধারী যুবক অবতরণ করিলেন। বহু কষ্টে তটভূমির কর্দ্দম হইতে পাদুকা রক্ষা করিয়া তাঁহারা উপরের রাস্তায় উঠিলেন। তাঁহারা হাবড়া ষ্টেশনে চলিলেন; পশ্চাতে পশ্চাতে দুই জন কুলি দ্রব্যাদি লইয়া চলিল।

ট্রেণ প্ল্যাটফরমে উপস্থিত ছিল। এঞ্জিন্ হইতে এক প্রকার অস্পষ্ট শব্দ উঠিতেছিল; যেন কর্ম্মপ্রার্থী দানব অধীরতা প্রকাশ করিতেছিল; প্ল্যাট-ফরমে লোক জনের গতায়াত, হাঁকাহাঁকির গোল উঠিতেছিল। যামিনী-মোহনের বন্ধুগণ একটা খালি কামরায় তাহার দ্রব্যাদি তুলিয়া দিলেন। একজন ছুটিয়া গিয়া একখানা সংবাদপত্র কিনিয়া আনিলেন; এমন সময় প্রথম ঘণ্টা পড়িল। যামিনীমোহন কামরায় উঠিয়া বসিল। ডাকাডাকি দৌড়াদৌড়ি আরও প্রবল হইয়া উঠিল; "পান-চুরুট-দেশলাই"-ওয়ালাগণ আরও উচ্চ স্বরে বিক্রেয় জিনিস হাঁকিতে লাগিল।

দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িল। যামিনীমোহন বন্ধুদিগের সহিত করমর্দ্দন করিল। এক জন হাসিয়া বলিলেন, "দেখিও যেন কোন নীল-নয়নার কনক-কেশ-জালে জড়িত হইয়া পড়িও না।"

এঞ্জিন্ হইতে একটা তীব্র হুইসল্ ধ্বনিত হইল,—যেন দানব একবার আপনার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিল। বিজাতীয় কণ্ঠে একজন শ্বেতাঙ্গ হাঁকিল, "হঠো! হঠো!" ট্রেণ ধীরে ধীরে প্ল্যাটফরম্ হইতে বাহির হইয়া গেল। যতক্ষণ দেখা গেল, যামিনীমোহনের বন্ধুরা রুমাল উড়াইতে লাগিলেন; ট্রেণ দৃষ্টির বাহিরে যাইলে তাঁহারা ফিরিলেন।

ঘাটে পান্সী আরোহীদিগের প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। যামিনীমোহনের বন্ধুগণ আসিয়া পান্সীতে উঠিলেন,—পান্সী আবার কলিকাতার দিকে চলিল।

আরোহীদিগের মধ্যে কয় জন চুরুট ধরাইয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। বন্ধুকে বিদায় দিয়া সকলেই যেন মনের মধ্যে কেমন শূন্যতা অনুভব করিতেছিলেন। একজন সঙ্গীদিগকে হাবড়ার পুলের নির্ম্মাণ-কৌশল বুঝাইতে লাগিলেন; অন্য সকলে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া তাহা শুনিতে লাগিলেন। জাহ্নবীর জলরাশি যেমন কোন দিকে দৃক্পাত না করিয়া বহিয়া যাইতেছিল, তেমনই শ্রোতাদিগের মনোযোগ বা অমনোযোগের প্রতি দৃক্পাতমাত্র না করিয়া তিনি অনর্গল হাবড়ার পুলের নির্ম্মাণকৌশল বুঝাইতে বুঝাইতে চলিলেন।

হাবড়ার পুলের নির্ম্মাণকৌশল বুঝান শেষ হইবার পূর্ব্বেই পান্সী আসিয়া তীরে লাগিল; নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বক্তা বক্তৃতা বন্ধ করিলেন। সকলে অবতরণ করিলেন।

৮

ট্রেণ হাবড়ার প্ল্যাটফরম্ ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। প্রকৃতির শোভাময় সৌন্দর্য্যের মধ্যে আসিয়া যামিনীমোহনের নগরদৃশ্যক্লান্ত নয়ন বড় আনন্দ লাভ করিল। যে দিকে তাকাও, কেবল সবুজের খেলা;—মাঝে মাঝে কোথাও একটা ডোবায় বা নালায় এখনও কিছু জল আছে, তাহার প্রায় সর্ব্বাংশই পানায় সমাচ্ছন্ন।

কিন্তু যামিনীমোহনের নয়ন আনন্দ বোধ করিলেও তাহার হৃদয় সে আনন্দোপভোগে অংশী হইতে পারিল না। পশ্চাতে পরিচিত, সম্মুখে

অজ্ঞাত;—পশ্চাতে পরিচিত গৃহকোণ, সম্মুখে লক্ষ্যহীন ভ্রমণ;—পশ্চাতে অভ্যস্ত জীবন, সম্মুখে অনভ্যস্ত নূতন ব্যাপার; পশ্চাতে প্রাচীন, সম্মুখে নবীন! যেন কোন হতভাগ্য গৃহে জীবনের সুখ দুঃখে বহুদিনের সঙ্গিনীকে রাখিয়া কোন অপরিচিত দারান্তর গ্রহণ করিতে যাইতেছিল। এই সময় স্বভাবতই অতীত জীবনের পরিচিত ঘটনা সকল ও শত শত ছোট খাট সুখ দুঃখের স্মৃতি মনে পড়ে,—তাহাদিগের গতিরোধ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। এই পুরাতন ও নূতনের সন্ধিস্থলে আজ অতীত জীবনের শত স্মৃতি যামিনীমোহনের হৃদয় প্লাবিত করিয়া তুলিল। তাহার হৃদয়ে স্মৃতির পর স্মৃতি, চিত্রের পর চিত্রের মত উদিত হইতে লাগিল—তাহার অধিকাংশই অস্পষ্ট। অতীত জীবনের সেই শত স্মৃতির মধ্যে একটা ঘটনার স্মৃতি, একজনের স্মৃতি, সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল।

দিন যায়, রাত্রি আইসে; আবার দিন যায়; ট্রেণ গন্তব্যস্থানাভিমুখে ছুটিয়া চলিতে লাগিল।

জীবনের সর্ব্বপ্রধান সুখ ও সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র যাতনার স্মৃতি হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলা অসম্ভব। তাই আজ সেই অতীত প্রেমের স্মৃতি তাহার হৃদয়ে যেন আরও স্পষ্ট হইয়া ফুটিতে লাগিল;—বিমলার কথা কেবলই তাহার মনে পড়িতে লাগিল।

এই সময় ট্রেণ একটা বড় ষ্টেশনে আসিয়া স্থির হইল। যাত্রীদিগের উঠা নামা, গোলমাল আরম্ভ হইল। বোম্বাই হইতে কলিকাতাগামী ট্রেণও তখন সেই ষ্টেশনের অপর প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইয়াছিল। যামিনীমোহন চাহিয়া দেখিল, সেই ট্রেণে—বিমলা! আপনার কামরার সেই দিকের দ্বার খুলিয়া যামিনীমোহন নামিতে গেল—দ্বার রুদ্ধ। বিফলমনোরথ হইয়া সকল ভুলিয়া যামিনীমোহন উন্মত্তবৎ চীৎকার করিয়া ডাকিল,—"বিমলা!"

সেই পরিচিত নয়নে বিস্ময় ও বিরক্তিব্যঞ্জক দৃষ্টি; তাহার পর গবাক্ষে দুইখানি পরিচিত হস্ত দৃষ্ট হইল; গবাক্ষদ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল।

যামিনীমোহন আর একবার তীব্র বেদনাব্যঞ্জক স্বরে ডাকিল—"বিমলা!"

সেই সময় কলিকাতাভিমুখগামী ট্রেণের এঞ্জিন হইতে তীব্র হুইসল্ শ্রুত হইল; ট্রেণ প্ল্যাটফরম্ ছাড়াইয়া গেল। যামিনীমোহন চেতনাহতের মত নিকটস্থ আসনে বসিয়া পড়িল। যখন সে প্রকৃতিস্থ হইল, তখন দেখিল, ট্রেণ ছুটিয়া চলিয়াছে। তীব্রতম যাতনায় তাহার হৃদয় মথিত হইতেছিল।

ট্রেণ যখন বোম্বাই সহরে পৌঁছিল, তখন যামিনীমোহনের জীবনের আর কোনও লক্ষ্য নাই।

*   *   *   *

ইহার পর যামিনীমোহন বোম্বাইয়ের পদতলচুম্বী নীল সাগরসলিলে আপনার জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিল, কি য়ুরোপীয় সমাজের সদাচঞ্চল ফেনিল উত্তেজনাময় স্রোতে জীবন ভাসাইয়াছিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। তবে কাহার দোষে বিমলা ও যামিনীমোহনের বিবাহসম্বন্ধ ভঙ্গ হইয়াছিল, তাহা লইয়া কলিকাতার মহিলাসমাজে আজও তর্ক বিতর্ক হইয়া থাকে। কিন্তু কে বলিবে,—দোষ কাহার?

মহারাষ্ট্র ইতিহাসের উপকরণ।

প্রাচীন ভারতে ইতিহাসরচনার প্রথা বিশেষ প্রচলিত ছিল না। মানবচরিত্র-বর্ণনায় সময়ক্ষেপ করা অপেক্ষা দেবস্তুতিমূলক রচনায় প্রাচীন কালের আর্য্য-গণের সমধিক প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণগ্রন্থে "নারাশংসী গাথা" বা নরচরিতাখ্যানমূলক কবিতার সম্বন্ধে যেরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাতে সে বিষয়ে ঋষিগণের তাদৃশ অনুরাগের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় দৈবশক্তিবর্ণনাপূর্ণ ঐতিহাসিক কাব্যও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে অতি বিরল। পুরাণ গ্রন্থ হইতে প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত কিয়ৎ-পরিমাণে সংগৃহীত করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু দুই একখানি পুরাণ ভিন্ন প্রায় অপর সকলগুলিই ধর্ম্মব্যাখ্যানে ও রূপকময় ধর্ম্মোপাখ্যানে পরিপূর্ণ। সুতরাং প্রাচীন ভারতের ইতিহাসোদ্ধার একরূপ দুর্ঘট ব্যাপার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ভারতের বৈদিক ও পৌরাণিক কালের ইতিহাসের ন্যায় বৌদ্ধযুগের ইতিবৃত্ত নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য নহে। বৌদ্ধগণের ললিতবিস্তর, দীপবংশ, মহা-বংশ ও জৈনগণের আদিপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের ও বর্ত্তমানকালের পণ্ডিত-মণ্ডলীর চেষ্টায় আবিষ্কৃত প্রস্তরলিপি, তাম্রশাসন ও প্রাচীন মুদ্রাদির

সাহায্যে, বৌদ্ধযুগের ইতিহাস আংশিক পরিস্ফুট হইয়াছে। নবাভ্যুদয়সম্পন্ন বৌদ্ধ ও জৈনগণ, তাঁহাদিগের প্রসিদ্ধ পুরুষগণের, বিশেষতঃ ধর্ম্মাচার্য্যগণের ও তাঁহাদিগের ধর্ম্মবিতণ্ডার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। প্রসিদ্ধ নরপতিগণের কাব্যাকারে রচিত জীবনচরিত ও প্রতাপশালী রাজবংশসমূহের কীর্ত্তিকাহিনীপূর্ণ "রাজপ্রশস্তি"-রচনার প্রথাও এইকালে প্রচলিত হইয়াছিল, এরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেকালের রচিত সমস্ত গ্রন্থ অদ্যাপি আধুনিক ঐতিহাসিক পণ্ডিতমণ্ডলীর হস্তগত হয় নাই। বহুসংখ্যক গ্রন্থই বিলুপ্ত ও দেশান্তরিত হইয়াছে। আধুনিক কৃতবিদ্যগণ অতি-অল্পসংখ্যক গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কহ্লণকৃত রাজতরঙ্গিণী, দিল্লীর ইতিবৃত্তমূলক কালিন্দীমাহাত্ম্য, বিহ্লণের বিক্রমাঙ্কদেবচরিত, গুজরাটের রাসমালা, হেমাদ্রিকৃত দেবগিরির যাদববংশীয় নৃপতিগণের "রাজপ্রশস্তি" প্রভৃতি কয়েকখানি কবিতাময় গ্রন্থ ভিন্ন সংস্কৃত সাহিত্যে ইতিহাস-নামের যোগ্য আর কোনও গ্রন্থের বিষয় শ্রুত হওয়া যায় না। প্রাকৃত বৃহৎকথা বা সংস্কৃত কথাসরিৎসাগরের ন্যায় কথাগ্রন্থই বা কয়খানি পাওয়া যায়? ফল কথা, পুরাণবর্ণিত কালের ও মুসলমানগণের আগমনকালের মধ্যবর্ত্তী সময়ে, ইতিহাসরচনায় প্রবৃত্তি অপেক্ষা সেকালের ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থসমূহের বিলোপই সেই যুগের ইতিহাস জ্ঞাত হইবার প্রধান অন্তরায় বলিয়া বোধ হয়।

এই যুগের মহারাষ্ট্র দেশের ইতিহাসও কয়েকখানি বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থ, এবং প্রাচীন প্রস্তরলিপি, তাম্রশাসন ও মুদ্রাদির সাহায্যেই আংশিকরূপে অবগত হওয়া যায়। এই প্রাচীন ইতিহাসোদ্ধারের কার্য্য প্রথমতঃ রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর সভ্যগণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। তৎপরে "ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়ারী" নামক পুরাতত্ত্ববিষয়ক মাসিকপত্রের দ্বারা এই কার্য্য বহুপরিমাণে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে, এবং এখনও হইতেছে। এই মাসিকপত্রে ভারতীয় প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের গবেষণামূলক রচনা-সমূহ প্রকাশিত হইয়া থাকে। সেই সকল প্রবন্ধের সারসঙ্কলন পূর্ব্বক পণ্ডিতাগ্রগণ্য ডাক্তার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর মহোদয় ইংরাজী ভাষায় মহারাষ্ট্রদেশের প্রাচীন ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত, অর্থাৎ মুসলমানদিগের আগমন-কাল পর্য্যন্ত সময়ের ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে।

প্রাচীনকালের তিমিরাচ্ছন্ন ভারত পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান-শাসিত ভারতে প্রবেশ করিলে, ঐতিহাসিক তত্ত্বের প্রথমাভাস দৃষ্টিগোচর হয়। এ কালের প্রারম্ভভাগের ইতিহাস মুসলমান লেথকগণের বিজয়বৃত্তান্তমূলক গ্রন্থ হইতে কিয়ৎপরিমাণে অবগত হওয়া যায়। মুসলমানগণ এ দেশে বদ্ধমূল হইলে, এতদ্দেশবাসিগণের সহিত বিশেষ পরিচয় ঘটিলে, মুসলমানগণের দ্বারা যে সকল "তওয়ারিখ" বা ইতিহাসগ্রন্থ রচিত হয়, তাহাতে ভারতবাসীর তদানীন্তন অবস্থা অপেক্ষাকৃত অধিকপরিমাণে বিবৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, সর্ব্বদেশের জেতৃজাতির লিখিত ইতিহাসে বিজিত জাতির চরিত্র ও বিবরণ সম্বন্ধে সচরাচর যে সকল দোষ সংঘটিত হইয়া থাকে, এই সকল তওয়ারিখ গ্রন্থেও সে সকল দোষের কিছুমাত্র অভাব দৃষ্ট হয় না। তথাপি এই সকল গ্রন্থের আলোচনা করিলে প্রায় সকল গ্রন্থ হইতেই কিয়ৎপরিমাণে এবং ফেরিস্তা, বদৌনী, গোলাম হোসেন, আবুল ফজল ও কাফি খাঁ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ও সমসাময়িক ইতিহাসলেথকগণের গ্রন্থ হইতে বহুপরিমাণে ভারতসংক্রান্ত আবশ্যক ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে। এই কারণে ভারতীয় ইতিহাসের উদ্ধারপ্রয়াসী লেথকগুলীর পক্ষে পারস্য ও আরবীয় ভাষা শিক্ষাপূর্ব্বক স্বদেশীয় ভাষায় ঐ সকল "তওয়ারিখ" গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ প্রকাশিত করা অতীব আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। স্যার এইচ্. এম্. ইলিয়ট সাহেব গবর্মেন্টের সাহায্যে অধিকাংশ প্রসিদ্ধ মুসলমান ইতিহাসলেথকের গ্রন্থের সারসঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ History of India, as told by its own Historians নামে পরিচিত ও বড় বড় আট খণ্ডে সম্পূর্ণ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার সঙ্কলিত সারার্থ সর্ব্বত্র ভ্রমপ্রমাদশূন্য নহে, এবং মূল গ্রন্থ বা তাহার অবিকল অনুবাদপাঠের ফলও ইলিয়ট মহোদয়ের সঙ্কলিত সংক্ষিপ্তসারপাঠের ফল হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তবে যত দিন মূলগ্রন্থসমূহের অবিকল অনুবাদ স্বদেশীয় ভাষায় প্রকাশিত না হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত ইতিহাসালোচনপ্রিয় লেথকগণকে অগত্যা 'ঘোল খাইয়া দুধের সাধ মিটান'র মত, ইলিয়টের গ্রন্থ পাঠ করিয়াই পরিতৃপ্ত থাকিতে হইবে।

মহারাষ্ট্রদেশে স্বদেশীয় ইতিহাসের উদ্ধারকামিগণ এ বিষয়ে বঙ্গদেশবাসিগণের অপেক্ষা কিয়ৎপরিমাণে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহাদিগের চেষ্টায়, ফেরিস্তার রচিত ইতিহাসের ও "বুসাতিনে সালাতিন" নামক বিজাপুরের

ওয়ারিথ গ্রন্থের অনুবাদ মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি আরঙ্গজীবের সমসাময়িক জীবনীলেখক সুপ্রসিদ্ধ কাফি খাঁ কর্ত্তৃক আরবীয় ভাষায় লিখিত প্রকাণ্ড ইতিহাসগ্রন্থের অবিকল মহারাষ্ট্রীয় অনুবাদ আরব্ধ হইয়া "বিবিধজ্ঞানবিস্তার" নামক মাসিকপত্রে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। তদ্ভিন্ন, দেশীয় ভাষায় পূর্ব্বকথিত ডাক্তার ভাণ্ডারকর প্রণীত Early History of the deccan down to the mehomeden Conquest নামক গ্রন্থের ও গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেবের প্রণীত History of the Marathas গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত এবং Bombay Gazzatteers প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে "মহারাষ্ট্র-দেশীয় দুর্গসমূহের বিবরণ" নামক গ্রন্থ সঙ্কলিত এবং কোহ্লাপুর কর্ণাট প্রদেশের গেজেটীয়ার-সমূহ অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মহা-রাষ্ট্রীয়গণ স্বদেশীয় ভাষায় রচিত প্রাচীন বখর বা ইতিহাসগ্রন্থসমূহের বিষয়ে ও গবেষণাপূর্ণ ঐতিহাসিকগ্রন্থের রচনাতেও বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেছেন।

মহারাষ্ট্র দেশের মুসলমানশাসিত কালের দেশীয় ভাষায় রচিত কোনও ইতিহাসগ্রন্থ অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। এইকালের মুসলমানগণের লিখিত ইতিহাসের মধ্যে ফেরিস্তার রচিত গ্রন্থই সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক ও উৎকৃষ্ট। এই গ্রন্থের যে দুইখানি সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ ইংরাজীতে প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে জেনারেল ব্রিগসকৃত অনুবাদই উৎকৃষ্ট। এই গ্রন্থে আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক ১২৯৪খৃঃ মহারাষ্ট্র বিজয় হইতে ১৬০৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় তিন শত বৎসরের ঐতিহাসিক বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। ফেরিস্তার গ্রন্থে ব্রাহ্মণী ও তদন্তর্ভুক্ত নিজামশাহী রাজ্যের ইতিহাস যেরূপ বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে, আদিল-শাহী, কুতুবশাহী ও বিজয়নগর প্রভৃতি রাজ্যের ইতিহাস সেরূপ বিস্তৃতভাবে বিবৃত হয় নাই। বিজাপুরের পারস্য ভাষায় রচিত অনেক ইতিহাসগ্রন্থ ছিল; কিন্তু এখন আর সে সকল গ্রন্থ সুপ্রাপ্য নহে। স্থানীয় লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ইংরাজ কর্ম্মচারী ও ভ্রমণকারিগণ আসিয়া ঐ সকল বহুমূল্য গ্রন্থ ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছেন। মহারাষ্ট্র দেশের ইতি-হাসলেখক ক্যাপ্‌টেন জেমস্ গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেব মহোদয়ও বিজাপুর হইতে পারস্যভাষায় রচিত কয়েকখানি ইতিহাসগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এই সকল কারণে, বিশেষতঃ পারস্যভাষার চর্চ্চার অভাবে, অনেক পারসী গ্রন্থ বিলুপ্তপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। মহারাষ্ট্রীয়গণের অভ্যুদয় কালেও পারসীগ্রন্থের প্রতি সাধারণের অনাদর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়

নৃপতিগণের অধীনে সেকালে "পারসীনবীশ" নামে পরিচিত পারস্যভাষাভিজ্ঞ কর্ম্মচারী থাকিতেন। শুনা যায়, এই পারসীনবীশদিগের নিকট অনেক পারস্য গ্রন্থ সংগৃহীত থাকিত। মহারাষ্ট্রীয় ও পারস্যভাষায় তুল্য অনুরাগ হেতু তাঁহাদিগের চেষ্টায় কোনও কোনও পারস্য গ্রন্থ মহারাষ্ট্রীয় ভাষাতে অনুবাদিত হইয়াছিল। কিন্তু অধুনা সেই সকল মূল গ্রন্থ বা তদনুবাদসমূহের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। কেবল কোহ্লাপুরের মহারাজের ভূতপূর্ব্ব পারসীনবীশের নিকট হইতে "বুসা তিনে সলাতিন" নামক গ্রন্থের প্রাচীন মারাঠী অনুবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুরের তত্ত্বাবধানে অনেক পারস্য ভাষায় রচিত ইতিহাসগ্রন্থ আছে। ঐ সকল গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হইলে, দাক্ষিণাত্যের মুসলমান শাসনকালের ইতিহাস বহুপরিমাণে পরিস্ফুট হইবার সম্ভাবনা।

উত্তর-ভারতে রচিত ইতিহাসগ্রন্থের মধ্যে কাফি খাঁর প্রণীত ইতিহাস হইতে মহারাষ্ট্রদেশের সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে। কাফি খাঁ আরঙ্গজীবের অধীন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম মহম্মদ কাশেম খাঁ। ইহাঁর রচিত গ্রন্থে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মোগল-শাসিত ভারতবর্ষের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। সয়ের মুতাক্ষরীণ প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থে কাফি খাঁর ইতিহাস হইতে অনেক অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। কাফি খাঁ মোগল সম্রাটের অধীন নানাবিধ রাষ্ট্রীয় ও সামরিক কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া, এবং সমসাময়িক প্রাচীনগণের ও বিভিন্নদেশীয় ও বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণের প্রমুখাৎশ্রুত বিবরণ অবলম্বন করিয়া স্বীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার লিখিত সমসাময়িক ঘটনাবলীর মোগলপক্ষীয় বিবরণ যে বহুপরিমাণে বিশ্বাসযোগ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহারাষ্ট্রীয়-দিগের বিষয়েও এই গ্রন্থে অনেক স্থলে উল্লেখ আছে। লেখক অপক্ষপাতিতার সহিত লিখিবার চেষ্টা করিয়াও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সম্বন্ধে স্বীয় তাচ্ছীল্য ও বিরাগ গোপন করিতে পারেন নাই। সেকালের মহারাষ্ট্রীয়গণ মোগলদিগের শাসনশৃঙ্খল ছিন্ন করিবার জন্য যেরূপ চেষ্টিত হইয়াছিলেন, এবং তদ্বিষয়ে যেরূপ কৃতকার্য্য হইতেছিলেন, তাহাতে কাফি খাঁর ন্যায় মোগল ইতিহাসলেখকের মনে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে প্রগাঢ় বিদ্বেষ উদিত হওয়া কিছুমাত্র আস্বাভাবিক নহে। এই কারণে মহারাষ্ট্রীয়দিগের উল্লেখ-স্থলে কাফি খাঁর গ্রন্থে অনেক স্থানেই তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কুক্কুর, নারকী

কুক্কুর (Helle dog) প্রভৃতি তীব্রঘৃণাসূচক বিশেষণসমূহ প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ শিবাজীর স্বর্গারোহণের উল্লেখকালে এই লেখক "ঐ কুক্কুর নরকে গমন করিল", এইরূপ বাক্য ব্যবহার না করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রতি গ্রন্থকারের এইরূপ বিদ্বেষ সত্ত্বেও তাঁহার গ্রন্থ যে ইতিহাসচর্চ্চাপ্রিয় লেখকগণের আলোচ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সয়ের মুতাক্‌রীণ, বাদশানামা, আলমগীরনামা প্রভৃতি গ্রন্থেও মহারাষ্ট্রীয়দিগের আংশিক ইতিবৃত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মুসলমানদিগের লিখিত গ্রন্থ ভিন্ন সেকালের মুসলমান নরপতিগণের অধীন হিন্দুকর্ম্মচারিগণও স্বসমকালের প্রসিদ্ধ ঘটনাবলীর বিবরণ লিখিয়া রাখিতেন। মুসলমান ভূপতিগণের অধীনে বাস হেতু ও তৎকালে সর্ব্বত্র পারস্য ভাষার আদরাধিক্যবশতঃ, তাঁহারা পারস্য ভাষাতেই স্বলিখিত ইতিহাসগুলির রচনা করিয়াছেন। এইরূপ যবনাধীন হিন্দু লেখক কর্ত্তৃক পারস্য ভাষায় লিখিত দুইখানি ইতিহাসগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমখানি দলপৎ রায় নামক আরঙ্গজীবের জনৈক বুন্দেল কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক লিখিত। কাশীরাজপন্থ নামক সুজাউদ্দৌল্লার কোনও কর্ম্মচারী দ্বিতীয় গ্রন্থের প্রণেতা। প্রথম গ্রন্থের লেখক দাক্ষিণাত্যের প্রত্যেক মোগল অভিযানের সময় সম্রাট আরঙ্গজীবের সঙ্গে থাকিয়া দাক্ষিণাত্য সমরের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ স্কট জোনাথন সাহেব কর্ত্তৃক Aurungzeb's Operation in the Deccan নামে প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় গ্রন্থে কাশীরাজপন্থ পাণিপতের তৃতীয় যুদ্ধের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং এই মহাসমরে উপস্থিত থাকিয়া যবনগণের পক্ষীয় যাবদীয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার লিখিত বিবরণ যে বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বলা অনাবশ্যক যে, এই গ্রন্থকারের পক্ষে যবনদিগের গুপ্তপরামর্শাদির বিবরণ অবগত হইবার যেরূপ সুবিধা ছিল, মহারাষ্ট্রীয় পক্ষের অবস্থা জানিবার তাদৃশ সুযোগ ছিল না। এসিয়াটিক্ রিসার্চেস্ নামক গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে এই গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয়গণও এই গ্রন্থ স্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন।

ইহার পর স্বদেশীয় ভাষায় রচিত ঐতিহাসিক উপকরণসমূহ আমাদিগের আলোচ্য। ভারতে মুসলমানশাসনকালে, কিয়ৎপরিমাণে মুসলমানদিগের

অনুকরণে ও প্রধানতঃ মুসলমানগণের সঙ্ঘর্ষে, ভারতীয় ভিন্নপ্রদেশীয় হিন্দুগণের মধ্যে স্বদেশীয় ভাষায় ইতিহাস ও ঐতিহাসিক গাথারচনার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। মুসলমানদিগের সহিত বিবাদ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়, রাজপুত ও শিখ প্রভৃতি যে সব জাতি স্বাধীনতালাভের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহারা অভ্যুদয়লাভের পর আপনাদিগের উন্নতির ইতিহাস, বিশেষতঃ মুসলমানগণের সহিত বিসম্বাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। জাতীয় অভ্যুদয়, স্বাধীনতা, অপর জাতির সহিত নিত্য সংঘর্ষ ও বিজয়লাভ, ইতিহাসরচনার প্রবর্ত্তক। পরপদানত, গৌরবহীন, বিপন্নজাতির ইতিহাসরচনার প্রবৃত্তি সম্ভব নহে। রাজপুত জাতির অতি প্রাচীন ইতিহাস সুপ্রাপ্য ও সুস্পষ্ট নহে। তাঁহাদিগের মধ্যযুগের ইতিহাস, পরস্পরের সহিত সংঘর্ষের ও যবনগণের সহিত বিরোধে জয়লাভের বা তাদৃশ কোনও জাতীয় গৌরবকর বা চিরস্মরণীয় ঘটনার বিবরণপূর্ণ আখ্যানমালা, বহুপরিমাণে সুলভ। মধ্যযুগে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজন্যবর্গের সহিত বিরোধে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টায় একমাত্র "মেওয়ার" (মিবার) প্রদেশই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সফলপ্রযত্ন হইয়াছিল বলিয়া, রাজপুতানার অপরাপর প্রদেশ অপেক্ষা মেওয়ারের স্বদেশীয় ভাষায় লিখিত ইতিহাস অধিকতর পরিস্ফুট ও বিস্তীর্ণ।

মহারাষ্ট্রীয়গণের ইতিহাসগ্রন্থসমূহও ঠিক এইরূপ অবস্থায় রচিত। মহারাষ্ট্রদেশের অতিপ্রাচীন ইতিহাসগ্রন্থের মধ্যে কেবল গুণভদ্ররচিত উত্তরপুরাণের ঐতিহাসিক পরিশিষ্ট (খৃঃ দশমশতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত) বিদ্যাপতি বিহ্লণ কৃত "বিক্রমাঙ্কদেবচরিত" (খৃঃ ১২শ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত) ও হেমাদ্রি-প্রণীত দেবগিরির যাদববংশীয় নরপতিগণের "রাজপ্রশস্তি" (ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত) এই তিনখানি গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। * এই তিনখানি গ্রন্থই সংস্কৃত ভাষায় কাব্যাকারে তদানীন্তন মহারাষ্ট্রপতিগণের দাক্ষিণাত্যের সার্ব্বভৌমত্বপ্রাপ্তিকালে রচিত। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যাদববংশীয় নৃপতিগণের অধঃপতনের পর মহারাষ্ট্রদেশে মুসলমান-শাসন প্রবর্ত্তিত এবং মহারাষ্ট্রজাতির অবনতির আরম্ভ হয়। ইহার পর তিন শত বৎসর কাল মহারাষ্ট্রীয়গণ যবনগণের কঠোর শাসনচক্রে নিষ্পেষিত হইয়া ম্রিয়মাণ অবস্থায় কালাতিপাত করেন। এই সময়ে জাতীয় ভাষায় কোনও ইতিহাস রচিত হয় নাই। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রাতঃস্মরণীয় "ক্ষত্রিয়কুলাবতংস শ্রীরাজা শিবছত্রপতি"র চেষ্টায় মহারাষ্ট্রীয়গণের

জাতীয় শক্তি সঞ্জীবিত হইলে, নবাভ্যুদিত মহারাষ্ট্র জাতির হৃদয়ে ইতিহাস-রচনার প্রবৃত্তি জাগরূক হইয়া উঠে। সর্ব্বপ্রথম, শিবাজীর মাতার আদেশে, অনুমান ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে, অজ্ঞানদাস নামক পুনার একজন গ্রাম্যকবি বা "ভাট" প্রতাপগড়ের যুদ্ধ ও আফজল খাঁর পরাভব সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ গীতিকবিতার রচনা করেন। তাহার পর, অপর কবিগণ কর্তৃক "সিংহগড়-বিজয়" ও শিবাজীর বাল্যসহচর বাজীফসলকরের শৌর্য্য সম্বন্ধেও দুই একটি কবিতা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই সকল কবিতা সমসাময়িক কবিগণ কর্তৃক রচিত হওয়ায়, ইহাদিগের মধ্যে সেকালের জনসমাজের জ্ঞান বিশ্বাসের ও ঐ সকল ঘটনার জীবন্ত ঐতিহাসিক চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এইরূপে মহারাষ্ট্রীয়গণের জাতীয় জীবনের বিকাশের সহিত, তাঁহাদিগের মধ্যে আপনাদিগের অভ্যুদয়-বিবরণ, প্রধান প্রধান যুদ্ধের বিজয়-বার্ত্তা ও প্রসিদ্ধ পুরুষগণের শৌর্য্যবীর্য্যাদিমূলক গাথারচনার ও তাহা গৃহে গৃহে সঙ্গীতাকারে গীত হইবার প্রথা প্রচলিত হয়। পরবর্ত্তিকালে এই প্রথা মহারাষ্ট্রদেশে বিশেষরূপে প্রসার লাভ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণের অভ্যুন্নতির পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। সম্প্রতি আকওয়ার্থ সাহেব ও শালিগ্রাম মহোদয়ের চেষ্টায় বহুসংখ্যক ঐতিহাসিক গাথা সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রাম্যকবির রচিত পূর্ব্বোক্ত গাথাত্রয়ের রচনার পর শিবাজীর সম-সাময়িক হিন্দুস্থানী কবিভূষণ শিবাজীর গুণগ্রাম বর্ণনা করিয়া সহস্রশ্লোক-সংবলিত এক ঐতিহাসিক কাব্যের রচনা করেন। বৃদ্ধগণের মুখে শুনা যায়, শিবাজীর সভাপণ্ডিত গাগাভট্ট সংস্কৃত ভাষায় এক "শিবাজী-চরিত" রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ঐ গ্রন্থের কোনও সন্ধানই পাওয়া যায় নাই। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমপাদে পুরুষোত্তম পণ্ডিত কর্তৃক "শিব-কাব্যং" নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে শিবাজী হইতে শেষ বাজীরাওয়ের সিংহাসনপরিত্যাগ ও ইংরাজদিগের আগমন পর্য্যন্ত কালের ইতিহাস কাব্যাকারে সংকলিত হইয়াছে।

---

* কর্ণাটকীয় ভাষায় দেবগিরি ও বিজয়নগরের হিন্দু নরপতিগণের চরিতাখ্যানমূলক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে দেবগিরির শেষ নৃপতি রামচন্দ্র রাওয়ের একখানি বখর (ইতিহাস) মান্দ্রাজের সরকারী গ্রন্থসংগ্রহালয়ে রক্ষিত আছে। তাঞ্জোর অঞ্চলে তদ্দেশীয় ভাষায় "নরপতিবিজয়" প্রভৃতি বিবিধ ইতিহাস গ্রন্থ আছে, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। তামিলী ভাষাতেও অনেক ইতিহাসগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, শুনিতে পাওয়া যায়।

যাহা হউক, শিবাজীর জীবদ্দশায় রচিত ঐতিহাসিক উপকরণের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত গাথাত্রয়, ভূষণের কবিতা-গ্রন্থ, এবং শিবাজীর প্রতি তুকারাম ও রামদাস স্বামীর প্রেরিত কয়েকখানি পত্র ভিন্ন আর কিছু পাওয়া যায় না। শিবাজীর মানবলীলাসম্বরণের ১২।১৩ বৎসর পরে, কৃষ্ণাজী অনন্ত সভাসদ নামক তাঁহার জনৈক কারকুন্, শিবাজীর স্বরাজ্যস্থাপনের ইতিহাস-সম্বলিত জীবনচরিত রচনা করেন। ইহাই মহারাষ্ট্রীয়দিগের জাতীয় ভাষায় রচিত ইতিহাস-নামের যোগ্য প্রথম গদ্য গ্রন্থ। পরবর্ত্তী কালে শিবাজীর জীবন অবলম্বন করিয়া অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয় কৃতবিদ্য-মণ্ডলীর চেষ্টায়, এ পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির রচিত শিবাজীর সাতখানি বখর পাওয়া গিয়াছে, এবং তন্মধ্যে পাঁচখানি বিবিধ টীকা টিপ্পনী সহ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে।

কৃষ্ণাজী অনন্ত সভাসদের বখর রচিত হইবার পর হইতে মহারাষ্ট্রদেশে গদ্য-ইতিহাস-রচনার প্রথা বিশেষরূপে প্রবর্ত্তিত হইল। ক্রমে, মহারাষ্ট্রীয়-গণের স্বরাজ্যকালে প্রাদুর্ভূত অধিকাংশ প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনচরিত ও বিখ্যাত ঘটনাসমূহের বিবরণ সমসাময়িক রাজকর্ম্মচারী ও মারাঠা সর্দ্দার-গণের যুদ্ধসহচর কারকুন্ ও পরভবিক লেখকগণ কর্ত্তৃক লিখিত হইতে লাগিল। মুসলমান নরপতিগণের অনুকরণে মহারাষ্ট্রদেশীয় ভূপতিগণ ও তাঁহাদিগের প্রতিনিধি, মন্ত্রী ও অভিজাতবর্গ আপনাদিগের জীবনের ও রাজকীয় দৈনন্দিন ঘটনাবলী লিখিয়া রাখিবার জন্য, "আখবরনবীশ" ও "বাকা-নবীশ"-(বৃত্তান্তলেখক)-সমূহ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সকল লেখকের গ্রন্থাদি এখনও মহারাষ্ট্রদেশে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য নহে। স্বরাজ্যকালে মহা-রাষ্ট্রীয়গণের রাষ্ট্রীয় উন্নতির সহিত ইতিহাসরচনাপ্রিয়তা এত দূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, নানা ফড়নবীসের ন্যায় রাজমন্ত্রিগণ "আত্মচরিত" লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় লেখকগণ কেবল স্বদেশীয় খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের কীর্ত্তিকলাপের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াই পরিতৃপ্ত না হইয়া, সেকালের দাক্ষিণাত্যের সুলতান ও নবাবগণের ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থেরও রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল বখরের মধ্যে বিজাপুরের সুলতান-গণের বিবরণ বিষয়ক আটখানি বখর সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই শ্রেণীর গ্রন্থসমূহ যে অধিকাংশস্থলে পারস্য ভাষায় রচিত তওয়ারিখ হইতে সঙ্কলিত, তাহা বলাই বাহুল্য।

এই সকল ঐতিহাসিক গ্রন্থ ভিন্ন সেকালের রাজন্ত ও সামন্তবর্গের এবং রাজাশ্রিত বা তৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের বংশধরগণের নিকট হইতে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের লিখিত মূল চিঠিপত্রাদি ও পারিবারিক উৎসবাদির ব্যয়বিবরণসম্বলিত কাগজপত্র সংগ্রহ করাও দুর্ঘট নহে। এই সকল বখর ও কাগজপত্র সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইলে, তাহা হইতে নানাবিধ বহুমূল্য ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারিবে। এই কারণে মহারাষ্ট্র-দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ ঐ সকল বখর ও ঐতিহাসিক কাগজপত্র সংগ্রহ করিবার জন্য বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। তাঁহাদিগের চেষ্টায় এ পর্য্যন্ত প্রায় চল্লিশখানি প্রাচীন বখর ও ৫। ৬ শত ঐতিহাসিকবিবরণসম্বলিত চিঠিপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রদেশের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহারা কিরূপ চেষ্টা করিতেছেন, এবং তাঁহাদিগের প্রয়াসসিদ্ধির কিরূপ সম্ভাবনা ও সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা "ডেকান ভার্ণাকিউলার ট্রান্-স্লেশন সোসাইটী"র গত বৎসরের বিবরণী হইতে দুই এক স্থল উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের গোচর করিতেছি।

"পুনার ভূতপূর্ব্ব মহারাষ্ট্রপতি পেশওয়েগণের দপ্তরখানায় যে সব সরকারী কাগজপত্র ছিল, সে সকল এক্ষণে বৃটিশ গবর্মেণ্টের রক্ষণাধীন আছে। ঐ সকল কাগজপত্র মহারাষ্ট্রদেশের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাসের রচনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইতে পারে বিবেচনায়, বর্ত্তমান সভা গবর্মেণ্টের নিকট ঐ সকল কাগজপত্র দেখিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ২।৩ বার প্রত্যাখ্যান করিয়া পরিশেষে গতবৎসর সদাশয় বোম্বাই গবর্মেণ্ট এই সোসাই-টীকে "পুনা দপ্তরের কাগজপত্র"-সমূহ দেখিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। এই পুনা দপ্তরের কাগজপত্র পাঠ করিলে, ইহাকে ঐতিহাসিক তত্ত্বের সমুদ্র-বিশেষ বলিয়াই ভ্রম জন্মে। ইহাতে মহারাষ্ট্রজাতির গত দুই শত বৎসরের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, ধর্ম্মসংক্রান্ত উন্নতির সুবিস্তৃত ইতিহাসরচনার উপযোগী যে সকল রাশি রাশি বহুমূল্য কাগজপত্র বা উপকরণ সংগৃহীত রহিয়াছে, তাহা দর্শন করিলে, প্রত্যেক ঐতিহাসিকের হৃদয়ই পরমানন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। সভার চেষ্টায় তৃতীয় পেশওয়ে শ্রীমন্ত বালাজী বাজীরাওয়ের জীবনী-সংক্রান্ত কাগজপত্রসমূহের যে সকল অত্যাবশ্যক অংশ গবর্মেণ্টের আদেশে ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়াছে, তাহা মুদ্রিত করিলে, ফুলস্ক্যাপ আকারের ৪৪০০ পৃষ্ঠা হইবে। সাতারার নরপতিগণের ইতিহাসের উপকরণসমূহ

প্রকাশ করিলে, তাহাও ঐ আকারের ১২ শত পৃষ্ঠার কম হইবে না। তদ্ভিন্ন ভূতপূর্ব্ব মহারাষ্ট্রপতিগণের চিটনাম বা পত্রলেখকদিগের স্বহস্তলিখিত প্রায় পঞ্চাশৎসহস্রাধিক পত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই সকল পত্রের মধ্যে অনূ্যন পাঁচ সহস্র পত্র এবং চতুর্থ পেশওয়ে মাধবরাও সাহেবের স্বহস্তে লিখিত ও স্বাক্ষরিত প্রায় পাঁচ ছয় শত পত্র প্রকাশযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এই সকল কাগজপত্র গবর্মেণ্টের চিরপ্রচলিত পদ্ধতিক্রমে মুদ্রিত হইলে, উহা সাধারণের হস্তাগত হইতে বহুবিলম্ব ঘটিবে। এই হেতু সাতারার দুই জন সুপ্রসিদ্ধ উকিল—রাজশ্রী বলবন্ত শ্রীধর সহস্রবুদ্ধি ও রাজশ্রী রঘুনাথ পাণ্ডুরাঙ্গ করন্দীকর, এই দুই মহোদয় নিঃস্বার্থ স্বদেশহিতৈষণার বশবর্ত্তী হইয়া ফুলস্ক্যাপ আকারের প্রায় ৫৫০০ পৃষ্ঠায় পরিমিত উপকরণ-মুদ্রণের ব্যয় প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। সভার অন্যতম উদ্যোগী সভ্য ও মহারাষ্ট্র ইতিহাসে সুপণ্ডিত রাজশ্রী দত্তাত্রয় বলবন্ত পারসনীস মহাশয়ের প্রতি ঐ সকল কাগজপত্র উপযুক্ত টীকা টিপ্পনী প্রভৃতি সহ সম্পাদন পূর্ব্বক প্রকাশ করিবার ভার প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অপরাপর যে সমস্ত ঐতিহাসিক উপকরণ মহারাষ্ট্রীয় কৃতবিদ্যমণ্ডলীর চেষ্টায় সংগৃহীত হইয়াছে, তৎসমূহের প্রকাশ জন্য এই সভার তত্ত্বাবধানে একখানি মাসিকপত্রও প্রকাশিত হইতেছে।"

পুনার পেশওয়েগণের দপ্তরের বহুমূল্য ঐতিহাসিক কাগজপত্রের ন্যায় আরও অনেক স্থানে প্রাচীন সর্দ্দার, জাইগীরদার ও সামন্তবর্গের বংশধরগণের নিকট, এবং জয়পুর, যোধপুর, গোয়ালিয়ার, বান্দা, ঝান্সী, সাগর, বরোদা, ইন্দোর, তাঞ্জোর, কর্ণাট, নাগপুর, সাতারা, কোল্হাপুর, কোলাবা ও ইসলামপুর প্রভৃতি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রদেশসমূহে মহারাষ্ট্র ইতিহাসের অনেক উপকরণ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। পুনার ভার্ণাকিউলার সোসাইটী সে সব উপকরণও সংগ্রহ করিবার চেষ্টায় আছেন, এবং তদ্বিষয়ে কিয়ৎপরিমাণে সফলপ্রযত্নও হইয়াছেন। পেশওয়েগণের অন্যতম সেনাপতি পরশুরাম ভাউ পটবর্দ্ধন মহোদয়ের বংশধরগণের নিকট হইতে মহারাষ্ট্র-ইতিহাসসংক্রান্ত এত কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছে, এবং সে সকল এত বহুমূল্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে যে, কেবল তাহাদিগের প্রকাশ জন্য "ঐতিহাসিক লেখ-সংগ্রহ" নামক একটি স্বতন্ত্র মাসিকপত্র প্রকাশ করা আবশ্যক হইয়াছে। আর এক জন ঐতিহাসিক, মহারাষ্ট্র মন্ত্রী নানা ফড়নবীসের দপ্তর অনুসন্ধান

করিয়া, তাহা হইতে ইতিহাসোপযোগী এত কাগজপত্র বাছিয়া বাহির করিয়াছেন যে, তৎসমস্ত প্রকাশিত করিতে প্রায় ৩০।৪০ সহস্র টাকার প্রয়োজন। নানা ফড়নবীসের দপ্তরে দ্বিতীয় মাধব রাওয়ের কয়েকটি দৈনন্দিন ঘটনায় বিবরণপূর্ণ পুস্তক (খাতা) পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে মাধব রাওয়ের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রত্যেক দিবসের ঘটনাবলী বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে। এই দপ্তরে একটা মানচিত্রের পুলিন্দা পাওয়া গিয়াছে;—তাহাতে বিবিধ যুদ্ধক্ষেত্রের, কেল্লা ও দুর্গসমূহের, দুর্গাবরোধের, সমগ্র ভারতবর্ষের, নিজামের রাজ্যের ইংরাজ-অধিকৃত প্রদেশের, মহারাষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের, কঙ্কণ প্রদেশের এবং ইংরাজদিগের নৌবলের (Navy) ও বোম্বাই প্রভৃতি নগরীর ভিন্ন ভিন্ন মানচিত্রসমূহ অদ্যাপি সযত্নে রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে কঙ্কণের মানচিত্রখানি প্রায় ৪০।৫০ হস্ত দীর্ঘ! মাধব রাওয়ের ভূগোলশিক্ষার ও দূরবীক্ষণযোগে নভোমণ্ডলস্থ গ্রহনক্ষত্রাদি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য নানা ফড়নবীস যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণও এই দপ্তরে প্রাপ্ত হওয়া যায়!

মহারাষ্ট্রদেশের বহির্ভাগস্থিত মহারাষ্ট্রীয়গণও স্বদেশীয়-ইতিহাস-উদ্ধারের কার্য্যে বিশেষ যত্নপরায়ণ হইয়াছেন। বরোদানগরে মহারাষ্ট্র ইতিহাসের উপকরণসংগ্রহের জন্য একটি সভা সংস্থাপিত ও তাহার তত্ত্বাবধানে কয়েকখানি বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন বখর প্রকাশিত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রদেশের কায়স্থগণও তাঁহাদিগের সামাজিক ইতিহাসের সংগ্রহে বিশেষ মনোযোগী হইয়া কতিপয় ইতিহাসগ্রন্থের প্রকাশ করিয়াছেন।

গদ্য গ্রন্থ ভিন্ন বিবিধ কবিতাময় গ্রন্থেও ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে। মহীপতি-প্রণীত ভক্তি-বিজয়-ভক্তলীলামৃত, সন্তবিজয়, সন্তলীলামৃত প্রভৃতি ভক্তচরিতাখ্যানমূলক গ্রন্থে মহারাষ্ট্রদেশের সাধুপুরুষগণের জীবনী ও ধর্ম্মোন্নতির ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। নামদেব, একনাথ, রামদাস, তুকারাম প্রভৃতির শিষ্যগণও তাঁহাদিগের কবিতাময় জীবনচরিত রচনা করিয়াছেন। এই সকল সাধুপুরুষের আবির্ভাবই মহারাষ্ট্রীয় জাতীয় উন্নতির ও স্বাধীনতার এক প্রধান কারণ হইয়াছিল। এই কারণে তাঁহাদিগের জীবনী মহারা... ইতিহাসের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। ভক্তচরিতাখ্যায়ক গ্রন্থ ভিন্ন, মহারাষ্ট্রীয় জাতির উৎপত্তির বিবরণ, ভূপতিবিজয়, প্রভুবংশকাব্য, জনকবিজয়, মাধববিজয় প্রভৃতি বিবিধ ইতিহাসমূলক গ্রন্থও সংস্কৃত ও মারাঠী ভাষায় রচিত হইয়াছিল।

এই প্রবন্ধে আমরা মহারাষ্ট্র ইতিহাসের দেশীয় উপকরণের বিপুলতা সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা বলিলাম, তাহা হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, ঐ সকল উপকরণ নিঃশেষরূপে সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইলে, মহারাষ্ট্র-দেশের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাসরচনার পথ সুগম হইবে। ভারতের আর কোনও প্রদেশের ইতিহাস লিখিবার এরূপ প্রচুর উপকরণ আছে কি না সন্দেহ। মহারাষ্ট্রীয়দিগেরও স্বদেশীয় ইতিহাসগ্রন্থপাঠেচ্ছা আজকাল এরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, ইতিহাস নামে পরিচিত বা তৎসংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হইবামাত্র, অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাহার সমগ্র সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছে। ইতিহাসপাঠকের এরূপ সংখ্যাধিক্য দেখিয়া, মহারাষ্ট্রের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস-লেখকের আবির্ভাব প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।

শ্রীসখারামগণেশ দেউস্কর।

মশক।

মশক আমাদের প্রকাণ্ড শত্রু। সারাদিনের পরিশ্রমের পর শ্রান্তদেহে শয়ন করিলাম; পোঁ পোঁ শব্দে রণভেরী বাজাইতে বাজাইতে দলে দলে মশককুল আক্রমণ করিতে আসিবে। 'মশারি'-রূপ দুর্গ-মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, কৌশলকুশল শত্রু কেমন সতর্কতার সহিত দুর্গদ্বার অন্বেষণ করিবে! রণনিনাদ থামাইয়া কেমন ধীরে ধীরে দুর্গ-প্রাচীরে উপবেশন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য সুযোগের প্রতীক্ষা করিবে! নেটের মশারি সূতা দিয়া নির্ম্মিত বটে, কিন্তু পালঙ্কপার্শ্বে বিলম্বিত দেখিলে বিনা সূতার হারের কথা মনে পড়ে। ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যামিতিক ছিদ্ররাজি যেন নিতান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরস্পর পরস্পরের সহিত আবদ্ধ;—পৃথক হইবার অব্যহিত পূর্ব্বে ভ্রাতায় ভ্রাতায় যেরূপ ভাব দেখা যায়, এই ছিদ্ররাজির মধ্যে যেন তাহা পূর্ণমাত্রায় বিরাজ-মান; সামান্য কারণেই পরস্পর বিভিন্ন হইয়া পড়ে। তস্কর যেমন নীরবে সিঁদের মধ্যে পদ প্রবেশিত করিয়া দেয়, মশক সেইরূপ মশারির ছিদ্রের মধ্যে আপন পশ্চাদ্ভাগের পদদ্বয় প্রবেশিত করিয়া দিয়া দেখে যে, পথ প্রশস্ত কি না। যদি সুযোগ না বুঝে, তবে আবার ভেরী বাজাইতে বাজাইতে অন্য স্থানে গিয়া পূর্ব্ববৎ পরীক্ষা করে; মশারির কোন স্থান ছিন্ন পাইলে, সেই পথ

দিয়া ভিতরে প্রবেশ পূর্ব্বক আমাদিগকে আক্রমণ করে। তাই বলিতেছিলাম, মশক আমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

কিন্তু জীবনের সকল কালে আমাদের শত্রুতা করে না। মাতৃজঠর হইতে নির্গত হইয়া অধিকাংশ পতঙ্গের ন্যায় পৃথক পৃথক চারি ভাবে বিরাজ করে। ইহাদিগের জীবনবৃত্তান্ত এতই কৌতুকাবহ যে, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে; ইহাদিগের শত্রুতার কথা ভুলিয়া যাইতে হয়। যে অস্ত্রের দ্বারা ইহারা আমাদিগকে আক্রমণ করে, তাহা এমনই সুকৌশলে বিনির্ম্মিত যে, তাহা দেখিবার সময় মনে হয়, মশক! আর কিছু-ক্ষণ আমার রক্তপান কর, তোমার অস্ত্রের নির্ম্মাণকৌশল নয়ন ভরিয়া দেখিয়া লই।

পক্ষীদিগের ন্যায় মশকমাতা অণ্ড প্রসব করে। ইহারা জলের ধারে গিয়া বহুসংখ্যক সূক্ষ্মাগ্র লম্বা ডিম্ব ছাড়িয়া দেয়। দিন কয়েক পরে এই সকল ডিম ফুটিয়া তাহা হইতে লম্বা লম্বা পোকা বাহির হয়; তাহাদিগের পক্ষ থাকে না। তখন মশকের কোন অবয়বই থাকে না। ইহাদিগের মুখ গোল, চ্যাপ্টা ও কেশমণ্ডিত। শরীরের অন্য অংশেও কেশ থাকে, কিন্তু তাহা মুখের কেশ অপেক্ষা ছোট। পুচ্ছদেশে দুইটি নল থাকে; একটি বড় ও একটি তদপেক্ষা ক্ষুদ্র। এই বড় নলে ইহাদের শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়। এই জন্য ইহাদিগকে শ্বাসপ্রশ্বাসনির্ব্বাহের সময়ে জলের মধ্যে মস্তক স্থাপন করিয়া শ্বাস প্রশ্বাসের নলটিকে জলের উপর উন্নমিত করিতে হয়। ইহাদিগকে আমাদের মত শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে হয় না। দ্বিতীয় নলটির মুখের নিকট অতি ক্ষুদ্র স্বচ্ছ চারিটি পাখনা থাকে। ইহা দ্বারা জল সঞ্চালিত করিয়া পোকা-গুলি সন্তরণ করিতে পারে। মুখের কেশদাম ইহারা নিয়ত সঞ্চালন করিতে থাকে। ইহার ফলে জলে সামান্য স্রোত উৎপন্ন হয়। এই স্রোতে যে সকল কীটাণু ও উদ্ভিদাণু ভাসিয়া আসিয়া ইহাদিগের মুখগহ্বরে প্রবিষ্ট হয়, তদ্দ্বারা ইহারা উদরপূর্ত্তি করে।

এইরূপ অবস্থায় জীবনধারণকালে ইহারা অনেকবার গাত্রাবরণ পরিত্যাগ করে। তিন সপ্তাহ পরে শেষ আবরণ উন্মোচন করিয়া মশক-শিশু এক নূতন আকার ধারণ করে। এ আকারের সহিত পূর্ব্বতন আকারের আর কোন সৌসাদৃশ্য থাকে না। তখন আর সেই কেশগুচ্ছপরিশোভিত, নলদ্বয়-বিশিষ্ট-পাখনা-সংযুক্ত লম্বদেহ নাই। তাহার পরিবর্ত্তে এক্ষণে ক্ষুদ্র গোলাবয়ব;

মস্তকের সহিত একটি লাঙ্গূল ভিন্ন আর কিছুই নাই। এই অবস্থায় মশক-শিশু আহার করে না। সর্প যেরূপ ভাবে আঁকা-বাঁকা হইয়া জলে সন্তরণ করে, সেইরূপ ইহারা আপনাদিগের শরীর কুঞ্চিত ও প্রসারিত করিয়া জলমধ্যে বেড়াইয়া বেড়ায়। নিশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য ঋষভ-কর্ণের ন্যায় দুইটি অঙ্গ চক্ষের নিকট বাহির হয়; তাহার অগ্রভাগ জলের উপর থাকে। প্রায় এক মাস এইরূপ নিরাহার থাকিয়া যখন মশকশিশুর অন্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবার সময় আইসে, তখন ইহারা মাথা তুলিয়া জলের উপরিভাগে শান্তভাবে লাঙ্গূল ছড়াইয়া শয়ন করে। ক্ষণকাল এই ভাবে থাকিতে থাকিতে মস্তকের উপর ঋষভকর্ণাকৃতি শ্বাস প্রশ্বাসের নলের মধ্যভাগের চর্ম্ম বিদীর্ণ হইয়া যায়। নিমেষের মধ্যে এই বিদারণ বর্দ্ধিত হয়। অমনি শরীরের অভ্যন্তর হইতে নবদূর্ব্বাদলশ্যাম মূর্ত্তি নয়নগোচর হয়। চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে এই শ্যাম মূর্ত্তি মস্তক উত্তোলন করে। পশ্চাদ্ভাগ পূর্ব্ব-দেহাবরণের মধ্যেই থাকিয়া যায়। এই সময় ইহাদিগকে মাস্তল-বিশিষ্ট নৌকার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। পরিবর্ত্তনের এই অবস্থা মশকদিগের পক্ষে অতি কঠিন; এই নৌকায় জল প্রবেশ করিলে মশকের আর পরিত্রাণ নাই। যে মশকশিশু এত দিন জলচরজীবরূপে বাস করিত, জলে যাহারা এতকাল আহার, বিহার ও সন্তরণ করিত, এখন জলস্পর্শমাত্রে তাহারা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। বায়ুর ঈষৎ সঞ্চালনে, জলবিহারী জীবগণের গতি বা পার্শ্বপরিবর্ত্তনে যে সামান্য জলতরঙ্গ উত্থিত হয়, তাহার এক একটির জন্য সহস্র সহস্র মশক-কুমার-কুমারীর জীবনলীলা সাঙ্গ হইয়া যায়। যাহাদিগের এরূপ কোন বিঘ্ন না ঘটে, তাহারা কিছু ক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া আপনাদিগের লাঙ্গূল নৌকা হইতে বিযুক্ত করিয়া লইয়া, জলের উপর একবার বসিয়া, রৌদ্রে পক্ষদ্বয় শুষ্ক করিয়া লয়। জল ইহাদিগের ভার সহ্য করিতে পারে, এবং সম্ভবতঃ ইহাদিগের গাত্রে তৈলাক্ত কোন পদার্থ থাকে; তাই ডুবিয়া যায় না। পলকের মধ্যে ইহা-দিগের গাত্র শুকাইয়া উঠে; অমনি পোঁ শব্দে জল হইতে উড়িয়া বায়ুমণ্ডল মুখরিত করে।

মশক শব্দ করে। এ শব্দ ইহার পক্ষসঞ্চালনজনিত; মুখের নহে। ইহা-দিগের জিহ্বা নাই। সুতরাং ইহাদিগের মুখ দ্বারা শব্দ করিবার সামর্থ্যও নাই। কেবল মশক বলিয়া নহে, কোন পতঙ্গই কথা কহিতে পারে না। ভ্রমরের গুণ্ গুণ্ ও ঝিল্লীর রবও মুখনিঃসৃত নহে।

অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে মশককে অতিশয় সুন্দর দেখায়। ইহার সর্ব্ব-শরীর লম্বা লম্বা চতুষ্কোণ আঁইসের দ্বারা আবৃত। মস্তকের উপর দুইটি বড় বড় চক্ষু; যেন জাল দিয়া আবৃত। নয়নের পার্শ্ব দিয়া, সম্মুখভাগে অতি-শয় মনোরম চারিটি শৃঙ্গ বাহির হইয়াছে। আমাদের লেখনী পক্ষিপুচ্ছের দুই পার্শ্ব দিয়া যেমন পালক সকল ধারাবাহিকরূপে বাহির হইয়াছে, সেইরূপ এই সকল শৃঙ্গের দুই পার্শ্বে অতিশয় মনোরম কেশদাম পরি-পাটীরূপে সজ্জিত। এই শৃঙ্গচতুষ্টয়ের মধ্যদেশে আমাদিগের শোণিতগ্রহণ-কারী শুণ্ড প্রসারিত।

শুণ্ডকে মশকের অস্ত্র না বলিয়া আয়ুধত্রাণ বলাই সঙ্গত। কারণ, এই শুণ্ডের আমাদিগকে বিদ্ধ করিবার সামর্থ্য নাই। শুণ্ডের মধ্যে কতকগুলি ছুরিকাসদৃশ অস্ত্র আছে। মশক দংশন করিবার সময় শুণ্ডের অগ্রভাগস্থিত ছিদ্র দিয়া সেই সকল অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া আমাদিগকে বদ্ধ করে। হস্তী যেমন শুণ্ড দ্বারা জলপান করে, অর্থাৎ শুণ্ড জলপূর্ণ করিয়া তাহা আপন মুখবিবরে ঢালিয়া দেয়, সেরূপ না করিয়া, মশক এই শুণ্ডের সাহায্যে শোণিতশোষণ করিয়া একবারে আপন পাকস্থলীতে লইয়া যায়। ইহারা শোণিত পান করে, কোন কঠিন পদার্থ আহার করে না, এই জন্য অন্যান্য পতঙ্গের ন্যায় ইহাদিগের মুখবিবরে কঠিনপদার্থপেষণোপযোগী কোন অবয়ব নাই। ইহাদিগকে রোমন্থন করিতে হয় না; সুতরাং গবাদির ন্যায় কোন কোন পতঙ্গের গলদেশের অভ্যন্তরে রোমন্থনের পূর্ব্বে খাদ্য রাখিবার জন্য যে থলি থাকে, তাহা মশক ও অন্যান্য শোষক পতঙ্গগণের মধ্যে কাহারও নাই।

শুণ্ডের মধ্যে মশকের অস্ত্রের সংখ্যা কত, তাহা এ পর্য্যন্ত নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হয় নাই। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ ছয়টি পর্য্যন্ত দেখিতে পাইয়াছেন। বস্তুতঃ, এই সকল অস্ত্র এতই সূক্ষ্ম ও একটির সহিত অপরটির এরূপ ভাবে সংশ্লিষ্ট যে, অতি উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ লইয়া দেখিলেও ভাল বুঝিতে পারা যায় না। অস্ত্রচিকিৎসকের ল্যান্‌সেটের ন্যায় অবিকল মশকাস্ত্রের গঠন। এ গুলি এরূপ কৌশলে সজ্জিত যে, অস্ত্রগুচ্ছটি যেন একটি তরবারির সঙ্কীর্ণ প্রতি-কৃতি। একটি তরবারির সহিত একটি সূক্ষ্মতম সূচীর আকারের যে তুলনা, সেই সূচীটির সহিত মশকের অস্ত্রগুচ্ছের আকারের সেই অনুপাত।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, এত ক্ষুদ্র অস্ত্রে বিদ্ধ হইয়া আমরা এত কষ্ট অনুভব করি কেন? ইহার কারণ এই যে, মশক আমাদিগকে বিদ্ধ করিয়া

কেবল যে আমাদের রক্তশোষণ করে, তাহা নহে; অতি স্বাদু এক প্রকার বিষ বিদ্ধস্থানে ঢালিয়া দেয়। মশক আমাদের গাত্রে বসিয়া হুল ফুটাইয়া দিবামাত্র আমরা কষ্ট অনুভব করি না। ইহারা হুল বা শুণ্ডটির অগ্রভাগ আমাদিগের গাত্রে প্রবেশ করাইয়া দিয়া, উহাকে ধনুকাকারে পরিণত করিয়া বিষ প্রয়োগ করিলে, আমরা যাতনা পাইয়া থাকি। সম্ভবতঃ, এই বিষ আমাদিগের অনিষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রদত্ত হয় না; নরশোণিত মশকের উপযোগী করিবার নিমিত্ত, সহজপরিপাচ্য করিবার জন্যই উহার অস্তিত্ব। কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন কি না, জানি না; কিন্তু আমাদের এইরূপই বোধ হয়। এই বিষ আমাদিগের শরীরে প্রবেশ করিলে দষ্ট স্থান ফুলিয়া উঠে। মশকদংশনের অব্যবহিত পরে দষ্ট স্থানে শীতল বারি প্রক্ষেপ করিলে, এই বিষের উগ্রতা কমিয়া যায়। তৈলসিক্ত অঙ্গে মশক বড় দংশন করে না। ধূমে ইহাদিগের শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হয়; এই জন্য ইহারা ধূমময় স্থানে বাস করিতে পারে না।

আমাদিগের দেশে চারি পাঁচ প্রকারের মশক দেখিতে পাওয়া যায়। "ডাঁশ" নামক এক প্রকার মশক আছে; ইহারা বড় বড়; আমাদিগের গৃহপালিত পশুর শোণিত পান করে। তাহাদিগের দ্বারা দষ্ট অঙ্গে আবার কোন কোন জাতীয় পতঙ্গ ডিম্ব প্রসব করিয়া যায়। সেই সকল ডিম্ব হইতে পতঙ্গশাবক উৎপন্ন হইয়া পশুগণকে বড়ই কষ্ট দিয়া থাকে। কখন কখন ইহাতে তাহাদের প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া থাকে। আর এক প্রকার মশক আছে,—তাহারা সাধারণ মশক অপেক্ষা ক্ষুদ্র। ইহাদিগের নাম "ওয়ানী"। ইহারা বর্ষাকালে সময়ে সময়ে দলে দলে প্রাদুর্ভূত হয়। অতি ক্ষুদ্র আর এক প্রকার মশক উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের বিষ বড়ই তীব্র; ইহাদিগের উৎপাত হইতে আত্মরক্ষার পক্ষে সাধারণ নেটের মশারি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। নেপাল তরাই ও ভুটান দুয়ারের নিবিড় শাল, শিশু, শিরীষ, ওদলা অরণ্যে কখন কখন এক এক দল ধূসরবর্ণ মশা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের দংশনে শরীরে অতিশয় প্রদাহ উপস্থিত হয়। অধিকসংখ্যক মশক দংশন করিলে সন্তাপে জ্বর হয়। মেচ জাতি এইরূপে দষ্ট হইলে অরণ্যজাত ওষধির প্রলেপ দিয়া থাকে; শুনিয়াছি, আপাঙের মূলও উপকারী।

দেবতার দান।

"বাছা সকল, ঘুমাও।"

কথাটা ঠাকুরমার মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতে পাঁচ সাতটা ক্ষুদ্র, পুষ্ট, কুসুমসুকুমার দেহ—কোনটা নড়িল, কোনটা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল, কোনটা উঠিয়া বসিল; পাঁচ সাতটা নবীন, কোমল, দেবোপম কণ্ঠ, সুনীল আকাশে শরতের মেঘধ্বনির ন্যায়, গর্জ্জন করিল,—"না, আমরা ঘুমাব না।"

"কেন ঘুমাবি না, রাত হয়েছে যে!"

"তুই রূপ-কথা বল্; নৈলে তোর হরিনামের ঝুলি চুরি করব।"

ঠাকুরমা জানিতেন, ছেলেগুলি বড় দস্যি; এদের পারিবার যো নাই; হরিনামের ঝুলি চুরি যাওয়া সর্ব্বনাশের কথা। তার চেয়ে একটা রূপ-কথা বলা ভাল। ঠাকুরমা বলিলেন,—"তোদের বাপ খুড়োরা ত এমন দস্যি ছিল না; তোরা এমন হলি কেন?"

ছেলেরা ভ্রূকুটি করিল। প্রস্ফুটোন্মুখ কুসুম যদি ভ্রূকুটি করিতে জানিত, সে ভ্রূকুটি বুঝি এমনই হইত। বলিল,—"তা হই হই। তুই রূপ-কথা বল্‌বি ত' বল্, নৈলে হরিনামের ঝুলিকে এখনি বিসর্জ্জন দিব।"

"হতভাগারা! এই বুঝি বুদ্ধি হচ্ছে! আচ্ছা, একটা গল্প বল্‌ছি। তোরা ঘুমিয়ে পড়্‌বি না ত?"

"না। আমরা শুন্‌ব।"

"তবে শোন্। আমার যেমন কপাল! ছোঁড়াদের জন্যে আমার ইহকাল পরকাল সব নষ্ট হবে।"

দেখেছিস্ ত, আমাদের গ্রামের ওধারে যে একটা বড় বট গাছ আছে, সেইখানে এক গণেশের মন্দির ছিল। সেই মন্দিরের দুয়ারে এক সন্ন্যাসী বসিয়া থাকিত, এবং অন্য লোক দেখিলে "শিব, শিব!" বলিত। সন্ন্যাসী বটে, কিন্তু একটি সেবাদাসীও ছিল। সন্ন্যাসী লোক দেখিলে "শিব, শিব" করে বটে, কিন্তু এত শিব-নাম করিয়াও দুই চারি মুঠা আতপ চাউল, আর দুই চারিটা কাঁচা কলা ছাড়া আর কোন লাভ প্রায় তাহার হয় না।

মধ্যে মধ্যে দুই একটা পয়সাও পায়; কিন্তু সে কদাচিৎ। সন্ন্যাসী বড় মনোদুঃখেই থাকে। সন্ন্যাসীর মনোদুঃখই হউক, আর যাহাই হউক্, সেবাদাসী ত ছাড়িবার নহে। সে দিন রাত পীড়াপীড়ি করে। বোবার শত্রু নাই মনে করিয়া সন্ন্যাসী চুপ্ করিয়া সবই সহ্য করে। এইরূপে দিন যায়।

এক দিন ঝন্ ঝনে দুই প্রহর বেলায় শিব দুর্গা সেইখানে বেড়াইতে আসিয়াছেন। মন্দিরদ্বারে সন্ন্যাসীকে দেখিয়া ভগবতী সবই জ্ঞানচক্ষে দেখিলেন। বলিলেন,—"হে দেবেশ! আজ কাল্ শুনিতে পাই, মানুষে আর দেবতাকে শ্রদ্ধা করে না। এত দিন মনে করিতাম, মানুষেরই দোষ। এখন দেখিতেছি, দোষ দেবতাদেরই।"

মহাদেব বলিলেন,—"তুমি অন্ত্যাশক্তি বলিয়া সব কথা জোর করিয়া কও। দেবতার কি দোষ দেখিলে, বল দেখি।"

ভগবতী বলিলেন,—"দেবতাদের কথা ছাড়িয়া দাও। তুমি ত দেবতারও দেবতা; তোমারই দেবত্ব দেখ না কেন?"

মহাদেব বলিলেন,—"কেন, আমার আবার তুমি কি দেখিলে যে শক্তিগিরি প্রকাশ কর্‌ছ।"

পার্ব্বতী রাগ করিয়া বলিলেন,—"তোমার চোখ নাই, তাই কিছুই দেখিতে পাও না। দেখিবেই বা কেমন করিয়া। তিনটাই হউক, আর দশটাই হউক, সারা দিন রাত নেশায় থাকিলে কি আর চক্ষু থাকে!"

মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"কি হইয়াছে, বল।"

পার্ব্বতী বলিলেন,—"ভোলা মহেশ্বর, তোমার ত কিছুতেই মনোযোগ হয় না। এই লোকটা যে এত দিন ধরিয়া তোমার নাম করিতেছে, অথচ এমন দীন দরিদ্র,—এ তোমার সাধনা করিয়া কি ফল পাইল? তোমরা এমন নিষ্ঠুর হইলে লোকে আর তোমাদের সেবা করিবে কেন? মর্ত্ত্যলোকে দেবপূজার যে লোপ হইতেছে, তাহা ঠিকই হইতেছে।"

মহাদেব বড় লজ্জিত হইলেন। বলিলেন,—"আচ্ছা, আজই ইহার ব্যবস্থা করিতেছি।"

শিব দুর্গা উভয়েই গিয়া গণেশের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। গণেশ উঠিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে মহাদেব বলিলেন,—"দেখ বাপু গণপতি, তোমার মন্দিরের দ্বারে ঐ যে ভিক্ষুক বসিয়া থাকে, ও ব্যক্তি বড় গরিব। উহার জন্ত তোমাকে কিছু করিতে হইবে।"

গণেশ বলিলেন,—"লোকটা ভাল নহে। ভিক্ষাজীবী, অথচ একটা সেবাদাসী রাখিয়াছে।"

মহাদেব বলিলেন,—"ও ত মানুষ; দেবতাদেরই কি বিনা সঙ্গিনীতে চলে! তা, রাখিলেই বা সেবাদাসী; সর্ব্বদা আমার নাম করে ত।"

তখন গণেশ যুক্তকরে বলিলেন,—"যে আজ্ঞা; আপনার যখন ইচ্ছা হইয়াছে, তখন সেই রূপই কার্য্য হইবে। সাত দিনের মধ্যে উহাকে লক্ষ টাকা দেওয়াইব।"

অদৃষ্ট এড়াইবার যো নাই। এক সুদখোর বণিক সেই মন্দিরের নিকটে সেই সময়ে বেড়াইতেছিল। মহাদেব ও গণপতির এই কথাবার্ত্তা শুনিয়া সে মনে করিল, এ একটা দাঁও বটে।

অণুমাত্র বিলম্ব না করিয়া সে গিয়া সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত হইল। অতি ভক্তিভরে—লাভের প্রত্যাশায় যে ভক্তির মাত্রা অসম্ভব বৃদ্ধি পায়, তাহা সচরাচরই দেখা যায়—অতি ভক্তিভরে সে সন্ন্যাসীর চরণে প্রণিপাত করিয়া যুক্তকরে অবস্থিত রহিল।

সন্ন্যাসী ভাবিল, এমন ভক্ত বুঝি আর হয় না। সন্ন্যাসী বলিল, "তোমাকে বড়ই ধার্ম্মিক দেখিতেছি। আমার নিকট কি প্রয়োজন?"

বণিক বলিল, "আপনার ন্যায় সাধু জগতে দুর্লভ; তাই আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিয়াছি।"

এত ভক্তি তাহার সন্ন্যাসি-জীবনে সে কখন পায় নাই। সুতরাং গলিয়া জলের অধিক হইয়া বলিল, "তোমার মতন ধার্ম্মিক ভক্তের অবশ্যই মঙ্গল হইবে; আশীর্ব্বাদ করিতেছি।"

বণিক বলিল, "প্রভো, ভক্তের ধৃষ্টতা যদি মার্জ্জনা করেন, তাহা হইলে একটি নিবেদন করিতে সাহস পাই।"

সাধু বলিলেন, "তোমার যাহা ইচ্ছা, জিজ্ঞাসা করিতে পার। তোমাকে অভয় দিতেছি।"

বণিক বলিল, "প্রভো, আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, আপনার সংসার-যাত্রার সুবিধা হয় কি? এইখানে বসিয়া আপনি দিনান্তে কত পাইয়া থাকেন?"

সন্ন্যাসী বলিল, "পাই আর ছাই! যাহা পাই, তাহাতে দিন চলে না। দুই চারিটা পটোল, বেগুন, মূলা, আর দুই চারিটা চাউল—আর কি পাইব? কখন কেহ এক আধটা পয়সা দেয়।"

বণিক সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া যুক্তকরে নিবেদন করিল, "আপনি যে ক্লেশ পান, এটা আমাদের অসহ্য। একবার অদৃষ্ট পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন?"

সন্ন্যাসী বলিল, "কিরূপে?"

বণিক নিবেদন করিল, "আপনার অদৃষ্টে কিছু হয় না; আমার অদৃষ্টে কিছু হয়, তাহা জানেন। আমি বলি কি, আজি হইতে সাত দিনের মধ্যে আপনি যাহা কিছু পাইবেন, তাহা আমাকে দিবেন। তৎপরিবর্ত্তে আমি আপনাকে এখনই এক শত টাকা দিতেছি। কেবল অদৃষ্ট-পরীক্ষা।"

সন্ন্যাসী এক শত টাকার কথায় রাজি হইতে তখনই উদ্যত; কিন্তু সেবাদাসীকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন গুরুতর কাজ করা যে নিরাপদ নহে, তাহা বিলক্ষণ জানিত, তাই বলিল, "আচ্ছা বিবেচনা করিয়া বলিব। তুমি কাল প্রাতঃকালে আসিও।"

রাত্রে কথাটা সেবাদাসীর কাছে উপস্থিত করায়, সে চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "পুরুষ জাতি যে বোকা, তা জানি; কিন্তু তোমার মতন এত বোকা, তা জানিতাম না। লাভের প্রত্যাশা না থাকিলে বেণে কি কখন টাকা বাহির করিতে যায়? তোমায় কিছু করিতে হইবে না; কাল প্রাতে আমি উপস্থিত থাকিব। যাহা বলিতে হয়, আমি বলিব।"

পরদিন প্রাতে গণেশের মন্দিরের দ্বারে সন্ন্যাসী বসিয়া এবং সাক্ষাৎ সেবাদাসী দাঁড়াইয়া। বণিক আসিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া বলিল, "প্রভুর বিবেচনা স্থির হইয়াছে ত?"

সন্ন্যাসীকে উত্তর করিতে হইল না। শ্রীমতী সেবাদাসী বলিল, "হইয়াছে। এক শত টাকায় কিছু হইবে না।"

বণিক দেখিল, বড় গোল। কিন্তু লক্ষ টাকার লোভ সম্বরণ করাও ত সহজ নহে, বণিকের পক্ষে ত একেবারেই নহে। সে ভাবিল; ক্রমে এক শত হইতে পাঁচ শত, পাঁচ শত হইতে হাজার, হাজার হইতে দশ হাজার, শেষে পঞ্চাশ হাজার পর্য্যন্ত উঠিল।

সেবাদাসী রাজি হইয়া বলিল, "টাকা কিন্তু এখনই চাই।"

বণিক স্বীকার করিল।

কিছুকাল পরে ছালায় ছালায়, বস্তায় বস্তায়, গাড়ীতে গাড়ীতে, টাকা আসিয়া পৌছিল।

ষষ্ঠ দিন কাটিয়া গেল, বণিক ভাবিয়া অবসান। সপ্তম দিন দ্বিপ্রহরে

প্রাণের দায়ে বণিক গিয়া মন্দিরদ্বারে উপস্থিত,—এমন সময় দেখিল, হর-পার্ব্বতী আসিতেছেন। হরপার্ব্বতী গিয়া গণেশের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। দেবতাদের কি কথা হয় শুনিবার জন্য হতভাগ্য বণিক গিয়া মন্দিরের দ্বারে কর্ণসংযোগ করিল। যেমন দ্বারে কর্ণসংযোগ করা, অমনি কাণটি দুয়ারে আটকাইয়া গেল।

মন্দিরের ভিতরে মহাদেব বলিলেন, "বাপু গণেশ, তুমি সেই দুঃখীর জন্য কি করিয়াছ?"

গণেশ বলিলেন, "আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছি। লক্ষ টাকা দেওয়াইব বলিয়াছিলাম, তাহার পঞ্চাশ হাজার টাকা সে পাইয়াছে। বাকি পঞ্চাশ হাজার যাহাকে দিতে হইবে, তাহার কাণ চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছি।"

ছেলেগুলি হাসিয়া কুটি কুটি। বলিল, "কর্ত্তা মা, বেণেকে কি আর পঞ্চাশ হাজার দিতে হইল?"

"তা আর হবে না। দেবতায় কাণ চাপিয়া ধরিলে টাকা না দিয়া কি রক্ষা আছে! বাছা সকল এখন ঘুমাও।"

বাছারা বলিল, "তুই আর একটা কিছু বল।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "আজ রাত হয়েছে, তোমরা ঘুমাও। আর এক দিন বলিব।"

শ্রীযোগমায়া দেবী।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

ব্রাউনিং-পত্নীর পত্রাবলী।

উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে ব্রাউনিং দম্পতীর স্থান বড় উচ্চে। পতিপত্নী উভয়েই এরূপ যশস্বী, এমন দৃষ্টান্ত সকল দেশের সাহিত্যেই বিরল। ব্রাউনিংএর কবিতা স্থানে স্থানে এত জটিল যে, দুর্ব্বোধপ্রায় বোধ হয়; সেই জন্য কবিকে Fit audience though few লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছিল। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, কবির উপাসক-বৃন্দ উপাসিতের শেষ পুস্তকগুলিকেও তাঁহার পূর্ব্বরচিত রচনার সহিত সমান সম্মান দেখাইতেন, কিন্তু ব্রাউনিংএর প্রথমরচিত রচনা সকলই তাঁহার যশোলাভের সোপান; শেষ কবিতাগুলি বড়ই জটিল। এই প্রসঙ্গে আমরা একটি হাস্যোদ্দীপক বর্ণনার কথা বলিব। বেসাণ্ট ও রাইসের Golden butterfly নামক উপন্যাসের নায়ক একবার ব্রাউনিং পাঠ

পারেন নাই ; তিনি আবার প্রথম হইতে আরম্ভ করিলেন—ফল সমানই হইল,—কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। বহুবার চেষ্টা করিয়া গলদঘর্ম্ম হইয়া পরিশেষে তিনি ব্রাউনিংএর গ্রন্থ সকল অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। সে সকল পুস্তক ভস্মসাৎ করিয়া তবে তাঁহার আক্রোশ মিটিয়াছিল। কেহ কেহ মনে করেন, কবিতা যতই অস্পষ্ট, যতই দুর্ব্বোধ হয়, তাহার ভাব ততই গভীর হয়—সে কবিতা ততই প্রশংসনীয়। ব্রাউনিংএর অন্ধ উপাসকদিগের মধ্যে অনেকে এই দলের।

পতি ও পত্নী।

পতির রচনায় যে অস্পষ্টতা, যে জটিলতা ছিল, পত্নীর রচনায় তাহা ছিল না; তাঁহার কবিতা সরল, প্রাণস্পর্শিনী—তাহা নির্ঝরমুক্ত বারিরাশির মত স্বত-উচ্ছ্বসিত হইত ;—তাঁহার কবিতার উৎস হইতে মধুর কবিতা আপনি প্রবাহিত হইত। টেনিসনের কথায় তাঁহার আপনার কথা বলা যাইতে পারে,—

"I do but sing because I must,
And pipe but as the linnets sing."

পতির কবিতায় চরিত্রবিশ্লেষণ, মানবচরিত্রের জ্ঞান, সূক্ষ্ম দর্শন ও স্বভাবপ্রিয়তা দৃষ্ট হইত ; তাঁহার কবিতা সকল যেন

"————Like Nature, half reveal
And half conceal the Soul within."

উৎকৃষ্ট কবিতা স্বচ্ছ স্রোতস্বতীর সহিত উপমেয়—তাহা স্বচ্ছ হইবে, এবং একটু মনোযোগ দিয়া দেখিলেই তাহার অন্তর পর্য্যন্ত দেখা যাইবে। পতির কবিতা এরূপ ছিল না—পত্নীর কবিতা এইরূপ স্বচ্ছ ছিল।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে কুমারী এলিজাবেথ ব্যারেটের জন্ম হয় ; ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কবি ব্রাউনিংএর সহিত তাঁহার বিবাহ হয় ; ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ব্রাউনিং-পত্নীর মৃত্যু হয়।

সম্প্রতি ব্রাউনিং-পত্নীর পত্র সকল প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল পত্র হইতে আমরা তাঁহার পারিবারিক জীবনের সুখ দুঃখের কথা জানিতে পাই। কবি ব্রাউনিং-পত্নীর কথা ইহাতে নাই। কিন্তু রমণী ব্রাউনিং-পত্নীর কথায় ইহা পূর্ণ। তাঁহার কবিতার উপাসক অনেক ;—এখন তাঁহার রমণীচরিত্রের উপাসকের অভাব হইবে না। কারণ, এই সকল পত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, ব্রাউনিং-পত্নী ভক্তিময়ী দুহিতা, পতিপ্রাণা পত্নী ও স্নেহময়ী জননী ছিলেন।

আজ কাল অনেক য়ুরোপীয় মহিলা, বিবাহপ্রথা ঘৃণিত, এই জঘন্য মতের পৃষ্ঠপোষক। এই সকল ভ্রান্ত মতের উপাসিকা মহিলাদিগের প্রভাবে গত কয় বৎসর হইতে ইংরাজী সাহিত্য কলুষিত হইতেছে ; বিগত কয় বৎসর মধ্যে প্রকাশিত বহু পুস্তক ধর্ম্মযাজকগণ কর্ত্তৃক প্রকাশ্যভাবে নিন্দিত হইয়াছে। ব্রাউনিং-পত্নীর জীবনের ইতিহাস পাঠ করিয়া এই সকল "নরনারী"র লজ্জিত হওয়া উচিত।

তাঁহার বিবাহিত জীবন নিরবচ্ছিন্ন সুখের ইতিহাস ; জননী হওয়া তিনি দুর্ভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। যখন তিনি রুগ্নদেহে, ক্রমেই নিরাশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছিলেন, তখন ব্রাউনিংএর প্রেম কেমন করিয়া তাঁহার জীবনে নবসুখ ও অন্ধকার হৃদয়ে আশার নবীন আলোক আনয়ন করিয়াছিল, সে কথা তিনি তাঁহার কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন। কবির সহিত পরিচয় ও প্রেমবন্ধনের কথা তিনি তাঁহার কোন বান্ধবীকে লিখিয়াছিলেন ;—বিবাহের দুই বৎসর পূর্ব্বে ব্রাউনিংএর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তৎপূর্ব্বেই উভয়ের পরিচিত এক বন্ধু তাঁহাদিগের পরিচয় করাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন ; কিন্তু কুমারী ব্যারেট তখন আর কোন অপরিচিতের সহিত পরিচিত হইবার ইচ্ছা করেন নাই। তাহার পর কুমারী

কবির সহিত পরিচয়।

ব্যারেটের একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইল ;—কবি তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিলেন। সেই সময় হইতে উভয়ের মধ্যে পত্রের আদান প্রদান চলিতে লাগিল। কবির পত্র সকল বড় মধুর, বড় সুন্দর। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে কুমারী ব্রাউনিংএর বড় ইচ্ছা ছিল না, তথাপি তাঁহার কবির সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা হইল। কবি প্রেমের কথা প্রকাশ করিলে, তিনি বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার পক্ষে বিবাহ করা অসম্ভব ; কবি যদি পুনরায় এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন, তবে তাঁহাকে কবির সহিত সাক্ষাৎ করা বন্ধ করিতে হইবে। এই কথা শুনিয়া কবি কিছু দিন আর সে কথা উত্থাপিত করেন নাই কিন্তু এই সময়ের মধ্যে কবি তাঁহার সহিত অনেকবার সাক্ষাৎ করেন ও তাঁহাকে বহু পত্র লেখেন—কবির কথায় ও পত্রে তিনি একটা জিনিস লক্ষ্য করিতেন—তাহা বিশ্লেষণ করা অসম্ভব ; কিন্তু বুঝিতে না পারাও সম্ভব নহে। তাহার পর কবি আবার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন।

বিবাহের প্রস্তাব।

কুমারী ব্যারেট তাঁহাকে স্পষ্টই বলিলেন যে, তিনি আপনার প্রেমরাশি ভস্মে নিক্ষেপ করিতে যাইতেছিলেন। তিনি বুঝাইয়া বলিলেন যে, যৌবনমাধুরী বা প্রফুল্লতা কিছুই তাঁহার নাই, এ অবস্থায় কবির পক্ষে তাঁহাকে বিবাহ করা দুর্ভাগ্যমাত্র। কবি বলিলেন,—ভালই হউক আর মন্দই হউক, তিনি তাঁহাকে ভাল বাসেন, এবং এ প্রেম জীবন থাকিতে যাইবার নহে ; তিনি আরও বলিলেন যে, প্রথম যৌবনের মাধুরী তাঁহারও নাই—তিনি জগতে অনেক দেখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও ভালবাসেন নাই। তিনি বেশ জানিতেন যে, কুমারী ব্যারেট তাঁহাকে বিবাহ না করিলেও তিনি তাঁহাকেই ভালবাসিবেন ; তবে বিবাহে তাঁহার অনিচ্ছা থাকিলে সে কথা তুলিয়া তাঁহাকে আর বিরক্ত করিবেন না—তাঁহার মত হইলে কবি বিংশতি বৎসর অপেক্ষা করিবেন ; তখন হয় ত কুমারী ব্যারেটও বুঝিবেন—কবির কথায় তিনি বিশ্বাস করিতে পারিবেন। বলা বাহুল্য, ইহার পর কবিকে বিবাহ করিতে কুমারী ব্যারেটের আর আপত্তি রহিল না। যাঁহারা বলিবেন, প্রেম অন্ধ—এই প্রেমই কবিকে তাঁহার প্রেমিকার দোষ দেখিতে দেয় নাই, তাঁহারা মনে রাখিবেন, কবি স্বয়ং বলিয়াছেন—প্রেম অন্ধ নহে ; লোকে বলে ঘৃণায় ঘৃণিতের সকল দোষ চক্ষে পড়ে—তাহা নহে ; প্রেমে প্রেমিকের সকল ত্রুটি যেরূপ চক্ষে পড়ে, ঘৃণায় সেরূপ কখনই হইতে পারে না।

পিতা ও কন্যা।

কুমারী ব্যারেটের পিতা তাঁহার সন্তানদিগের বিবাহের বিরোধী ছিলেন। সন্তানদিগের মধ্যে যিনি যখন বিবাহ করিতেন, তাঁহার সহিত তখন হইতে পিতার সম্বন্ধ শেষ হইত ; পিতা আর তাঁহার নামও সহ্য করিতে পারিতেন না। বিবাহ হেতু পিতার সহিত এই অসদ্ভাবে কুমারী ব্যারেট বড়ই দুঃখিতা হইয়াছিলেন। তিনি পিতাকে বড়ই ভালবাসিতেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বিপদে সাহসের জন্য তিনি পিতাকে বড় ভালবাসিতেন। অনেক মহিলা সবল পুরুষদিগকে ভক্তি করিয়া থাকেন—কুমারী ব্যারেট সেই দলের ছিলেন। পিতার একটি কোমল কথায়, একটি স্নেহের দৃষ্টিতে, কন্যার কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত ; পীড়ার সময় সোপানশ্রেণীতে তাঁহার পদশব্দ শুনিলে কন্যার দেহে রক্তস্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিত ; কন্যা পিতাকে এমনই ভালবাসিতেন। কিন্তু বিবাহের পর হইতেই পিতা কন্যার উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কন্যা পিতাকে অনেকবার পত্র লিখিয়াছিলেন। বিবাহের পাঁচ বৎসর পরে কন্যার একখানি পত্র পাইয়া পিতা তদুত্তরে একখানি অত্যন্ত কঠিন পত্র লেখেন ও তাঁহার পূর্ব্বপ্রেরিত সকল পত্র ফিরাইয়া দেন—তিনি সে সকল পত্র খুলেনও নাই।

বিবাহ।

বিবাহে কিছুতেই মিষ্টার ব্যারেটের মত হইবে না জানিয়া, প্রেমিক প্রেমিকা তাঁহার অজ্ঞাতে বিবাহ করিবেন, স্থির করেন। ইহার জন্য কেহই দুঃখিত হয়েন নাই। একটা গির্জ্জায় দুই জন সাক্ষীর সমক্ষে বিবাহ হয়।

বিবাহের দিন মিস্ ব্যারেটকে দেখিয়া বোধ হইয়াছিল, যেন কে তাঁহাকে শ্মশান হইতে তুলিয়া আনিয়াছে।

বিবাহের পরেই ব্রাউনিং-পত্নী বুঝিতে পারিলেন, অসাধারণ প্রতিভা ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যই তাঁহার পতির সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ গুণ নহে, তাঁহার নৈতিক চরিত্র অতি মহৎ ; তাঁহার প্রেমের—"নাই সীমা আগে পাছে, যত চাও তত আছে।" থ্যাকারে এক স্থানে পরিহাসচ্ছলে প্রেমকে "মটন চপের" তুল্য বলিয়াছেন,—তাহা বড় শীঘ্র জুড়াইয়া যায়। কবির প্রেম সেরূপ ক্ষণস্থায়ী ছিল না, তাহা পবিত্র, স্থির, অচঞ্চল। যে প্রেম সম্বন্ধে কবি সাদে বলিয়াছেন,—"From heaven it comes to heaven returneth", কবির প্রেম সেইরূপ। ব্রাউনিং-পত্নী বলিয়াছেন, তাঁহার স্বামীর কোথাও যেন কোন অসম্পূর্ণতা ছিল না—তবে তিনি ভাবিয়া পাইতেন না, কেন ব্রাউনিং তাঁহার মত অনুপযুক্ত পাত্রে আপনার প্রেম অর্পণ করিয়াছিলেন। বিবাহের পাঁচ বৎসর পরে ব্রাউনিং-পত্নী লিখিয়াছেন, এ বিবাহ করাতে দুঃখিত হওয়া দূরে থাকুক, এই বিবাহ তাঁহার জীবনের সুখ ও সম্মানের কারণ হইয়াছে।—তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার পতি তাঁহার পক্ষে একাধারে পতি, প্রেমিক ও শুশ্রূষাকারী।

বিবাহান্তে।

পতির এইরূপ প্রেম পাইয়াছিলেন বলিয়াই রুগ্নদেহে সংসারের নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও তাঁহার কবিতা স্বচ্ছ স্রোতস্বতীর মত সদা প্রবহমানা ছিল। তাঁহার পত্র সকল পাঠ করিয়া তাঁহার উপর অনেকের শ্রদ্ধা আরও বর্দ্ধিত হইবে, সন্দেহ নাই ; কারণ, এই সকল পত্র হইতে আমরা বুঝিতে পারি, সংসারের সংঘর্ষে ব্রাউনিং-পত্নীর হৃদয়ের নারী-সুলভ কোমলতা বিনষ্ট হইয়া যায় নাই। পূর্ব্বে তাঁহার কবিতা পাঠ করিয়া অনেকে তাঁহার প্রশংসা করিতেন ; এখন তাঁহার পত্র সকল পাঠ করিয়া আরও অনেকে তাঁহার প্রশংসা করিবেন, সন্দেহ নাই।

ভ্রমণবৃত্তান্ত।

ভারতবর্ষে।

"মার্কটোয়েন" আখ্যাধারী সুপ্রসিদ্ধ পরিহাসরসিক মিষ্টার ক্লেমন্সের কথা আমরা পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি। * অল্প দিন পূর্ব্বে তিনি দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন ; ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন নগরেও তিনি বক্তৃতা করিয়াছিলেন ; সম্প্রতি তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, পরিহাসরসিকের পুস্তকে হাস্যরসের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়। লেখক আপনি বলিয়াছেন বর্ত্তমান পুস্তকে তিনি ভিন্ন ভিন্ন স্থান সম্বন্ধে তাঁহার ধারণামাত্র প্রদান করিয়াছেন—খুঁটী নাটি লইয়া ব্যাপৃত হয়েন নাই ; বাস্তবিক, যখন তিনি ইচ্ছা করিয়া খুঁটিনাটি লইয়া ব্যাপৃত হয়েন, তখন ভিন্ন খুঁটিনাটিতে তাঁহার বড় সুবিধাও হয় না। তদ্ভিন্ন তিনি পাঠককে প্রত্যেক বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ প্রদান করিতে বাধ্যও নহেন। পাঠককে আনন্দপ্রদান করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ; তবে যদি তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া পাঠকের কোন শিক্ষালাভ হয়, সেটা পাঠকের "উপরি"-লাভ। যাহা হউক, পাঠকের এই "উপরি"লাভও বড় অল্প হয় নাই। আমরা নিম্নে লেখকের ভারতভ্রমণের বিবরণ হইতে দুই স্থানের বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ; পাঠক ইহাতে পাওনা ও "উপরি"-পাওনা, উভয়ই দেখিতে পাইবেন।

* [illegible]

দিল্লীতে।

ভ্রমণের পর দিল্লীতে লেখক বিশ্রাম করেন; যে গৃহে তিনি অবস্থান করিতেন, সেটা ঐতিহাসিক গৃহ। সে গৃহে একজন ইংরাজের ছিল—গৃহবাসী প্রাচ্যপ্রভাবে পরিশেষে প্রাচ্যদেশের মত শুদ্ধান্ত পর্য্যন্ত রাখিয়াছিলেন। তিনি বড় উদারপ্রকৃতির লোক ছিলেন—অবরোধবাসিনীদিগের জন্য একটা মসজিদ্ ও নিজের জন্য একটা গির্জ্জা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন; যে দিক দিয়াই হউক, তাঁহার একটা সদ্গতি হইবে। সিপাহি-বিদ্রোহের সময় এই গৃহে ইংরাজ সেনাপতির আড্ডা ছিল। প্রাচ্য ধরণে সজ্জিত উদ্যানের মধ্যে গৃহ অবস্থিত—উদ্যানের বহুশাখাপ্রশাখাশালী পাদপে বহু শাখামৃগ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এই সকল শাখামৃগ বড় কৌতুহলশালী—ভয় তাহাদিগের বড় একটা নাই। সুবিধা পাইলেই তাহারা গৃহের কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হয়—ও দ্রব্যাদি লইয়া পলায়ন করে। এক দিন প্রাতঃকালে গৃহস্বামী স্নানাগারে ছিলেন—স্নানাগারের বাতায়ন মুক্ত ছিল। নিকটেই একটা পাত্রে খানিকটা হরিদ্রা রং ও একটা তুলি ছিল। বাতায়নসম্মুখে কতকগুলা বানর দেখিয়া তাহাদিগকে তাড়াইবার অভিপ্রায়ে গৃহস্বামী তাহাদিগের দিকে স্পঞ্জখানা ছুড়িয়া ফেলেন। কপিদল কিছুমাত্র ভীত না হইয়া লম্ফ দিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার গাত্রে রং দেয়; তিনি পলায়ন করেন। তাহার পর বিজয়ী বীরবৃন্দ সে কক্ষের দ্রব্যাদি ও কক্ষপ্রাচীর রং করিয়া পার্শ্বের কক্ষে আসিয়া রং করিতে আরম্ভ করিল। এমন সময় লোকজন আসিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়।

বানর।

এই সকল বানর পরিহাসরসিকের সহিত রসিকতা করিয়া আপনাদিগের পরিহাসপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছিল। একদিন লেখকের কক্ষের একটা বাতায়ন মুক্ত ছিল;—প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গের পর লেখক দেখিলেন যে, সেই মুক্ত বাতায়নপথে দুইটা বানর তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে—একটা আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া চুল ব্রশ করিতেছে, আর একটা তাঁহার "নোট-বহি" লইয়া হাস্যোদ্দীপক রচনার এক পৃষ্ঠা পাঠ করিতেছে ও চীৎকার করিতেছে। যে ব্রশ লইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে কিছু গোল ছিল না; কিন্তু যে "নোট-বহি" লইয়াছিল, তাহাকে তাড়াইবার জন্য লেখক তাহাকে কি একটা ছুড়িয়া মারিয়াছিলেন; তিনি বলেন—সেটা বড় অন্যায় হইয়াছিল।

মার্কটোয়েনের মতে বোম্বাই সহরে দ্রষ্টব্য জিনিসের অভাব নাই। তিনি পার্সিদিগের মৌন মন্দিরের (Tower of Silence) যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, পরিহাসরসিকের পুস্তকপাঠে আনন্দ ব্যতীত শিক্ষাও লাভ করা যায়। পার্সিদের মৃতদেহ গৃধ্র কর্তৃক ভক্ষিত হইয়া থাকে। মৌনমন্দিরগুলি প্রাচীরবেষ্টিত, ছাদবিহীন, একমাত্রদ্বারবিশিষ্ট। "মন্দিরের" ঠিক মধ্যভাগে একটি গভীর কূপ; অবশিষ্ট স্থান তিন ভাগে বিভক্ত; এক স্থানে শিশুদিগের, অন্য স্থানে স্ত্রীলোকদিগের, আর অপরত্র পুরুষদিগের মৃতদেহ রক্ষিত হয়। শববাহিগণ ভিতরে প্রবেশ করিয়া বসনমুক্ত শব নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া চলিয়া আইসে। তাহারা মন্দিরের বাহিরে আসিতে না আসিতে প্রাচীর হইতে শত শত গৃধ্র আসিয়া, মৃতদেহ ভক্ষণ করিয়া ফেলে—অস্থিরাশি মন্দিরের পাষাণনির্ম্মিত হর্ম্ম্যতলোপরি পড়িয়া থাকে; তাহার পর কিছু কাল পরে সেই অস্থিরাশি কুড়াইয়া কূপমধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, সাধু অসাধু, সকলের অস্থিরাশিই সেই একই কূপমধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়।

মৌন-মন্দির।

মার্কটোয়েন অবশ্য মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই—শববাহকগণ ভিন্ন আর কেহই মন্দিরমধ্যে যাইতে পারে না। বাহির হইতে লেখক যাহা দেখিয়াছিলেন, তিনি তাহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—নগরের কোলাহল হইতে দূরে—পত্রপুষ্পপর্ণ বৃক্ষলতাবেষ্টিত উচ্চভূমিতে মৌনমন্দির অবস্থিত। তন্নিম্নে

আনতপত্রমুকুটশোভিত নারিকেল-তরুরাজির কুঞ্জ ; তাহার পরেই জন-কোলাহলময়ী সুদূর-প্রসারিতা নগরী ; তাহার পরে জলবেণীরম্য নীল জলরাশিবিস্তার,—সিন্ধু-বক্ষে কত তরণী আসিতেছে, যাইতেছে। সকলই যেন শব্দহীন গম্ভীরমূর্ত্তিতে বিরাজিত। মৌনমন্দিরের প্রাচীরে বৃত্তাকারে বহু গৃধ্র বসিয়া রহিয়াছে—মৃতদেহের জন্য অপেক্ষা করিতেছে ; তাহারা এমন নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছে যে, দেখিলে বোধ হয়, যেন প্রাচীরোপরি গৃধ্রমূর্ত্তি সকল রক্ষিত হইয়াছে। সহসা সকলে সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া গেল—সকলেই নির্ব্বাক, দ্বারপথে মৃতদেহ বহন করিয়া কতকগুলি লোক প্রবেশ করিল। তাহারা মন্দিরদ্বারাভিমুখে প্রস্থান করিল—শবাধারে শব রক্ষিত। শবোপরি একখানি শ্বেত বস্ত্রাচ্ছাদন রহিয়াছে—অন্যান্য শব বিবস্ত্র। শববাহিগণের পশ্চাতে মৃতব্যক্তির শোকার্ত্ত আত্মীয়স্বজনগণ গমন করিতেছেন,—তাঁহারাও শুভ্রবেশধারী ; দুই জন দুই জন একত্র হইয়া গমন করিতেছেন—যে দুই জন একত্র গমন করিতেছেন, তাঁহারা একখানি রুমালের দুই প্রান্ত ধারণ করিয়াছেন। সর্ব্বশেষে একটি সারমেয় গলরজ্জুবদ্ধ হইয়া আনীত হইতেছিল। শববাহী দল ভিন্ন অন্য কেহ মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইয়া মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনাদিরা সেই স্থানে একটি প্রার্থনামন্দিরে প্রবেশ করিয়া মৃত ব্যক্তির আত্মার মঙ্গলকামনায় প্রার্থনা করিতে থাকে। শববাহিগণ মন্দিরদ্বার মুক্ত করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে। অল্পক্ষণ পরেই শববাহিগণ শবাধার ও আচ্ছাদনবস্ত্র লইয়া বাহিরে আইসে ও দ্বার রুদ্ধ করে। শব সেই মৌনমন্দিরে রাখিয়া আইসে।

বোম্বাই সহরে লেখক একজন যোগীকে দেখিয়াছিলেন,—তিনি নির্ব্বিকার, উলঙ্গ। লেখক শুনিয়াছিলেন যে, তিনি হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের বহু ভাষ্য রচনা করিয়াছেন।

বিবিধ।

আফ্রিদিস্থানে হিন্দু।

বর্ত্তমান সীমান্ত গোলযোগের কল্যাণে আফ্রিদিদিগের নাম এখন আর পাঠকের নিকট অপরিচিত নহে ; কিন্তু অনেকেই অবগত নহেন যে, আফ্রিদিস্থানে বহু হিন্দু অধিবাসী বাস করেন। আফ্রিদিস্থানের খাঁ অর্থাৎ সর্দ্দারগণের রক্ষিত না হইলে, ইঁহারা সেখানে বাস করিতে পারিতেন না। আমরা নিম্নে আফ্রিদিস্থানের হিন্দু অধিবাসিগণের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

অরোরাগণ পঞ্জাবে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী—ইহাদিগের সংখ্যাও অল্প নহে। আফ্রিদিস্থানের অধিকাংশ হিন্দু অধিবাসীই এই সম্প্রদায়ের—ইহারা সাধারণতঃ কিরার নামে পরিচিত। ইহারা সকলেই গুরু নানকের শিষ্য ; ধর্ম্মকর্ম্মে ইহাদিগের অনাহত মনোযোগ। দেখিলে সহসা তদ্দেশবাসী মুসলমান ও এই সকল হিন্দুর মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় না ; কেবল মেইডান উপত্যকার ভিন্ন ভিন্ন গ্রামবাসী হিন্দুগণ শিখ্ সম্প্রদায়ের বিশেষ চিহ্ন দীর্ঘকেশ ধারণ করিয়া থাকে। ইহাদিগের ভাষা পঞ্জাবী ও তদ্দেশের ভাষার মিশ্রণোৎপন্ন। উচ্চপর্ব্বতবাসী হিন্দুগণ দীর্ঘকেশও ধারণ করে না ; তাহারা মুসলমান প্রতিবেশিগণের ভাষাই ব্যবহার করে। আফ্রিদি হিন্দুগণ বলিয়া থাকে যে, তাহারাই আফ্রিদিস্থানের আদিম অধিবাসী। পূর্ব্বে তাহারা সকলেই হিন্দু ছিল, তাহার পর মুসলমান ধর্ম্মের প্রবল বন্যায় আফ্রিদিস্থান প্লাবিত

ইহারা কাহারা ?

বংশধর। ভিন্ন ভিন্ন আফ্রিদি সম্প্রদায়কে মুসলমান করিতে না কি প্রায় আট শত বৎসর লাগিয়াছিল। এখন তাহারা স্বাধীনতারক্ষার জন্য ইংরাজদিগের সহিত যেরূপ যুদ্ধ করিতেছে, পূর্ব্বে ধর্ম্মরক্ষার জন্য মুসলমানদিগের সহিত সেইরূপ যুদ্ধ করিয়াছিল। ভারতবর্ষ বা আফগানিস্থানের কোন শাসনকর্ত্তা তাহাদিগকে জয় করিতে পারেন নাই। মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারকগণ আপনাদিগের ধর্ম্ম প্রচার করিতেন; আফ্রিদি হিন্দুগণ দেখিত, তাহাদিগের স্বদেশবাসিগণ মসলেম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে ও পারস্যে উচ্চ পদ পাইত; তাহারা শুনিত, হিন্দুস্থানে হিন্দুদিগের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে;—এই সকল কারণে ক্রমে ক্রমে তাহারা গায়ত্রী ত্যাগ করিয়া কল্‌মা গ্রহণ করে। এখন আফ্রিদিস্থানের অধিবাসিগণের মধ্যে শতকরা পাঁচজনমাত্র হিন্দু; অবশিষ্ট সকলেই মুসলমান। এখনও প্রতি বৎসরই দুই এক জন হিন্দু যুবক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তদ্ধর্ম্মাবলম্বিনী কোন রমণীকে বিবাহ করেন, বা কোনও হিন্দু রমণী মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়া মুসলমান পতির সহিত পরিণয়বন্ধনে বদ্ধ হয়েন।

প্রচলিত গোঁড়া হিন্দু ধর্ম্মের পদে পদে নিষেধ, পদে পদে বিবিধ বিধান। সে সকল পালন করিয়া মুসলমানপ্রধান দেশে স্বধর্ম্ম বজায় রাখা একরূপ অসম্ভব; কাজেই ইসলামের

শিখ-ধর্ম্ম।

স্রোতে মুষ্টিমেয় হিন্দু প্রায় ভাসিয়া যাইতেছিল। এই সময় প্রবল অত্যাচারে পঞ্জাব ও তন্নিকটবর্ত্তী নানা স্থান হইতে বহু শিখ টিরা ও অন্যান্য উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহাদিগের নিকট আফ্রিদি হিন্দুগণ গুরু নানক ও গুরু গোবিন্দের ধর্ম্মের কথা শুনিতে পায়। তাহাদিগের পক্ষে শিখ-ধর্ম্ম-গ্রহণে নানা সুবিধা বুঝিতে পারিয়া তাহারা শিখ-ধর্ম্ম অবলম্বন করে। এইরূপে শিখ হইয়া ইহারা মুসলমান ধর্ম্মের প্রবল স্রোত প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

খাল্‌সা সাম্রাজ্যের প্রাধান্যকালে আফ্রিদিস্থানে ইহাদিগের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। আফ্রিদি শিখগণ লাহোরের রাজার আশ্রিত ও অনুগৃহীত ছিল; বৃটীশ প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদিগের সে প্রতিপত্তি এখন অন্তর্হিত হইয়াছে; তবে সোয়াট উপত্যকা ভিন্ন অন্যত্র ইহারা দাসের মত ব্যবহৃত হয় না, এবং ইহাদিগকে কোন বিশেষ বেশ পরিধান করিতে হয় না।

আফ্রিদিস্থানে ব্যবসা বাণিজ্য প্রায় হিন্দুদিগের একচেটিয়া। এই সকল হিন্দু বণিকের মধ্যে অনেকে ধনশালী। তাহারা সেখানে বড়লোকের মতই বাস করে। তাহারা ভূমি-

আচার ব্যবহার।

সম্পত্তি করিতে পারে না সত্য, কিন্তু ঋণের জন্য ভূমিসম্পত্তি বন্ধক রাখিতে পারে। স্থানে স্থানে তাহাদিগের ধর্ম্মশালাও আছে। মুসলমানগণ সাধারণতঃ তাহাদিগের উপর কোনও অত্যাচার করে না; তবে তাহারা এই হিন্দুদিগকে "কাফের" কহে, এবং ইহাদিগের স্পৃষ্ট কোনও আহারীয় আহার করে না। কিন্তু অনেক মুসলমান ইহাদিগের চাকরী করে; ধনবান হিন্দুদিগের গৃহে প্রহরী ও সশস্ত্র ভৃত্যগণ প্রায়ই মুসলমান। হিন্দুদিগকে স্বতন্ত্র নাপিত ও যানবাহক রাখিতে হয়; কারণ, মুসলমান নাপিত কাফেরের কেশ কর্ত্তন করে না, মুসলমান যানবাহক কাফেরকে বহন করে না। আফ্রিদিস্থানে ঝট্‌কা অর্থাৎ তরবারির এক আঘাতে ছাগ বা মেষ কর্ত্তন নিষিদ্ধ; শঙ্খধ্বনিসম্বন্ধেও সেই ব্যবস্থা; কিন্তু অর্থের প্রভাব সর্ব্বত্রই সমান—সুসভ্য আমেরিকাতেও যেমন, অসভ্য টিরাতেও তেমনই—অর্থ সর্ব্বসাধনক্ষম; কাজেই সম্প্রদায়ের সর্দ্দারকে কিছু উপহার দিলেই সকল গোল চুকিয়া যায়; সুতরাং ধনবান হিন্দুগণ অর্থবলে যাহা ইচ্ছা করিয়া থাকেন। মুসলমানদিগের মত আফ্রিদি হিন্দুদিগেরও প্রতিহিংসাবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল। আফ্রিদিদিগের সাম্প্রদায়িক কলহে হিন্দুগণ এক বা অপর পক্ষ অবলম্বন

নীয় কি না সন্দেহ। অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে তাহাদের সততা সত্য সত্যই প্রশংসনীয়। কোন আফ্রিদি যদি ঋণ গ্রহণ করে, তবে কোন দলিলাদি না থাকিলেও, তাহার বংশীয়গণ তাহার মৃত্যুর পর সেই ঋণ পরিশোধ করিয়া থাকে—সে ঋণ পরিশোধ না করা বড় অপমানের কথা। আফ্রিদিস্থানের বিচারে হিন্দু ও মুসলমানে কোন পার্থক্য নাই। আফ্রিদিস্থানে ঋণদাতা 'মহাজনগণ' সকলেই হিন্দু।

হিন্দু ও মুসলমান।

মোটের উপর আফ্রিদিস্থানে হিন্দু মুসলমানে সদ্ভাবের অভাব নাই। লাহোরবাসী এক গুরু-পরিবারের অনেক শিষ্য আফ্রিদিস্থানবাসী। প্রতি বৎসর পরিবারের এক জন আফ্রিদিস্থানে গিয়া বার্ষিক সংগ্রহ করিয়া আনেন। সেই পরিবারের কর্তা বহুবার টিরায় গমন করিয়াছেন, তিনি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দেও একবার সেখানে গিয়াছিলেন—তাঁহারই কথিত বিবরণ হইতে বর্তমান প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইল। তিনি আফ্রিদিস্থানের প্রায় সকল গ্রামেই গমন করিয়াছেন; কিন্তু কখনও মুসলমানগণ তাঁহার প্রতি কোনরূপ কুব্যবহার করে নাই, বরং অনেক স্থানেই স্থানীয় সর্দ্দার তাঁহাকে মাননীয় অতিথিজ্ঞানে সম্মান করিয়াছেন। এই সকল হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, মুসলমানবহুল আফ্রিদিস্থানে হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীদিগের মধ্যে কোন অসদ্ভাব নাই।

শেষ কথা।

আফ্রিদিস্থানে পর্ব্বতাঙ্গে খোদিত একটি গুহামন্দির আছে। টিরাহ্ সেই মন্দির মুসলমানগণ কর্তৃক পঞ্চ পীরের আবাসস্থান বলিয়া ও হিন্দুদিগের নিকট পঞ্চ পাণ্ডবের লুকাইবার স্থান বলিয়া পরিচিত। ইংরাজ অধিকার হইতেও হিন্দু-তীর্থযাত্রীরা সেই মন্দির দেখিতে গিয়া থাকে—দস্যু তস্করের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার্থ এই সকল যাত্রীকে একটা নির্দ্দিষ্ট কর-প্রদান করিতে হয়। এই কর প্রদান করিলে আর কোন আশঙ্কা থাকে না।

গঙ্গোত্রীর পথে।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, ধারাসু হইতে বাহির হইয়া অগ্রসর হইতে হইতে রাস্তার পার্শ্বে একখানি গ্রাম দেখিয়াছিলাম। আজ সর্ব্বাগ্রেই সেই গ্রামের কাহিনী বলিতেছি, যাঁহারা মনে করিয়াছেন, সেই গ্রামে হয় ত কোন অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, এবং আমি তাহারই একটা অপূর্ব্ব বর্ণনা করিব, তাঁহাদিগকে একেবারে ষোলআনা নিরাশ হইতে হইবে; কারণ সে গ্রামে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কোন ব্যাপার ঘটে নাই; সেখানে কোন লোমহর্ষণ কাণ্ডের অভিনয়ও হয় নাই। গ্রামটি জনশূন্য; বর্ণনার খাতিরে বলিতেছি না, সত্য সত্যই সে গ্রামে লোক নাই। ঘর আছে, দ্বার আছে, প্রাঙ্গণ আছে, প্রাঙ্গণের পার্শ্বে এখনও পূর্ব্বের মত ফুল ফোটে, এখনও দূরদূরান্তর হইতে পক্ষিকুল আসিয়া সেই গ্রামের উন্নত বৃক্ষরাজিতে বাসা করিয়া

থাকে ; এখনও সে গ্রামের অনেক গৃহে দ্রব্যাদি সজ্জিত আছে, কিন্তু লোক নাই। সে এক ভয়ানক দৃশ্য। ছোট ছোট বাড়ীগুলি হা হা করিতেছে ; আমার বোধ হইল, যেন একটা রুদ্ধ বায়ু সেই গ্রামের উপর দিয়া সভয়ে ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে। অপরাহ্ণ সময়ে এমন একটা পরিত্যক্ত পল্লীর নিকট উপস্থিত হইলে মনে গভীর বিষাদের ভাব উদিত হয়। মনুষ্যসমাগমশূন্য গ্রাম কখনও কল্পনাও করিতে পারি নাই। এই ভাবের একটা দৃশ্য বঙ্কিম বাবুর আনন্দ-মঠে পড়িয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতেও মানুষের অতিসামান্য সাড়াশব্দ ছিল। এ গ্রামে তাহার কিছুই নাই। আমি গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিলাম, কিন্তু সঙ্গী সিপাহী কিছুতেই আমাকে সেখানে প্রবেশ করিতে দিবে না। গ্রামের অবস্থা দেখিয়া মনে হইল, বুঝি সেকালের ঠাকুরমার গল্পের কোন একটা দৈত্য আসিয়া এক দিনে গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধবনিতাকে দামোদরে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সিপাহীকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে, এ অতি ভয়ানক গ্রাম ; বৃশ্চিকে এ গ্রামের এই দশা করিয়াছে। গ্রামের লোকেরা নিরাপদে এই পর্ব্বতক্রোড়ে বাস করিতেছিল ; তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার পীড়া বা অসুখ ছিল না ; হঠাৎ এক দিন কোথা হইতে এক দল বৃশ্চিক এই গ্রামে দেখা দিল, এবং যাহাকে পাইল, তাহাকেই দংশন করিতে আরম্ভ করিল। আমাদের কবিগণ যার কথায় সহস্রবৃশ্চিকদংশন অনুভব করেন, তাঁহাদের মধ্যে এই জাতীয় একটি বৃশ্চিককে প্রেরণ করিলে আর দ্বিতীয়বার দংশনের অবকাশ দিতে পারিতেন না। এই গ্রামে যে সমস্ত বৃশ্চিক আসিয়াছিল, তাহাদের বিষ এমনই তীব্র যে, যাহাকে দংশন করিয়াছে, তাহাকেই সেই মুহূর্ত্তেই শমনভবনে গমন করিতে হইয়াছে।

এই আকস্মিক বিপৎপাতে গ্রামের লোক যে যে দিকে পারিল, পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। পলায়নসময়ে যে হাতের নিকটে যে দ্রব্য পাইয়াছিল, তাহাই লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। যে কোন প্রকারে হউক, তখন প্রাণ বাঁচাইতে পারিলেই হয়। সেই দিন অপরাহ্ণ হইতে এই গ্রাম জনশূন্য। আজ পর্য্যন্তও কাহারও সাহস হয় নাই যে, গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কোন দ্রব্য বাহির করিয়া আনে। এমন কি, আমরা যে পথে চলিতেছি, পথিকগণ ঐ পথে চলিবার সময় অতি সতর্ক ও দ্রুতপদবিক্ষেপে চলিয়া যায়। রাত্রিকালে কেহই সে পথে চলিতে সম্মত হয় না।

আমার সঙ্গী সিপাহী সেখানে কিছুতেই দাঁড়াইতে চাহিল না, এবং সে

বেচারী প্রতি মুহূর্ত্তেই পায়ের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল;—কত বার যে অনর্থক তাহার পদদ্বয় ঝাড়িতে লাগিল, তাহার আর সংখ্যা করা যায় না। আমি তাহাকে অগ্রসর হইতে বলিলাম। সে কি করে; আমার জন্য সেখানে দাঁড়াইয়া সে ত আর তার 'জান' দিতে পারে না; তার 'জানের' মূল্য আছে; গৃহে তার মা আছে, দুইটি ভগিনী আছে, তিন মাস পূর্ব্বে সে একটি গৃহস্থের সাত বৎসরের বালিকা কন্যার ভার গ্রহণ করিয়াছে। সে অকারণ এমন ভয়ানক স্থানে দাঁড়াইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার জীবন বিপন্ন করিবে কেন? আমি যেন কিছুতেই সে গ্রামের দিকে একপদও অগ্রসর না হই, সে বার বার এই অনুরোধ জানাইয়া আমাদের রাত্রিবাসের স্থান স্থির করিবার জন্য চলিয়া গেল।

আমি দাঁড়াইয়া সেই ভয়ানক গ্রাম দেখিতে লাগিলাম। কেমন সুখে গ্রামবাসিগণ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিল; ঐ সকল জনহীন শূন্য কুটীর সকল এক দিন বালকবালিকার উচ্চ হাস্যে প্রতিধ্বনিত হইত, কত আশা, কত উৎসাহ ঐ সকল ক্ষুদ্র গৃহে আবদ্ধ ছিল। আজ সব শূন্য! হয় ত উহার কত কুটীরে কত মৃতদেহ মাটীর সহিত মিশিয়া গিয়াছে। হয় ত কত গৃহে নরকঙ্কাল চারি দিকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে;—সে হতভাগ্য-দিগের শবদেহ শ্মশানভূমিতে লইয়া যাইবার সাহস কাহারও হয় নাই। আমার বড়ই ইচ্ছা হইল, একবার গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করি; কিন্তু যখন বৃশ্চিকের কথা মনে হইল, তখন আর প্রবেশ করিতে সাহস কুলাইল না। বৃশ্চিক মহাশয় আমার অপরিচিত জীব নহেন; তাঁহার দংশনের সহিত এই প্রশান্ত হিমালয়বক্ষে একবার আমার পরিচয় হইয়াছিল। আমি তখন হরিদ্বার হইতে বদরিকাশ্রমে যাইতেছিলাম; এক অন্ধকার রাত্রে লছমন ঝোলা পার হইয়া একটি বৃক্ষতলে শয়ন করিয়াছিলাম। সেই রাত্রিতে আমার দক্ষিণ হস্তের মধ্যম অঙ্গুলিতে বৃশ্চিক দংশন করে। সে যন্ত্রণার কথা চিরকাল আমার মনে থাকিবে। সৌভাগ্যক্রমে এক জন সন্ন্যাসী যদি অদ্ভুত উপায়ে আমাকে আরোগ্য না করিতেন, তাহা হইলে সেই অন্ধকার রজনীতে সেই লছমন ঝোলায় আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনের শেষ যবনিকা পতিত হইত। এই বৃশ্চিক-তাড়িত গ্রামের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমার সেই দিনের কথা মনে হইল; সেইরূপ বা ততোধিক অসহ্য যন্ত্রণা পাইয়া এই গ্রামে কত নরনারী, কত বালক বালিকা, কত যুবক যুবতী অকালে জীবন

বিসর্জ্জন করিয়াছে। কত জনের জন্য কত প্রকারের মৃত্যু-ব্যবস্থা হইয়াছে, কে বলিতে পারে?

আমি সেই স্থানে দাঁড়াইয়া কত কথা ভাবিতেছি, এমন সময়ে স্বামীজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহাকে গ্রামের ইতিহাস বলিলাম। তিনি কোথায় সেই গ্রামবাসিগণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিবেন, না তাহার উল্টা হইল। তিনি আমাকে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন, কেন আমি এমন ভয়ানক স্থানে দাঁড়াইয়া আছি; জীবনটা যদি এতই দুর্ব্বহ হইয়া থাকে, তবে মরণের আরও অনেক দ্বার উন্মুক্ত আছে, তাহারই কোন একটা দিয়া প্রবেশ করিলেই ত সকল জ্বালা জুড়াইয়া যায়, এমন করিয়া পথে পথে এ পাপের বোঝা বহিয়া বেড়ান কেন? ইত্যাকার অনেক কথা তিনি আমাকে শুনাইতে শুনাইতে চলিতে লাগিলেন; এবং আমি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলাম। তাঁহার ঐ সকল অনুযোগের জবাব আমার বুদ্ধির ভাণ্ডারে ছিল না; আর থাকিলেও এ ক্ষেত্রে তাহা প্রয়োগ করা যায় না। এ তিরস্কারের ভিতর দিয়া যে স্নেহের অমৃতধারা বহিয়া যাইতেছিল, যদি কেহ জীবনে এই ভাবের তিরস্কার কখনও পাইয়া থাকেন, তিনিই আমার সেই সময়ের মনের ভাব বুঝিতে পারিবেন।

এই ভাবে আমরা 'ডুণ্ডা' নামক একটি গ্রামে উপস্থিত হইলাম। আমরা যেখানে উপস্থিত, সে স্থানটিতে গ্রাম নাই; গ্রাম পর্ব্বতের পার্শ্বে; এখানে রাস্তার ধারে দুইখানি দোকানঘর। আমরা তাহারই এক দোকানের বারান্দায় উপবিষ্ট হইলাম। দুই দোকানই বন্ধ, দোকানদার কেহই সেখানে নাই। এক জন রাখাল সেখানে মহিষ চরাইতেছিল, সে বলিল, দোকানদার দুই জনই শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে। সিপাহীও পূর্ব্বে আসিয়া সেই দোকানেই বসিয়া আছে; গ্রামে রসদসংগ্রহের জন্য যায় নাই। কারণ, দুই জন দোকানদারই গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু লোক; তাহারা দোকান হইতেই আমাদের জিনিসপত্র গোছাইয়া দিবে। আমরা এই আশায় বসিয়া আছি। দোকানদারের আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। পেয়াদা সান্ধ্যকৃত্য সমাপন করিবার জন্য চলিয়া গেল। স্বামীজীও সেখান হইতে উঠিয়া এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতে গেলেন; আমি একাকী সেই নির্জ্জন বারান্দায় বসিয়া রহিলাম; সেদিন থাকিয়া থাকিয়া কেবল সেই জনহীন পল্লীর শ্মশান-দৃশ্য আমার

মনে পড়িতেছিল"; আমি বসিয়া বসিয়া সেই গ্রামের মৃত পলায়িত ব্যক্তিগণের জীবনকাহিনী ভাবিতেছিলাম।

এমন সময়ে কোথা হইতে এক প্রকাণ্ডকায় দীর্ঘযষ্টিধারী ব্যক্তি আসিয়া সেই কুটীরপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। একটি কিসের বস্তা তাহার পৃষ্ঠদেশে আবদ্ধ। সে প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া প্রথমে আমাকে দেখিতে পায় নাই; তাহার পৃষ্ঠের সেই বস্তাখানি খুলিয়া সে যেমন সেই বারান্দায় উঠাইতে যাইবে, অমনই আমার উপর তাহার দৃষ্টি নিপতিত হইল। তখন সেই পুরুষপুঙ্গব এমন সুমধুর স্বরে "কোন্ হ্যায়" বলিয়া আমাকে সম্ভাষণ করিলেন যে, সে অভ্যর্থনায় আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। আমি যেন কেমন একটা থতমত খাইয়া গেলাম। পুনরায় প্রশ্ন হইল; এইবার আমি জবাব করিলাম, "মুসাফির"। পথে ঘাটে কখন কোন দিন আমি সাধু, সন্ন্যাসী বলিয়া আপনার পরিচয় দিই নাই, দিতে প্রবৃত্তি হয় নাই, কথা মুখে বাধিয়া গিয়াছে। হৃদয়ের মধ্যে এত পাপ, এত প্রলোভন, এত বড় একটা সংসার, এতখানি অতৃপ্ত সংসারবাসনা সত্ত্বেও নিজেকে সন্ন্যাসী, সাধু, সর্ব্বত্যাগী বলিয়া পরিচয় দেওয়াটাকে আমি, অমার্জ্জনীয় অপরাধ কেন, মহাপাপ বলিয়াই মনে করিতাম। যাহাদিগকে হিন্দু সাধারণ ধার্ম্মিকের উচ্চ মঞ্চে বসাইয়া যুগযুগান্তর হইতে ভক্তি শ্রদ্ধার উপহার দিয়া আসিতেছে, আমি আমার এই পাপকলঙ্কিত, ধূলিধূসরিত মলিন হৃদয়কে কেন সে পবিত্র মঞ্চের সমীপস্থ করিব? তাই আমি সকল সময়েই নিজেকে 'মুসাফির' বলিয়া পরিচয় দিয়াছি। আমি যে তীর্থভ্রমণে যাইতেছি, এ কথাও আমি কখন কাহারও নিকট বলি নাই, বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইত। তীর্থভ্রমণও আমার উদ্দেশ্য ছিল না; অসংখ্য নরনারী যে ভক্তিপ্রবণ হৃদয় লইয়া তীর্থদর্শনে যায়, তাহার তিলার্দ্ধও আমাতে ছিল না। 'যেন তেন প্রকারেণ' আমার দিন কয়টি কাটিয়া গেলেই আমি বাঁচি, ইহাই তখন আমার উদ্দেশ্য ছিল; আর সে কয়টি দিন লোকালয় অপেক্ষা বন জঙ্গলে কাটিয়া গেলেই ভাল। সে কথা যাক্।

আমি আগন্তুক দোকানদার মহাশয়কে যে জবাব দিলাম, তাহা তাঁহার নিকট সন্তোষজনক বোধ হইল না। তাহার সেই আটা, গম, লবণ, লঙ্কা-পূর্ণ প্রশস্ত পণ্যশালার দ্বারদেশে এক জন অজ্ঞাতকুলশীল ঝাঁকড়া-চুলওয়ালা কৃষ্ণকায় ব্যক্তি উপবিষ্ট থাকিবে, ইহা তাহার পক্ষে অসহ্য হইল। "মুসাফির"

আদমির সেখানে থাকিবার স্থান হইবে না, সে সদাব্রত দিতেও বসে নাই, এই কথা বলিয়া আমাকে তখনই সে স্থান ত্যাগ করিবার জন্য আদেশ প্রচার করিল। আজকালকার অজাতশ্মশ্রু হুজুরগণের মত আমার জবাব না শুনিয়াই সে একেবারে Summery আদেশ দিয়া বসিল। আমি তাহার আদেশের প্রতিবাদ করিবার জন্য দুই একটি কথা বলিতে না বলিতেই "ব্যস্, গোল মৎ করো, হিঁয়াসে নিকালো" বলিয়া আমাকে জোর করিয়া বাহির করিতে আসিল। সেই নির্জন পর্ব্বতপ্রান্তে, ততোধিক নির্জন কুটীরে, এক জন প্রকাণ্ডকায় পর্ব্বতবাসীর প্রদত্ত অর্দ্ধচন্দ্রের উপর আমার বিশেষ প্রীতি না থাকায়, আমি অগত্যা তাহার সেই বারান্দা, আমার সেই অন্ধকার রাত্রের আশ্রয়স্থান ত্যাগ করিয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সে বিশেষ রাগের ভরে সিপাহীর গাঁট্‌রী এবং স্বামীজীর কমণ্ডলু উঠানে ফেলিয়া দিল। আমি আর সেগুলি কুড়াইয়া লইলাম না।

দোকানদার তখন ঘরের দ্বার খুলিয়া ভিতরে গেল, এবং আলো জ্বালিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। ইত্যবসরে স্বামীজী ও সিপাহী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং আমাকে অমন ভাবে দণ্ডায়মান দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দোকানদার যে আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে, সে কথা তাঁহাদিগকে বলিলাম। আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া দোকানদার বাহির হইয়া আসিল; তখনও তাহার মেজাজ খুব চড়া, কিন্তু তাহার এমন উগ্রমূর্ত্তি হইবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ আমি ত মোটেই খুঁজিয়া পাই নাই। আমাদের তিন জনকে দেখিয়া তাহার ক্রোধ আরও প্রজ্বলিত হইল, এবং আমাদের যে অভিসন্ধি মন্দ, তাহা বুঝিতে তাহার আর অধিক বিলম্ব হইল না। অন্য কথা না বলিয়া সে এক প্রকাণ্ড যষ্টি ঘরের ভিতর হইতে বাহির করিয়া "আও" বলিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। কথা নাই বার্ত্তা নাই, একেবারে মহা যুদ্ধঘোষণা। লোকটার উদ্ধতভাব দেখিয়া আমার হঠাৎ কেমন রাগ হইল; আমি সিপাহীকে বলিলাম যে, উহার কাণ ধরিয়া লাঠিখানি কাড়িয়া লয়! সিপাহীও চটিয়া গিয়াছিল, এবং এতক্ষণ পরে সে আত্মপরিচয় দিল; কিন্তু দোকানদার তখন রাগে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে, সে একেবারে রাগের চোটে তিহরীর অমন প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজপরিবারকে 'নস্যাৎ' করিয়া দিল; সে কাহারও হুকুম মানে না।

সিপাহী মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট যে মহাস্ত্র আছে, তাহার প্রয়োগ

করিলেই দোকানদারের মস্তক অবনত হইবে; কিন্তু তাহার এ অমোঘ অস্ত্র ব্যর্থ হইল দেখিয়া তাহার গৌরবের উপর প্রকাণ্ড একটা আঘাত লাগিল; বিশেষতঃ তাহার যে মনিবকে এত বড় একটা হিমালয় পর্ব্বত অবনত-মস্তকে কর প্রদান করে, সেই ভারতপূজ্য গিরিরাজকে কি না এক জন সামান্য দোকানদার মানিতে চাহে না, আর সেই কথা সে কি না সেই রাজার এক জন প্রভুভক্ত ভৃত্যের মুখের উপর আমাদের সম্মুখে শুনাইয়া দিল? সিপাহী রাগিয়া একেবারে সিংহের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল, এবং দোকানদারকে ভাল করিয়া শিক্ষা দিবার জন্য আস্তিন গুটাইতে লাগিল। আমার তখন ইচ্ছা, বেটাকে ঘা কতক ভাল করিয়া বসাইয়া দেয়। কিন্তু স্বামীজী নিরীহ প্রকৃতির লোক, তিনি তাড়াতাড়ি সিপাহীর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন। সিপাহী কি সহজে যাইতে চায়? স্বামীজী তাহাকে সেই উঠান হইতে রাস্তায় টানিয়া লইয়া গেলেন; এ দিকে দোকানদার "আও না" বলিয়া তাহাকে সদর্পে আহ্বান করিতে লাগিল! আমার দিকে আর তাহার দৃষ্টি নাই। আমি আর কি করিব, সিপাহীর ঝুলি ও স্বামীজীর কমণ্ডলু কুড়াইয়া লইয়া ধীরে ধীরে রাস্তায় যেখানে তাঁহারা দাঁড়াইয়াছিলেন, সেখানে উপস্থিত হইলাম। "ভাগ্‌তা কাঁহে" বলিয়া আমাদিগকে বিদ্রূপপূর্ণ কম্‌প্লিমেণ্ট দিয়া দোকানদার আবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

আমরা অনন্যোপায় হইয়া নিকটস্থ একটা বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। কারণ, দ্বিতীয় দোকানদার তখনও আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। সিপাহী প্রস্তাব করিলেন যে, আমরা নিকটের গ্রামে যাই। আমরা বলিলাম, এ রাত্রি আমরা সেই বৃক্ষতলেই থাকিব, এবং কোন প্রকার আহারের আয়োজনেরও দরকার নাই; তবে সিপাহীর যদি কিছু আহারের আবশ্যক থাকে, তাহা হইলে সে গ্রামে যাইতে পারে। কিন্তু সে আমাদিগকে ছাড়িয়া গেল না; সে রাত্রি সেও অনাহারে কাটাইবে স্থির করিয়া কম্বল মুড়ী দিয়া বসিল।

স্বামীজী আমার পার্শ্বেই বসিয়াছিলেন; এবং লোকটা বড়ই গোঁয়ার বলিয়া তাহার উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করিতেছিলেন। আমি চুপ করিয়াই বসিয়া আছি। এ পথে বাহির হইয়া এমন সাদর অভ্যর্থনা কোন দিনই পাই নাই। এই পাহাড়ের মধ্যে এমন একটা উৎকট বীরের আবির্ভাবে আমি বড়ই আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলাম। স্বামীজী ধীরে ধীরে আমার নিকট হইতে উঠিয়া আবার সেই দোকানের দিকে গেলেন; তিনি সেখানে কি করিলেন,

বুঝিতে পারিলাম না। প্রায় আধ ঘণ্টা তিনি অনুপস্থিত। আমি ঘুমাইবার আয়োজন করিতেছি, এমন সময়ে তিনি সেই দোকানদারকে সঙ্গে করিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন! এবং আমাকে ডাকিয়া বলিলেন যে, দোকানদারের কোন দোষ নাই, সে আজ একটু অধিকপরিমাণে সিদ্দি খাইয়াছিল, এবং তাহার পরে গাঁজাতেও বেশী দম দিয়াছিল; তাই তাহার মাথা ঠিক নাই। এখন সে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াছে এবং তাহার ব্যাবহারের জন্য দুঃখিত হইয়াছে। আমি বুঝিলাম, এ স্বামীজীর কর্ম্ম।

দোকানদার তখন সেখানে বসিয়া আমি কোথা হইতে আসিতেছি জিজ্ঞাসা করিল; আমি তখন বলিলাম, আমি বাঙ্গালী, দেরাদুনে থাকি; তখন আমার আওয়াজটা তাহার পরিচিত বলিয়া বোধ হইল। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি কালীকান্ত সাহেবের বাসায় থাকিতাম? আমি যখন হাঁ বলিলাম, তখন লোকটা বড়ই অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। আমার কণ্ঠস্বর তাহার পরিচিত; আমিও তাহার পরিচিত। যখন তিহরীরাজ্য লইয়া রাণীজী ও মৃত রাজার ভ্রাতা কুমারবিক্রম সাহেবের বিবাদ হয়, তখন দেরাদুনের মাষ্টার কালীকান্ত বাবু কুমার সাহেবের পক্ষ অবলম্বন করেন। এ লোকটি সেই কুমার সাহেবের পক্ষীয়। এ তখন প্রায়ই সংবাদ আদি লইয়া দেরাদুনে যাতায়াত করিত, এবং কুমার সহেবের স্বপক্ষের এক জন প্রধান সাক্ষী ছিল। আমি ও কালীকান্ত বাবু একত্র থাকিতাম, সুতরাং তখন আমাকে দেখিয়াছে; কিন্তু সে সময়ে এমন দিন ছিল না, যে দিন আমাদের বাসায় ৫। ৭ জন লোক না আসিত। কাজেই আমি ইহাকে চিনিতে পারিলাম না।

আমি কালীকান্ত সাহেবের বিশেষ আত্মীয় লোক, আমার উপরে এ প্রকার ব্যবহার করিয়া সে অতিশয় অন্যায় করিয়াছে, নেশার ঝোঁকে মানুষ জানোয়ারের মত ব্যবহার করে, এই সব বলিয়া সে আমাদিগকে দোকানে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল; কিন্তু সিপাহী কিছুতেই রাজী হইল না; সে এই দোকানদারকে নিগৃহীত করিয়া তাহার মহারাজের গৌরব পুনঃস্থাপিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। রাজধানীতে গিয়াই ধুন্ধুরাম দোকানদারের উপর 'গিরেপ্‌তারি' পরওয়ানা বাহির করিয়া তবে সে ছাড়িবে। সিপাহীর নির্ব্বন্ধাতিশয়দর্শনে আমরা আর কিছুই বলিলাম না; দোকানদার ভবিষ্যৎ বিপদ বুঝিয়া অতি ধীরে ধীরে

দোকানে চলিয়া গেল, এবং ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। আমরা অনাহারে সেই বৃক্ষতলে রজনী অতিবাহিত করিলাম।

আজি ১৪ই জুন রবিবার অতি প্রত্যূষে উঠিয়া বাহির হইলাম। আট মাইল রাস্তা আসিয়া উত্তর-কাশীতে উপস্থিত হইলাম। উত্তর-কাশী সম্বন্ধে আমার ডায়েরীতে অতি সামান্য লেখা আছে। কারণ আমি উত্তর-কাশীতে যে ত্রিশূল দেখিয়াছিলাম, তাহা আঁকিয়া আনিয়াছিলাম। যে কাগজে তাহা আঁকিয়াছিলাম, সেই কাগজেই উত্তর-কাশীর সমস্ত বিবরণ যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম, তাই ডায়েরীতে অতি সামান্যই লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। সেই ত্রিশূল-অঙ্কিত কাগজখানি দেখিয়া গত বৎসরের পূর্ব্ববৎসরে জন্মভূমিতে আমি উত্তর-কাশী সম্বন্ধে একটা বড় প্রবন্ধ লিখি; তাহার পর যে সে কাগজ ও সে ছবি কোথায় গিয়াছে, আমি আর তাহার সন্ধান পাইতেছি না। আমার ডায়েরীর এক পৃষ্ঠাতেও সেই ত্রিশূলের একটা ছোট ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছিলাম,—সেখানিও কে ছিঁড়িয়া লইয়াছে। উত্তর-কাশীর বর্ণনা আমি দিতে পারিলাম না। যাঁহারা জন্মভূমি পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা তাহাতে দেখিতে পাইবেন। আমি এখানে ঠিক ঠিক আমার ডায়েরীখানি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

14th June, Sunday—প্রাতে যাত্রা, ৮ মাইল রাস্তা আসিয়া উত্তর-কাশীতে উপস্থিত। ঠিক গঙ্গার উপরে একটা ৪ হাত square নাটমন্দিরে আমাদের থাকিবার স্থান হইল; একেবারে গঙ্গার উপর। পাণ্ডা স্থির হইল, সে বিশেষ যত্ন করিতে লাগিল। দুই প্রহরের মধ্যে আর কোথাও যাওয়া হইল না। আমার পায়ের তলায় হঠাৎ একটি ফোড়া দেখা দিল। এখানে অতি সামান্য দুই একখানি দোকান আছে, খাবার দ্রব্য বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না; চাউল আদি অতি দুর্ম্মূল্য। স্থানটি সহর বা গ্রামের মতও নহে; বাড়ীগুলি মাঠের মধ্যে বিক্ষিপ্ত; মন্দিরগুলিও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; কোন নিয়ম, কোন শৃঙ্খলা নাই। শুনিলাম, এখানেও কাশীর ন্যায় সমস্তই ছিল; জ্ঞানবাপী, বিষ্ণুঘাট প্রভৃতি ছিল। একবার বর্ষাতে সমস্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কাশীর ন্যায় এখানেও মণিকর্ণিকার ঘাট আছে। আজ দর্শন হইল না। শুনা যায়, কাশী অপেক্ষাও এই কাশী পুরাতন; তবে বৌদ্ধগণের সময়ে একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। মহাত্মা শঙ্কর আসিয়া এই স্থানের উদ্ধার করেন। এখানে আপাততঃ দুইটি সদাব্রত আছে; একটি লছমীচাঁদ শেঠের; যাহাকে সাধারণতঃ কলিকাতার ছত্র বলে; ইঁহাদের এখানে, হৃষীকেশে ও গঙ্গোত্রীতে ছত্র আছে। দ্বিতীয় ছত্র একজন ব্রহ্মচারীর; ইনি শীতের কয় মাস দেশে দেশে ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন, আর এই কয় মাস গঙ্গোত্রীযাত্রী সাধুদিগকে আহার দান করেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বিশ্বনাথ দর্শন করিতে গেলাম। আমরা যখন গেলাম, তখন মন্দির অন্ধকার; প্রথমেই মন্দিরের সম্মুখে একটা ঘরের ছাদ বিদীর্ণ করিয়া সেই অনাদি পুরাতন ত্রিশূল রহিয়াছে; সবিস্ময়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম; ত্রিশূল দর্শন করিলাম; কিন্তু অন্ধকারের জন্য

ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না; আগামী কল্য দেখিয়া সবিশেষ লিখিয়া রাখিব। তাহার পরে অন্ধকারে পাণ্ডার হাত ধরিয়া বিশ্বনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। পাণ্ডা আমাকে অন্ধের মত এক স্থানে বসাইয়া দিল; অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলাম না; অজ্ঞাতসারে চক্ষু মুদ্রিত হইয়াছিল। পূজক কখন আসিয়াছিল, জানি না; শঙ্খ ঘণ্টার রবে জাগিয়া উঠিলাম; তখন আরতি আরম্ভ হইল; আমি চাহিয়া দেখি, আমি একেবারে বিশ্বনাথের কোলের কাছে বসিয়া আছি; সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলাম; চারি দিকে স্তোত্র গীত হইতেছে; আরতি হইতেছে। চতুর্দ্দশবর্ষীয় একটি সুন্দর বালক অতি-সুমিষ্টস্বরে মহাদেবের স্তুতিগান করিতে করিতে আরতি করিতেছে; দেহের মৃদু সঞ্চালনে তাহার সুন্দর কৃষ্ণকেশগুচ্ছ আন্দোলিত হইয়া আরও শোভার বিকাশ হইতেছে। অতি আনন্দ ও শান্তি উপভোগ করিলাম; জীবনে এরূপ সুদিন অতি কমই হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া মন্দির হইতে বাহির হইলাম। তখন রাত্রি হইয়াছে; স্বামীজী ও পাণ্ডা মহাশয় বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। ধীরে ধীরে বাসায় আসিলাম। পায়ের তলায় বড়ই বেদনা হইল।

১৫ই জুন সোমবার—প্রাতে উঠিয়া পায়ের ফোড়ার অবস্থা অতি খারাপ দেখিলাম, চলিতে ফিরিতে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। এত দিন কিছুই হইল না, আজ কেন এমন হইল? শরীরও বড়ই অসুস্থ হইল। দুই প্রহরে শরীর বেশী কাতর হওয়ায় স্থান ত্যাগ করিয়া নিকটেই কেদারেশ্বরের মন্দিরে স্থান লওয়া গেল। মন্দিরের সঙ্গেই সম্মুখে একটি ছোট ঘর, এটি ঠিক মন্দিরের দরদালান; সেখানেই আড্ডা করা গেল। অপরাহ্নে ত্রিশূল ও বিশ্বনাথ দর্শনের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পায়ের জ্বালায় বাহির হওয়া গেল না। দিনটা যেন বিফলে গেল বলিয়া বোধ হইল। গঙ্গোত্রী যাওয়ার সঙ্কল্প ঘুচিয়া গেল, মসুরীতে ফিরিয়া যাওয়াই স্থির হইল। রাত্রে এক জন বাঙ্গালী ভৈরবী মন্দিরে আসিয়া খুব গান করিলেন। কিন্তু শেষে তাঁহার রীতি প্রকৃতি শুনিয়া দেখিয়া বুঝিয়া আমি বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলাম। শরীর বিশেষ কাতর।

১৬ই জুন মঙ্গলবার—প্রাতে কয়েক জন সাধু আসিয়া উপস্থিত হইলেন; দুইটি বালক অতি সুন্দর, আর একটি যুবক বড়ই ধর্ম্ম-পিপাসু, তাঁহার প্রকৃতি বড়ই মধুর। তাঁহাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল; তাঁহারা গঙ্গোত্রী যাইতেছেন; আমরা আর সে পথে যাইব না; আমরা লোকালয়ে ফিরিয়া যাইতেছি। পায়ের বেদনায় বাহির হওয়া কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে; তবুও শেষ বেলায় অনেক কষ্টে বিশ্বনাথের মন্দিরে যাইয়া ত্রিশূলের একটা rough ছবি ও স্থানের বিশেষ বর্ণনা, ইতিহাস লিখিয়া আনিলাম। ত্রিশূল কত কালের, কাহার, কেহই কিছু জানে না; অষ্টধাতুতে নির্ম্মিত, তবে তাহার মধ্যে তাম্রের ভাগ বেশী বলিয়া বোধ হয়। পাণ্ডারা বলিলেন, অনেক দিন পূর্ব্বে (বোধ হয় নেপাল-যুদ্ধের সময়) নেপালের রাজা এখানে আসিয়াছিলেন; তিনি এই ত্রিশূল দর্শন করিয়া ইহা উঠাইয়া লইয়া পশুপতিনাথের মন্দির

সম্মুখে রাখিবার আদেশ দিয়া যান। তাঁহার আদেশক্রমে কর্ম্মচারিগণ খনন করিতে আরম্ভ করেন। অপর কাগজে লিখিত চিত্রের নীচে যে কলসীটি আছে, খুঁড়িতে খুঁড়িতে এই প্রকার সাতটি কলসী দেখিতে পাওয়া যায়; শেষে আর খনন করা অসম্ভব হইয়া পড়ে; অনেক বৃশ্চিক ও সর্প বাহির হইয়া খননকারীদিগকে দংশন করিয়া মারিয়া ফেলে; সকলে পলায়ন করে; সুতরাং নীচে আর কত দূর ত্রিশূল প্রোথিত আছে, কে জানে? এই সাত কলসী পর্য্যন্ত হিসাব করিলেও ৭২ হস্ত হইবে; কারণ, একটি কলসী হইতে ত্রিশূলের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত ১২ হাত হইবে; আর উপরের ত্রিশূল তিন হাত; সর্ব্বশুদ্ধ ৭৫ হাত জানিতে পারা গিয়াছে। ত্রিশূলের গায়ে তিন লাইন কি লেখা আছে (তাহার নকল অন্য কাগজে রহিল) পড়া গেল না। স্বামীজী বলিলেন, পালি ভাষা। আর একটি ব্যাপার আছে; এই ত্রিশূলের গায়ে অঙ্গুলি দ্বারা সামান্য ঠেলা দিলে ত্রিশূল কাঁপিয়া উঠে, কিন্তু জোর করিয়া ঠেলিতে গেলে মোটেই নড়ে না। স্বামীজী বলিলেন, ইহার মধ্যে magnetic কিছু আছে। (পাণ্ডা বলিলেন, এখন আর পূর্ব্বের মত কাঁপে না; কারণ ঘরের ছাদে বাধিয়া যায়।) এক জন শ্রেষ্ঠী একটি ঘর বানাইয়া শুধু ত্রিশূলটি ঘরের ছাদ ভেদ করিয়া উপরে বাহির করিয়া দিয়াছেন। এই ত্রিশূল দর্শন করাই আমার এখানে আসিবার উদ্দেশ্য। অপরাহ্নে নর্ম্মদাতীরস্থ অমরকণ্ঠ মহাদেবের মন্দির-বাসী চৈতনদাস নামক একজন ভক্ত সাধু আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ধর্ম্মালোচনা হইল। সচরাচর পথে ঘাটে যেমন সন্ন্যাসী দেখিতে পাওয়া যায়, ইনি তেমন নহেন; কোন প্রকার সন্ন্যাসীর ভাণ নাই। উঠিয়া যাইবার সময়ে আমাকে তাঁহার আশ্রমে যাইবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া গেলেন, এবং যাইবার ঠিকানাও বলিয়া গেলেন। মধ্য-ভারতবর্ষের বিলাসপুর ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হইবে; ছত্রিশগড়ের নিকটে নর্ম্মদাতীরে অমরকণ্ঠ মহাদেবের মন্দির বলিলেই লোকে দেখাইয়া দিবে। স্বামীজী আমার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন; শরীর সুস্থ হইলে মসূরী ফিরিয়া গেলেই হয়; কিন্তু তিনি তাহা চান না; যাহাতে আগামী কল্যই আমরা বাহির হইতে পারি, তাহারই বন্দোবস্ত করিতে তিনি ব্যস্ত। আমার জন্য পাহাড়ী ডাণ্ডী ভাড়া করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমার নিষেধ শুনিতেছেন না।

১৭ই জুন বুধবার—আজ উত্তর-কাশী-ত্যাগের কথা ছিল, কিন্তু আমার জন্য যানের বন্দোবস্ত না হওয়ায় যাওয়া স্থগিত রহিল; এ দিকে আমার পা ক্রমেই ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। আজ ভগীরথ-দশহরা। পাণ্ডা বলিলেন, আজ অতি পবিত্র দিন। পাণ্ডার অনুরোধে আমি অতি কষ্টে মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিতে গেলাম; মণিকর্ণিকার ঘাটের তেমন আড়ম্বর এখানে কিছুই নাই। আমাদের কাশী প্রকাণ্ড সহর, উত্তর-কাশী সামান্য গ্রামও নহে; একটি বাঁধা ঘাটও নাই। ঠিক পুরাতন আর্য্যভাব এখনও এখানে বর্ত্তমান; কৃত্রিমতা কিছুই নাই; যাহা ছিল, তাহাই আছে; মানুষের হাত মোটেই লাগে

নাই। স্থানটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পূর্ণ। পুরাতন আর্য্য-ব্রাহ্মণগণের ন্যায় এখনও এ স্থানের ব্রাহ্মণেরা ক্ষেত্র-কর্ষণ করে, এবং গো-পালন করে। সম্পত্তির মধ্যে গোধূমক্ষেত্র ও গো-মহিষ; তাহাতেই ইহারা সন্তুষ্ট। পাণ্ডাগণ বড়ই দরিদ্র। বদরিকাশ্রমে কি কেদারনাথের পথে অনেক বড়মানুষ আসিয়া থাকে, গঙ্গোত্রীর পথে সাধু সন্ন্যাসী ছাড়া আর কেহ বড় একটা আসে না; পাণ্ডাদিগের সেই জন্যই কিছু আয় হয় না; এমন কি, বিশ্বনাথের পূজক ব্রাহ্মণের সামান্য কিঞ্চিৎ জমি ভিন্ন অন্য সম্পত্তি মোটেই নাই; প্রণামী দর্শনী অতি সামান্যই হইয়া থাকে। অন্যান্য বিবরণ পৃথক কাগজে লিখিয়া রাখিলাম। ১২৲ টাকা দিয়া একখানি পাহাড়ী ডাণ্ডী ভাড়া করা হইল। স্বামীজীর এ অনুরোধ আমি কিছুতেই অতিক্রম করিতে পরিলাম না। আমার সন্ন্যাস ও কঠোরতা ঘুচিয়া গেল!

১৮ই জুন, বৃহস্পতিবার—আজ উত্তর-কাশীত্যাগ। উত্তর-কাশীতে যে কয় দিন ছিলাম, সে কয় দিনের বিবরণ ভিন্ন ভিন্ন কাগজে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম; তবে যে আমার ডায়েরীতে উপরের কয়েকটি কথা লিখিত ছিল, সে স্বামীজীর কথা মত। তিনি বলিয়াছিলেন, আল্গা কাগজের লেখা হয় ত হারাইয়া যাইতে পারে; অন্ততঃ চুম্বক করিয়া খাতায় লিখিয়া রাখা ভাল। বৃদ্ধের দূরদর্শিতায় ফল ফলিয়াছে; সে কাগজগুলির আর উদ্দেশ হইতেছে না; এই খাতায় যাহা ছিল, তাহাই আমার সম্বল; এবং তাহাই উত্তর-কাশী সম্বন্ধে আমার বক্তব্য বিষয়। কত দিন চলিয়া গিয়াছে, সব কথা তেমন মনে নাই। এ অবস্থায় খাতাখানিতে যাহা লেখা আছে, তাহাই যথাযথ তুলিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য মনে করিলাম। ত্রিশূলের ছবি আমার কাছে মোটেই নাই; আমার পরমপূজনীয় সুহৃদ উত্তরপাড়া-নিবাসী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমার সেই ছবি দেখিয়া স্বহস্তে একটা sketch করিয়াছিলেন; তাহা যদি তাঁহার নিকট থাকে, তবে ভবিষ্যতে সেই ত্রিশূলের ছবি পাঠকগণকে উপহার দিতে পারিব।

আমি আজ আর সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গী নহি। আজ পাহাড়ী ডাণ্ডীতে চড়িয়া চলিতেছি। তীর্থের পরিসমাপ্তি মন্দ নহে। চার জন প্রকাণ্ডকায় পাহাড়ী আমার ডাণ্ডী-বাহক। স্বামীজী আমাকে এই অবস্থায় ফেলিয়াছেন। আমার পায়ের অবস্থা অবশ্যই দিন দিন খারাপ হইতেছিল, তাহারই জন্য তিনি বিশেষ ভীত হইয়া আমার জন্য এই ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন, এবং যত শীঘ্র আমরা মসূরীতে পৌঁছিতে পারি, ততই মঙ্গল মনে করিয়া দণ্ডে দশবার ডাণ্ডীওয়ালাদিগকে দ্রুতগমনের জন্য তাড়না করিতে লাগিলেন। আজ তাঁর ভাব দেখিয়া বোধ হইল, কেহ যদি আজই আমাদিগকে মসূরী পৌঁছাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে তিনি তাঁহার একমাত্র সম্বল পাগড়ী, গায়ের কম্বল ও হাতের কমণ্ডলুটিও দিতে প্রস্তুত।

এই স্থানে ডাণ্ডীর একটা বর্ণনা দেওয়া বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িল। কারণ, আমার যে এই তিন ঘণ্টাতেই ভয়ানক বুকের বেদনা হইল,

তাহার ত একটা কারণনির্দ্দেশ করিতে হইবে। একখানি মোটা লম্বা বাঁশ, অবশ্য বাঁধুনি খুব দৃঢ়, আর একখানি কম্বল, আর দুইখানি শক্ত দড়ি, এই তিনটি দ্রব্য আমার ডাণ্ডীর উপকরণ। পর্ব্বতবাসিগণ সেই বাঁশের দুই দিকে থানিকটা স্থান বাহিরে রাখিয়া কম্বলখানি দড়ি দিয়া সেই বাঁশের সঙ্গে বেশ করিয়া বাঁধিয়া লইল। আমি সেই কম্বলের মধ্যে বসিয়া বুকের মধ্যে বাঁশটি লইয়া দুই হাত দিয়া চাপিয়া বসিয়া রহিলাম; সুতরাং প্রতিপদ-বিক্ষেপে আমার বুকে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা; যথাসম্ভব বুক রক্ষা করিতে লাগিলাম বটে, কিন্তু কত রক্ষা করা যায়? বুকে এবং হাতে বেদনা হইয়া গেল। এ সুখের অপেক্ষা সোয়াস্তি ভাল ছিল! পা দুখানি কম্বলের বাহিরে ঝুলিয়া থাকায় আরও কষ্ট হইতে লাগিল। শেষে ডাণ্ডিওয়ালার পরামর্শে বেদনাযুক্ত পাখানি অপর পায়ের হাঁটুর উপর রাখিয়া কথঞ্চিৎ ভাল বোধ হইল। ডাণ্ডীওয়ালাগণ এরূপ না করিয়া যদি আমাকে কম্বল দিয়া জড়াইয়া বাঁধিয়া দড়ির মধ্যে বাঁশ দিয়া স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইত, তাহা হইলেও বোধ করি বেশী সোয়াস্তি হইত।

যাহা হউক, এই ভাবে আট মাইল আসিয়া সেই দাঙ্গার ক্ষেত্র ডুণ্ডার দোকানে উপস্থিত হইলাম। এবার দ্বিতীয় দোকানদার দোকানেই ছিল, এবং আমরা তাহারই দোকানে অতিথি হইলাম। ধুন্দুরাম দোকানদার আজ দোকান বন্ধ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এ দোকানদার আমাদের যথেষ্ট খাতির করিল। আমার পায়ের অবস্থা দেখিয়া তাড়াতাড়ি গ্রামে গিয়া কতকগুলি জোয়ান সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিল, এবং আটা ও জোয়ান একত্র বাটিয়া গরম করিয়া তাহার উপরে বেশ ভাল করিয়া ঘৃত দিয়া আমার পায়ে একটা পুল্টিস্ দিয়া দিল; যাতনা কম বোধ হইতে লাগিল। আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, ২।১ দিন এখানে থাকিয়া পা ভাল হইয়া গেলে শেষে মস্থরী চলিয়া যাইব। কিন্তু স্বামীজী তাহাতে রাজী নন। ডাণ্ডীওয়ালারা বসিয়া থাকিতে চাহে না; তাহাদিগকে ছাড়াইয়া দিতে গেলে বন্দোবস্ত অনুসারে ১২৲ টাকা দিতে হয়; তাহাই বা কোথায় মেলে? আরও এক কথা, পথে ঘাটে যার তার যে সে ঔষধ ক্ষতস্থানে লাগাইতে দেওয়া স্বামীজীর ইচ্ছা নহে। তিনি আমাকে কোন রকমে টানিয়া মস্থরীতে লইয়া যাইতে চান। অগত্যা অপরাহ্ণে আবার রওনা হওয়া গেল। বাহির হইবার সময়ে দোকানদার আর একটা পুল্টিস গরম করিয়া লাগাইয়া দিল, এবং রাত্রে আরও দুই বার যাহাতে লাগাইতে পারি, আমাকে তদুপযুক্ত সরঞ্জাম দিল। দোকানদারকে ধন্যবাদ দিয়া আমি আবার সেই অপূর্ব্ব যানে উঠিয়া বসিলাম।

ক্রমশঃ।

শ্রীজলধর সেন।

কবিতাকুঞ্জ।

বিশ্ববধূ।

তুমি শুধু আছ বসি বিশ্ব-অন্তঃপুরে
আপন সৌন্দর্য্যমাঝে আপনি বিলীন।
ঘেরি তব চারিধার বসন্ত নবীন
ঢালিছে সুরভি-সার; বাঁশরীর সুরে
মলয় গাহিছে ফিরি' মধুর মধুরে;
নিত্য হাসি হাসিছে কুসুম; নিশিদিন
জ্বলিছে তারকা-দীপ; বিরাম-বিহীন
ধ্বনিছে জলদ-শঙ্খ সুদূর সুদূরে!
যুগযুগান্তর ধরি মুগ্ধ কবিকুল
হেরি সে আরতিলীলা রাতুল চরণে
সর্ব্বস্ব সঁপিয়া দেয় সজলনয়নে;
অবশেষে কহি উঠে আনন্দে আকুল,—
"হে বধু! হেরিনু সব, আজি শেষবার
দেখাও গুণ্ঠনে-ঢাকা মু'খানি তোমার।"

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

গান।

সিন্ধু কাফি—ঝাঁপতাল।

এ হৃদিকুঞ্জবনে তুমি রহ হে প্রাণ-সখা,
মম জীবন-ভাতি,
নিখিল শান্ত নব, নিরতি নিভৃত সব,
নীরব সে দিনরাতি।
স্নিগ্ধ-বসন্ত-সুসেবিত, পুষ্পিত, চম্পক
বেলা মালতী জাতি;
বিহর তথা মম হৃদয়বিলাসী,
শত-ফুল-গন্ধে মাতি;
রহ ঘিরি মোরে, তব ভুজ-ডোরে,
হে চিরজীবন-সাথী!
দিব পিক-কূজন, মলয় সমীরণ,
কুসুমহার দিব গাঁথি।
শয়ন তরে দিব শিশির-সুশীতল,
কিশলয়-কোমল এ বুক পাতি।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

সিন্ধু।

আকুল, অনন্ত বারি,
তরঙ্গিত দূর দূরান্তর;
সীমাশূন্য, কূলশূন্য
অসীম—এ অনন্ত সাগর।
অনন্তের অন্তঃস্থল
পৃথিবীতে রাখিতে ঢাকিয়া,
তরঙ্গিত সিন্ধু বুকে
অলসেতে পড়েছে হেলিয়া।
দূর হ'তে দূরান্তরে
ছুটিতেছে তরঙ্গ ভীষণ।
গাঢ় নীল বারিরাশি
মরকত বিমল যেমন।
নিথর নীলিমাকাশ
বিরাজিছে বারিধির বুকে;
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু
ছুটিয়াছে গগনের মুখে।
সাম্য, চাঞ্চল্যের এই
সুগভীর মহান্ মিলন,
এক স্থির; অপরের
দিগ্‌ব্যাপী কল্লোল ভীষণ।
সীমাশূন্য মহা গীত
উঠিতেছে কল্লোলে কল্লোলে;
প্রকৃতি গম্ভীর স্থির
সুগভীর সাগরের জলে।
শুধু জলজন্তুগণ
খেলিতেছে তরঙ্গ ফেনিলে;
নিরজন চারি ধার—
তৃণটুকু ভাসে না সলিলে।
চারি দিক প্রাণিশূন্য—
স্তব্ধ—স্থির—প্রশান্ত—বিজন;
অর্দ্ধেক পৃথিবী ঘিরে
তরঙ্গের গভীর গর্জ্জন।
রবি, শশী দেয় কর,
সুবিমল সাগরের নীরে
ঝিকিমিকি করে দূরে
স্বর্ণরশ্মি—তরঙ্গের শিরে।

৺প্রমীলা নাগ।

তুমি।

তুমি স্নিগ্ধ যেমন শব্দবিহীন
স্তব্ধ বরষা-রাতি;
তুমি উজ্জ্বল যেন কুসুমবহুল
পুষ্পসময়ভাতি;
তুমি কোমল যেমন শারদ আকাশে
জ্যোৎস্নামধুর নিশি;

তুমি মধুর যেমন অরুণ উদয়ে
পুলক-আকুল দিশি;
তুমি সুখদ যেমন বেদনাতপ্তে
অশ্রু—বেদনহারী;
তুমি উদার যেমন গগনবিলীন
সুনীল সাগরবারি;
তুমি অসীম যেমন নিঃস্ব হৃদয়ে
ব্যাকুল বাসনারাশি;
তুমি পূত যেমন শিশুর অধরে
সরস মধুর হাসি;
তুমি হাস্যে যেমন নববিকশিত
কুসুম লোচনলোভা;
তুমি ক্রন্দনে যেন শিশিরসিক্ত
বিকচ-কুসুম-শোভা;
তুমি প্রণয়ে যেমন সুনীল আকাশে
রজত জ্যোৎস্নাধারা,
তুমি বিরাগে যেমন প্রভাতগগনে
ম্লান-আলোক তারা;
তুমি হৃদয়-সরসে ফুটিয়া উঠেছ
প্রভাতনলিনী সম;
তুমি চন্দ্র যেমন করেছ উজল
আঁধার হৃদয় মম।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

কুহু।

আদিকালে কবে তুই উঠিলি প্রথম,
রে মর্ম্মবিদারী কুহু! কি মানে নিষম,
কি মধু বিধুরে, কেন ওরে চিরাদৃত!
কোন প্রত্যাখ্যান-স্বপ্নে? ঘনশ্যামাবৃত
নিভৃত নিকুঞ্জে কার কণ্ঠে ছি'লি জাগি?
সে দিন কি চন্দ্রাপীড় মেলেছিল আঁখি
এই স্বরে? ফুটেছিল কবি-কল্পনায়
মেঘদূত সেদিন কি শিপ্রাতীরে? হায়,
আকণ্ঠ নিমজ্জি' ওই ছড়ায়ে কুন্তল,
বধূ, শূন্য কুম্ভ ভাসাইয়া, শুদ্ধ ছল ছল
উৎকর্ণে শুনিছে ও কি! অবেলায় নেয়ে,
ঘরে ফিরে যাবে বুঝি ওই মুগ্ধ মেয়ে
আর্দ্রবাসে, আর্দ্রকেশে, শুনে তোয়ে কুহু!
ফিরে ফিরে পথে থেমে, বক্ষে লয়ে উহু!

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

কবিতা।

কবিতা!
সতত বাসনা জাগে পূজি তোমা হৃদি ভাগে
ধরার সৌন্দর্য্য-আগে তব অধিষ্ঠান!
এ জগত কবিত্ব মহান!

সৌন্দর্য্য-আধার বিশ্ব, নরনারী কি রহস্য,
আলোক-আঁধার-দৃশ্য জন্ম-অবসান।
এ জগত কবিত্ব মহান।

সুনীল অম্বর ভরা চন্দ্র সূর্য্য আলো করা
চারুশোভা মনোহরা স্বরগ সমান!
ফুটে উঠে শতদল যেন দীপ্ত শতদল
বিস্ময়ে বিহ্বল তাই হয়েছে নয়ান।
এ জগৎ কবিত্ব মহান।

এ ধরা প্রেমের বন্ধ প্রাণে প্রাণে নিত্য দ্বন্দ্ব
হৃদে হৃদে প্রেমগন্ধ বহে অবিরাম।
তরঙ্গ নাচিয়া দোলে, বিহঙ্গ কুলায় বোলে,
ফুল সে বসন্তকোলে অনঙ্গ-সন্ধান।
এ জগত কবিত্ব মহান।

নির্ম্মম কঠোর হিয়া আপন সর্ব্বস্ব দিয়া
বাঁধিতে পারে না হিয়া, খোঁজে প্রতিদান।
লাঞ্ছনা ঝটিকা যায় তবু ছুটে পায় পায়
আলোক আঁধার হায় সকলি সমান।
এ জগত কবিত্ব মহান!

সসাগরা বসুধারা বনশোভা প্রীতি-ভরা
ঊর্দ্ধশির, কি বিশাল পর্ব্বত পাষাণ;
প্রবল সাগর-নীর মলয় বহিছে ধীর
সুনীল বিস্তার স্থির আকাশ বিমান।
এ জগত কবিত্ব মহান।

তপন চন্দ্রমা যাচে দিবস নিশীথ কাছে
নিত্য ধায় পাছে পাছে, তবু ব্যবধান।
অভিমান নিরাশায় কাঁদিয়া ফিরিয়া চায়
নয়-চক্ষে বারি ধায় অনিন্দ্য বয়ান।
এ জগত কবিত্ব মহান।

না জানি কেমন সেই কবিতা সৃজিল যেই
মর্ত্ত্যলোকে স্বর্গ এই আনন্দ ভূমান্।
প্রকৃতি সে প্রতি বর্ষে বিতরিছে অতি হর্ষে
জীবনে এ উপভোগ অযাচিত দান।
এ জগত কবিত্ব মহান।

শ্রীচুণীলাল গুপ্ত।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। চতুর্থ ভাগ, প্রথম সংখ্যা। বর্ত্তমান বর্ষে "বিশ্বকোষের" বিখ্যাত সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু পরিষৎ-পত্রিকার সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সংখ্যা পাঠ করিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি। এই সংখ্যার প্রথমেই ভূতপূর্ব্ব সম্পাদকের "মহারাণী বিক্টোরিয়ার রাজত্বে বাঙ্গালা সাহিত্য" নামক একটি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধটি আশানুরূপ হয় নাই; এরূপ বিস্তৃত বিষয়ের আলোচনা সঙ্ক্ষিপ্ত প্রবন্ধে অসম্ভব। আর প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গুপ্ত মহাশয় বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিক্টোরিয়া রাজত্বের বাঙ্গালা সাহিত্যের যে সকল লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যেও বিশেষ কোনও নূতন কথার অসদ্ভাব। এই প্রবন্ধে তিনি যে সকল মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাও সম্পূর্ণ অভিনব নহে, তাঁহার পূর্ব্বপ্রকাশিত অন্যান্য সন্দর্ভেও প্রায় এই সকল কথাই ইতিপূর্ব্বে সাধারণে পাঠ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র রায়ের "ভৌগোলিক পরিভাষা" আলোচনার যোগ্য। শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরীর "নরোত্তম ঠাকুর" প্রবন্ধটি উৎকৃষ্ট,—জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। এই সংখ্যায় নরোত্তম ঠাকুরের "দেহকড়চ" অবিকল প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদক বলিতেছেন,—"ইহা বঙ্গভাষার এক খানি প্রাচীন গদ্য গ্রন্থ। প্রায় সাড়ে তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের কিরূপ অবস্থা ছিল, এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা হইতে তাহার কতক কতক নিদর্শন পাওয়া যায়। দেহ-কড়চের দুই খানি পুথি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। * * * দুই খানি পুথিই বর্ণাশুদ্ধিতে পরিপূর্ণ।" কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিৎ সম্পাদক মূলে সংশোধন না করিয়া, টীকায় সংশোধন, পাঠান্তরাদির নিরূপণ ও আবশ্যকমত অর্থনির্দ্দেশ করিয়া বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন। "দেহকড়চ" বিদ্বৎসমাজে সমাদৃত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাঙ্গালার প্রত্নতত্ত্ব" পাণ্ডিত্যপূর্ণ উপাদেয় প্রবন্ধ। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বিরচিত "রমাই পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গল" প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। শাস্ত্রী মহাশয় প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, ধর্ম্মপূজা বৌদ্ধধর্ম্মের শাখাবিশেষেরই রূপান্তর ও অবশেষমাত্র। তিনি এখনও এ বিষয়ের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত আছেন, এবং ক্রমে আরও নূতন তত্ত্ব প্রকাশিত করিবেন, বলিতেছেন। আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছি। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ পরিশিষ্টে "ধর্ম্মমঙ্গল"-প্রথিত লাউসেনের রাজধানী ও ধর্ম্মপূজার আদিম জন্মভূমি "ময়নাগড়ে"র বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। আমরা আশা করি, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা এই নবনির্ব্বাচিত পথের পথিক হইয়া ক্রমশঃ অধিকতর উন্নতি ও উপযোগিতা লাভ করিবে। এসিয়াটিক্ সোসাইটীর জর্ণ্যাল যেমন বিবিধ 'বিশিষ্ট' বিষয়ের আলোচনায় অগ্রণী, পরিষদের মুখপত্র পরিষৎ-পত্রিকাও বঙ্গভাষায় সেই অভাবপূরণ করিতে পারিবে। বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস, বাঙ্গালা দেশের, জাতির, ভাষার, সাহিত্যের প্রত্নতত্ত্ব, প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্য সাহিত্য প্রভৃতির অনুসন্ধান, আবিষ্কার, উদ্ধার ও সমালোচনা প্রভৃতি যে সকল 'বিশিষ্ট' বিষয়ের আলোচনা ব্যক্তিগত চেষ্টায় দুঃসাধ্য, সাধারণের অনধিগম্য, পণ্ডিতজনের আলোচ্য ও পরিষদের মত বিদ্বৎসমাজেরই একমাত্র কর্ত্তব্য,—সেই সকল নিতান্ত আবশ্যক গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় অবহিত হইলে, পরিষদের সাফল্য ও পত্রিকার গৌরব অবশ্যম্ভাবী। বক্ষ্যমাণ সংখ্যায় তাহার যে সূচনা দৃষ্ট হইতেছে, তাহা আশাপ্রদ। প্রার্থনা করি, নূতন সম্পাদক ক্রমে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করুন।

আলফন্স ডোডে।

মসূরীর পথে।

আর গঙ্গোত্রীর পথে লিখিলে চলিবে কেন? এ যাত্রায় গঙ্গোত্রী-দর্শন হইল না। আমরা এবার পথের মধ্য হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। কেন আসিলাম? দেশে এমন কি আকর্ষণ ছিল যে, তাহারই জন্য লোকালয়ে আসিলাম? এ কথার উত্তর দেওয়া তখন বড় সহজ হইত না। এখন যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, 'গঙ্গোত্রীর পথে' না হইয়া 'মসূরীর পথে' হইল কেন, তাহার একটা জবাব দিতে পারি। এখন এই ক্ষুদ্রগৃহপ্রান্তে বসিয়া নিজের জীবন সমালোচনা করিলে সে কথার জবাব পাই। গঙ্গোত্রীর পথে যাইতে যাইতে প্রতিদিনই আমার লোকালয়ের কথা মনে পড়িত; এমন দিন যায় নাই, যেদিন আমি মানুষের বসতিস্থানে আসিবার জন্য ব্যাকুল হই নাই। পশ্চাতে এত টান লইয়া কি কেহ পর্ব্বতে আরোহণ করিতে পারে? সম্মুখে স্থিরদৃষ্টি না হইলে এ সব দুর্গম বিপদসঙ্কুল পথে চলিবার যো নাই। একাগ্রতাই এই হিমালয়ে প্রধান পথপ্রদর্শক; আমার সেই পথপ্রদর্শকের অভাব হইয়াছিল, তাই আমি পথ ছাড়িয়া, অনন্তহিমানীমণ্ডিত গঙ্গার উৎপত্তিস্থান ছাড়িয়া, জনকোলাহলপূর্ণ বিলাসকাকলিমুখরিত কৃত্রিমতার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। আর আমি যদি গঙ্গোত্রী যাইবার জন্য একাগ্রচিত্ত হইতাম, তাহা হইলে কি পথের মধ্যে আমার পদতলে এমন একটা প্রকাণ্ড স্ফোটক হয়? হিমালয়ের মধ্যে আমি রোগে কষ্ট অতি কমই পাইয়াছি। এবারে আমাকে নিতান্তই ফিরিতে হইবে, তাই নানা দিক হইতে নানা প্রকার বাধা আমাকে ছাঁকিয়া ধরিয়াছিল।

ডুণ্ডা হইতে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা ধারাসুতে রাজার বাঙ্গলায় পঁহুছিলাম। গঙ্গোত্রীর উদ্দেশে যাইবার সময়েও এই বাঙ্গলাতেই আমরা ছিলাম। এত শীঘ্রই আমাদিগকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া বাঙ্গলার চৌকীদার বড়ই বিস্মিত হইল; কিন্তু সে যখন শুনিল, আমি অসুস্থ—তাই ফিরিতে হইয়াছে, তখন সেই পর্ব্বতবাসী বড়ই কাতর হইল, এবং আমার পায়ের ফোড়া আরোগ্যের সহস্র রকম ঔষধের ব্যবস্থা করিল। ডুণ্ডার সে দোকানদার আমার পায়ে যে পুল্টিস বাঁধিয়া দিয়াছিল, এবং রাত্রে পুনরায়

লাগাইবার জন্য যে উপকরণ দিয়াছিল, তাহাতেই বিশেষ উপকার হইবে বলাতে, বাঙ্গলার চৌকীদার সেই পুল্টিস গরম করিবার জন্য তাড়াতাড়ি তাহার বাড়ীতে চলিয়া গেল। কিছু ক্ষণ পরেই সে তাহার দুইটি শিশুপুত্র ও একটি কিশোরী কন্যা সঙ্গে আমাদের নিকট উপস্থিত হইল; মেয়েটির হাতে গরম পুল্টিসের বাটী। চৌকীদার একখণ্ড নেকড়ায় করিয়া আমার পায়ে পুল্টিস বাঁধিয়া দিবার বন্দোবস্ত করিতেছে দেখিয়া, মেয়েটি "ঐসী নেহী" বলিয়া অসম্মতি জ্ঞাপন করিল; এবং সে যে এ বিষয়ে তাহার পিতা অপেক্ষা বেশী অভিজ্ঞ, তাহা দেখাইবার জন্য বাপের নিকট হইতে পুল্টিস কাড়িয়া লইল, এবং আমার ফোড়ার উপরে ধীরে ধীরে বসাইয়া দিতে লাগিল। চৌকীদার যে প্রকারে দিতেছিল, চিকিৎসাশাস্ত্রে সেই প্রকার বিধান থাকিলেও, মেয়েটির এ প্রকার স্নেহের বিধানের উপর কোন কথাই বলা ঘটিয়া উঠিল না। শুনিলাম, চৌকীদার তার মেয়ের শাসনে সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত থাকে; আজ আড়াই বৎসর হইল, তাহার সহধর্ম্মিণী এই "ছোটো লেড়কাঠো" দিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ছোট ছেলেটি যখন নয় দিনের, তখন তাহার মায়ের মৃত্যু হয়। সেই মৃত্যুদিন হইতেই বালিকা মায়ের পদে প্রোমোশন পাইয়াছে; সেই দিন হইতে সে তার মায়ের অপেক্ষাও অতি যত্নে ছোট ভাই দুটিকে লালনপালন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। হঠাৎ কোথা হইতে বালিকার ক্ষুদ্র প্রাণে ষোল আনা মাতৃকর্ত্তব্যের আবির্ভাব হইল, তাহা আমরা ক্ষুদ্র মানব কেমন করিয়া বলিব? কিন্তু চৌকীদার বলিল, তাহার সহধর্ম্মিণী বাঁচিয়া থাকিতেও তাহার গৃহস্থালী এমন গোছালো ছিল না। যেখানে যেটি যেমন ভাবে থাকিলে মানায়, এই বালিকা তাহা কেমন সুন্দর ভাবে করে; কখন কাহার কি দরকার হইবে, তাহা এই এতটুকু মেয়ের ঐ ক্ষুদ্র মাথার ভিতরে কেমন ঠিক আছে! আর সর্ব্বাপেক্ষা বিপদগ্রস্ত চৌকীদার বেচারী; তাহার পরলোকগতা সহধর্ম্মিণী তাহাকে সময়ে অসময়ে দুই একটা উপদেশ ও দুই একটা কটুকাটব্য বলিত; কিন্তু সে আজ এই বৃদ্ধবয়সে যে মায়ের হাতে পড়িয়াছে, সে যতক্ষণ জাগিয়া থাকিবে, ততক্ষণ তার এই ষষ্টিবৎসর-বয়স্ক ক্ষুদ্র শিশু পুত্রটিকে নানা প্রকার শাসনে রাখে! তার এই অপোগণ্ড ছেলেটির কি কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য, কোথায় যাওয়া উচিত কোথায় যাওয়া উচিত নয়, এই প্রকার সহস্র বিষয়ের পরামর্শ দেয়; শুধু পরামর্শ দিয়াই ক্ষান্ত থাকে না। তাহার সেই পরামর্শ-অনুসারে কার্য্য হইতেছে কি না,

তাহার অনুসন্ধান লয়। চৌকীদার বলিল, এই অল্প সময়ের মধ্যেই বালিকা স্থির করিয়া লইয়াছে যে, সমস্ত বিষয়ে সে তাহার বাপের অপেক্ষা বেশী বুঝে; আর তার বাপের বুঝিবার শক্তিও ভারি কম; তাই একটি কথা পাঁচ বার বলিয়াও তাহার বিশ্বাস হয় না। সে তখনও মনে করে, তার কথা বুঝি তাহার বাপ বোঝে নাই; তাই যখন তখন প্রশ্ন করে, "বাবাজী সমজ্মে গিয়া?" চৌকীদার যতক্ষণ "হাঁ মায়ী" বলিয়া কথাগুলির পুনরুক্তি না করিবে, ততক্ষণ নিস্তার নাই। মেয়ের এই সব অলৌকিক গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে চৌকীদার সত্যসত্যই আত্মহারা হইয়া গেল; তার হৃদয়ের মধ্যে কন্যাস্নেহের এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় অমৃতধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। হয় ত সেই সব কথা বলিতে বলিতে তার সেই জীবনের সহচরীর স্বর্গারোহণের কথাও তাহার মনে হইয়াছিল।

যখন চৌকীদার তার মেয়ের গুণকাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল, তখন মেয়েটি সেখান হইতে প্রস্থান করিল, এবং যেখানে আমাদের আহারের আয়োজন হইতেছে, সেই দিকে গেল; স্বামীজীও সেই দিকে চলিয়া গেলেন। আমি অতৃপ্তহৃদয়ে বালিকার স্নেহের ইতিহাস শুনিতে লাগিলাম। চৌকীদার আর কেন বিবাহ করিবে? এমন সোনার চাঁদ 'লেড়কা লেড়কী' যার ঘর আলো করিয়া বিরাজিত, সে আবার কি দুঃখে বিবাহ করিবে? আর বিবাহ করিলে যে তাহার লেড়কালেড়কী পর হইয়া যাইবে, তাহার কি? আমি তাহার এ কথায় একটা আপত্তি করিলাম;—বিমাতা হইলেই যে মন্দ লোক হয়, তাহা ঠিক নয়। আমার কথায় বাধা দিয়া চৌকীদার বলিল, "নেহি নেহি পণ্ডিতজী, হররোজ এইসী হোতা"; এই বলিয়া সে তাহার দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতার ইতিহাস বলিতে বসিল;—তার এক মাসতুতো ভাই আছে, সে যখন পাঁচটি সন্তানের বাপ, তখন তার স্ত্রী মারা গিয়াছিল; সকলেই বিবাহ করিতে নিষেধ করিল, কিন্তু সে তার শ্বশুরের কথা শুনিয়া তার শ্যালিকাকে বিবাহ করিয়াছে; হায় হায়! আপন বড় বোনের ছেলে, তবুও সপত্নীসন্তান বলিয়া সেই ছেলেমেয়েগুলিকে সে কত কষ্ট দেয়, তা আর বলিবার নয়। আর কোন এক গ্রামের এক জনের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী তার সপত্নীর একমাত্র শিশুকন্যাকে এরূপ যন্ত্রণা দিত যে, এক দিন সেই মেয়েটি সকলের সম্মুখে পাহাড়ের গা হইতে ঝাঁপ দিয়া নীচের 'খদে' পড়িয়া বিমাতার যন্ত্রণার হাত হইতে নিস্তার পাইয়াছে। এই রকম আরও দশটা

গল্প বলিল। বুঝিলাম, এই পর্ব্বতপ্রদেশেও সপত্নীসন্তানের প্রতি হিংসা বর্ত্তমান আছে। একটা ভাবনা মনে হইল; এত দেশ ভ্রমণ করিলাম, মনুষ্য-প্রকৃতি সকল স্থানেই এক প্রকার; সেই দেবাসুর সকল দেশে সকল গ্রামে সকল স্থানেই আছে। সেই কলহ বিবাদ, সেই হিংসা দ্বেষ, সেই ভাল মন্দ, স্থানেই সমভাবে বিরাজ করিতেছে; এমন একটা স্থানও আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় দেখিলাম না, যেখানে পূর্ণ শান্তি, পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ মঙ্গল বিরাজমান। এরূপ স্থান কি জগতে নাই?

মনের মধ্যে স্বর্গ নরক ত একটু একটু বুঝি; কিন্তু নিজের মনটুকু লইয়া যে সংসারে চলা যায় না, তার কি? প্রতিদিনই সহস্র মনের সঙ্গে ব্যবহার করিতে হইবে; সহস্র প্রকারের প্রকৃতির সঙ্গে আদান-প্রদান করিতে হইবে। তাহার মধ্যে সব দিক গোছাইয়া স্বর্গ ঠিক রাখাটা কবিকল্পনায় সহজেই হয়, কিন্তু প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে জীবনসংগ্রামে কতখানি সম্ভবে, তাহা জানি না। মনুষ্যপ্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া আমি ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। সে কথা এখন থাক।

চৌকীদারের সুখ দুঃখের কাহিনী শুনিতে শুনিতে রাত্রি অধিক হইয়া গেল। এ দিকে আমাদের আহার প্রস্তুত। যথাসময়ে আহারাদি করিয়া সেই রাজ-বাঙ্গলায় হয় ত এ জন্মের মত শেষ নিদ্রার আয়োজন করা গেল।

শুক্রবার—আজ শুক্রবার; আমরা আজ ধারাসু হইতে নূতন পথে মসূরী যাইব। নূতন বটে, কিন্তু পথ নহে; পর্ব্বতের মধ্যে সাধারণের সর্ব্বদা-গমনোপযোগী যে রাস্তা, তাহার ভীষণতা মনে করিলেই প্রাণ আকুল হইয়া উঠে; পাহাড়ীদিগকে কোন রাস্তার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা 'সি' অক্ষরটির উপর অনাবশ্যক দীর্ঘ টান দিয়া "সিধা সড়ক" বলিয়া যে রাস্তার গুণ ব্যাখ্যা করিয়াছে, সেই রাস্তার চড়াই উৎরাই ভাঙ্গিতেই আমাদের মত দুর্ব্বলপ্রাণ জীবের অস্থিপঞ্জর ভাঙ্গিয়া যায়। আর আজিকার এই যে নূতন পথে আমরা যাইব, তাহার সম্বন্ধে ডাণ্ডিওয়ালারাই এক ভীষণ বর্ণনা দাখিল করিল; এ সব পাকদাণ্ডী দিয়া সচরাচর লোকজন চলে না; নিতান্ত জরুরী কাজ না থাকিলে এবং শরীরে যথেষ্ট শক্তি না থাকিলে, এ পথে কেহ যাইতে চাহে না। কিন্তু আমাকে শীঘ্র মসূরী পৌঁছাইবার জন্য স্বামীজী সব প্রকার কষ্ট সহ্য করিতেই প্রস্তুত; পক্ষান্তরে পাঁচ দিনের কাজ যদি একটু বেশী কষ্ট স্বীকার করিলে দুই দিনেই হয়,

ডাণ্ডিওয়ালাগণেরও তাহাতে আপত্তি নাই। সুতরাং আমরা গঙ্গার তীরভূমি ত্যাগ করিয়া একবারে পর্ব্বতের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। নদীর তীর দিয়া ক্রমাগত যাওয়ার সুবিধা অসুবিধা দুইই আছে; সুবিধা এই যে, চড়াই উৎরাই থাকিলেও তাহা প্রায়ই খুব বড় হয় না; কারণ নদীর গায়ে গায়ে যাইতে হইবে; তবে রাস্তার সুবিধার জন্য কোন স্থানে চড়াই উঠিতে হয়, কোথাও বা নামিতে হয়, এবং কোন স্থানে একটু রাস্তা সংক্ষেপ করিবার জন্য এক আধটা পর্ব্বত পার হইতে হয়। সুবিধা এই। অসুবিধা এই যে, সেই পর্ব্বতদুহিতা আপন মনে কাহারও সুবিধা অসুবিধার দিকে দৃষ্টি না করিয়া, সময় যে অমূল্যধন, এ কথাটা মোটেই না পড়িয়া ও না বুঝিয়া, আপন খুসীতে একবার বামে একবার দক্ষিণে চলিতেছেন। তাঁহাকে যাইতে হইবে দক্ষিণ দিকে, হিমালয়নিঃসৃতা কাহারও দক্ষিণ ছাড়া গতি নাই, অন্ততঃ ভারতবর্ষের দিকে যাঁহাদের টান। কিন্তু এই পর্ব্বতনন্দিনীগণের দিক্‌নির্ণয়-শক্তি এমনই প্রবলা যে, তাঁহারা দক্ষিণ দিকে না গিয়া খাড়া পশ্চিম দিকেই তিন মাইল চলিলেন; তাহার পর হয় ত চৈতন্য হইল; তখন নানা কৌশলে এবং যেখানে কৌশল সফল হয় না, সেখানে বলপ্রকাশে পর্ব্বত-দেহ বিদীর্ণ করিয়া বিশ পঁচিশ হাত দক্ষিণ দিকে গেলেন। আবার দিক্ ভুল! আবার পশ্চিম কি পূর্ব্ব দিকে গতি। এমন নিষ্কর্ম্মা ভবঘুরে আপনা-ভোলা পর্ব্বত-নদীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলে রাস্তা যে সহজে ফুরাইতে চায় না, তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা যদি গঙ্গার ধারে ধারে ক্রমাগত চলিতাম, তাহা হইলে এই ধারাসু হইতে মসূরী আসিতে অনেক দিন লাগিত; বিশেষ মসূরীর সঙ্গে ত গঙ্গাদেবীর সাক্ষাতের কখনও কোন সুদূর সম্ভাবনাও নাই। একজন আপনার গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া হিমালয়ের এক পার্শ্বের শিখরদেশে বসিয়া আছেন, আর এক জন সেই হিমালয়ের পদ ধৌত করিয়া নিম্ন হইতে নিম্নতর প্রদেশে যাইতেছেন। এক জন উপরে উঠিতে-ছেন, এক জন নীচে নামিতেছেন; এক জন মস্তকে উঠিতেছেন, আর এক জন পদতলে লুটাইয়া পড়িতেছেন; এ দুই জনের সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব। তবে এ দুই জনের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কাহার গৌরব অধিক, সে বিচার এখন করিতে গেলে "শিবের গীত"ও সীমা অতিক্রম করিয়া বসে।

আমরা আজ গঙ্গাকে ফেলিয়া এড়োএড়ি পাকদাণ্ডি দিয়া মসূরী যাইবার সোজা পথে উঠিলাম। এ পথের কষ্টের কথা আর কি বলিব? তবুও আমি

আর এখন পদব্রজে চলিতেছি না; আমার চলিবার শক্তি নাই; আমি সেই দৃঢ়কায় পর্ব্বতবাসী দুইটি জীবের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া এই চড়াই উৎরাই পার হইতেছি। কিন্তু তাহাদের বারম্বার কাঁধ-বদল ও লোক-বদল দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেছিলাম যে, একে আমার মত প্রকাণ্ডদেহ মানুষকে বহন করাই সহজ কথা নহে, তাহার উপর এই রাস্তা। আমাদের বঙ্গদেশীয় ডাল-ভাত-ভোজী বাঙ্গালী বেহারা হইলে ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই তাহাদের বেহারা-জীবনের শেষ হইয়া যাইত। কিন্তু পাহাড়ী লোকের মত কষ্টসহিষ্ণু জাতি বোধ হয় ভারতবর্ষে অধিক নাই। তাহারা অনায়াসে তিন চারি মণ বোঝা লইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চড়াই উঠিয়া যায়। আমরা দেখিয়াছি, পনর ষোল বৎসরের একটি মেয়ে তিন মণ একটা কাপড়ের গাঁট লইয়া রাজপুর হইতে মসূরী যাইতেছিল। রাজপুর হইতে মসূরী সহর প্রায় সাত মাইল, আর তাহার আগাগোড়া চড়াই। আমার সঙ্গে যে বাহকেরা ছিল, তাহারা বলিল যে, আমি যদি তিহরীর পথে মসূরী আসিতাম, তাহা হইলে তাহাদের এত কষ্ট হইত না। কিন্তু তাহারা পাঁচ দিনের কাজ দুই দিনে শেষ করিবার জন্য ইচ্ছাক্রমেই এই ভয়ানক পথে আসিয়াছে। তাহাদের কষ্টের সঙ্গে তুলনায় আমার কষ্ট কম হইলেও, আমার বড়ই ক্লেশ হইতেছিল; এ প্রকার ডাণ্ডি চড়িয়া যাওয়া অপেক্ষা আমার পদব্রজে যাওয়ার শক্তি থাকিলে তাহাই শত গুণে ভাল ছিল। আমার এ ভক্তির মধ্যে Sentimentality মোটেই নাই। তাহা হইলে আর অনায়াসে পরের স্কন্ধে চড়িয়া তীর্থপর্য্যটনের শেষ করিতাম না। আমি বাহকগণের কষ্টে ব্যথিত হইয়াছিলাম কি না, সে কথা নাই বলিলাম; কিন্তু আমার যে কষ্ট হইতেছিল, তাহা অসহ্য। আমাদের দেশে একটা প্রবাদকথা আছে,—"সুখের চাইতে স্বস্তি ভাল!" আমারও সেই কথা মনে হইতে লাগিল; পরের স্কন্ধে চড়িয়া যাওয়া অপেক্ষা হাঁটিয়া যাওয়া আমার ভাল ছিল। পথ চলিয়া পায়ে বেদনা হওয়াটা এখন একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছি। পথ চলিতে চলিতে তখন এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে, বেদনাবোধ ছিল না; সুতরাং পথ চলিতে চড়াই বা উৎরাইয়ের কষ্ট আমার তেমন অনুভব হইত না। কিন্তু ডাণ্ডির বাঁশ ক্রমাগত আমার বুকে লাগিয়া এমন যন্ত্রণা দিতে লাগিল যে, আমার বোধ হইতেছিল, আমার বুকের অস্থিপঞ্জর বুঝি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যখন এক একবার ডাণ্ডি নামাইয়া বাহকগণ বিশ্রাম করে, আমি তখন অনন্যোপায় হইয়া দুই হাতে বুক চাপিয়া বসিয়া থাকি-

তাম। কিন্তু আর উপায় নাই। পথের মধ্যে থাকিবার স্থান নাই। বহু কষ্টে বহু পরিশ্রমে লালুড় গ্রামে আসিয়া একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আমি ত একেবারে শুইয়া পড়িলাম, এবং বুকের বেদনায় অস্থির হইয়া গেলাম। কিন্তু স্বামীজীকে কিছুই বলিলাম না। তিনি আমার পায়ের অবস্থা দেখিয়াই কাতর, এবং সেই জন্যই বৃদ্ধ এত কষ্ট স্বীকার করিয়া তাড়াতাড়ি আমাকে লইয়া মসূরী যাইতেছেন; তাহার পর যদি তাঁহাকে বলি, আমার বুকে অসহ্য বেদনা, তাহা হইলে হয় ত এই পর্ব্বতের মধ্যে বৃদ্ধ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবেন। আমার এই ভয় বড়ই অধিক হইয়াছিল, বিশেষ এখন তাড়াতাড়ি যাইতে হইলে আর ত কোন উপায় নাই; যেমন করিয়া হউক, এই দাণ্ডীতেই যাইতে হইবে।

লালুড় গ্রামের লোকেরা পরম যত্নে রাজঅতিথির সেবা করিল। এবার আমরা এক-আধ জন লোক নহি, আমরা দলে নয় জন লোক। ছয় জন ডাণ্ডিওয়ালা, আমরা দুই জন, আর এক জন সিপাহী। আমরা পরম পরিতোষের সহিত মধ্যাহ্নক্রিয়া শেষ করিয়া সেই তরুতলেই বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। আমার পায়ের অবস্থা অনেক ভাল।

অপরাহ্ণে প্রকাণ্ড তিন ক্রোশের চড়াই উঠিতে হইল। ইহার মধ্যে জল পাইবার যো নাই; এই জন্য এ স্থানটি আরও ভয়ানক। ভগবান যদি এই সব পাষাণ-হৃদয়ে জলের প্রস্রবণ না দিতেন, তাহা হইলে এই সব পর্ব্বত মানুষের গমনাগমনের অযোগ্য হইত। আমাদের সঙ্গে যে সামান্য জল ছিল, নয় জন মানুষ একবার পান করিতেই তাহা নিঃশেষ হইয়া গেল। আমরা সকলেই রাস্তা হইতে অনেকগুলি 'চিলু' ফল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম। এ ফলগুলি খুব বড় না হইলেও নিতান্ত ছোট নহে, এবং ইহাদের স্বাদ অম্লমধুর; সুতরাং এ সময়ে এই ফল আমাদের বড়ই উপকারে লাগিল। আমার যদিও বেশী তৃষ্ণা বোধ হয় নাই, কারণ আমি ত আর হাঁটিতেছি না, তথাপি বাহকেরা যখন এক এক স্থানে বসিয়া সেই ফল পরস্পরে বাঁটিয়া খাইতে লাগিল, তখন আমাকেও তাহাদের সমান ভাগ দিতে লাগিল। আমি দুই চারিটি খাইলাম, এবং দুই চারিটি তাহাদিগকে দিলাম। এই ফল খাইয়া সকলেই মুখে কথঞ্চিৎ রস আনিতে লাগিলেন। এই প্রকারে বহু কষ্টে প্রায় সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময়ে চড়াই উঠা শেষ হইল; তখনও জল নাই; আর পর্ব্বতের অতি উচ্চ শিখরের উপর জল কোথায় বা থাকিবে? আমরা

কি করি? সেই সন্ধ্যার সময়, যখন চারি দিকে সব নিস্তব্ধ হইয়া আসিতেছে, যখন পশ্চিম-গগনে সূর্য্য অস্ত গিয়াছেন,—কিন্তু এখনও তাঁহার গমনপথ সিন্দূররঞ্জিত রহিয়াছে, যখন পাখীরা চারি দিকে বাসায় যাইতেছে, সেই সময় আমরা সেই পর্ব্বতের মস্তকে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছি; সেখানে আর গ্রাম বা লোকালয় কোথায় থাকিবে? এখন তিন মাইল পথ নীচে নামিলে তবে গ্রাম পাওয়া যাইবে। গ্রামের জন্য আমরা তত ব্যস্ত হই নাই। এক রাত্রি বৃক্ষতলে কাটাইতে আর আমাদের কষ্ট নাই; এমন অনেক বিনিদ্র রজনী অনাবৃত নীলাম্বর-তলে প্রস্তরশয্যায় কাটিয়া গিয়াছে। সে জন্য ভাবনা হয় নাই; এক রাত্রি অনাহারে থাকিলেও মারা যাইব না; এমন অনাহার এ দীর্ঘ প্রবাসে অনেক দিন সহিতে হইয়াছে; অতি অল্প দিনই দুই বেলা আহার জুটিয়াছে। সে জন্য ব্যাকুল হই নাই। আমরা তখন তৃষ্ণায় কাতর; ফলগুলি ইতিপূর্ব্বেই ফুরাইয়া গিয়াছে; এখন আর তৃষ্ণানিবারণের কোনও উপায় নাই। সিপাহী প্রস্তাব করিল, আজ রাত্রে এইখানে গাছের তলায় সকলে পড়িয়া থাকি, এবং দাণ্ডিওয়ালারা কয়েক জন নীচে যাইয়া আমাদের জন্য জল অনুসন্ধান করিয়া লইয়া আসুক। সিপাহী কখনও সে পথে মসূরী যায় নাই, সে কোন সংবাদই রাখে না। ডাণ্ডিওয়ালাদের মধ্যে দুই জন সে পথ জানে। তাহারা বলিল, এখান হইতে দেড় মাইল নীচে একটা ঝরণা আছে, এক মাস পূর্ব্বে তাহারা সেই পথে যাইবার সময়ে দেখিয়া গিয়াছে; এত দিনে যদি সেই ঝরণা শুকাইয়া গিয়া না থাকে, তাহা হইলে কষ্টে-সৃষ্টে এই দেড় মাইল পথ গেলে জল মিলিতে পারে। স্বামীজীর সেই মত হইল। তখন অন্ধকার হইয়াছে। আমরা বিশেষ সাবধানে নামিতে লাগিলাম; বোধ হয় দুই মাইল পথ নামিয়া আমরা একটা অতি ক্ষুদ্র ঝরণা পাইলাম; তাহার জল অতি শীতল। আমরা প্রাণ ভরিয়া সেই জল পান করিলাম, এবং সে রাত্রি ঐ ঝরণার পার্শ্বেই অতিবাহিত করিবার সঙ্কল্প করিলাম। সকলের তাহাতে মত হইল না। আর এক মাইল নীচে নামিলেই যখন লোকালয় পাওয়া যাইবে, তখন অকারণ এই হিংস্রজন্তুপূর্ণ স্থানে বাস করিবার প্রয়োজন কি? স্বামীজী না হয় সন্ন্যাসী, আমিও না হয় বাড়ী ঘর ছাড়িয়া পথে পথে বেড়াইতেছি; ডাণ্ডিওয়ালারা ত আর সন্ন্যাস করিতে বাহির হয় নাই; তাহারা আমাকে মসূরী পৌঁছাইয়া দিয়া টাকা পাইবে, সেই টাকায় তাহাদের সংসার চলিবে; তাহাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার

তাহাদের প্রত্যাগমনপথের দিকে চাহিয়া দিন গণিবে; তাহাদের অভাবে তাহাদের পর্ব্বতকুটীর অন্ধকার হইবে। তাহারা অকারণ এই জঙ্গলের মধ্যে পড়িয়া থাকিতে স্বীকার করিবে কেন? অবশেষে সেই অন্ধকারে আরও এক মাইল নীচে নামিয়া 'মারোয়াড়া' গ্রামে পৌছিলাম। তখন গ্রামের লোকের অর্দ্ধরজনী। রাত্রি প্রায় আটটা বাজিয়া গিয়াছে, এত রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিবার কোন দরকার তাহাদের হয় না; বিশেষ কোন ব্যাপার উপস্থিত না হইলে সন্ধ্যার সময়ে পর্ব্বতক্রোড়স্থ গ্রাম সকল নিদ্রার ক্রোড়ে সুষুপ্ত হইয়া পড়ে।

আমরা নয় জন লোক হঠাৎ সেই রাত্রে সেই সুপ্ত গ্রামের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া একটা বিষম কোলাহল জাগাইয়া তুলিলাম। প্রথমে যে গৃহস্থের দ্বার আমরা আক্রমণ করিলাম, সে ত কিছুতেই কথা কহে না; অনেক ডাকাডাকিতে এক জন স্ত্রীলোক সাড়া দিল, এবং জানাইয়া দিল যে, তাহারা গরিব মানুষ; তাহাদের গৃহে অতিথির স্থান হইবার সম্ভাবনা নাই; গ্রামের লম্বরদার বড়মানুষ, তাহার বাড়ীতে গেলে আমরা স্থান পাইব। কিন্তু সে লম্বরদার (তহসিলদার) কোন গৃহের মালিক, সে প্রশ্নের আর কোনও উত্তর পাওয়া গেল না। আমরা তখন সকলে মিলিয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করা সুবিধাজনক নহে স্থির করিয়া, সেই কুটীরপ্রাঙ্গণে বসিয়া পড়িলাম। সিপাহী ও ঐ প্রদেশের পথ ঘাট সম্বন্ধে জানা শুনা আছে, এমন দুই জন ডাণ্ডিওয়ালা লম্বরদারের গৃহ-উদ্দেশে যাত্রা করিল। তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায় অবলম্বন করিল; সম্মুখে যাহার গৃহ দেখে, চেঁচাইয়া তাহাকেই জাগায়, এবং সে যখন লম্বরদারের গৃহ "আউর আগাড়ি" বলিয়া অর্গলবদ্ধ গৃহের মধ্যেই পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া দ্বিতীয়বার নিদ্রার আয়োজন করে, তখন সিপাহী তাহারই নিকটবর্ত্তী আর এক গৃহস্থকে ডাকিয়া উঠায়। এমনি করিয়া সেই ক্ষুদ্র গ্রামের সমস্ত অধিবাসীকে জাগরিত করিয়া অবশেষে গ্রামের অপর প্রান্তের একখানি অনতিবৃহৎ গৃহ হইতে লম্বরদার মহাশয়কে টানিয়া বাহির করিল। রাজার পেয়াদা, রাজার পরওয়ানা আছে, সে এক জন সামান্য লম্বরদার কি করে; ভয়ে ভয়ে আমাদের কাছে আসিল; কিন্তু সে সময়ে বোধ হয় সে মনে মনে এমন অতিথিগণকে যমের গৃহের সোজা রাস্তা দেখাইতেছিল। লম্বরদার আসিয়াই এত রাত্রে "রসদ মিল্‌না ত বহুত মুস্কিলকা বাত" বলিয়া গৌরচন্দ্রিকা আরম্ভ করিল। স্বামীজী তাহাকে বলি-

লেন, আমাদের জন্য কিছুরই দরকার নাই, তবে এই ডাণ্ডিওয়ালা ছয় জন রাত্রে কিছু আহার করিতে না পারিলে প্রাতে কেমন করিয়া পথ চলিবে? আর গ্রামে যদি কোন দোকান থাকে, তাহা হইলে আমরা পয়সা দিয়া আটা আদি কিনিতে সম্মত আছি। স্বামীজীর কথা শুনিয়া লম্বরদার চলিয়া গেল, এবং কিছুক্ষণ পরে আসিয়া আমাদিগকে ডাকিয়া লইয়া গেল। আমরা গিয়া দেখি, একখানি ঘরের মধ্যে আমাদের দুই জনের জন্য দুইখানি চারপায়ী দিয়াছে; এবং তিন চারি জন গ্রামবাসী আমাদের আহারের আয়োজন করিতেছে। স্বামীজী একখানি চারপাইয়ের উপর আসন করিয়া বসিলেন; এবং গ্রামবাসিগণকে বলিলেন যে, ডাণ্ডিওয়ালারাই সকলের আহার প্রস্তুত করিবে, তাহাদের আর কোন কষ্ট করিতে হইবে না। গ্রামবাসিগণ তখন ধীরে ধীরে আসিয়া স্বামীজীর সম্মুখে বসিল; তাহারা চার পাঁচটি মানুষ—বোধ হয় তাহারাই গ্রামের মধ্যে ভাল মানুষ, কারণ এত রাত্রে যখন তাহারা আমাদের জন্য কষ্ট করিয়া সমস্ত সংগ্রহ করিয়া দিল, তখন তাহাদের মনে একটু ধর্ম্মভাব আছে!—স্বামীজী যথারীতি তাহাদের সঙ্গে ধর্ম্মকথা জুড়িয়া দিলেন; আর আমি বুকের বেদনায় কাতর হইয়া দ্বিতীয় চারপাইয়ের উপর শুইয়া পড়িলাম, এবং ধীরে ধীরে নিদ্রার কোমলক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিলাম। অনেক রাত্রে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইলে নিদ্রার ঘোরেই কি খাইয়া আবার শুইয়া পড়িলাম। কোন দিক দিয়া রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল।

শনিবার—প্রাতে গ্রাম-ত্যাগ। আজ ক্রমাগত উৎরাই। ছয় মাইল নামিয়া আসিয়া একটি স্থানে উপস্থিত; তাহার দুই পার্শ্বে অতি উচ্চ পর্ব্বত; মধ্যে অতি সঙ্কীর্ণ স্থান, সেই স্থান দিয়া একটা ঝরণা প্রবলবেগে বহিয়া যাইতেছে। আর সেই ঝরণার এমন আঁকা বাঁকা চলন যে, তাহার মধ্যে ডাণ্ডি ঘোরা দূরে থাকুক, দুই এক স্থানে মানুষেরই ঘোরা ফেরা শক্ত। আমাদিগকে সেই ঝরণার উজান বাহিয়া কতক দূর যাইতে হইবে; কারণ ঝরণার যে পারে আমরা দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহার অপর পার একেবারে সমানে দাঁড়াইয়া আছে; তাহার গায়ে একগাছি তৃণও নাই। বিরাট পর্ব্বত নিজের পাষাণ-দেহের অস্থিকঙ্কাল বাহির করিয়া নগ্নদেহে দাঁড়াইয়া আছে। আমাদিগকে সেই ঝরণা উজান বাহিয়া যাইতে হইবে, তাহা হইলে অপর পারে একটা সমতলভূমিতে উপস্থিত হইতে পারিব। ডাণ্ডিওয়ালাদের এক জন ডাণ্ডি স্কন্ধে লইয়া প্রথমে গেল, এবং দুই চারি পা গিয়াই অদৃশ্য হইল, কারণ

সেই ঝরণার গতি এমনি বাঁকা যে, দশ পা গেলেই আর মানুষ দেখা যায় না। সিপাহীর হাত ধরিয়া স্বামীজী রওনা হইলেন; আমাকে ফেলিয়া যাইবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ডাণ্ডিওয়ালারা যখন তাঁহাকে অভয় প্রদান করিল, তখন তিনি অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত মনে চলিয়া গেলেন। আমাকে লইয়া যাইবার জন্য তিন জন লোক রহিল। এতদিন অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়া অনেক যানে আরোহণ করিয়াছি, কিন্তু আজ যানের চরম! পর্ব্বতবাসিগণ স্কন্ধ অপেক্ষা পৃষ্ঠে বেশী বোঝা বহিতে পারে। আমাদের দেশের কুলীরা স্কন্ধে অথবা মস্তকে মোট বহন করে; পর্ব্বতবাসিগণ তাহা পারে না, তাহারা পৃষ্ঠে করিয়া লইয়া যায়।

ডাণ্ডিওয়ালারা আমাকে তাহাদের একজনের পিঠে চড়িয়া গলা জড়াইয়া ধরিতে বলিল; কিন্তু আমি তাহা বড় সুবিধার কথা মনে করিলাম না। হঠাৎ যদি আমার হাত খুলিয়া যায়, তবেই একেবারে প্রাণ হারাইব। সে ভাবে যাইতে অস্বীকৃত দেখিয়া তাহারা আমাকে কম্বলে জড়াইয়া এক জন তাহার পিঠের সঙ্গে বাঁধিল, এবং অবলীলাক্রমে সেই জলরাশি ভেদ করিয়া যাইতে লাগিল; আর দুই জন তাহার পশ্চাতে থাকিল, এবং তাহারা অতি সতর্কভাবে আমার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। বুঝিলাম, তাহাদের মতলব এই যে, যদিই কোন রকমে আমি কম্বল ছিঁড়িয়া পড়িয়া যাইবার মত হই, তাহা হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ আমাকে ধরিয়া ফেলিবে। পথও নিতান্ত কম নহে; আধ মাইলের উপর হইবে। ঝরণার স্রোতও অতিশয় প্রবল; সেই স্রোতের প্রতিকূলে যাইতে হইতেছে। প্রতিপদক্ষেপেই পতনের সম্ভাবনা, কিন্তু সবলকায় ডাণ্ডিওয়ালা অতিসাবধানে পা ফেলিয়া আমাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিল। আজ আমার পায়ের অবস্থা অনেক ভাল। এমন কি, পা পাতিয়া আমি দুই চারি পা চলিলেও চলিতে পারি।

আমরা ঝরণা পার হইয়া একটা পরিত্যক্ত দোকান-ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। গ্রাম সেখান হইতে এক মাইল উপরে, আমাদিগকে আজ আর উপরে উঠিতে হইবে না। সুতরাং আমরা সেই দোকানেই বসিলাম; সিপাহী ও ডাণ্ডিওয়ালারা গ্রামে গিয়া আহার-দ্রব্য লইয়া আসিল। শুনিলাম, সে গ্রামের নাম "আল্মন।" আজ অপরাহ্ণে আমরা আর বাহির হইতে পারিলাম না। কারণ, দুই জন ডাণ্ডিওয়ালা অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছে,

তাহাদিগকে এ অবস্থায় ফেলিয়া যাওয়াও অকর্ত্তব্য মনে করিয়া আমরা সে রাত্রি সেখানেই বাস করিলাম।

রবিবার—আজ আমরা মসূরী পঁহুছিব। এই 'আন্‌মস' হইতে মসূরী বার মাইল রাস্তা; অবশ্য চলিই উঠিতে হইবে। অসুস্থ ডাণ্ডিওয়ালা দুই জন ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। অনুমান পাঁচ মাইল রাস্তা আসিয়া একটা মেষ-পালকের আড্ডায় আশ্রয় লইলাম। সে আমাদের জন্য খাদ্য-দ্রব্য কিছুই সংগ্রহ করিতে পারিল না, অনাহারেই মধ্যাহ্ন কাটিয়া গেল।

বেলা প্রায় তিনটার সময়ে আমরা আবার বাহির হইলাম। মাইল দুই আসিয়া অতি সুন্দর রাস্তায় পড়িলাম। আর কিছু দূর আসিয়াই আমরা ল্যাণ্ডর সহর দেখিতে পাইলাম। তখন স্বামীজী, সিপাহী ও দুই জন ডাণ্ডি-ওয়ালা মসূরীর দিকে চলিয়া গেলেন। আমি দিবাভাগে এমন সুন্দর যানে আরোহণ করিয়া সহরের মধ্যে যাইতে অস্বীকার করিলাম। কাজেই আমরা সহরের বাহিরে সন্ধ্যার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বেলা তখন প্রায় তিনটা। মসূরীতে গ্রীষ্মকালে দেরাদুনের The Great Trignometrical Survey আফিসের একটা শাখা উঠিয়া আসে। বড় বড় সাহেবেরা এবং conpator মহাশয়েরা গ্রীষ্মের কয় মাস মসূরীতে বাস করেন। সর্ভে আফিসের বাঙ্গালী বাবুরা আমার পরমাত্মীয়। স্বামীজী তাঁহাদের বাসায় পৌঁছিয়া সংবাদ দিলেই দুই তিন জন আমার সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং সন্ধ্যার অনেক পূর্ব্বেই তাঁহারা আসিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া আমার এমন আনন্দ হইল যে, আমার পায়ের যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলাম। সেই সময়ে সেখান দিয়া একটা ঘোড়া যাইতেছিল, তাঁহারা সেই ঘোড়া ভাড়া করিলেন, এবং আমি তাঁহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া ধীরে ধীরে সহরে প্রবেশ করিলাম; বন্ধুদ্বয় আমার সঙ্গে গল্প করিতে করিতে পদব্রজে চলিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময়ে আমরা বাসায় পৌঁছিলাম। সেই রাত্রেই বন্ধুগণ ডাণ্ডিওয়ালাদিগকে বিদায় দিলেন, এবং সিপাহীকেও যথেষ্ট পুরস্কার দিয়া ও তিহরীর বন্ধুগণকে ধন্যবাদপত্র লিখিয়া বিদায় করিলেন। আমার গঙ্গোত্রী-ভ্রমণ-বৃত্তান্তও সমাপ্ত হইল। পাঠকমহাশয়-গণ একবার সমস্বরে বলুন,—"আঃ বাঁচা গেল!"

শ্রীজলধর সেন।

আলফন্স ডোডে।

সাধারণ পাঠকসমাজে উপন্যাসের যত আদর, অন্য কোনও প্রকার পুস্তকের তত আদর নাই। কোন কোন সমালোচকের মতে উপন্যাস-বিভাগে ফরাসী সাহিত্যের যেরূপ উৎকর্ষ হইয়াছে, অন্য কোন সাহিত্যের সেরূপ উৎকর্ষ হয় নাই। আবার কোন কোন সমালোচক ইহাও বলিয়া থাকেন যে, ফরাসী সাহিত্যে অশ্লীল উপন্যাসের সংখ্যা অন্য সকল সাহিত্য অপেক্ষা অধিক। এ কথা যে একেবারে অসত্য, এমন কথা বলিতে পারা যায় না; কিন্তু ফরাসী উপন্যাসের একজন সমালোচক এ কথার যে উত্তর দিয়াছেন, তাহাও নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তিনি বলেন,—ফরাসী উপন্যাস অপ্রাপ্তবয়স্ক পাঠকের জন্য লিখিত হয় না। ইংলণ্ডে বালক বালিকারাও অবাধে সংবাদপত্র ও উপন্যাস সকল পাঠ করিতে পাইয়া থাকে; ফ্রান্সে জনক বা জননী আপনি পাঠ না করিয়া কোনও পুস্তক দুহিতাকে পাঠ করিতে দেন না। জগতে পাপের অভাব নাই সত্য; কিন্তু পাপের পূতিগন্ধ বাদ দিয়াও পাপের চিত্র চিত্রিত করা যাইতে পারে। ভিক্টর হুগোও বাস্তবাদর্শ-প্রিয়, জোলাও বাস্তবাদর্শ-প্রিয়, তথাপি উভয়ের রচনায় কত প্রভেদ! কোন সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ আবিল জলাশির বর্ণনার সময় হুগো সেই জলবক্ষে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যকরোজ্জল নীলাম্বরের চিত্রও অঙ্কিত করিতেন; জোলা সেই চিত্রটি পরিহার করেন, অধিকন্তু তাঁহার বর্ণনায় সেই আবদ্ধ জলের অপ্রীতিকর দুর্গন্ধ অনুভূত হয়। ডোডের বাস্তবাদর্শমূলক উপন্যাস "স্যাফো"র উৎসর্গ এইরূপ,—"To my sons when they are twelty"; ইহা হইতেই পাঠক সমালোচকের পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তির অর্থ বুঝিবেন—ফরাসী উপন্যাস অপ্রাপ্তবয়স্ক পাঠকের জন্য লিখিত হয় না।

বিগত বিংশতি বৎসরকাল যে সকল ঔপন্যাসিকের পুস্তক সকল ফরাসী উপন্যাসের পূর্ব্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে গীদে মোপাসাঁ, পিয়ের লোটি, এড্‌মণ্ড ডি গন্‌কুর, আলফন্স ডোডে, জর্জ্জেস অনেট, পল-বুর্জ্জ্যা ও এমিল্ জোলার নাম সাধারণের নিকট বিশেষ পরিচিত। ইহাঁদের অন্যতম ডোডের সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে।

দরিদ্র পরিবারে ডোডের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা সামান্য ব্যবসায়ে ব্যাপৃতছিলেন। তাঁহার আয় বড় অধিক ছিল না, কিন্তু পরিবারে সন্তানের সংখ্যা ছিল

সপ্তদশ। অল্প আয়ে এই বৃহৎ পরিবারের প্রতিপালন একেবারে অসম্ভব না হইলেও দুঃসাধ্য; কাজেই পরিবারে দুঃখ দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর দংশন সর্ব্বদাই সহ্য করিতে হইত। শৈশব হইতে ডোডে নিত্য দেখিতেন, রুটিওয়ালা আর ধারে রুটি দিতে চাহে না; ভৃত্য বেতন না পাইয়া আর প্রভুকে সম্মান করে না; উত্তমর্ণগণ ক্রমেই অধীর হইয়া উঠিতেছে। নানা দুঃখে সজলনয়না জননী ও নানা জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত সদাক্রুদ্ধ পিতার স্মৃতি ডোডের শৈশব-স্মৃতির সহিত বিজড়িত হইয়া গিয়াছিল। ডোডের প্রথম জীবনের ইতিহাস পাঠ করিতে করিতে অনেক সময় অশ্রু সম্বরণ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। তিনি তাঁহার নানা পুস্তকে আপনার জীবনের নানা অবস্থার বর্ণনা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন—সে সকল বর্ণনা তাঁহার আপনার অভিজ্ঞতার ফল বলিয়াই হৃদয়স্পর্শী ও হৃদয়বিদারক।

এইরূপ দরিদ্র পরিবারে নানা কষ্ট সহ্য করিয়া বিদ্যাশিক্ষার পর ডোডে কোনও বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এখানে তাঁহার যন্ত্রণার সীমা ছিল না। ডোডে আপনি বলিয়াছেন, তাঁহার সেই যন্ত্রণার সহিত তুলনায়, প্যারিসের দরিদ্রদুঃখও তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। সেই সময় আত্মহত্যা করিয়া সকল যন্ত্রণা শেষ করিবার কথাও তাঁহার মনে হইয়াছিল! ক্ষীণদৃষ্টি শিক্ষকের উপর ছাত্রগণ নানাপ্রকার অত্যাচার করিত—আবার ডোডে বড় অল্পে ব্যথিত হইতেন। একটি ছাত্রকে ডোডে বড় ভালবাসিতেন; সে অবকাশের সময় তাঁহাকে নিজ গৃহে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল। ডোডে বড় আশায় সেই অভিলষিত দিনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ডোডের শিক্ষাদান-কৌশলে বালক সেবার বিদ্যালয়ে পুরস্কার পাইয়াছিল। পুরস্কারবিতরণের দিন তাহার পিতা মাতা বিদ্যালয়ে আসিয়াছিলেন; বিদ্যালয়ের কার্য্য শেষ হইলে বালক ডোডেকে পিতা মাতার নিকট লইয়া গিয়া বলিল, "ইনিই ডোডে, ইনি সাহায্য না করিলে আমি পুরস্কার পাইতাম না।" তাহার পিতা মাতা একবার ডোডের দিকে চাহিলেন, তাহার পর সন্তানকে লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী চলিয়া গেল—হতাশহৃদয়ে ডোডে ফিরিয়া আসিলেন।

এক বৎসর এই যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ডোডে আর পারিলেন না; সাহিত্য-সেবা করিবার সঙ্কল্প করিয়া তিনি ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমকালে প্যারিসে আসিলেন। ভ্রাতা আর্ণেষ্ট পূর্ব্ব হইতেই প্যারিসে থাকিতেন। দুই দিন ধরিয়া বহুজনাকীর্ণ তৃতীয় শ্রেণীর কক্ষে বহুকষ্টে আসিয়া ডোডে প্যারিসে উপনীত হই-

লেন; পরিধানে গ্রীষ্মকালোপযোগী বসন, তাহাতে শীতনিবারণ হয় না। পথে তাঁহার মূর্চ্ছার উপক্রম হইয়াছিল, সহযাত্রী নাবিকগণ দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে একটু পানীয় প্রদান করিয়াছিল—সে পানীয় ক্ষুধাতৃষ্ণাকুল ডোডের কি মিষ্টই লাগিয়াছিল! চল্লিশ "সু" অর্থাৎ প্রায় এক টাকা মাত্র সম্বল লইয়া ডোডে প্যারিসে উপনীত হইলেন।

ভ্রাতা আর্ণেষ্ট ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় পথে একটা হোটেলে উপস্থিত হইলেন—তখনও হোটেলের দ্বার রুদ্ধ। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর দ্বার মুক্ত হইলে উভয়ে অল্পব্যয়ে মূল্যোপযোগী সামান্য আহারীয় আহার করিয়া গৃহে উপস্থিত হইলেন।

প্যারিসে আসিয়া ডোডের নূতন প্রকার যন্ত্রণার আরম্ভ হইল—ইহাও দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম। পুস্তক রচনা করিয়া ডোডে প্রকাশকদিগের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই এই নবীন লেখকের রচনা প্রকাশ করিতে সম্মত হইল না। প্রতিদিন কত আশায় বহুশ্রমের ফল পুস্তকখানি লইয়া নবীন লেখক প্রকাশকদিগের দ্বারস্থ হইতেন, আর প্রতিদিন হতাশ হইয়া দারিদ্র্য-দুঃখপূর্ণ গৃহে ফিরিয়া আসিতেন। ডোডের জীবনে সেই একদিন—আর যখন তাঁহার একখানা পুস্তকের প্রকাশক হইবার জন্য লালায়িত হইয়া নানা দেশ হইতে নানা প্রকাশক তাঁহার দ্বারস্থ হইত, সেই একদিন! বড় কষ্টে নবীন লেখকের দিন কাটিতে লাগিল।

ডোডের এই সময়ের একটা বড় যাতনাকর ঘটনা পাঠকের প্রচুর আনন্দদায়ক হইবে। নিমন্ত্রণে যাইতে হইলে প্রথমে তদুপযোগী বেশ আবশ্যক, তাহার পর নিমন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক। বহুকষ্টে ডোডে একটা ভাল কোট সংগ্রহ করিলেন, একটা সমিতিতে নিমন্ত্রিতও হইলেন। নিমন্ত্রণস্থলে উপস্থিত হইলে তাঁহার দীর্ঘকেশ ও দীপ্ত কৃষ্ণতার নয়ন দেখিয়া মহিলাদিগের অধরপ্রান্তে মৃদুহাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। কোনও কারণে একজন তাঁহাকে কোনও রাজপুত্র বলিয়া মনে করিলেন—বোধ করি, সে দিন রাজপুত্রেরও সেই নিমন্ত্রণ-সভায় আসিবার কথা ছিল। একবার নৃত্যের পর নৃত্যকারিগণ আহারাগারে প্রবেশ করিলেন। লজ্জাশীল ডোডে সাহস করিয়া সে কক্ষে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। আবার নৃত্য আরম্ভ হইল, সকলে আহারাগার হইতে আসিলেন। এইবার ডোডে সাহস করিয়া সে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ক্ষীণদৃষ্টি ডোডে চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন—কক্ষে আর কেহ নাই।

টেবিলে বহু কাচপাত্রে উজ্জ্বল আলোক শত-হীরকদীপ্তি জ্বালাইয়া তুলিতেছে; ডোডে ধীরে ধীরে হস্ত প্রসারিত করিয়া একটা পানীয়পূর্ণ ডিক্যাণ্টার লইলেন, ভাবিলেন, একটা উৎকৃষ্ট পানীয় লইয়াছেন। তিনি একটু একটু করিয়া গ্লাসে পানীয় ঢালিয়া লইলেন; ধীরে ধীরে গ্লাস মুখে তুলিলেন।—একি—এ যে কেবল জল! তিনি কেবল জল ঢালিয়া ভাবিয়াছেন, মদ্য ঢালিয়াছেন। ডোডের মুখ বিকৃত হইল; সেই সময় কক্ষের একপ্রান্ত হইতে কলহাস্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। ডোডে দেখিতে পান নাই, কক্ষের এক প্রান্তে এক-জন পুরুষ ও একটি রমণী ছিলেন; তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহারা হাস্য-সম্বরণ করিতে পারেন নাই। কম্পিত-করে তিনি গ্লাস নামাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেন, জামার আস্তিনে বাধিয়া একটি,—দুইটি,—তিনটি গ্লাস পড়িয়া গেল; তিনি ঘুরিতে গেলে কোটের পুচ্ছদেশে বাধিয়া বহু কাচপাত্র পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। শব্দ শুনিয়া গৃহকর্ত্রী সেই কক্ষে আসিলেন; সৌভাগ্যবশতঃ তিনিও ক্ষীণদৃষ্টি। ডোডে সে কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া গৃহে ফিরিবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহার এক পরিচিত ডাক্তার "রাজপুত্রকে" আপনার গাড়ীতে লইয়া যাইতে চাহিলেন; তাঁহার গৃহ ডোডের আবাস-গৃহের সম্মুখে। কিন্তু ডোডের ওভার-কোট ছিল না, কাজেই ডোডে ডাক্তারের অনুরোধে স্বীকৃত হইতে পারিলেন না—তিনি একাকী গৃহাভিমুখগামী হইলেন। দ্বারে ভৃত্য বলিল, "কোট লইলেন না?" ডোডে কোনও উত্তর দিলেন না; গৃহের বাহিরে আসিলেন। তখন তুষারপাত আরম্ভ হইয়াছে; সেই তুষারাবৃত পথে কম্পিতকলেবরে ডোডে চলিতে লাগিলেন। তিনি শীতে কম্পমান, ক্ষুধায় কাতর। পথে একটা আহারাগারে কদর্য্য আহারীয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া ডোডে গৃহে ফিরিলেন। তিনি যখন গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন, তখন ডাক্তারের গাড়ী আসিয়া তাঁহার গৃহদ্বারে স্থির হইল। বিষণ্ণমনে ডোডে গৃহে প্রবেশ করিলেন।

তখন ডোডে বহুকষ্টে এক জন প্রকাশক যোগাড় করিয়া কতকগুলি কবিতা প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তকখানি দেখিতে নয়নবিনোদন—সেই ডোডের প্রতিভার প্রথম সন্তান। এই সময় আপনার পূর্ব্বকর্ম্ম হারাইয়া ভ্রাতা আর্নেষ্ট প্যারিস ত্যাগ করিলেন। এত দিন ডোডের বন্ধুর জীবন-পথে সুখে দুঃখে এক জন সঙ্গী ছিলেন, এখন তিনি একাকী। সেই সময়ের কথায় ডোডে বলিয়াছেন যে, তখন এক এক দিন অনাহারে গিয়াছে; এক এক দিন পাদুকা-অভাবে শয্যায় দিন কাটাইতে হইয়াছে; আবার যদি বা পাদুকা

কিনিয়াছেন, তথাপি তাহার কদর্য্য শব্দে লোকের কাছে যাইতে লজ্জা করিত। কিন্তু অর্থাভাবে জামা কাটাইতে না পারিয়া যখন তাঁহাকে মলিন জামা পরিধান করিতে হইত, তখনই তাঁহার বড় কষ্ট হইত। অনেক দিন উপযুক্তবেশবিরহে ডোডে মহিলাদিগের নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাঁহার অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ভ্রাতা আর্নেষ্ট প্যারিস ত্যাগ করেন;—তখন হইতে তিন বৎসর কাল ডোডের এমনই কষ্টে কাটিয়াছিল।

এই সময় একটা ঘটনা ঘটিল। ডোডের একটি কবিতা পাঠ করিয়া সম্রাট-পত্নী প্রীত হইলেন। তাঁহার ইচ্ছায় ডোডের একটা কার্য্য জুটিল; নিরাশার অন্ধকারে ডোডে আশার আলোক দেখিতে পাইলেন। ইহার পর তাঁহার যশ, অর্থ, বন্ধু, কিছুরই অভাব ছিল না; কিন্তু কিছুতেই অসাধারণ প্রতিভার অধীশ্বর ডোডের হৃদয়ের মাধুর্য্য বিনষ্ট হয় নাই।

কেহ কেহ ডোডেকে ফরাসী ডিকেন্স বলিয়াছেন। উভয়েই প্রকৃতি-প্রিয়, উভয়েই সমাজের নিম্নস্তরচিত্রণে সুনিপুণ। কিন্তু উভয়ের রচনায় যথেষ্ট প্রভেদও পরিলক্ষিত হইবে। ডিকেন্সের উজ্জ্বল প্রশান্ত হাস্য ডোডের রচনায় অল্প স্থানেই দেখা যায়। আবার ডিকেন্স যেখানে হাস্যরস ঢালিয়াছেন, সেখানে কেবল হাস্যরসই প্রবল; যেখানে হাস্য ত্যাগ করিয়া করুণরস ঢালিয়াছেন, সেখানে নিরবচ্ছিন্ন করুণারই প্রবাহ। ডোডে এতদুভয় যেমন করিয়া মিশ্রিত করিতে পারিতেন, ডিকেন্স তেমন পারিতেন না। হাস্যরস-প্লাবিত রচনায় ডোডে কিরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন, যাঁহারা তাহা জানিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে "টার্টারিনে"র কীর্ত্তিকাহিনী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সে কাহিনী পাঠ করিতে করিতে অতি গম্ভীর দার্শনিকের অধরেও হাস্য ফুটিয়া উঠিবে। আবার করুণরসপ্লাবিতকাহিনীকথনে ডোডে কিরূপ পারগ ছিলেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ তাঁহার "জ্যাক" নামক উপন্যাসের উল্লেখ করা যাইতে পারে। নায়ক জ্যাক বড় অল্পে ব্যথিত হয়—এইরূপ প্রকৃতির লোকেরা কঠোর জগতে বড়ই যাতনা পাইয়া থাকে।—তাহার জননী "Is a butterfly creature, whose wings were early singed in the irregular flames of trivial intrigues, and she is constitutionally incapable of standing alone." জ্যাক পিতার নাম জানিত না; সে হৃদয়ের পূর্ণ আবেগে জননীকে ভালবাসিত। সে তাহার জননীর খেলিবার পুতুল ছিল; শিশু জ্যাক জননীর কাছে অনেক সময় আদর পাইত। তাহার

বিপথগামিনী জননী একটা অপদার্থ কবিতারচনাকারীকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিল—সেই কবিনামধারীর চরণে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিল। সেই অপদার্থের ইচ্ছায় জননী ও পুত্রে বিচ্ছেদ ঘটিল। হতভাগ্য জ্যাক জীবনপথে সঙ্গিহীন, স্নেহহীন হইল। কিন্তু জীবনের নানা দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যে জ্যাকের জননীর প্রতি ভালবাসা অক্ষুণ্ণ ছিল। নানা কষ্ট পাইয়া দুঃখে রোগে জ্যাক মৃতপ্রায় হইল;—মৃত্যুশয্যায় সে জননীকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইল। কিন্তু তখনও তাহার দুঃখের শেষ হয় নাই! জ্যাকের মৃত্যুর পর তাহার জননী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মৃত?" যে দয়ালু চিকিৎসক জ্যাকের মৃত্যুকালে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন,—"মুক্ত।" সত্য সত্যই সে হতভাগ্যের পক্ষে মরণ মুক্তিমাত্র। কোন কোন সমালোচক এ কথাও বলিয়াছেন যে, লেখক এই পুস্তকে এত করুণরস ঢালিয়াছেন যে, পাঠকের পক্ষে তাহা অতিরিক্ত বেদনাদায়ক হইয়া উঠে; কিন্তু তাঁহারা বুঝেন না যে, হতভাগ্য নায়কের দুঃখে পাঠকের সহানুভূতির সৃষ্টিই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। তাঁহার সেই উদ্দেশ্য যে সফল হইয়াছে, তাহাতেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয়।

ডোডের "রবার্ট হেলমণ্ট" এক নূতন ধরণের পুস্তক। ইহা প্যারিস-অবরোধ-কালে একটি গ্রামে বদ্ধ একজনের রোজনামচা। প্রতিভাশালী লেখকের প্রতিভা সকল প্রকার রচনাকেই কিরূপ উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ এই পুস্তকের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

উপন্যাস ব্যতীত ডোডে কয়েকখানি নাটক ও কতকগুলি ছোট গল্প লিখিয়াছিলেন। তাঁহার "আর্টিষ্টস্ ওয়াইভস্" নামক পুস্তকে অনেকগুলি সুন্দর ছোট গল্প আছে।

আলফন্স ডোডের নামের সহিত তাঁহার পত্নী জুলিয়া ডোডের নাম বিশেষরূপে বিজড়িত। পত্নী জুলিয়া যে কেবল সংসারের শত কষ্টে পতির সাহায্যকারিণী ছিলেন, তাহা নহে। পতির সাহিত্যিক কার্য্যেও তিনি সাহায্য করিতেন। তিনি আপনিও একজন সুলেখিকা।

French Academyর উপর ডোডের শ্রদ্ধা ছিল না। যে সভা বল্জাক প্রভৃতি প্রতিভাবান লেখককে সভ্য নির্ব্বাচন করে নাই, তাহার উপর ডোডের বিরক্তি ব্যতীত শ্রদ্ধা ছিল না। এড্‌মণ্ড ডি গন্‌কুর অপর একটি সভা সংস্থাপন করিবার জন্য ডোডের হস্তে বহু অর্থ ন্যস্ত করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার অবসর ডোডে আর পাইলেন না। ডোডে

তাঁহার একখানি পুস্তকে "ফ্রেঞ্চ অ্যাকাডেমীকে" আক্রমণ করিয়াছিলেন। জোলাও পূর্ব্বে এই অ্যাকাডেমী-বিরোধীদিগের দলে ছিলেন; তাহার পর জোলা আপনার মত পরিবর্ত্তিত করিয়া উহার সভ্য হইবার জন্ম বহুবার চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছেন।

জোলার সাহিত্যিক কার্য্য যেরূপ সুনিয়মে সম্পাদিত হয়, ডোডের সেরূপ হইত না। জোলা প্রতি দিন প্রাতে তিন বা চারি ঘণ্টা লিখিয়া থাকেন। ডোডে হয় ত কিছুদিন কিছুই লিখিতেন না, আবার হয় ত কিছু দিন গুরুতর পরিশ্রম করিতেন। যখন লিখিতে আরম্ভ করিতেন, তখন তিনি প্রতিদিন আঠার ঘণ্টা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন; আহারের সময়ও উঠিতেন না,—তাঁহার লিখিবার ঘরে খাদ্য আনিতে হইত। ডোডে ধীরে ধীরে লিখিতেন, এবং একাধিকবার রচনার সংশোধন করিতেন। উপন্যাসগুলি তিনি আপনি লিখিতেন; আপনি কেবল বলিয়া যাইয়া অন্যের উপর লিখিয়া লইবার ভার দিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইত না। তবে তাঁহার শরীর যখন সুস্থ ছিল, তখন নাটক সম্বন্ধে তিনি এই ব্যবস্থা করিতেন;—তিনি কক্ষে পদচারণ করিতে করিতে বলিয়া যাইতেন, লিপিকর তাহাই লিখিয়া লইতেন। ডোডে প্রথমে নোট-বুকের এক পৃষ্ঠায় নানাবিধ নোট লইতেন, তাহার পর অপর পৃষ্ঠায় তাহাই ভাল করিয়া লিখিতেন। নোটগুলির যে অংশ যখন কোন রচনায় ব্যবহৃত হইত, সে অংশ তখনই চিহ্নিত করা হইত। ডোডের পুস্তকগুলির পাণ্ডুলিপি তিনবার লিখিত হইত—এত সংশোধনেও লেখকের তৃপ্তি হইত না।

ডোডের জীবন শেষ হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার প্রতিভার পরিচায়ক গ্রন্থমালা বিনষ্ট হয় নাই। আবার "Temples crumble into ruin; pictures and statues decay; but books survive.—একরূপে দেখিতে গেলে ডোডের মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু "The great and good do not die, even in this world, Embalmed in books their spirits walk abroad." ডোডের যশঃপ্রভায় ফরাসী সাহিত্য উজ্জ্বল থাকিবে। *

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

---

* "সাহিত্য-সমাজের" অধিবেশনে পঠিত।

মাতৃ-আজ্ঞা।

১

নবীন-সন্ন্যাসিবেশে শচীর দুলাল
যবে আসি দিলা দরশন,
হাহাকারে চারিধারে ভক্ত সব ঘেরি তাঁরে
উভরোলে করিলা রোদন ;—
"গোরা যদি ছেড়ে যায় কি ফল জীবনে, হায়,
জাহ্নবী-সলিলে সবে পশিব এখন।"

২

বিষন্ন বৈষ্ণব সবে করিয়া সম্ভাষ
কহিলেন সন্ন্যাসী নিমাই,—
"শুন যত প্রিয়জন! ত্যজ ক্ষোভ অকারণ,
করযোড়ে ভিক্ষা এই চাই ;
কৃষ্ণের কাঙাল আমি, যা'রা কৃষ্ণ-অনুগামী
তাদের ছাড়িয়া মোর অন্য গতি নাই।

৩

"তোমা সবে তেয়াগিয়ে, কাঁদাইয়ে মা'য়,
বৃথা মোর, বৃথা এ সন্ন্যাস ;
মিছা সে যমুনা ভুলে ফিরিনু জাহ্নবী-কূলে,
মিছা মোর, মিছা সে প্রয়াস।—
হায়! কোথা বৃন্দাবন! কোথা কৃষ্ণ প্রাণ-ধন!
ধিক্ মোরে! মিটিল না জনমের আশ।

৪

"তাই পুন তোমাদের স্নেহের ভবনে
শূন্যমনে আইনু ফিরিয়া ;
দেখিনু দুখিনী মা'য় শোকে মোর মৃতপ্রায়,
বজ্রে বুক গিয়াছে ভাঙিয়া ;
বিরহী বৈষ্ণবদল লুটাইছে ধরাতল,
অবিরল আঁখিজল যেতেছে বহিয়া।

৫

"হেরি' সে শোকের ছবি, বিষাদে বিহ্বল,
পরিণাম না করি গণন,
মাতৃ-সন্নিধানে আজ করেছি মূঢ়ের কাজ,
জান সবে, নহে তা' গোপন ;
উঠিতে বসিতে ক্ষণে সেই চিন্তা উঠি' মনে
চিত্তে মোর নিদারুণ করিছে পীড়ন।

৬

"স্বাধীন মানসে সর্ব্ব-সমক্ষে সে দিন
সাক্ষী করি বিশ্ব চরাচর,
মুড়ায়ে কেশের রাশ পরেছি কৌপীন-বাস,
কৃষ্ণ-আশে তৃষিত কাতর ;—
আজি মাতৃ-আজ্ঞা পেলে দণ্ড কমণ্ডলু ফেলে
চাহি পুন পশিবারে সংসার ভিতর!

৭

"কিন্তু ত্রিজগৎ যদি মোরে উপহাসে
বরষিয়া বিদ্রূপের বাণ,
প্রতিজ্ঞা করেছি যাহা যতনে পালিব তাহা,
বাক্য মোর না হইবে আন ;
গৃহে বসি করি মেলা খেলিব কৃষ্ণের খেলা,
কৃষ্ণ-প্রেম বিনা আর কি চাহে পরাণ?

৮

"যাও তবে, ভক্ত সব বিবরি' বিশেষ
নিবেদিও মায়েরে আমার,—
সন্ন্যাসী সন্তান প্রতি যা' করেন অনুমতি
ধর্ম্মাধর্ম্ম করিয়া বিচার,
তর্ক নাই, দ্বিধা নাই, শিরে সে ধরিবে তাই,—
মাতৃ-আজ্ঞা—দেববাণী—করিবে সে সার।—"

৯

প্রভুর বচন শুনি, ত্বরিত হরষে
ভক্ত সব শচী পাশে ধায়,
সুখের বারতা হেন উচ্ছ্বসিত স্রোতে যেন
শতমুখে নিবেদিলা তাঁয়,—
"মাগো তোর আজ্ঞা হ'লে নিমাই নদিয়া চলে,
সহস্র মায়ের ছেলে দেহে প্রাণ পায়।

১০

"তোমার সকাশে আজি শ্রীমুখে আপন
যে প্রতিজ্ঞা করিলা নিমাই,
উঠিতে বসিতে ক্ষণে সেই কথা জাগে মনে,
আমা সবে পাঠাইলা তাই ;
বিলম্ব না সহে আর, বল্ মাগো একবার,
নদিয়ার চাঁদে মোরা ঘরে নিয়ে যাই।"

১১

ব্যাকুল বৈষ্ণবকুলে চাহি' একবার
ভূতলে মা স্থাপিলা নয়ন ;
সহসা নিশ্বাসে কাঁপি' বসন-অঞ্চলে ঝাঁপি'
অশ্রু বুঝি করিলা গোপন ;
মুহূর্ত্তেকে আর বার তুলি' দু'টি আঁখিতার
ধীরে ধীরে সকাতরে কহিলা তখন।—

১২

"হা নিমাই ! এত দিনে মায়েরে তোমার
এল বুঝি বুঝিবার কাল !
নারী আমি হীনমতি, সদা স্বার্থপথে গতি,
প্রাণে যত জড়তা-জঞ্জাল !
মৃদু ঘাতে টুটে যায়, কোথা সে মৃণাল, হায়,
কোথা হেন বজ্রে বাঁধা পরীক্ষা বিশাল !

১৩

"নিজ ধর্ম্ম ভার তুমি মায়েরে সঁপিয়া
বাড়াইলে মায়ের সম্মান ;
ধর্ম্মে তোর সাধি' বাদ সাধিব স্বার্থের সাধ,
আমি কি রে এমনি পাষাণ !
জানি রে বিরহে তোর যা'বে এ জীবন মোর,
যায় যা'ক্ !—সত্য তব করিব না আন !

১৪

"তোমারে ইঙ্গিতে ধরি যত নীচ জন
তীব্রহাসে করিবে কৌতুক,
শুভ্রযশে সগৌরবে পীড়িবে ছিঁড়িবে সবে
ক্রুদ্ধ দন্তে দুরন্ত হিংস্রক,—
সে সব শাণিত বাণ স'বে না মায়ের প্রাণ,
মর্ম্মে মর্ম্মে বিসরিয়া বিদরিবে বুক।

১৫

"হে সাধু বৈষ্ণবগণ ! মায়ের বচনে
সন্ন্যাসীরে কহিও আমার,—
আজি পঞ্চরাত্রি গত লইলা যে পুণ্যব্রত
পণ করি [illegible] সংসার,
সে ব্রত করিতে নাশ ছলে যদি করি আশ,
জননীর যোগ্য তবে নহি আমি তাঁর।"

১৬

বিষাদে বিস্ময়ে রোষে বৈষ্ণব-সমাজ
সিন্ধু যেন উঠিল শ্বসিয়া ;—
বলে, "মাগো কি করিলে নিজবাক্যে বিদাইলে
প্রাণ-শূন্য করিলে নদিয়া ?
এ কথা শুনিলে পরে আর ত র'বে না ঘরে,
এখনি ছাড়িয়া যা'বে গৃহ আঁধারিয়া।"

১৭

বৈষ্ণবের বাণী শুনি' চকিতে চমকি'
করে শির করিয়া তাড়ন,
বলে মাতা,—"হাহা বিধি ! আমার অঞ্চল-নিধি
সত্য কি রে ত্যজিবে ভবন ?"
বলিতে বলিতে কথা বজ্রাহত তরু যথা
ভূতলে মা মূর্চ্ছাতুর পড়িলা তখন।

১৮

উচ্ছ্বাসে ভকত-সব উঠিল কাঁদিয়া,
শান্তিপুর পূরিল রোদনে ;—
কেহ প্রভু প'রে রোষে, কেহ বা মায়েরে দোষে
বিনাইয়া বিবিধ বচনে ;
কেহ বা কহিছে,—"হায় ! এমন না হ'লে মা'র
এমন তনয় তবে হ'বে বা কেমনে ?"

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

রাজা টোডরমল।

সম্রাট্ আকবরের যে সকল হিন্দুজাতীয় রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, রাজা টোডর-মল * (১) তাহার মধ্যে একজন প্রধান। আকবর তাঁহাদের সমরকৌশল, শাস্ত্র-জ্ঞান, সংগীতপারদর্শিতা, চিকিৎসানৈপুণ্য, কবিত্ব, গণিতজ্ঞান ইত্যাদিতে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহারা এক এক বিষয়ে অদ্বিতীয়—তাঁহাদের কেহ কেহ বা দুই বা তদধিক বিষয়ে নৈপুণ্য লাভ করিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন।—তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ রণ-বীর, অথচ আয়-ব্যয়াদিনিপুণ;—রাজা টোডরমল সেই শ্রেণীর লোক। তাঁহাকে প্রায় সকলেই সম্রাটের হিসাব-পরীক্ষক বলিয়াই জানেন। কিন্তু তাহা নয়। তিনি এক জন প্রকৃত বীরপুরুষ। তিনি কোন্ কোন্ যুদ্ধে কত প্রকারে বীর-দম্ভ প্রকাশ করিয়া অক্ষয় শূর-কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহা বিবৃত হইবে।

অতি অল্প বয়সেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। সুতরাং তাঁহার জননীকে অশেষ ক্লেশে নিপতিত হইতে হয়। বাল্যকাল হইতেই টোডরমলের বুদ্ধি-বৃত্তি মার্জ্জিত ও প্রখর ছিল। কেরাণীর কার্য্য হইতে তিনি অত্যুচ্চ পদবীতে অধিরোহণ করেন (২)।

তিনি ক্ষত্রিয় বর্ণ। লাহোর তাঁহার জন্ম-ভূমি। (৩)

৯৭২ হিজিরায় তিনি আকবরের কার্য্য করিতেন। সেই সূত্রে তাঁহাকে জুনাপুরে খাঁ জমালের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে রাজা

---

(১) হিন্দী ভাষায় ও প্রাচীন ইতিহাসপুস্তকে তাঁহার নাম টোরেল মল।

(২) "তক্রীহুল্ ইমারতী" নামক অমুদ্রিত পার্সী পুস্তকে এই পরিচয় পাওয়া যায়। আসিয়াটিক সোসাটীতে ঐ পুস্তক আছে। আগরা গবর্মেণ্ট কলেজের সিলচাঁদ উহার প্রণেতা। ঐ পুস্তকে আগরার পুরাতত্ত্ব কীর্ত্তিত। উহাতে বিস্তর মহামূল্য ও প্রীতিপ্রদ প্রসঙ্গ নিবদ্ধ। বিজ্ঞাপনে জেম্স ষ্টিফেন নামক ইংরেজের প্রশংসাবাদ দৃষ্ট হয়। ঐ সাহেবের উপাধি জানিবার উপায় নাই। ব্লক্‌মান্ অনুমান করেন—তাঁহার নাম বেবিঙটন বা ঐরূপ একটা কিছু হইবে। পুস্তকের ভাষায় সুশৃঙ্খলার অভাব।

(৩) সম্রাট আকবরের ১৮শ রাজ্যাব্দে তিনি তৎকর্ম্মচারিপদে নিযুক্ত হন। "মাসিরুল্ উমরা" পুস্তকে ঐ কথাই লিখিত থাকিলেও, উহা গ্রহণযোগ্য নয়। 'বদৌনির' মতে ৯৭১ হিজিরায় তিনি মুজফ্‌ফরের অধীনে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হন।

টোডরমল, অলৌকিক বিক্রম প্রকাশ করিলেও, যুদ্ধের বিজয়লক্ষ্মী সম্রাটের অঙ্কগত হন নাই। তখন আকবরের ১০ম রাজ্যাব্দ চলিতেছিল। ১৮শ রাজ্যাব্দে (৯৮১ হি) তাঁহার কার্য্য সুদৃঢ় হয়। ইহাই তাঁহার প্রথম ও প্রয়োজনীয় পদ-মর্য্যাদা। তৎপূর্ব্বেই গুজরাট বিজিত হইয়াছিল। সেই প্রদেশের আয় ব্যয়ের তালিকা প্রস্তুত করিবার ভার তাঁহার উপর বিন্যস্ত হইল। বলা বাহুল্য, তাঁহাকে তদুপলক্ষে তথায় অবস্থান করিতে হয়। পর বর্ষে (১৯শ অব্দে) পাটনা অধিকৃত হইলে তিনি "আলম্‌" ও "নিকারা" প্রাপ্ত হন। সেই সময়ে "মুনিম্ খাঁ"কে বাঙ্গালা দেশে লইয়া যাইবার ভার তাঁহার উপর পড়িল। ঐ যুদ্ধ-যাত্রায় তিনিই মূলাধার—সুতরাং তাঁহারই সুপ্রচুর প্রাধান্য। যখন বঙ্গদেশে দায়ুদ খানি করা-রাণীর সঙ্গে যুদ্ধে খাঁ আলমের মৃত্যু হইল,—মুনিম খাঁর যুদ্ধতুরঙ্গ রণক্ষেত্র হইতে দ্রুতপদে ধাবিত হইতেছিল—তখনই তিনি অদম্য। তিনি ধীরভাবে বলিতেন—"যদি খাঁ খাঁনাও উপরত হয়—তাহাতেই কি? আমরা নিশ্চয় জয়লাভ করিব।" তাহার পর তিনি বঙ্গ ও উৎকলের রাজস্বের ব্যবস্থা করিয়া সম্রাট্-সদনে গিয়া উপনীত হইলেন। তখন হইতে রাজস্বের হিসাব, উত্তম বন্দোবস্ত প্রভৃতির জন্য তাঁহাকে প্রয়োজনীয় কর্ম্মচারী বলিয়া সকলের প্রতীতি জন্মিল। আর প্রধানতঃ সেই ভারই তাঁহার উপর পড়িল। কিন্তু খাঁ জঁহা (৪) আবার যৎকালে পঞ্জাব হইতে আহূত হইয়া বঙ্গাক্রমণে আদিষ্ট হইলেন, তখনও রাজা টোডরমলকে তাঁহার সাহায্যার্থ তথায় যাইতে হয়। সে বারেও তিনি পূর্ব্ববৎ দায়ুদের পরাজয়ে খ্যাতিমান্ হইলেন।

একবিংশ রাজ্যাব্দে তিনি বাঙ্গালা হইতে জয়লব্ধ দ্রব্যের নিদর্শন-স্বরূপ ৩০০ কি ৪০০ হস্তী আনয়ন করেন। পর বৎসর গুজরাটে দ্বিতীয়বার যাইবার নিমিত্ত তাঁহার উপর হুকুম হয়। উজির খাঁ নামে তথায় যে শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তাঁহার কার্য্য, আশানুরূপ সন্তোষপ্রদ হওয়া দূরে থাকুক—নিতান্ত জঘন্য হইতেছিল। রাজা যখন আমেদাবাদ-সংক্রান্ত গোলযোগের শান্তি করিতেছিলেন, মির্জ্জা আলি গুলাবের প্রতারণায় মুজফ্ফর হুসেন বিদ্রোহী হন। সেই যুদ্ধে উজির খাঁ, দুর্গে লুক্কায়িত হইবার বাসনা করেন—কিন্তু টোডরমল যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিলেন। তিনি আমেদাবাদের বার ক্রোশ দূরবর্ত্তী ধোলাক

(৪) কেন না, ৯৮৩ হিজিরায় খাঁ খাঁনানের মৃত্যু হয়। আর সেই সূত্রেই বঙ্গও বিশৃঙ্খল হইয়া যায়।

নামক স্থানের সমীপে বিদ্রোহীদিগকে পরাভূত করেন। রাজা, ঐই সময়ে উপস্থিত থাকিয়া রণে মিলিত না হইলে, উজির খাঁ জীবন হারাইতেন। যাহা হউক, যুদ্ধে পরাজিত মুজফ্ফর জুনাগড়ে পলাইয়া গিয়া প্রাণ বাঁচাইল।

এইবার তিনি "উজির" হইলেন। যখন আকবর আজমীর হইতে পঞ্জাবে যান, ঠিক্ সেই সময়েই রাজা টোডরমলের গৃহদেবতাগুলি নষ্ট হয়।

আকবর, মজফ্ফরের মৃত্যু এবং বাঙ্গালা ও বিহারের বিদ্রোহবৃত্তান্ত অবগত হইয়া, টোডরমল, কাদিক্ খাঁ, তার্সন্ খাঁ প্রভৃতিকে ফতেপুর শিক্রি হইতে বিহারের প্রেরণ করিলেন। রোটসের শাসনকর্ত্তা মাহিবালি এবং মহম্মদ্ মেকুম খাঁই ফারাঙ্খূদি, তাঁহাদের সহকারী নিযুক্ত হইলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি তিন সহস্র সুসজ্জীকৃত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া রাজার সহিত মিলিত হন। কিন্তু তিনি তাঁহাকে শান্ত রাখিয়াছিলেন। তিনি এই সংবাদ রাজসভায় জ্ঞাত করিয়াছিলেন। তখন "ম্যাকুম ই কাবুলির", কাক্শালদিগের এবং মির্জা সরফুদ্দিন্ হুসেনের অধীনস্থ বাঙ্গালার বিদ্রোহকারী সকল, ত্রিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য, পঞ্চাশটি হস্তী, বহুসংখ্যক রণতরী এবং গোলাগুলি সমভি-ব্যাহারে লইয়া মুঙ্গেরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। টোডরমল, নিজসহকারী-দিগের বিশ্বাসঘাতকতায় ভীত হইয়া, মুঙ্গের দুর্গে অবরুদ্ধ হইলেন। এই অবরোধসময়ে, তাঁহার দুই জন কর্ম্মচারী "হুমায়ুন ফর্ম্মিলি" এবং "তারখাঁ দেওয়ান" সেই বিদ্রোহকারীদিগকে মিলিত করিয়াছিল। রাজা খাদ্যাভাবে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও নির্ব্বিঘ্নে জীবনধারণ করিয়াছিলেন। তিনি রাজসভা হইতে কিছু টাকা সাহায্য পাইতেন। কিছু কাল অবরোধের পর, বাবাখাঁ কাক্শালের মৃত্যু হইল, এবং মজ্জুন কাক্শালের পুত্র জবারি পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিল। বিদ্রোহিগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। "ম্যাকুম ই কাবুলি", বিহারের দক্ষিণাংশে গমন করে, এবং আরব বাহাদুর হঠাৎ পাটনা আক্রমণ করিয়া, সম্রাটের ধনসম্পত্তি হস্তগত করিবার প্রয়াস পায়। উক্ত ধন-সম্পত্তি, ঐ নগরের দুর্গে পাহাড় খাঁ কর্ত্তৃক নির্ব্বিঘ্নে রক্ষিত ছিল। ম্যাকুম ই ফেরান্-খুডিকে পাহাড় খাঁকে সাহায্য করিবার জন্য পাটনায় প্রেরণ করিয়া টোডর-মল এবং কাদিক খাঁ, উভয়ে "ম্যাকুম ই কাবুলির" অনুগমন করিলেন। তাঁহারা বিহারে পঁহুছিলেন। ম্যাকুম, কাদিক খাঁকে পরাভূত করিবার মানসে একদা রাত্রিতে হঠাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করে; কিন্তু উড়িষ্যার জমিদার ইসাখাঁও তাঁহার সহিত সংমিলিত দেখিয়া সে পলাইতে বাধ্য হয়।

তখন তিনি আক্‌বরকে জানাইলেন যে, দক্ষিণবিহারের গার্হি পর্য্যন্ত দিল্লীর সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছে।

সপ্তবিংশতি বৎসরে (৯৯০ হিজিরায়) তোডরমল দেওয়ান হইলেন। তিনি, কর সম্বন্ধে যে উন্নতি বিধান করিয়া এত প্রসিদ্ধ হন, তাহা এই সময়েই প্রচারিত হয়। আইনের তৃতীয় ভাগে খাজনার ফর্দ্দ সন্নিবিষ্ট আছে। ইহা মজফ্‌ফর-রচিত করপ্রথা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

টোডরমল, কর-সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করেন, তাহা অত্যাবশ্যক। তিনি, ভাষা এবং কর-হিসাবপ্রথা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে হিন্দী ভাষায়, হিন্দু মুহুরীর দ্বারা এই সকল বিষয় লিখিত হইত। টোডরমল এই নিয়ম করিলেন যে, রাজকীয় সমস্ত হিসাব, পারস্ত-ভাষায় লিখিত হইবে। অধুনা ইংরাজেরা যেরূপে ভারতবর্ষে ইংরাজী ভাষা প্রচলিত করিয়াছেন, মুসলমানাধিকারে টোডরমলও সেইরূপ স্বজাতীয়দিগকে পারস্তভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য করেন। অগত্যা সকলেই অর্থোপার্জ্জনার্থ পারস্ত ভাষার অনুশীলন করিতে লাগিল। ইহার ফলে বিস্তর হিন্দু সম্রাটের কর্ম্মচারী হইলেন।

আকবর, মানসিংহকে সাত সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক-পদে নিযুক্ত করেন। টোডরমলের পূর্ব্বোক্ত আদেশ এবং আকবর কর্তৃক হিন্দুদিগের সর্ব্বোচ্চ পদ-প্রাপ্তি-সম্বন্ধে তাহাদের অন্তঃকরণে যে গুপ্ত অভিপ্রায় ছিল, তাহা এই :—

প্রথমতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ হইবার পূর্ব্বে হিন্দুগণ মুসলমানদিগের পারস্তভাষার শিক্ষক হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় পার্সী ও উর্দ্দুর প্রসারবৃদ্ধি হয়। হিন্দুগণ পারস্তভাষা না শিখিলে "উর্দ্দু" ভাষার কি প্রকারে অস্তিত্ব থাকিত? আকবরের পূর্ব্বে হিন্দুগণ সাধারণতঃ পারস্তভাষা পড়িতেন না, এবং তজ্জন্যই তাঁহারা মুসলমানদিগের রাজনীতি অতি অল্পই জানিতেন।

উনত্রিংশ বৎসর রাজত্বকালে আকবর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করেন। ৩২ বৎসর রাজত্বকালে একজন ক্ষেত্রী, আন্তরিক ঘৃণাপ্রযুক্ত রাত্রিতে তোডরমলকে আহত করে। জিঘাংসু তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই নিহত হইল।

যুসুফ্‌জাইস্‌দিগের সহিত সমরে বীরবল নিহত হইলে, টোডরমলের উপর এই ভার পড়িল যে, তিনি মানসিংহকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইবেন। কেন না, বীরবলের স্থানে তৎকালে মানসিংহকেই সৈন্যাধ্যক্ষতা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। চৌত্রিশ রাজ্যাব্দে আকবর কাশ্মীরে অভিযান করেন।

তখন লাহোর এই টোডরমলের অধীনে রক্ষিত হইয়াছিল। ইহার অব্যবহিত পরে তিনি রাজকীয় কর্ম্ম হইতে অবসর লইবার অভিলাষী হন। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, জীবনের কাল পূর্ণপ্রায়। অতএব অবশিষ্ট কতিপয় দিবস ভাগীরথীতীরে যাপন করিবেন। প্রথমে পাৎসা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাঁহাকে অবকাশ দেন। কিন্তু তাঁহাকে "হরিদ্বার" হইতে পুনরায় আনয়ন করেন। টোডরমল, নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক প্রত্যাগত হন। ফিরিয়া তিনি কিন্তু অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। ৯৯৮ হিজিরার একাদশ দিবসে তাঁহার দেহাবসান ঘটে। লাহোরেই তিনি তনুত্যাগ করেন। রাজা ভগবান দাস তাঁহার সৎকারার্থ গমন করিয়াছিলেন।

রাজা টোডরমলের সমসাময়িক কোন কোন ঐতিহাসিক, তাঁহাকে গোঁয়ার ও গোঁড়া বলিয়াছেন বটে, কিন্তু আকবরের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদের মধ্যে তাঁহার ন্যায় উত্তম সেনানী ও আয়-ব্যয়-পরীক্ষক সুদুর্লভ। তাঁহার কার্য্যপরম্পরাই তাঁহার গুণাবলী জাগরূক রাখিয়াছে। আবুল ফাজল, টোডরমল, (৪) মানসিংহ, এই তিন জন আকবরের সভার মুকুটস্বরূপ। তাঁহার পুত্রের নাম ধারু। তাঁহার উপাধি "সপ্তশতী।" সিন্ধুদেশে অভিযানসূত্রে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি খাঁ খানাঙের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। লোকে বলে, তিনি সোনা দিয়া ঘোঁড়ার খুর বাঁধাইতেন।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

রাণী ভবানী।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ;—পুণ্যকীর্ত্তি।

রাণী ভবানী যখন তীর্থভ্রমণোপলক্ষে কাশীধামে গমন করেন, তখন আর তাহাকে পুরাণ-বর্ণিত আনন্দনগরী বলিয়া চিনিয়া লইবার উপায় ছিল না। ধর্ম্মান্ধ আরঙ্গজীবের কঠোর শাসনে সীমাচিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, দেবমন্দিরগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, বিশ্বেশ্বরের মন্দির পর্য্যন্তও মুসলমানের মসজেদে পরিণত হইয়াছিল! উপযুক্ত আবাসগৃহের অভাবে

(৪) সম্রাট শাহজাহানেরও টোডরমল নামে এক কর্ম্মচারী ছিলেন।

তীর্থযাত্রীদিগের ক্লেশের অবধি ছিল না; হিন্দুদিগের পক্ষে সে দৃশ্য সভাবতঃই হৃদয়বিদারক হইয়া উঠিয়াছিল।

কাশীধামের পুণ্যক্ষেত্র এরণ্ডপত্রাকৃতি; সুক্ষ্মানুসুক্ষ্মরূপে সীমাচিহ্নসংস্থাপন না করিলে, কোন্ কোন্ স্থান পুণ্যক্ষেত্র, তাহা সহজে নির্ণয় করা যায় না। রাণী ভবানী এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য বহুব্যয়ে কাশীধামের লুপ্তোদ্ধারে যত্নবতী হইয়াছিলেন। তাঁহার কল্যাণে আবার সীমাচিহ্ন নির্দ্দিষ্ট হইল; আবার বহুশত মন্দিরচূড়ায় কাশীর পূর্ব্ব গৌরব বিকশিত হইয়া উঠিল; আবার শঙ্খঘণ্টানিনাদে পুণ্যভূমি মুখরিত হইল।

এই কার্য্যে কত অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই; পদে পদে কত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই; কত দিনের অধ্যবসায়ে এই মহাব্রত উদযাপিত হইয়াছিল, তাহার কথা চিন্তা করিলেও বিস্মিত হইতে হয়।

প্রচুর অর্থব্যয় করিতে পারিলে অন্য লোকেও ইহা সুসম্পন্ন করিতে পারিতেন। কিন্তু কাশীর লুপ্তোদ্ধার করিয়া রাণী ভবানী তাহার সর্ব্বত্র আত্মহৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিবার জন্য যে সকল অভিনব কীর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, অন্য লোকের হৃদয়ে তাহা হয় ত আদৌ উদিত হইত না।

রাণী ভবানীর প্রত্যেক পুণ্যকীর্ত্তিতেই তাঁহার বিশেষত্ব প্রকটিত হইয়াছিল; অন্য লোকে অর্থবলে যাহার সম্পাদন করিতে পারিতেন, তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইতেন না; তিনি প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যেই এমন কিছু নূতনত্বের পরিচয় প্রদান করিতেন যে, লোকে দুই হাত তুলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিত। সেগুলি তাঁহার বিশেষত্বসূচক; তাহাতে তাঁহার জীবহিতব্রতের পরিচয় প্রকাশিত হইত। কাশীধামের লুপ্তোদ্ধার কার্য্যেও তাহাই হইয়াছিল।

তিনি কাশীর সীমাচিহ্ন-সংস্থাপন করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ব্যবধানে "এক এক ধর্ম্মঢোকা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। অর্থাৎ ঐ ঐ স্থানে এক এক পিন্না, এক এক বৃক্ষ ও এক এক কূপ খনন করিয়া দিয়াছিলেন। পথশ্রান্ত লোক বা যাহারা আপন মস্তকে দ্রব্যাদি বহন করে, তাহারা শ্রান্ত বা পিপাসাযুক্ত হইলে বিনা সাহায্যে ঢোকার উপর মোট বা দ্রব্যাদি রাখিয়া বৃক্ষমূলে বসিয়া বিশ্রাম এবং জলপানাদি করিত, পরে ঢোকার উপর হইতে অক্লেশে মোট আপন মস্তকে লইয়া পুনর্ব্বার গমন করিত।" (১)

(১) নবনারী।

অন্তঃপুরবাসিনী রাজরাণী হইয়াও যাঁহার কোমল হৃদয় ভারবাহী দীন-দরিদ্রের দুঃখ কষ্টে বিগলিত হইত, কাশীবাসিগণ যে অদ্যাপিও অন্নপূর্ণার অবতার বলিয়া প্রাতরুত্থানসময়ে তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ইহাই রাণী ভবানীর অবিনশ্বর স্মৃতিচিহ্ন।

এক জন চরিতাখ্যায়ক এই সকল কথার উল্লেখসময়ে লিখিয়া গিয়াছেন,—

"নিজ কাশীতে নিত্য প্রাতঃকালে এক প্রস্তরের চৌব্বাতে আট মণ ছোলা ভিজান যাইত, তাহা অনাহূত যে সকল লোক আগত হইত, তাহাদিগকে দেওয়া যাইত এবং অন্নপূর্ণার মন্দিরে নিত্য নিত্য ২৫ মোণ তণ্ডুল বিতরণ হইত।"

সাঁতোল-নিবাসিনী রাণী শর্ব্বাণী করতোয়াতটে যে মহাপীঠের আবিষ্কার করেন, তদ্দর্শনার্থ বহু শত যাত্রী সমবেত হইত। পথ ঘাটের সুব্যবস্থা না থাকায় লোকের যথেষ্ট কষ্ট হইত; রাণী ভবানী সে কষ্ট দূর করিয়া তীর্থ দর্শনের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন, এবং সীতারামের দেবমন্দিরগুলির জীর্ণসংস্কার করিয়া তথায় যথারীতি সেবা পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। অন্যকৃত প্রাচীন কীর্ত্তিরক্ষায় জন্য তাঁহার যেরূপ আন্তরিক অনুরাগ ছিল, হিন্দুসাধারণের সেরূপ অনুরাগ থাকিলে রাণী ভবানীর পুণ্যকীর্ত্তি এত অল্পদিনের মধ্যেই এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইত না!

অর্দ্ধবঙ্গব্যাপী রাজসাহী রাজ্যের অধীশ্বরী হইয়াও রাণী ভবানী ব্রহ্ম-চারিণীর ন্যায় জীবনযাপন করিতেন। কখনও নাটোর রাজবাটীতে, কখনও পুণ্যতীর্থে, কখনও বা বড়নগরের গঙ্গাতীরে অবস্থান করিয়া, রাজকার্য্য পরিদর্শন, পুরাণাদিশ্রবণ, সন্ধ্যাবন্দনাদিসম্পাদন ও লোক-হিত-সাধনে দিনযাপন করিতেন। তাঁহার হবিষ্যান্নের জন্য উড়ি ধান্য ভিন্ন কৃষিজাত ধান্য ব্যবহৃত হইত না। এক জন হিন্দু কবি এই সকল কথার উল্লেখ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—

"অতিপুণ্যবতী রাজ্ঞী কুশাসনবিলাসিনী।
ব্রীহ্যন্ননিয়তাহারা ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বিনী।" (১)

যে সময়ে প্রাচীন রাজবংশের উত্তরাধিকারিগণ যথাকালে রাজস্বদানে অশক্ত হইয়া নবাব-দরবারে নানারূপে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে বাধ্য হইতেন, সেই সময়ে বর্ষে বর্ষে বহুলক্ষ মুদ্রা রাজকর পরিশোধ করিয়া এই সকল বহুব্যয়-সাধ্য পুণ্যকার্য্য সংস্থাপন করায়, রাণী ভবানীর শাসনপ্রতিভা সকলের নিক-টেই বিস্ময়ের ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল।

---

(১) লঘুভারতম্।

এই সকল কীর্ত্তিকাহিনী স্মরণ করিয়া একজন সহৃদয় ইংরেজ রাজপুরুষ লিখিয়া গিয়াছেন,—

"রাণী ভবানী পুণ্যশীলা ও ধর্ম্মপরায়ণা বলিয়া সবিশেষ পরিচিতা। তিনি সর্ব্বদাই দেবসেবা ও দেবমন্দিরপ্রতিষ্ঠার জন্য মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতেন; একমাত্র কাশীধামেই তিন শত দেবমন্দির, অতিথিশালা ও ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছিলেন। আজ পর্য্যন্ত তাহার অনেকগুলি রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, অনেকগুলি এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না;—হয় ত বিস্তীর্ণ রাজ্য হস্তচ্যুত হইলে রাণী ভবানীর বংশধরগণ অর্থাভাবে সেগুলির রক্ষা করিতে পারেন নাই! রাণী ভবানী এই সকল সেবাপূজার জন্য অর্থ ও ভূমিদান করিয়া গিয়াছিলেন; তন্মধ্যে কতকগুলি নাটোরে অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। শ্যাম-রায়ের সেবা এখনও মুরশিদাবাদ প্রদেশে সর্ব্বজনপরিচিত। ইহার জন্য রাণী ভবানী যে ভূমিদান করেন, তন্মধ্যে চূয়াগাছা ও কালীগঞ্জের মধ্যবর্ত্তী ডিহি ফুলবাড়িয়া সর্ব্বপ্রধান।"(২)

কাশীধামের পুণ্যকীর্ত্তির আর সেরূপ গৌরব নাই;—একদিন কাশীধামে রাণী ভবানীর ছত্রই সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠিয়াছিল, এখন কেবল তাহার ধ্বংসা-বশেষমাত্রই বর্ত্তমান;—সে পূর্ব্বগৌরব অতীতকাহিনীমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

মুরশিদাবাদ প্রদেশের পুণ্যকীর্ত্তিগুলিও কালক্রমে পূর্ব্বগৌরবচূড়া হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে। যে শ্যামসুন্দর বিগ্রহের সেবা পূজা ইংরাজ রাজপুরু-ষেরও বিস্ময়োদ্দীপন করিয়াছিল, তাহার জন্য রাণী ভবানী যে সহস্র-বিঘা-পরি-মিত শস্যবহুলা সফলা ভূমি সম্প্রদান করিয়াছিলেন, এ স্থলে দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই অতীত-সাক্ষী দানপত্রখানি উদ্ধৃত হইল।

"শ্রীযুতশ্যামসুন্দরদেবচরণসরসীরুহরাজেষুসেবার্থদবোত্তর পত্রমিদং।"

"নিজ সুকৃতীবিধাত্রী লিখ্যতে দানপত্রী শাকে ১৬৮৩ সনে ১১৬৮ বর্ষে লিখনং কার্য্যনঞ্চাদৌ পরন্তু মদীয়রাজ্যৈকদেশে রাজসাহীপর-গণাখ্যে গ্রামাণ্যন্তর্গতপরগণে গোহাসেতিপ্রসিদ্ধরাজ্যোপদেশে এক-সহস্রবিঘেতি লৌকিকপ্রসিদ্ধা শস্যসম্প্রদানভূমিঃ॥"

"দেবস্ব হারিণো যে চ যে চ তদ্বিঘ্নকারকাঃ।
নরকান্নিষ্কৃতিস্তেষাং নাস্তি কল্পশতৈরপি॥"

ইংরাজাধিকার প্রচলিত হইয়া কালক্রমে রাজবিধির বিচারানুষ্ঠানে রাণী ভবানীর প্রদত্ত অনেক দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ভূমির কর ধার্য্য হইয়াছিল।

(২) Westlands' Jessore.

মূল দানপত্রগুলি যথাকালে প্রকাশিত ও প্রমাণীকৃত না হওয়ায়, অনেকস্থলে এইরূপ বিচারবিভ্রাট সংঘটিত হইয়াছিল। অনেকে স্বার্থসিদ্ধির জন্যও অনেক কাগজপত্র লুকাইয়া ফেলিয়াছিলেন। যে সকল দেবোত্তরভূমি এখনও প্রচলিত আছে, তাহারও সমস্তগুলির দানপত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজসাহীর কালেক্টারীতে কতকগুলির অনুলিপি আছে; মূলদানপত্র কি হইল, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। (১)

রাণী ভবানীর ভূমিদানপত্রের সংখ্যানির্ণয় অসম্ভব; তিনি যে বহুলক্ষ বিঘা ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা বঙ্গদেশে প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল দানপত্রে সাধারণতঃ নিম্নোক্ত শ্লোকাবলী লিখিত থাকিত,—

"বহুভির্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ।
যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলং॥
ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্নাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ॥
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত্ত বসুন্ধরাং।
স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে॥"

রাণী ভবানী সাদরে শাস্ত্রানুশাসনবাক্য উদ্ধৃত করিয়া দানপত্র লিখিয়া দিতেন; উত্তরকালে তাহার মর্য্যাদা সকল স্থলে সম্যক্‌রূপে রক্ষিত হয় নাই বলিয়া রাণী ভবানীর গৌরব ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না।

রাণী ভবানীর এই সকল পুণ্যকীর্ত্তির মর্য্যাদানিরূপণ আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। লোকে গৌরবলালসায়, বা স্বধর্ম্মানুরাগে, বা স্বদেশপ্রীতিতে প্রণোদিত হইয়াই এই শ্রেণীর পুণ্যকীর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে;

(১) রাজসাহীর কালেক্টারীতে যে সকল অনুলিপি রক্ষিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এইগুলি প্রধান;—যথা;—

১১৬২। ২৫ কার্ত্তিক রাধাকান্ত দেব ঠাকুর ১০০০ বিঘা।
১৬৫। ১ শ্রাবণ কানাইয়ালাল দেব ঠাকুর ২০০০ বিঘা।
১১৬৭। ২২ মাঘ মদনমোহন দেব ঠাকুর ১০০০ বিঘা।
১১৬৮। ২৪ আশ্বিন গোপীনাথ দেব ঠাকুর ১৭৫০ বিঘা।
১১৬৮। ২২ চৈত্র শ্যামসুন্দর দেব ঠাকুর ৩০০০ বিঘা।
১১৬৯। ১৫ কার্ত্তিক লক্ষ্মীজনার্দ্দন দেব ঠাকুর ৫০০ বিঘা।
১১৭০। ৮ পৌষ লক্ষ্মীজনার্দ্দন দেব ঠাকুর ৫০০ বিঘা।
১১৭১। ১৫ ভাদ্র মনোমোহন দেব ঠাকুর ১২৫০ বিঘা।

রাণী ভবানীর পুণ্যকীর্ত্তিগুলি ইহার কোন শ্রেণীর অন্তর্গত, তাহার আলোচনা না করিলে আমরা তাঁহাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারিব না।

অনেকে গৌরবলালসায় উত্তেজিত হইয়া লোকপ্রশংসা বা রাজদত্ত-উপাধিলাভাশায় অনেক পুণ্যকীর্ত্তির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর দান একেবারেই নিন্দনীয় নহে। কিন্তু ইহার সহিত খ্যাতিলাভগণনার সংস্রব থাকায়, ইহাতে দাতার মহোচ্চহৃদয়ের পরিচয় প্রকাশিত হয় না। যাঁহারা উপাধিলাভের পূর্ব্বে গ্রামে গ্রামে দীনদরিদ্রদিগকে অন্ন জল বিতরণ করিয়া গলদ্‌ঘর্ম্মকলেবরে আত্মকার্য্যের ঢক্কানিনাদ করিতেছেন, উপাধিলাভ করিবামাত্র তাঁহারাই যে আবার দীনদুঃখীদিগকে রিক্তহস্তে ফিরাইয়া দিতেও কাতর হন না,—এরূপ দৃষ্টান্ত এ হতভাগ্য দেশে বিরল নহে। যে বিষয়ে দান করিলে রাজার শুভদৃষ্টিলাভের পথ সহজ হইবে, সেই বিষয়ে দান করিবার জন্যই ইঁহাদের সমধিক আগ্রহ। নিজের বাসগ্রামের কাঙ্গাল প্রতিবেশিগণ অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে, তাহাদের করুণ ক্রন্দন নিতাই কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে, অথচ ধনকুবের গ্রামবাসী বড়লোক মহাশয় শৈলশিখরবিহারী বিলাসিগণের বিশ্রামভবননির্ম্মাণের জন্য সমুদয় সহৃদয়তা ফুরাইয়া ফেলিতেছেন,—এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। রাণী ভবানীর দানশীলতা এই শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল না।

তাঁহার দানশীলতার সহিত খ্যাতিলাভগণনার সংস্রব ছিল না বলিয়া তাহা উৎসের ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া চতুর্দ্দিক শীতল করিয়া দিত। স্বদেশপ্রেমিকের জীবন নিষ্কাম সেবকের জীবন। তিনি স্বদেশকে এমন প্রণয়ে স্নেহে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসিতে জানেন যে, তাহাতে তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই মধুময় হইয়া যায়। রাণী ভবানীর পুণ্যকার্য্যের মূলে স্বদেশপ্রীতি বর্ত্তমান থাকায় তাহার আলোচনামাত্রও আমাদের নিকট মধুময় বলিয়া বোধ হয়।

নবম পরিচ্ছেদ;—রাজকুমারী তারা।

রাণী ভবানী যাঁহাদের সহায়তায় রাজসাহীর রাজ্য শাসন করিয়া প্রতিভাশালিনী শাসনকর্ত্রী বলিয়া ইতিহাসে চিরস্মরণীয়া হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই জনের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। রাজান্তঃপুরে রাজকুমারী তারা, এবং রাজকার্য্যালয়ে বৃদ্ধ মন্ত্রী দয়ারাম, রাণী ভবানীর প্রত্যেক রাজকার্য্যের মন্ত্রণার সহায় বলিয়া পরিচিত ছিলেন। স্বচক্ষে দর্শন করিতে না পারিলেও,

স্বকর্ণে সকল কথা শ্রবণ করিয়া, এই দুই জন বিশ্বস্ত মন্ত্রীর সহায়তায়, রাণী ভবানী রাজকার্য্য সুসম্পন্ন করিতেন।

তারা ঠাকুরাণীর (১) নাম নানা কারণে বাঙ্গালীর নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তিনি বিবিধ বিদ্যার অনুশীলন করিয়া বালবৈধব্যপীড়িতা হইয়া নিরন্তর মাতৃসন্নিধানে বাস করিয়া বহুলপরিমাণে মাতৃগুণে বিভূষিতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। যৌবনোন্মেষে তাঁহার রূপলাবণ্য সুশিক্ষার আলোকে অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। রাণী ভবানী তাঁহাকেই রাজসাহী রাজ্যের পাটেশ্বরী করিবার আশায় নবাব-সরকারে জামাতার নাম জারি করাইয়াছিলেন। (২) তাঁহার অকালমৃত্যুতে সে আশা সফল হয় নাই; কিন্তু বালবিধবা তারা রাজসাহীর শাসনকার্য্যে লিপ্ত হইয়া রাণী ভবানীর সবিশেষ সহায়তা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

তারা ঠাকুরাণীর বিষয় বিভবের অভাব ছিল না; মাতার স্নেহানুরাগে তিনি যে সকল তালুক উপঢৌকন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে একালের লোকে বড়মানুষ বলিয়া অহঙ্কার করিতে পারিতেন। কিন্তু রাজকুমারী তারা অতুল সম্পদের অধিকারিণী রাণী ভবানীর সাধু দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া, আত্ম-সম্পদের অধিকাংশ ভাগ পুণ্যকীর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার্থই ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। উপর্য্যুপরি প্রবল ভূমিকম্পে নাটোর-রাজবাটীর প্রায় সমস্ত পুরাতন অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়াছে; সমুন্নত মন্দিরচূড়ায় যে সকল স্থান গৌরবময় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা এখন ভগ্নস্তূপ! যে দুই চারিটি পুরাতন মন্দির বর্ত্তমান ছিল, তাহা বিগত ১৮৯৭ সালের ১২ই জুনের ভূমিকম্পে একেবারে ধূলিপরিণত হইয়াছে। এখন কেবল একটিমাত্র মন্দির নাটোর-রাজবাটীর পূর্ব্ব গৌরবের

---

(১) রাজসাহী প্রদেশে রাজকুমারীমাত্রই "ঠাকুরঝি-মহাশয়"-নামে সম্বোধিত হইয়া থাকেন; ইঁহারা এখনও রাজকার্য্যে অনেক সহায়তা করিয়া থাকেন। প্রাদেশিক প্রথানুসারে তারা দেবীকে লোকে "তারা ঠাকুরঝি মহাশয়" বলিত; তিনি এখনও সেই নামে পরিচিতা।

(২) রাজসাহীর খাজুরা-গ্রাম-নিবাসী রঘুনাথ লাহিড়ীর সহিত তারা ঠাকুরঝি মহাশয়ের বিবাহ হয়; রাণী ভবানী কন্যাজামাতার হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিবেন বলিয়া নবাবদরবারে রঘুনাথের নাম জারি করাইয়াছিলেন। গ্রাণ্ট সাহেবের রাজস্ববিষয়ক পুস্তকে ইহার উল্লেখ আছে। রঘুনাথের মাতা রাজসাহী কালেক্টরী হইতে ইংরাজ রাজত্বেও পেন্সন পাইয়াছিলেন।

সাক্ষিরূপে দণ্ডায়মান ;—তাহার নাম তারকেশ্বর-মন্দির। ইহা তারা ঠাকু-রাণীর কীর্ত্তিচিহ্ন।

নাটোরের ন্যায় বড় নগরেও তারা ঠাকুরাণীর কীর্ত্তিচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি মাতার সহিত বড়নগরে গঙ্গাবাস করিবার সময়ে, তথায় একটি গোপাল-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন ; তাহাতে তারা ঠাকুরাণী আত্মপরিচয় প্রদান করিবার সময়ে আপনার স্বামিকুলের উল্লেখ না করিয়া কেবল পুণ্যময়ী মাতার নামোল্লেখ করিয়া লিখাইয়াছিলেন ;—

"শশুনৈত্রশাকে শ্রীভবানীতনুসম্ভবা।
নির্ম্মমে শ্রীমতী তারা শ্রীমদ্গোপালমন্দিরম্ ॥"

এতদ্ভিন্ন রাঢ়দেশে "তারা-পীঠ" নামে যে বিখ্যাত হিন্দুতীর্থক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও তারা ঠাকুরাণীর পুণ্যকীর্ত্তির সাক্ষিরূপে অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। তিনিও মাতার ন্যায় পূজাব্যপদেশে ক্ষুধাতুরকে অন্নদান করিবার জন্য, এই সকল দেবোদ্দেশে অনেক দেবোত্তরভূমি দান করিয়াছিলেন ; এবং তাঁহার অভাবে এই সকল পুণ্যকীর্ত্তি রক্ষা করিবার আশায়, সমস্ত ভার নাটোর ছোটতরফ রাজপরিবারের আদিপুরুষ রাজকুমার শিব নাথ রায় বাহাদুরের উপর ন্যস্ত করিয়া দানপত্র সম্পাদন করিয়া গিয়াছিলেন। (১)

নাটোর রাজবংশের রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে দয়ারামের নাম চিরসংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। কখনও অসিহস্তে ভূষণার শিবিরে, কখনও লেখনীহস্তে নাটোর রাজ-কার্য্যালয়ে, কখনও বা উষ্ণীষমস্তকে নবাব-দরবারে, দয়ারাম রায় আন্তরিক অনুরাগে নাটোরাধিপতির সৌভাগ্যবর্দ্ধনের চেষ্টা করিতেন। রামজীবনের সংসারে দয়ারামের পদমর্য্যাদা সর্ব্বজনপরিচিত হইয়া উঠিয়া-ছিল। তিনি রাজবাটীতে "দয়ারাম দাদা" বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

রাণী ভবানী যখন রাজসাহী রাজ্যের শাসনভার পরিচালিত করিতে-ছিলেন, দয়ারাম তখন বার্দ্ধক্যবশতঃ সর্ব্বদা রাজবাটীতে অবস্থান করিতেন না। তাঁহার অনুপস্থিতিসময়ে কেহ কেহ তাঁহার কৃত কার্য্যের দোষোদ্ঘাটন করিবার চেষ্টায় তারা ঠাকুরাণীর নিকট অনেকরূপ অভিযোগ করিতেন। তদুপলক্ষে সময়ে সময়ে দয়ারাম ও তারা ঠাকুরাণীর মধ্যে কলহ হইত।

---

(১) রাজসাহীর কালেক্টারীতে তারা ঠাকুরাণীর দানপত্রের যে সকল অনুলিপি দেখিতে পাওয়া যায়, মূল দানপত্র নহে বলিয়া তাহাতে তাঁহার স্বাক্ষর নাই। অনুলিপিগুলিও এখন নিতান্ত জরাজীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এই দানপত্র বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত।

সে কলহ কিরূপ সুখের কলহ ছিল, তাহার একটি জনশ্রুতি অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

একবার তারা ঠাকুরাণী সংবাদ পাইলেন যে, দয়ারাম কেবলমাত্র আপনার নাম স্বাক্ষর করিয়া অনেক ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। রাজভৃত্যের পক্ষে এরূপ কার্য্য সম্পূর্ণ অনধিকারচেষ্টা বলিয়া, তারা ঠাকুরাণীর পরামর্শে সেই সমস্ত ব্রহ্মোত্তর অসিদ্ধ গণ্য করিবার জন্য ব্রাহ্মণগণকে রাজধানীতে আহ্বান করা হইল। বিপ্রবর্গ দয়ারামের শরণাগত হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে রাজদরবারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলিয়া, স্বয়ং রাণী ভবানীর দরবারে উপনীত হইলেন।

তারা ঠাকুরাণী বুঝাইয়া দিলেন যে, দয়ারাম রাজভৃত্যমাত্র, রাজকার্য্যপরিচালনের অধিকার থাকিলেও, ভূমিদানের অধিকার নাই। অতএব তাঁহার স্বাক্ষরযুক্ত দানপত্রগুলি অসিদ্ধ! দয়ারাম ইহার কিছুমাত্র প্রতিবাদ না করিয়া এক খণ্ড পুরাতন জীর্ণ পত্র বাহির করিয়া রাণী ভবানীকে প্রদান করিলেন, এবং বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন ;—"মা! আমি রাজভৃত্য হইয়াও যে ব্রাহ্মণগণকে ভূমি দান করিয়াছি, তাহা অসিদ্ধ হয় হউক, তাহাতে আর দুঃখ কি? কিন্তু এই জীর্ণ পত্রখানি দেখুন, ইহা আপনার বিবাহের লগ্নপত্র ; ইহাও কিন্তু এই রাজভৃত্য দয়ারামই স্বাক্ষর করিয়া দিয়াছিল।" (১) বলা বাহুল্য, কাহারও ব্রহ্মোত্তর আর অসিদ্ধ হইতে পারিল না।

তারা ঠাকুরাণীর শিক্ষা দীক্ষার কথা, অপরূপ রূপলাবণ্যের কথা, এবং সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার কথা বঙ্গদেশের সকল স্থানেই ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সে কথা কালক্রমে সিরাজদ্দৌলারও কর্ণগোচর হইয়াছিল। মাতামহের অসঙ্গত বাৎসল্যবশতঃ সিরাজের বাল্যজীবনেই অশেষ কুশিক্ষার বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল ; যৌবনোদ্গমে তাঁহার অধীর হৃদয় প্রবৃত্তিদমনে অশক্ত হইয়া নানারূপ ভোগবিলাসের সূচনা করিয়াছিল। হিরাঝিলের প্রমোদভবনে যে বিলাসলালসা বিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা তারা ঠাকুরাণীর দিকে ধাবিত হইল। বড়নগর-নিবাসিনী রাণী ভবানী ও রাজকুমারী তারা তচ্ছ্রবণে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। অবশেষে গোপনে বড়নগর

---

(১) "মাতর্দ্ধর্ম্মময়ি তব দয়য়ৈব সদাশয়ঃ। মৎকৃতেন চ পত্রেণ বিবাহো যদি সিধ্যতি।
ভৃত্যোঽয়ংহি দয়ারামো দত্তভূমিং দ্বিজন্মনে। তুচ্ছং ব্রহ্মোত্তরপত্রং সিধ্যেদিত্যত্র কা কথা॥"

—লঘুভারতম্।

হইতে পলায়ন করিয়া তারা ঠাকুরাণীর মৃত্যুসংবাদ রটনা করার পরামর্শ স্থির হইলে, তদনুরূপ আয়োজন হইতে লাগিল। বড়নগরের নিকট যে সকল সন্ন্যাসী বাস করিতেন, তাঁহারাই রাণী ভবানী ও তারা ঠাকুরাণীকে গোপনে নাটোরে আনয়ন করিয়াছিলেন, এইরূপ কিম্বদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। এই জনশ্রুতি একেবারে অমূলক বলিয়া বোধ হয় না। রাণী ভবানী সন্ন্যাসীদিগের এই কার্য্যের প্রত্যুপকার করিবার জন্য নাটোরে একটি আখড়া স্থাপন করিয়া ভূমিদান করিয়াছিলেন; তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

জনশ্রুতির কল্যাণে এই ঘটনা বহুবিধ আকারে বঙ্গসাহিত্যে বিবৃত হইয়াছে। দ্বাদশনারী রচয়িতা বলেন,—

"রাজকন্যা তারার রূপরাশির প্রশংসাবাদ শুনিয়া তারাকে আপন জীবনতোষিণী করিতে দুরন্তের ইচ্ছা হইল। ভবানী অর্থের প্রলোভনে ভুলিলেন না। বরং গর্ব্বসহকারে সিরাজকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, যদিও হিন্দুগর্ব্ব খর্ব্বপ্রায়—যদিও হিন্দু আজি উৎসন্নদশাগ্রস্ত, তথাপি সিরাজ হেন পাপিষ্ঠেরা তাহার পদদলিত হইবার যোগ্য নহে। সৈন্যদল নবাবের আজ্ঞাক্রমে রাজসাহীর রাজভবনলুণ্ঠনমানসে তদভিমুখে গমন করিল। অন্নদাত্রী পালনকর্ত্রী মাতার উত্তেজনায় সমগ্র রাজ্য কাঁপিয়া উঠিল। ভবানীর শত সহস্র প্রজা সৈন্য সিরাজের বিদ্রোহিতা অবলম্বন করিল।"

দ্বাদশনারী-লেখক এইরূপ উপক্রমণিকা করিয়া, এই যুদ্ধ বর্ণনায় ইহার উপসংহার করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, সে যুদ্ধে সিরাজসেনা পরাজিত হইয়া মুর্শিদাবাদে পলায়ন করিয়াছিল। রাজসাহী প্রদেশে কিন্তু এরূপ জনশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায় না। নবাব আলিবর্দ্দীর শাসনসময়ে সিরাজের যৌবনোদ্গমকালে তারার উপর তাঁহার পাপচক্ষু পতিত হইয়াছিল; তাহা লইয়া কোনরূপ প্রকাশ্য বলপ্রয়োগের আয়োজন হইতে পারে নাই। সিরাজের হৃদয়বেগ দুর্দ্দমনীয়; সুতরাং রাণী ভবানী বড়নগর হইতে নাটোরে পলায়ন করিয়া আত্মসম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন—ইহাই রাজসাহীর জনশ্রুতি।

আর এক জন লেখক বলেন:—

"রাজকুমারী তারার অলৌকিক রূপলাবণ্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য সিরাজদ্দৌলা গঙ্গাবাসপুরীতে (বড়নগরে) আগমন করিয়া সসৈন্যে রাজপুরী বেষ্টন করিলেন। মাতা ও কন্যা আত্মঘাতিনী হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রাজরাজেশ্বরীর মন্দিরে পূজা আরম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে মত্তরাম নামক জনৈক সন্ন্যাসী শূলহস্তে সিরাজের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ায় তিনি প্রাণভয়ে পলায়ন করায় রাজকুমারীর ধর্ম্মরক্ষা হইল।" (১)

---

(১) নব্যভারতম্।

বড়নগর রাজবাটীর রাণী ভবানীর বংশধর রাজা উমেশচন্দ্রের নিকট শুনিয়াছেন বলিয়া, আর এক জন লেখক লিখিয়া গিয়াছেন ;—

"প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী এই সময়ে বঙ্গের প্রধান জমিদার ছিলেন। ইঁহার হস্তে প্রভূত ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল। ইঁহার প্রচুর ধনবল ও সৈন্যবল ছিল। প্রজাদিগকে প্রাণদণ্ডাদি সর্ব্ববিধ দণ্ডদানের অধিকার ছিল। রাণী এই সময়ে আজিমগঞ্জের নিকটস্থ তাঁহার প্রকাণ্ড ভবনে বিধবা দুহিতা তারা দেবীর সহিত গঙ্গাবাস করিতেছিলেন। তারা অপূর্ব্ব সুন্দরী, তৎকালীন বঙ্গীয় রূপসীমণ্ডলে আদর্শ রূপবতী ছিলেন। সপ্তম বর্ষ বয়সে তারার বিবাহ হয়। বিবাহের সাত দিবস পরে তিনি বিধবা হন। এখন তারা পূর্ণযৌবনা, এক দিন প্রাসাদশিখরে দাঁড়াইয়া সিক্তকেশের রাশি শুষ্ক করিতেছিলেন, এমন সময়ে নবাবের বজরা সেই ভবনের নিম্নস্থ জাহ্নবীবক্ষে ধীরগতিতে ভাসিয়া যাইতেছিল। তরলমতি নবাব শ্যেন পক্ষীর মত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই রূপরাশি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার তরুণ প্রাণে তারার রূপের যে ছাপ বসিয়াছিল, তাহা তিনি কিছুতেই মুছিয়া ফেলিতে পারিলেন না। অবশেষে উন্মাদের মত রাণীর নিকট তারাপ্রাপ্তির প্রস্তাব করিলেন। রাণী রোষে ঘৃণায় অপমানে সংক্ষুব্ধ হইয়া সেই পাপ প্রস্তাবে অসম্মতি প্রদান করিলেন। নবাব সিরাজদ্দৌলা কৌশলে পরাজিত হইয়া বল অবলম্বন করিলেন। ভবানী ভয় পাইলেন না, তাঁহার সাহস টুটিল না।" ইত্যাদি। (১)

বড়নগরের রাজা উমেশচন্দ্র এখন স্বর্গারূঢ়। তিনি রাণী ভবানীর বংশধর বলিয়া গৌরব করিতেন, এবং অনেক বিষয়ে বর্ত্তমান লেখকের সহায়তা করিতেন। তাঁহার নিকট শুনা বলিয়া যত কথা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সমস্তই যে তিনি বলিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ রহিয়া গেল। কোনরূপ প্রকাশ্য বলপ্রয়োগের আয়োজন বা যুদ্ধকলহের কথা যে রাজা উমেশচন্দ্র বিশ্বাস করিতেন, তাহা বোধ হয় না। রাণী ভবানীর জীবনী সঙ্কলনের জন্য তাঁহার নিকট যে প্রশ্নাবলী প্রেরিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ইহার উল্লেখ ছিল ; কিন্তু তিনি রাজসাহী প্রদেশের প্রচলিত জনশ্রুতির কোন প্রতিবাদ করেন নাই।

জনশ্রুতি মুখে মুখে বিস্তৃত হইয়া এত রূপান্তরিত হইয়া পড়ে যে, অল্প দিনের মধ্যেই সত্যের সঙ্গে অসত্য জড়িত হইয়া প্রকৃত তথ্যনির্ণয়ের পথ অবরুদ্ধ করিয়া দেয় ; এ স্থলেও তাহাই হইয়াছে। মুসলমানদিগের ইতিহাসে সিরাজের অনেক কুকীর্ত্তির উল্লেখ আছে, কিন্তু এই ঘটনার উল্লেখ নাই। প্রকাশ্য যুদ্ধ হইলে তাহার কোন-না-কোনরূপ উল্লেখ থাকা সম্ভব হইত।

---

(১) নব্যভারত ; ১২৯৮ ;—শ্রীবিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়।

সিরাজের নবাবী আমলে এই ঘটনা সংঘটিত হয় নাই; আলিবর্দ্দীর শাসনসময়ে হইয়াছিল। সিরাজ ইচ্ছামাত্রই প্রকাশ করিয়াছিলেন, কোনরূপ বাহুবলপ্রয়োগের চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার চরিত্রবিকারের কথা কাহারও অপরিজ্ঞাত ছিল না। রাণী ভবানী কলঙ্কগ্রস্ত হইবার ভয়ে তারা ঠাকুরাণীর মৃত্যু রটনা করিয়া দিয়া নাটোরে পলায়ন করিয়াছিলেন, ইহাই বিশ্বাসযোগ্য জনশ্রুতি।

দশম পরিচ্ছেদ;—রাষ্ট্রবিপ্লব।

রাণী ভবানী যখন রাজসাহীর রাজ্যভার গ্রহণ করেন, সে সময়ে জমিদারেরাই প্রকৃতপ্রস্তাবে এ দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইয়া উঠিয়াছিলেন। সম্রাট আকবরের ন্যায় প্রবলপ্রতাপশালী মোগল রাজরাজেশ্বরকেও জমিদারবর্গের পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইয়াছিল। (১)

নবাব মুরশিদ কুলী খাঁর শাসনসময়ে রাজস্বদানে অশক্ত হইয়া কোনও কোনও পুরাতন জমিদারকে রাজপদ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল; তদুপলক্ষে যে সকল নূতন জমিদারের অভ্যুদয় হয়, তাঁহারাও অল্পদিনের মধ্যেই প্রাচীন জমিদারবংশের ন্যায় পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এইরূপে বিষ্ণুপুর ও বীরভূমির প্রাচীন জমিদার-বংশ, দিনাজপুর, রাজসাহী, বর্দ্ধমান ও কৃষ্ণনগরের অপেক্ষাকৃত আধুনিক রাজবংশ, বাঙ্গালার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া মোগল রাজসরকারে নির্দ্দিষ্ট রাজকর প্রদান করিয়া স্বরাজ্যে স্বাধীনভাবে সর্ব্বপ্রকার রাজশক্তির পরিচালন করিতেছিলেন। ইঁহারা দেওয়ানী ফৌজদারী বিচারকার্য্য সম্পাদন করিয়া অপরাধিগণকে রাজবাটীতে কারারুদ্ধ

(১) The first class of Bengal Zamindars represented the old Hindu and Mohomedan Rajas of the country, previous to the Mogul conquest by the Emperor Akber in 1576, or persons who claimed that status. The second class were Rajas, or great landholders, most of whom dated from the 17th and 18th centuries, and some of whom were, like the first class, *de facto* rulers in their own estates or territories, subject to a tribute or land tax to the representative of the Emperor. These two classes had a social position faintly resembling the Feudatory Chiefs of the British Indian Empire, but that position was enjoyed by them on the basis of custom, not of treaties.

—The Bengal MS Records, vol I. 31.

করিতেন, সেনাপালন করিয়া রাজ্য রক্ষা করিতেন, এবং সর্ব্বাংশে সামন্ত নরপতির ন্যায় পদগৌরব সম্ভোগ করিতেন। (১)

বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার নবাব নাজিমের ন্যায় এই সকল জমিদারগণও দিল্লীশ্বরের সনন্দ গ্রহণ করিয়া, দিল্লীশ্বরের নামের দোহাই দিয়া, রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন; সুতরাং যথাকালে রাজকর প্রদান করিতে পারিলে, মুরশিদাবাদের নবাব ইহাদিগের রাজ্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না।

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ এই সকল পরাক্রান্ত জমিদারদলের সহায়তায় দিল্লীশ্বরের নিকট সনন্দ লাভ করিয়া বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার মস্‌নদ অধিকার করেন। বর্গীর হাঙ্গামায় বিপর্য্যস্ত হইয়া কখনও ঋণগ্রহণে, কখনও বা সেনা-সহায়তাগ্রহণে, নবাব আলিবর্দ্দী জমিদারদলের পদমর্য্যাদার উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। জমিদারেরা স্বরাজ্যে এত দূর প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, ইংরাজ সওদাগরগণ তাঁহাদের দরবারেই বিচারপ্রার্থী হইতেন; সময়ে সময়ে তাঁহাদের উৎপীড়নে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া হাহাকার করিতেন; কখনও বা উৎকোচ উপঢৌকন পাঠাইয়া মনস্তুষ্টিসাধন করিতেও ক্রটি করিতেন না।

সিরাজদ্দৌলা ইহার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি নিজাম-উল্-মোলকের ন্যায় স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন করিবার আশায়, নাম-সর্ব্বস্ব দিল্লীর বাদশাহের সনন্দ-গ্রহণ করা আবশ্যক মনে করিলেন না। বাহুবলে ইংরাজদমন করিয়া, শাসনকৌশলে জমিদারগণকে পদানত রাখিয়া, বিচারবলে দুষ্টদলন করিয়া, ইচ্ছানুসারে রাজ্যশাসন করিবেন, অঙ্কুরেই তাহার কিছু কিছু আভাস পাওয়া গিয়াছিল। সিরাজ-চরিত্র অদম্য হৃদয়বেগের বশীভূত হইয়া উত্তরোত্তর অনেকের স্বার্থের পথে কণ্টক রোপণ করিবে, ইহা বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বেই, রাজধানীর পাত্রমিত্রগণ, জমিদারদলের সহায়তায় অন্য কোনও ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। সিরাজদ্দৌলা তাহার সন্ধান পাইয়াছিলেন; রুগ্নশয্যাশায়ী বৃদ্ধ আলিবর্দ্দীও তাহার পূর্ব্ব লক্ষণ বুঝিতে পারিয়া অন্তিম-সময়ে সিরাজদ্দৌলাকে সাবধান হইবার জন্য উপদেশ দান করিয়াছিলেন।

---

(১) Such Zamindars held princely courts, maintained their own bodies of armed followers, dispensed justice in their territories or estates, and handed down their position from father to son.

—The Bengal MS. Rrcords, vol. l. 33.

বৈদ্য রাজা রাজবল্লভের চেষ্টায় নওয়াজেস মোহম্মদকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য অনেক ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। আলিবর্দ্দীর জীবনকালে নওয়াজেসের মৃত্যু হওয়ায় সে চেষ্টা সফল হয় নাই। সিরাজদ্দৌলা সিংহাসনে পদার্পণ করিবামাত্র ষড়যন্ত্রকারিগণ স্বার্থরক্ষার জন্য নওয়াজেসের পালিত পুত্রের সদ্যোজাত শিশুসন্তানকে সিংহাসনে বসাইবার উদ্যোগ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে সকলে মিলিয়া পূর্ণিয়ার নবাব সাইয়েদ আহম্মদের পুত্র শওকৎ জঙ্গকেই নবাব নির্ব্বাচনের চেষ্টা করায়, সিরাজদ্দৌলা নবাবগঞ্জের যুদ্ধে শওকৎ জঙ্গকে নিহত করায়, সে আশাও নির্ম্মূল হইয়া গেল। ষড়যন্ত্রকারিগণ তখন অনন্যোপায় হইয়া ইংরাজদিগের সহায়তায় মীরজাফরকে সিংহাসনে বসাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

সিরাজদ্দৌলা ইংরাজদিগকে দেখিতে পারিতেন না; ইংরাজেরাও তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই; এরূপ ক্ষেত্রে ইংরাজেরাও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতে অসম্মত হইলেন না।

রাণী ভবানী এই সকল ষড়যন্ত্রে কোন পক্ষেই লিপ্ত ছিলেন না; তিনি বিদেশীয় বণিক-সমিতির সহায়তায় সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার পক্ষপাতিনী ছিলেন না। বরং জমিদারদলের অগ্রণী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে এই অকীর্ত্তিকর রাজবিগ্রহের সংকল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার আশায়, ইঙ্গিতে সদুপদেশ প্রেরণ করিবার জন্য, শাঁখা, সিন্দুর ও শাটী উপঢৌকন পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। রমণীর নিকটেও যাহা স্ত্রীজনসুলভ কাপুরুষোচিত অপকার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, বাঙ্গালার প্রধান প্রধান পুরুষ জমিদার ও সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারিগণ তাহা পৌরুষের কার্য্য বলিয়া ইংরাজের সহায়তা গ্রহণ করাই স্থির করিলেন।

ষড়যন্ত্রের কথা আকারে ইঙ্গিতে সিরাজ-কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু মীরজাফর কোরাণ স্পর্শ করিয়া শপথ করায় তিনি মীরজাফরকেই সেনাপতিপদে বরণ করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন বৃহস্পতিবারে পলাশির প্রান্তরে সিরাজ-সেনার সহিত ইংরাজদিগের যে যুদ্ধাভিনয় হইল, তাহাতেই সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে রাজপ্রাসাদে, এবং রাজপ্রাসাদ হইতে কাঙ্গালের মত রাজপথে দাঁড়াইতে বাধ্য হইলেন। সেনা সংগ্রহ করিয়া নষ্টরাজ্যের পুনরুদ্ধারকামনায় গোপনে বিহার প্রদেশে পলায়ন করিতে গিয়া,

পথিমধ্যে ধৃত ও শৃঙ্খলাবদ্ধচরণে মুরশিদাবাদে আনীত হইয়া, কুকুরের ন্যায় নির্দ্দয়রূপে নিহত হইলেন!

পলাশির যুদ্ধাবসানে যে রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা হইল, তাহাই বাঙ্গালার জমিদার-বংশের স্বাধীন রাজশক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিল। রাজবিদ্রোহী রাজকর্ম্মচারী সিংহাসনে আরোহণ করিলেন; পদাশ্রিত বণিক-সমিতি সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন; তাঁহাদের সহিত নবাবের এবং নবাবের সহিত তাঁহাদের, নানা কারণে মনোমালিন্য সংঘটিত হইতে লাগিল।

মীরজাফর ইতিহাসে "ক্লাইবের গর্দ্দভ" নামে পরিচিত হইয়া উঠিলেন। ক্লাইব স্বদেশযাত্রা করায়, যাঁহাদিগের উপর কলিকাতার ইংরাজদরবারের কার্য্যভার ন্যস্ত হইল, তাঁহারা মীরকাশিমের-টাকা খাইয়া, জরাপলিত বৃদ্ধ "গর্দ্দভকে" কলিকাতায় নির্ব্বাসিত করিয়া, মীরকাশিমকে সিংহাসনদান করিলেন।

মীরকাশিমের দিনও সুখে কাটিল না। তিনি বাঙ্গালীর বাণিজ্য রক্ষা করিতে গিয়া, ইংরাজের বিরাগভাজন হইলেন। কালক্রমে তাহাতেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। সে অগ্নিতে মোগলরাজছত্র ভস্মীভূত হইয়া গেল। মীরকাশিম ফকিরের ন্যায় বঙ্গবিহার উড়িষ্যা হইতে চিরবিদায়গ্রহণ করিলেন; বৃদ্ধ মীরজাফর ইংরাজের হাত ধরিয়া আবার জরাপলিত-মস্তকে গৌরবহীন রাজমুকুট পরিধান করিলেন।

দিল্লীশ্বর শাহ আলম নামমাত্র বাদশাহ ছিলেন। মহারাষ্ট্র সেনাপতিগণ তাঁহাকে স্বরাজ্যে প্রবেশ করিতে দেন নাই। তিনি কখন আহমদ শাহ আব্দালী, কখন বা অযোধ্যাধিপতি উজীর বাহাদুরের শরণাপন্ন হইয়া, সিংহাসনারোহণের আয়োজন করিতেছিলেন। তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট তারিখে, বার্ষিক ২৬০০০০০ লক্ষ টাকা রাজকর লইয়া, ইংরাজদিগকে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী-সনন্দ প্রদান করিলেন।

ইংরাজ সেনাপতি লর্ড ক্লাইব ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে "শুভ পুণ্যাহের" সূচনা করিয়া বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যায় ইংরাজ রাজত্বের ভিত্তিমূল প্রোথিত করিলেন; এই হইতে কোম্পানীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করিল।

দিল্লীর অধঃপতনে মোগল সাম্রাজ্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল;- মুরশিদাবাদের অধঃপতনে, সর্ব্বত্র অরাজকতার সূত্রপাত হইল। কোম্পানী বাহাদুর নূতন রাজ্যে সহসা শান্তি সংস্থাপন করিতে পারিলেন না;—অরাজকতা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

এই সকল রাষ্ট্রবিপ্লবে রাণী ভবানী স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া প্রাণপণে প্রজারক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনকৌশলে দস্যু তস্করের অত্যাচার প্রবল হইতে পারিল না; কিন্তু ইংরাজ বণিকদিগের অত্যাচার প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। ইংরাজেরা বঙ্গদেশের নানা স্থানে বাণিজ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন; রাণী ভবানীর রাজ্যেই তাঁহাদের অধিকাংশ বাণিজ্য-দ্রব্য উৎপন্ন হইত। লাভের লোভে অন্ধ হইয়া ইংরাজ সওদাগরগণ বলপূর্ব্বক সুলভ মূল্যে ক্রয় ও দুর্ল্লভ মূল্যে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করায়, দেশের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। রাণী ভবানী ইহার গতিরোধ করিতে পারিলেন না; যাঁহারা দিল্লীশ্বরের সনন্দক্রমে বঙ্গদেশের রক্ষক, তাঁহারাই স্বার্থরক্ষার জন্য ভক্ষক হইয়া উঠিলেন।

বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ।

মার্কিন স্থাপত্য।

একটি গল্প আছে,—আমেরিকার কান্‌সাস্ অঞ্চলে, এক নূতন রেলপথ নির্ম্মাণের সময়, রেল-কোম্পানির সহিত একটি ক্ষুদ্র গ্রামের অধিবাসিগণের বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। অধিবাসিগণ তাঁহাদের ক্ষুদ্র সহরটির মধ্য দিয়া রেল চালাইতে অনুরোধ করেন; কিন্তু রেলের কর্ত্তৃপক্ষগণ, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া, গ্রামের পাঁচ ক্রোশ ব্যবহিত একটি স্থান দিয়া পথ নির্ম্মাণ করিলেন। গ্রামে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল; সাধারণ সভাগৃহে গ্রামবাসিগণ সমবেত হইয়া স্থির করিলেন,—রেলপথ যদি গ্রামের নিকটবর্ত্তী না হয়, গ্রাম নিশ্চয়ই রেলপথের সন্নিহিত হইবে। পরদিন অতি প্রত্যূষ হইতেই বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা, হোটেল ও সাধারণ উপাসনালয়, সমৃদ্ধিশালী গ্রামটিকে মহাশ্মশানে পরিণত করিয়া, পঞ্চক্রোশদূরবর্ত্তী রেলওয়ে ষ্টেশনের সংলগ্ন বৃহৎ প্রান্তরে নীত হইতে লাগিল। সন্ধ্যার মধুর ক্ষীণালোক অপসৃত না হইতেই বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকাস্থ সান্ধ্য-প্রদীপের স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতিঃ এবং সহস্র নরনারীর আনন্দকোলাহলে, পূর্ব্বদিনের নির্জ্জন প্রান্তরটি উৎসবময় হইয়া উঠিল। নাগরিকগণ সদ্যঃ-প্রতিষ্ঠিত ভজনালয়ে সমবেত হইয়া জগদীশ্বরকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ দিলেন; একটা ক্ষুদ্র দিনে, একটি অশ্রুতপূর্ব্ব বিস্ময়কর কার্য্যের সংঘটন হইয়া গেল;—রেলওয়ের কর্ত্তারা অবাক্!

পাঠকপাঠিকাগণ এই বিবরণটি অবাস্তবিক গল্প ভাবিবেন না;—ইহা হোসেন সার ন্যায় কোনও সুচতুর ঐন্দ্রজালিকের অদ্ভুত ইন্দ্রজাল নয়, আধুনিক সম্মোহনবিদ্যার (Hypnotism) সাহায্যেও এ কার্য্য সাধিত হয় নাই;—আধুনিক উন্নত বিজ্ঞানের সাহায্যে ও কেবল স্থপতিবিদ্যার কৌশলে, উল্লিখিত বিস্ময়কর ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

অট্টালিকার স্থানান্তরীকরণ কার্য্যের সহিত আমেরিকার নূতন অধিবাসিগণ বহুকাল হইতে

পরিচিত আছেন। ঠিক অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে কয়েক জন স্থপতিবিদ্যাকুশল ব্যক্তির যত্নে, একটি ক্ষুদ্র গৃহ রাজপথের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে নীত হইয়াছিল। তৎকালে যথোপযুক্তরূপ বলপ্রয়োগের উপযোগী কোনও যন্ত্রই পরিজ্ঞাত ছিল না;—এই প্রতিকূল অবস্থাতেও তাঁহাদের আশাতীত সফলতা দেখিয়া, সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। ভবিষ্যতে অট্টালিকা সকল যাহাতে সহজ ও উৎকৃষ্টতর প্রথায় স্থানান্তরিত হইতে পারে, তাহার একটা সুব্যবস্থা করিবার জন্ত একদল মার্কিন শিল্পী সেই সময় হইতেই বহুবিধ চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞানের নানা শাখার উন্নতির সহিত উক্ত প্রথারও ক্রমোন্নতি হইয়াছে; এবং আজ কাল যে প্রণালীতে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা স্বল্পব্যয়ে যথেচ্ছ পরিচালিত হইতেছে, তাহার বিবরণ শুনিলে বাস্তবিকই স্তম্ভিত হইতে হয়।

আজ কাল ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক কার্য্যের জন্য যে প্রকার যন্ত্রের সাহায্য গৃহীত হইয়া থাকে,—আশ্চর্য্যের বিষয়, অট্টালিকা পরিচালন কার্য্যে তাহার কিছুই আবশ্যক হয় না। কেবল কতকগুলি "স্ক্রু" এবং কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া থাকে; বলপ্রয়োগ কার্য্যটা অশ্বাদি দ্বারাই সম্পন্ন হয়; অধিক বলপ্রয়োগের আবশ্যকতা দেখিলে কখনও কখনও কেবল সাধারণ বাষ্পীয়যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অট্টালিকা স্থানচ্যুত করিতে হইলে, গৃহভিত্তির মধ্য দিয়া যে সকল ছিদ্রপথ থাকে, তন্মধ্যে প্রথমতঃ কতকগুলি দীর্ঘ কাষ্ঠখণ্ড উপর্য্যুপরি রক্ষিত হয়, পরে তাহার উপর কয়েকটি সুদৃঢ় "স্ক্রু" (Lifting jack screw) স্থাপিত করিয়া, কার্য্য আরম্ভ হয়। এই "স্ক্রু"গুলি কিয়ৎকাল ঘুরাইলেই অট্টালিকা ভিত্তিচ্যুত হইয়া উর্দ্ধে উত্থিত হইতে থাকে। এই "স্ক্রু"গুলি এ প্রকার সুব্যবস্থায় স্থাপিত যে, ইহাদের আবর্ত্তন-কার্য্যে অধিক বলের আবশ্যকতা হয় না,—এক জন সবল ব্যক্তির দ্বারাই এক একটি 'স্ক্রু' বেশ সহজে চালিত হইয়া থাকে। এই প্রকারে উত্তোলিত হইলে, অট্টালিকাটি বৃহৎ বৃহৎ স্তম্ভাকার কাষ্ঠখণ্ডের (Roller) উপর স্থাপিত করিয়া, সম্মুখ হইতে রজ্জু ও শৃঙ্খলাদি দ্বারা সুকৌশলে টানিয়া, অভীষ্ট স্থানে নীত হইয়া থাকে। এই কার্য্যে অধিক কাষ্ঠেরও আবশ্যক হয় না,—অট্টালিকা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই, পশ্চাৎ হইতে কাষ্ঠগুলি আনিয়া নূতনপথ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। এই উপায়ে বাটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে নীত হইলে, নূতন ভিত্তির খনন-কার্য্য আরম্ভ হয়;—পরে ভিত্তি-গহ্বরের উপরও কাষ্ঠ সজ্জিত করিয়া, অট্টালিকাটি গহ্বরের উপর আসিয়া উপস্থিত হইলে, নূতন ভিত্তি গঠিত করিয়া, পুরাতন বাটীর সহিত তাহা সুদৃঢ়ভাবে সংলগ্ন করা হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত কার্য্যগুলি এত সুকৌশলে সম্পন্ন হইয়া থাকে যে, স্থানান্তরিত করিলে বাটীগুলির অণুমাত্র ক্ষতি হয় না। অল্প দিন হইল, সিকাগো সহরে একটি নূতন রাজপথ নির্ম্মাণের প্রয়োজন হয়। রথ্যাটি বিখ্যাত নর্ম্মাণ্ডি হোটেলের অধিকৃত ভূমিখণ্ডের উপর দিয়া না গেলে, সাধারণের বিশেষ অসুবিধা হইত। উপায়ান্তর না দেখিয়া হোটেল-স্বামী পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে বৃহৎ বাড়ীটি ২৫০ গজ দূরবর্ত্তী একটি স্থানে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই কার্য্য এত দক্ষতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল যে, হোটেল-পরিচালনকালে হোটেলবাসী ভদ্রলোকগণের স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট গৃহ পরিত্যাগের প্রয়োজন হয় নাই, এবং চলিষ্ণু হোটেলে থাকিয়াও, তাঁহারা কোন প্রকার অশান্তি ভোগ করেন নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ব্রাইটন্‌ব্রিচ্ নামক আর একটি ৩৫০ হাত উচ্চ ত্রিতল হোটেল স্থানান্তরিত হয়। এই হোটেলটি ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে, সমুদ্র হইতে প্রায় ৪০০ হাত দূরে বহুব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল; কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে, এই প্রাসাদের সংলগ্ন অধিকাংশ ভূমিই সাগরগর্ভসাৎ হওয়ায়, ইহার স্থায়িত্বসম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু হোটেলস্বামী বাড়ীটি স্থানান্তরিত করিবার ইচ্ছা

প্রকাশ করিলে,—কেহই সেই বৃহৎ প্রাসাদ নির্ব্বিঘ্নে পরিচালিত করিতে সাহস করেন নাই। অল্প দিন হইল, মিলার নামক জনৈক শিল্পী, ১১২ খানি অনাবৃত রেলগাড়ীর উপর বাড়ীটি পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে স্থাপিত করিয়া, বাষ্পীয় শকটের সাহায্যে স্থানান্তরিত করিয়াছেন।

এই অট্টালিকা-পরিচালন কার্য্য আজকাল আমেরিকায় এত অধিক হইতেছে যে, অধিবাসিগণের নিকট ইহা একটা দৈনন্দিন ঘটনা বলিয়া বোধ হয়। প্রত্যেক বৃহৎ নগরেই বাটী স্থানান্তরিত করিবার জন্য দুই তিনটি কোম্পানী আছে;—উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইলে, তাহারা ক্ষুদ্র বৃহৎ অট্টালিকামাত্রই নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া আইসে। বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে, আমেরিকার সহিত য়ুরোপের বহুকাল হইতে প্রতিযোগিতা চলিতেছে, এবং অনেক ব্যাপারে য়ুরোপীয়গণ মার্কিনের সমকক্ষতাও লাভ করিতেছেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আজও কোনও য়ুরোপীয় শিল্পী প্রাসাদসঞ্চালন-বিদ্যার অনুসরণ করিতে পারেন নাই।—এখন যে উপায়ে সৌধ প্রভৃতি স্থানান্তরিত হইয়া থাকে, তাহাই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রথা; তাহা বলা যায় না;—আজ কাল ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ প্রদেশের নগরগুলির প্রতিদিনই যে প্রকার উন্নতি হইতেছে, এবং বাণিজ্য ও লোকসংখ্যার সহিত নগরমধ্যে জলাশয় ও নূতন রাজপথাদির যে প্রকার আবশ্যকতা দৃষ্ট হইতেছে,—তাহাতে আশা করা যায়, এই প্রথা ক্রমেই অধিকতর উন্নত হইবে। *

অধ্যাপক ল্যাঙ্গলে।

আমেরিকার বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্ অধ্যাপক ল্যাঙ্গলের (S. P. Langley) নানা গবেষণার কথা, "বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহে" পূর্ব্বে অনেক লিখিত হইয়াছে। যথেচ্ছ বিমানবিহারের উপযোগী একটি যন্ত্রনির্ম্মাণের জন্য, ইনি গত দ্বাদশ বর্ষ হইতে যে প্রকার সহিষ্ণুতার সহিত পরীক্ষাদি করিয়া আসিতেছেন, তাহার উদাহরণ জগতে বাস্তবিকই দুর্লভ। সম্প্রতি অধ্যাপক ল্যাঙ্গলে, একখানি ইংরাজি বৈজ্ঞানিকপত্রে, তাঁহার পরীক্ষাদির আমূল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বায়ু অপেক্ষা লঘু বাষ্প দ্বারা সাধারণ উপায়ে যে প্রকারে ব্যোমযান উৰ্দ্ধোথিত হইয়া থাকে,—সেই প্রথায় ব্যোমযান-নির্ম্মাণ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহার কল্পনা কিছু মৌলিক ধরণের;—অধ্যাপকের সঙ্কল্প ছিল, পক্ষিজাতির ন্যায় অতি দুর্ব্বল প্রাণিগণ যে উপায়ে দুইখানি পক্ষের সাহায্যে অনায়াসে আকাশে বিচরণ করে,—সেই প্রকার কৃত্রিম-পক্ষ নির্ম্মাণ করিয়া, আকাশপরিভ্রমণের একটা যন্ত্র উদ্ভাবন করিবেন। শকুন ইত্যাদি কতকগুলি পক্ষীকে উড়িবার সময় স্থিরপক্ষ হইয়া আকাশে বিচরণ করিতে দেখিয়া,—এই সকল পক্ষীর উড্ডয়ন-কৌশল আবিষ্কার করিবার জন্য ইনি প্রথমতঃ বহুবিধ পরীক্ষা করেন; আবশ্যকীয় যন্ত্রাদির নির্ম্মাণকল্পে, এই প্রথম অনুষ্ঠানেই তাঁহার বহুল অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল। কিন্তু অনতিকালমধ্যেই এই প্রভূত অর্থব্যয়ের সার্থকতা দৃষ্ট হইয়াছিল;—বহু পরীক্ষাদির পর পক্ষীদের উড্ডয়ন-তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া,—অতি লঘু ও ঈষৎবক্র ধাতুফলকে সুকৌশলে চাক্রবালিক (Horizoutal) অর্থাৎ "আড়া-আড়ি" গতি প্রয়োগ করিয়া, তিনি ধাতু-ফলক-

---

* অনুসন্ধিৎসু পাঠক, অট্টালিকাসঞ্চালন প্রথার সচিত্র বিবরণ, গত জুলাই মাসের ষ্ট্রাণ্ড ম্যাগাজিন্ নামক ইংরাজি মাসিকপত্রে দেখুন।

টিকে অচঞ্চল অবস্থায় রাখিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, এবং উহাকে যে কোনও দিকে চালিত করিবারও সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

উপাদান সকল হস্তগত হইলে, এবং নির্ম্মাণপ্রথা সুপরিচিত থাকিলে,—প্রায়ই অভীষ্ট যন্ত্র-নির্ম্মাণ কঠিন হয় না; কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী পরীক্ষাদির পর পক্ষীর উড্ডয়ন-তত্ত্ব সম্বন্ধে নানা বিষয় আবিষ্কার করিয়াও, কল্পিত যন্ত্রটির নির্ম্মাণ-বিষয়ে ল্যাঙ্গলে সাহেবকে নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত কৃত্রিমপক্ষে চাক্রবালিক গতির যোজনা করিতে হইলে, কোন্ প্রকার যন্ত্র দ্বারা অবিরাম গতিযোজন কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে, তিনি বহু চিন্তাতেও তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। অধ্যাপক স্বয়ং জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও গণিতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, কিন্তু আধুনিক যান্ত্রশিল্পে তৎকালে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন না; এই জন্য পূর্ব্বোক্ত কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা, তাঁহার বড়ই দুরূহ বোধ হইয়াছিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া, শেষে কয়েকটি শিল্পী বন্ধুর সাহায্য গ্রহণ করিয়া, নানাপ্রকার যন্ত্র দ্বারা কৃত্রিম পক্ষ উদ্ধোত্থিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রত্যেক পরীক্ষাতেই পক্ষপরিচালক যন্ত্রটির ভারাধিক্য প্রযুক্ত সকল আয়োজনই ব্যর্থ হইতে লাগিল। পুনঃপুনঃ অকৃতকার্য্য হইয়াও, ল্যাঙ্গলে অণুমাত্র নিরাশ হ'ন নাই;—শেষে কয়েকটি সুচতুর শিল্পীর সহিত পরামর্শ করিয়া, একটি ২৬ আউন্স-(এক সেরেরও কম!)-ভারবিশিষ্ট বাষ্পীয়যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই অতি ক্ষুদ্র যন্ত্রটির অসাধারণ শক্তি * দেখিয়া, তাহার সাহায্যে ল্যাংলের নূতন ব্যোমযানটি যে নির্ব্বিঘ্নে চালিত হইবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ রহিল না। কিন্তু সমগ্র যন্ত্রটি পরীক্ষাক্ষেত্রে নীত হইলে, তাহাতে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা ত্রুটি দৃষ্ট হইতে লাগিল। একটি সংশোধিত হইতে না হইতেই, অপর এক অভাবনীয় দোষ প্রকটিত হইয়া, অধ্যাপকের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিতে লাগিল। এই প্রকার বিবিধ ত্রুটির সংশোধনে প্রায় পাঁচ বৎসর অতিবাহিত করিয়া, গত মে মাসে, ল্যাঙ্গলে যন্ত্রনির্ম্মাণ শেষ করিয়াছেন।

ল্যাঙ্গলের এই যন্ত্রটির আয়তন অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু যথেচ্ছ আকাশপরিভ্রমণের উপযোগী সকল সুব্যবস্থাই ইহাতে সুন্দরভাবে দর্শিত হইয়াছে। এখন এই প্রথায় বৃহদায়তন যন্ত্রের নির্ম্মাণ ও তাহার পরীক্ষা না হইলে, এই আবিষ্কারের উপযোগিতা কিছুই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না। ল্যাঙ্গলে কয়েকটি বিখ্যাত শিল্পীকে এই প্রথায় যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন, সম্প্রতি "ম্যাক্সিম" কামানের উদ্ভাবয়িতা হেরাম্ ম্যাক্সিম্, অন্য প্রণালীতে, একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আকাশ-ভ্রমণ যন্ত্রের নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এবং ইতিমধ্যে একটি কারখানা স্থাপিত করিয়া, উক্ত যন্ত্র বিক্রয়ও করিতেছেন। † ল্যাঙ্গলের যন্ত্র নির্ম্মিত হইলে, উভয় যন্ত্রের মধ্যে বিশেষ প্রতিযোগিতা হইবার সম্ভাবনা। শেষে যোগ্যতরটিই যে স্থায়িত্ব লাভ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই;—কিন্তু অধ্যাপক ল্যাঙ্গলে অসাধারণ অধ্যবসায়ের সহিত পক্ষীর উড্ডয়ন-ব্যাপার সম্বন্ধে যে সকল নবতত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছে,—সে গুলি নিশ্চয়ই অধ্যাপকের নাম অক্ষয় রাখিবে।

---

* ইহার শক্তি এক ঘোড়ার শক্তির তুল্য;—অর্থাৎ, একটি ৩৩০০০ পৌণ্ড ভারবিশিষ্ট কোনও পদার্থকে, এক মিনিট সময়ের মধ্যে, এক ফুট উর্দ্ধে তুলিতে যে শক্তির আবশ্যক, যন্ত্রটি হইতে সেই পরিমাণ শক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

† ম্যাক্সিমের এই যন্ত্রের বিশেষ বিবরণ আজও প্রকাশিত হয় নাই;—জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি পরিজ্ঞাত হইলে, যথাসময়ে "সাহিত্যে" বিবৃত হইবে।

বুদ্বুদ।

বুদ্বুদ পদার্থটা অতীব তুচ্ছ,—জগতে যাহা কিছু অকিঞ্চিৎকর, ক্ষণস্থায়ী ও অসার, বুদ্বুদের সহিত সকলেই তাহার উপমা দিয়া থাকে;—কিন্তু বিজ্ঞানবিদ্‌গণের নিকট বুদ্বুদ একটা বিষম ব্যাপার;—ইহার উৎপত্তি, বিকাশ ও ধ্বংস, সকলই অতীব জটিল কার্য্য-পরম্পরায় জড়িত।

বুচার (I. F. Bucher) নামক জনৈক পণ্ডিত বুদ্বুদ অবলম্বন করিয়া কিছু দিন পরীক্ষাদি করিয়াছিলেন, এবং সম্প্রতি পরীক্ষান্তে বুদ্বুদ সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা প্রকাশ করিয়াছেন। এই পণ্ডিতটি বলেন, তরল পদার্থমাত্রেরই গোলাকার ধারণ করিবার একটা শক্তি আছে। মুক্তাবস্থায় থাকিলেই তরল পদার্থে এই শক্তির বিকাশ দৃষ্ট হয়। এই জন্য, জল কিম্বা অপর তরল পদার্থ উচ্চ স্থান হইতে নিক্ষেপ করিলে, বা কোন তৈলাক্তপাত্র জলসিক্তিত হইলে, জলবিন্দু সকল গোলত্ব প্রাপ্ত হয়। তরল পদার্থের এই একই নির্দ্দিষ্ট আকারগ্রহণ-শক্তির কারণ সম্বন্ধে, বর্ত্তমান ও প্রাচীন কালে অনেক অনুসন্ধান হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিতগণ একমত হইয়া বলেন,—প্রত্যেক তরলপদার্থজাত ক্ষুদ্র বিন্দু-মাত্রেই একটি শক্তি নিয়ত কার্য্য করিতেছে;—উক্ত শক্তি-বিন্দুর ঠিক কেন্দ্র হইতে সমভাবে আকর্ষণ করিয়া, চতুর্দ্দিকের অণুগুলিকে গোলাকারে সজ্জিত করে। বুদ্বুদের গোলত্বে এই শক্তির কোনও কার্য্যই নাই, ঠিক ইহার বিপরীত আর একটি শক্তি দ্বারা বুদ্বুদ গঠিত হইয়া থাকে। তরল পদার্থের অতিসূক্ষ্ম আবরণ দ্বারা বায়ু আবদ্ধ হইলেই, উক্ত বায়ুর মধ্য হইতে একটি চাপ সমান বলে আবরণের চারি দিকে আঘাত করিতে থাকে; ইহারই ফলে আবরণ স্ফীত হইয়া, সাধারণতঃ গোলাকার বুদ্বুদে পরিণত হয়।

বুদ্বুদের আবরণ অতীব সূক্ষ্ম; বুচার সাহেব গণনা করিয়া দেখিয়াছেন,—জলবিম্বের দশ লক্ষ আবরণ উপর্য্যুপরি সজ্জিত করিলে, ইহাদের সমবেত স্থূলতা এক ইঞ্চির অধিক হয় না। এতদ্ব্যতীত বুদ্বুদের উপর সূর্য্যরশ্মি পতিত হইলে যে সকল সুন্দর বর্ণ দৃষ্ট হয়, তাহার উৎপত্তির কারণ-নির্ণয়েও অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন; এবং বুদ্বুদের সূক্ষ্ম আবরণ কি পরিমাণ স্থূল হইলে, উহার বাহ্য অংশ, অন্তর্ভাগ হইতে প্রতিফলিত আলোকতরঙ্গের সহিত সম্মিলিত হইয়া কোন্ কোন্ বর্ণের উৎপাদন করিবে, তাহাও বুচার সাহেব গণনা করিয়াছেন।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

মহিলা ঔপন্যাসিক।

ইংরাজী সাহিত্যে উপন্যাসের অসাধারণ আদরের কথা আর নূতন করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালীন সাহিত্যে নাটকের যে স্থান, বর্ত্তমান সময়ের সাহিত্যে উপন্যাসের সেই স্থান। ব্ল্যাক, ব্ল্যাকমোর, হার্ডি ও হাগার্ড হইতে ক্রোকেট,

কিছু পর্য্যন্ত ঔপন্যাসিকদিগের নিত্য নূতন উপন্যাস বর্ত্তমান সময়ের ইংরাজী সাহিত্য প্লাবিত করিয়া দিতেছে। ইংরাজী সাহিত্যে প্রতিদিন গড়ে ছয় বা সাত খানা নূতন উপন্যাস প্রকাশিত হইয়া থাকে। আবার ইংরাজী সাহিত্যে উপন্যাসের বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মহিলা ঔপন্যাসিকের সংখ্যাও বর্দ্ধিত হইতেছে। এই সকল মহিলা ঔপন্যাসিকের উপন্যাস পুরুষ ঔপন্যাসিকদিগের উপন্যাস অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে। "ওয়্যান্ অ্যাট্ হোম্" পত্রে শ্রীমতী সারা টুলে, ত্রয়োবিংশতি জন মহিলা ঔপন্যাসিকের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

এই প্রবন্ধে দেখা যায় যে, এই ত্রয়োবিংশতি মহিলা ঔপন্যাসিকের মধ্যে, পঞ্চদশ জন বিবাহিতা; অবশিষ্ট আট জন কুমারী। বিবাহিতাদিগের মধ্যে তিন জন বিধবা; তিন জন বিবাহবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন। আজ কাল ইংরাজী সাহিত্যে বিবাহের ঔচিত্য অনৌচিত্যের বিচার ও প্রেমবিহীন বিবাহের বিষয়ে আলোচনা যেন কিছু অতিরিক্ত হইয়া দাঁড়াইতেছে। এই সকল মহিলা ঔপন্যাসিকদিগের মধ্যেও কেহ কেহ এই সকল আলোচনায় যোগদান করিয়াছেন। অলিভ্ স্লিনারের Story of an African Farm ও সারা গ্র্যাণ্ডের Heavenly Twins প্রভৃতি গ্রন্থে ইহাই দেখা যায়। উইডা আপনি অবিবাহিতা; তিনি এক স্থানে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ইংরাজী সাহিত্যের অধঃপতনের একটা কারণ এই যে, যে প্রণয় গীর্জ্জায় বা অন্ততঃ রেজেষ্ট্রী-আফিসে সার্টিফিকেট না পায়, সে প্রণয়ের কথা উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করা নিষিদ্ধ। এই অতিরিক্ত সুরুচিপ্রিয়তা ইংরাজী উপন্যাসের অধঃপতনের অন্যতম কারণ।

বিবাহ-বন্ধন।

শ্রীমতী টুলে যে ত্রয়োবিংশতি জন মহিলা ঔপন্যাসিকের বিবরণ বিবৃত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে বিদেশের প্রভাব পরিহার করিতে পারেন নাই। শ্রীমতী ক্লিফোর্ড, অলিভ্ স্লিনার এবং শ্রীমতী হামফ্রি ওয়ার্ড, উপনিবেশে জন্ম গ্রহণ করেন। জন অলিভার হব্স্ আমেরিকায় ও শ্রীমতী মোল্স্‌-ওয়ার্থ হল্যাণ্ডে জন্মিয়াছিলেন। উইডা অর্দ্ধেক ফরাসী। শ্রীমতী ষ্টিলের শিক্ষা ভারতবর্ষেই হইয়াছিল। ফ্লোরেন্স মেরিয়াটও অল্প বয়সে কিছু কাল ভারতবর্ষে কাটাইয়াছিলেন। মেরী করেলি, কুমারী এডওয়ার্ডস্ ও শ্রীমতী ম্যাকুওড্, ইহাদিগের উপর ফরাসী প্রভাব বড় পরিস্ফুট। বিয়াট্রিস হ্যারাডেন্ কিছু কাল ক্যালিফর্ণিয়ায় ছিলেন। শ্রীমতী হ্যারিসনও ভারতবর্ষের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। সারা গ্র্যাণ্ডের বিবাহিত জীবন সিঙ্গাপুর, হংকং প্রভৃতি প্রাচ্য প্রবাসেই অতিবাহিত হইয়াছিল। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, এই ত্রয়োবিংশতি জন মহিলা ঔপন্যাসিকের মধ্যে কেবলমাত্র সাত জন খাঁটি ইংরাজী প্রভাবের মধ্যে পরিবর্দ্ধিত; আর সকলেই অল্পাধিকপরিমাণে বিদেশের বিভিন্ন প্রকার অবস্থার মধ্যে থাকিয়া, অন্যপ্রকার প্রভাবের অধীন ছিলেন। শ্রীমতী মিড্ ও সারা গ্র্যাণ্ড আয়র্লণ্ডে, ও শ্রীমতী ষ্টিল্ স্কটল্যাণ্ডে, জন্মগ্রহণ করেন।

বিদেশের প্রভাব।

এই সকল মহিলা ঔপন্যাসিকের মধ্যে অনেকের প্রথম পুস্তকই সাধারণের নিকট বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। এ কথা অবশ্য বলাই বাহুল্য যে, প্রথম পুস্তক প্রকাশের জন্য প্রকাশক পাইতে অনেকেরই বড় বিপদ হইয়াছিল। সারা গ্র্যাণ্ড আপনি তাঁহার প্রথম পুস্তক প্রকাশ করেন। কুমারী হ্যারাডেনের প্রথম পুস্তক সম্বন্ধে প্রকাশক ব্ল্যাকউড্ এই মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, অমন বিষাদপ্লাবিত পুস্তক পাঠক-সমাজে আদৃত হয় না; কিন্তু পুস্তকখানির আশাতীত আদর হইয়াছিল।

প্রথম পুস্তক।

এই সকল মহিলা ঔপন্যাসিকের মধ্যে অনেকের প্রথম পুস্তক অল্পবয়সে রচিত। কুমারী

ব্রাডন চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার প্রথম পুস্তক প্রকাশ করেন। প্রথম পুস্তকের রচনাকালে জন অলিভার হব্‌সের বয়স দ্বাবিংশতি ও অলিভ্‌ স্ক্রিনারের বয়স, বোধ করি, বিংশতি বৎসর হইয়াছিল।

শ্রীমতী হামফ্রি ওয়ার্ড, কুমারী সার্জেন্ট ও কুমারী ব্রাডেন, তিন জনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কুমারী বার্ণেট দরিদ্রের দুহিতা; অল্পবয়সে গল্প লিখিবার কাগজ সংগ্রহ করাই তাঁহার পক্ষে দুষ্কর ছিল। শ্রীমতী হ্যারিসনের পিত্রালয়ে অল্পবয়সে উপন্যাস-পাঠের ব্যবস্থা ছিল না। অধিক বয়স না হইলে তিনি উপন্যাস পাঠ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হয়েন নাই।

এই সকল মহিলা ঔপন্যাসিকের মধ্যে কেহ কেহ সাধারণ ধরণের উপন্যাস লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন। কেহ কেহ আজকাল্‌কার বিবিধ সামাজিক সমস্যার তর্ক বিতর্কে উপন্যাস পূর্ণ করিতেছেন। শ্রীমতী হামফ্রি ওয়ার্ড তাঁহার উপন্যাস-সমূহে ইংলণ্ডের নানা সামাজিক সমস্যায় মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; তাঁহার পুস্তকে শিক্ষণীয় বিষয়ের অভাব নাই, ইহা তাঁহার পক্ষে অল্প প্রশংসার কথা নহে। আত্মাভিমান একটু অল্প হইলে তাঁহার পুস্তক সাধারণের নিকট আরও অধিক আদৃত হইত, সন্দেহ নাই। প্রণয়হীন পরিণয়ের সম্বন্ধে আজকাল নানা উপন্যাসে যে নানারূপ মতামত দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার মূল অলিভ্‌ স্ক্রিনারের Story of an African Farm গ্রন্থে। সেই গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন যে, প্রণয়ের জন্য যে বিবাহ হয়, সে বিবাহ আত্মায় আত্মায় মিলনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাহ্যিক নিদর্শন; আর প্রণয়হীন পরিণয়ের মত অপবিত্র ব্যাপার জগতে আর কিছুই নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার এই মহিলা ঔপন্যাসিকের গ্রন্থে যে তর্কের উৎপত্তি, তাহার ব্যাপ্তি এখন বহু ঔপন্যাসিকের গ্রন্থে দৃষ্ট হইবে।

উপন্যাসে মতামত।

শ্রীমতী লিন্‌ লিন্‌টন তাঁহার সমসাময়িক সমাজের চিত্র চিত্রিত করিয়া থাকেন। মহিলাদিগের নানারূপ খেয়াল ও চাতুরী, পুরুষদিগের আত্মম্ভরিতা, তাঁহার পুস্তকে অতি নিপুণভাবে চিত্রিত দেখা যায়। তাঁহার উপন্যাসে যেন সমাজের প্রতি তাঁহার বিরক্তি ও কিছু ঘৃণার ভাব প্রকাশিত দেখিতে পাই।

শ্রীমতী ষ্টিলের গ্রন্থে ভারতবর্ষের নানা ছবি অঙ্কিত হইয়া থাকে।

মেরী করেলির সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়াই আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। মেরী করেলি এক দিকে যেমন আজকালকার "সোসাইটী"র প্রতি তীব্রতম আক্রমণ করিয়া থাকেন, অপর দিকে আজকালকার শালীনত্ববিবর্জ্জিতা "নবনারী"র প্রতি তাঁহার ঘৃণা ও ক্রোধের সীমা নাই। জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি কতকগুলি মতে তাঁহার বিশ্বাস আছে। খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মের মতামতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বাহির করাও তাঁহার পুস্তকের একটা বিশেষ অঙ্গ। সমালোচকদিগের উপর তাঁহার বড়ই ক্রোধ; তাঁহার Sorrws of satan গ্রন্থে তিনি সমালোচকদিগকে সং সাজাইয়া দেখাইয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ সকল সাধারণ পাঠকসমাজে সবিশেষ আদর পাইয়াছে।

জীবন-চরিত।

হামফ্রি ওয়ার্ড।

"সাহিত্যে"র বর্ত্তমান সংখ্যায় "সহযোগী সাহিত্যের" অপর একটি প্রবন্ধে আমরা শ্রীমতী হামফ্রি ওয়ার্ড সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়াছি। বর্ত্তমান সময়ের ইংরাজি ঔপন্যাসিকদিগের মধ্যে তাঁহার স্থান একটু স্বতন্ত্র। বাস্তবাদর্শ-প্রিয় ও কল্পনাদর্শ প্রিয়, এই দুই শ্রেণীর ঔপন্যাসিকদিগের কোনও শ্রেণীতেই শ্রীমতী ওয়ার্ডের স্থান নির্দ্দেশ করা যায় না। তিনি উভয় দল হইতেই কিছু কিছু গ্রহণ করিয়াছেন; অথচ তিনি উভয় দল হইতেই স্বতন্ত্র। তাঁহার উদ্দেশ্যের উচ্চতা উপলব্ধি করিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে জর্জ্জ এলিয়টের উত্তরাধিকারিণী বলিয়াছেন; আবার কেহ কেহ তাঁহার উপন্যাসে সমাজতত্ত্ব, ধর্ম্ম ও রাজনীতির জটিল তর্ক বিতর্কে বিরক্ত হইয়াছেন। এই শেষোক্ত দলের মত এই যে, শ্রীমতী ওয়ার্ডের কেবল জর্জ্জ এলিয়টের আম্ভরিতাই আছে, তাঁহার প্রতিভা শ্রীমতী ওয়ার্ডের নাই। সম্প্রতি "বুক্‌ম্যান্" পত্রে প্রকাশিত তাঁহার বিবরণ হইতে বর্ত্তমান প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইল।

শ্রীমতী ওয়ার্ডের জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহার জীবনের সহিত তাঁহার পুস্তকের সম্বন্ধ বড় অল্প নহে। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার নানা পুস্তকে তাঁহার আপনার

রচনায় জীবনের ছায়া।

জীবনের ছায়া দৃষ্ট হইবে। শ্রীমতী ওয়ার্ড অ্যাল্‌বড়ুরী নামক পল্লীগ্রামে বাস করেন। অ্যাল্‌বড়ুরী খাঁটি ইংরাজী পল্লীগ্রামের আদর্শ। শ্রীমতী ওয়ার্ডের প্রসিদ্ধ "মার্সেলা" নামক উপন্যাসে এই পল্লীগ্রামের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। ঔপন্যাসিকের আপনার আবাসগৃহ তাঁহার একাধিক উপন্যাসে বর্ণিত গৃহের আদর্শ।

শ্রীমতী ওয়ার্ড দরিদ্রদিগের দুঃখ দুর্দ্দশায় সমধিক সহানুভূতিসম্পন্না হইলেও তাহাদিগের গৃহে তিনি প্রায় কখনই গমন করেন না। কিন্তু গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই

ঔপন্যাসিকের পরিবার।

তাঁহাকে ভালবাসে; তাহারা সকলেই জানে যে, তাঁহার নিকট কোনরূপ সাহায্য প্রার্থনা করিলে কখনই বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিতে হইবে না। শ্রীমতী ওয়ার্ডের এক পুত্র ও দুই কন্যা; ইঁহারা সকলেই দরিদ্রের দুঃখমোচনে বদ্ধপরিকর। কন্যাদ্বয়ের মধ্যে একজন প্রায়ই গ্রামের দরিদ্রদিগের গৃহে গমন করিয়া তাহাদিগের অভাব দূর করিবার চেষ্টা করেন। গত বৎসর গ্রীষ্মকালে তিনি লণ্ডন হইতে বহু দরিদ্র শিশুকে গ্রামে লইয়া আসিয়াছিলেন। গ্রামের দরিদ্র পরিবারসমূহে সেই সকল শিশুর অবস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। ইহাতে গ্রামের দরিদ্রগণও কিছু সাহায্য পাইয়াছে; আর শিশুগণও ধূলিধূমময় জনারণ্য লণ্ডনের বাহিরে স্নিগ্ধশ্যাম শোভাময় পল্লীগ্রামে আসিয়া আনন্দ ও উপকার উভয়ই পাইয়াছে। শিশুরা তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গণে খেলা করিত, এবং তাঁহার মিষ্ট কথায় তুষ্ট হইত। শিশুর দুঃখ তিনি সহিতে পারেন না। ওয়ার্ড-দম্পতী অত্যন্ত অতিথিসৎকারপরায়ণ; তাঁহাদিগের গৃহও লণ্ডন হইতে বড় দূরে নহে; কাজেই তাঁহাদিগের গৃহে দুই এক জন অতিথি প্রায় সর্ব্বদাই থাকেন। শ্রীমতী ওয়ার্ড "ফেশানেবল" সমাজের পক্ষপাতী নহেন; বিলাসিনী আনন্দসর্ব্বস্ব মহিলাদিগকে তিনি দেখিতে পারেন না। সাহিত্যসেবী, শিল্পী প্রভৃতি নানা ব্যবসায়ের বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সহিত মিশিতে শ্রীমতী ওয়ার্ড বিশেষ আনন্দ উপলব্ধি করেন। কোন সাধারণ সভা সমিতিতে তিনি কিছু গম্ভীর; কিন্তু পরিচিতদিগের মধ্যে সকলেই তাঁহার সরস মধুর আলাপে বিশেষ

প্রীত হইয়া থাকেন। শ্রীমতী ওয়ার্ডের বিশেষ গাম্ভীর্য্য বা পাণ্ডিত্যাভিমান নাই। পরন্তু তিনি কথাবার্ত্তায় বিশেষ সরল।

শিক্ষা ও আন্তরিকতা।

সমালোচকগণ একবাক্যে এ কথা বলিয়া থাকেন যে, শ্রীমতী ওয়ার্ডের উপন্যাসসমূহে অসাধারণ আন্তরিকতা লক্ষিত হইয়া থাকে। রচনায় এই আন্তরিকতার জন্য তাঁহার পিতা টমাস আর্ণল্ড এবং তাঁহার ভ্রাতা ম্যাথিউ আর্ণল্ড প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। তাসম্যানিয়ায় শ্রীমতী ওয়ার্ডের জন্ম হয়। পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি সেখান হইতে চলিয়া আইসেন। বিদ্যালয় ত্যাগ করিবার পরেই অক্স-ফোর্ডে বিখ্যাত দার্শনিক ও নীতিবিদ্‌দিগের প্রদর্শিত পথে তিনি সাহিত্য সেবা করিতে আরম্ভ করেন। তখন তিনি সাহিত্য-সমালোচনা, সমালোচনা ও শিশুদিগের উপযোগী গল্প লিখিতেন। তাঁহার সাহিত্য-সমালোচনার বিশেষ প্রশংসা হইয়াছিল। সেই জন্য এড-মণ্ড গস্ দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, আজকাল লোকে উপন্যাস ভিন্ন আর কিছুই পাঠ করিতে চাহে না; তাই ইচ্ছায় হউক, আর অনিচ্ছায় হউক সকল লেখককেই উপন্যাস লিখিতে হয়; শ্রীমতী ওয়ার্ড উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করায় আমরা একজন প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্য-সমালোচক হারাইয়াছি।

শ্রীমতী ওয়ার্ড যখন "রবার্ট এল্‌স্‌মেয়ার" গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তখন তিনি আপনিও একবার ভাবেন নাই যে, তাঁহার পুস্তকে ইংরাজ সমাজে এমন পরিবর্ত্তন ঘটিবে। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইবামাত্র পাঠকসমাজে ইহার এত অতিরিক্ত আদর হইয়াছিল যে, তাহাতে স্বয়ং লেখিকাই বিস্মিত হইয়াছিলেন। "রবার্ট এল্‌স্‌মেয়ার" যে কেবল সাধারণ পাঠকসমাজে অতিরিক্ত আদর পাইয়াছিল, এমন নহে। পাঠকদিগের মধ্যে এক দল কেবল আনন্দলাভের জন্য পাঠ করেন; আর এক দল পুস্তকে লিখিত বিষয় পাঠ করিয়া চিন্তা ও বিচারশক্তির চালনা করিয়া থাকেন। শ্রীমতী ওয়ার্ডের গ্রন্থ এই শেষোক্ত দলের নিকটও অত্যন্ত আদৃত হইয়াছিল।

মহিলাদের সম্বন্ধে তাঁহার মত।

আজ কাল ইংলণ্ডে মহিলাদিগের অধিকার সম্বন্ধে নানা তর্ক বিতর্কের ঝঞ্ঝাবাত সর্ব্বদাই বহিয়া থাকে। এ গোলযোগে শ্রীমতী ওয়ার্ড কোনও পক্ষ অবলম্বন করেন নাই। তবে রমণী-দিগের শিক্ষাদানসম্বন্ধে তাঁহার মত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। অক্স্‌ফোর্ডে অবস্থানকালেই শ্রীমতী ওয়ার্ড মহিলাদিগের মধ্যে উচ্চশিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। মহিলাদিগকে পুরুষের সহিত সমান শিক্ষাদান করাই তাঁহার অভিপ্রেত। আজ এই উনবিংশতি শতাব্দীর শেষ-ভাগে কেহই এ কথা বলিবেন না যে, স্ত্রীশিক্ষা অনাবশ্যক বিলাসমাত্র; এখন এ কথা সর্ব্বতোভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, পুরুষদিগের শিক্ষার মত মহিলাদিগেরও শিক্ষা নিতান্ত আবশ্যক। দেখিতে গেলে শ্রীমতী ওয়ার্ড অন্তঃপুরবাসিনীর মতই বাস করেন। তিনি আপনি সমাজের ফেনিল আবর্ত্তে আসিতে চাহেন না; পরন্তু আপনার সুখপূর্ণ গৃহকোণে থাকিতেই ভালবাসেন। কিন্তু যাঁহারা মনোযোগসহকারে তাঁহার পুস্তক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর বলিয়া দিতে হইবে না যে, তাঁহার গ্রন্থের নায়িকা "মারসেলা"র মত যে সকল মহিলা সমাজ ও প্রচলিত প্রথার যুক্তিহীন কঠোর শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া কর্ম্মপ্রার্থী হৃদয়ের জ্ঞান ও উন্নতির পিপাসা পরিতৃপ্ত করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের সহিত শ্রীমতী ওয়ার্ডের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

মধ্য এসিয়ায় চারি বৎসর।

উৎসাহশীল, কর্ম্মপ্রার্থী, অধীর জাতি সকলের মধ্যে এক এক জন মানব দেশভ্রমণোপলক্ষে যেরূপ কষ্ট সহ্য করিয়া থাকেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। লিভিংষ্টোন প্রভৃতি হইতে ন্যান্‌সেন পর্য্যন্ত ভ্রমণকারিগণের বৃত্তান্ত, গৃহকোণপ্রিয়, বিদেশগমনপরাঙ্মুখ বঙ্গবাসীর নিকট নিতান্তই স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিয়া মনে হয়। সম্প্রতি ডাক্তার স্ভেণ্‌হেডিন মধ্য এসিয়া ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। সেই সঙ্কটসঙ্কুল, বিঘ্নবিজড়িত ভ্রমণ-বৃত্তান্তের কিঞ্চিৎ বিবরণ আমরা প্রদান করিলাম।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে, দ্বাদশটি অশ্ব ও চার জন লোক লইয়া ডাক্তার তুষারসমাচ্ছন্ন পামির-অধিত্যকাভিমুখে যাত্রা করেন। পামিরের পূর্ব্বভাগভ্রমণেই গ্রীষ্মকাল ও শরৎকাল কাটিয়া যায়। খাস্‌গড়ে শীত কাটাইয়া, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি আবার যাত্রা করেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, দুই শত মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে গিয়া মরুপ্রান্তে শস্যশ্যামলা ভূমি পাইবেন; সেখানে কোন প্রাচীন সভ্যতার চিহ্ন দেখিবার আশাও তাঁহার ছিল। ডাক্তারের ইচ্ছা ছিল, সেখান হইতে তিব্বতে যাইবেন। কাজেই বহু দ্রব্যাদি লইতে হইয়াছিল। ভারবাহী আটটি উষ্ট্র ব্যতীত সঙ্গে কুক্কুর, মেষ, কুক্কুট প্রভৃতি ছিল; সেই মরুমধ্যে প্রতিদিন প্রাতে কুক্কুটের পরিচিত কণ্ঠরবে সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইত। একটা উষ্ট্রের ককুদের উপর কুক্কুটের খাঁচাটি রক্ষিত হইত;—প্রথম প্রথম কয় দিন প্রত্যহ ডিম্বের অভাব হইত না। কিন্তু সলিলের স্বল্পতার সঙ্গে সঙ্গে কুক্কুটের ডিম্বপাড়াও বন্ধ হইয়া গেল। সঙ্গে চার জন লোক ছিল,—ভৃত্য ইস্‌লামবেগ, ইয়ারখন্দবাসী কাসিম ও ম[illegible] শা ও মরুপথপ্রদর্শক কাসিম। প্রথম প্রথম কয় দিন ভূমি খনন করিয়া জল পাওয়া যাইত; সে জল লবণাক্ত হইলেও উষ্ট্রের পানোপযোগী। কিছু দিন ভ্রমণের পর সকলে এক পর্ব্বতমূলে উপনীত হইলেন। সেখানে স্ফটিকোপম জলরাশিপূর্ণ দুইটি হ্রদ শোভমান;—কূলে কূলে নলবনে হংস কারণ্ডবাদির কূজন; চারি দিকে ভূমি তৃণলতায় আচ্ছাদিত।

সেখানে দুই দিন অবস্থানের পর সকলে আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। দুই ঘণ্টার মধ্যেই পর্ব্বতমালা দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল। মরুপ্রান্তে শেষ বৃক্ষতলে একটু বিশ্রাম করিয়া আবার সকলে অগ্রসর হইলেন। সঙ্গে দশদিনের উপযোগী জল লইবার কথা ছিল; কিন্তু ডাক্তার দেখিলেন, কেবল চার দিনের উপযোগী জল লওয়া হইয়াছে। কূপ খনন করা হইল—জল উঠিল না। যাহা হউক, পথপ্রদর্শক আশা দিল, চারি দিনের মধ্যেই জল পাওয়া যাইবে। পর দিবস মরুমধ্যে বিষমবাত্যা বহিতে লাগিল। বালুকায় চারি দিক যেন ঘনমেঘাচ্ছন্ন হইয়া গেল; মরুমধ্যে এক প্রকার অস্পষ্ট হরিতাভ আলোক দৃষ্ট হইতে লাগিল। এখন উত্তরে ও দক্ষিণে পর্ব্বতমালা, আর কেবল বালুকাবিস্তার। সকলে পূর্ব্বাভিমুখে বহুকষ্টে সেই বালুকাসমুদ্রপথে চলিতে লাগিলেন। সত্যই এ যেন বালুকাসমুদ্র—বালুকাতরঙ্গে পূর্ণ। দৃশ্যমধ্যে কিছুমাত্র বৈচিত্র্য নাই। মক্ষিকার গুঞ্জনশব্দও শ্রুত হয় না; পবনতাড়িত একটা শুষ্ক বৃক্ষপত্রও দৃষ্ট হয় না! ২৬শে এপ্রেল শূন্য জলকুণ্ড সহ দুইটি উষ্ট্র ত্যাগ করিয়া আসিতে হইল। তখনও যে জল ছিল, তাহাতে কোনরূপে দুই দিন চলিতে পারে। সেই দিন সন্ধ্যাকালে যাত্রিদল বালুকাবিবর্জ্জিত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বড় আশায় কূপ-খনন আরব্ধ হইল।

সলিলানুসন্ধানে।

সকল প্রাণীগুলি, এমন কি কুক্কুট পর্য্যন্ত, বড় আশায় সেই কূপপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। দশ ফিট খননের পর জলসিক্ত মৃত্তিকা দেখা গেল। সকলের মনেই বড় আশার সঞ্চার হইল। তাহার পর আবার শুষ্ক মৃত্তিকা! সকল আশা ফুরাইল। ২৭শে তারিখে দেখা গেল, দুইটি মরাল উড়িয়া যাইতেছে। সকলের মনে আশার সঞ্চার হইল। সন্ধ্যাকালে গগনে সজল জলদজাল দৃষ্ট হইল। তাম্বু খাটান হইল। বারিপাতমাত্র সেই জীবনদায়ী সুধা সংগ্রহের জন্য সকলে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। কিন্তু মেঘমালা পবনতাড়িত হইয়া ভাসিয়া গেল! পর দিন প্রাতে নিদ্রান্তে সকলে দেখিলেন, দ্রব্যাদি বালুকায় প্রোথিতপ্রায়। দ্রব্যাদি তুলিয়া লইয়া আবার যাত্রারম্ভ হইল। চারি দিক বালুকাসমাচ্ছন্ন; যেন মরুদেশ ঘন কুহেলিকাবরণমণ্ডিত। সামান্য দূরের বস্তুও আর নয়নগোচর হয় না। পবনতাড়িত বালুকাকণার ঘাতপ্রতিঘাতে সেই মরুভূমে এক প্রকার শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। সে দিন একটা উষ্ট্র হারাইয়া গেল। ২৯শে তারিখে সামান্য একটু জল অবশিষ্ট ছিল; কিন্তু পর দিবস প্রভাতে আর তাহা পাওয়া গেল না।

বালুকাবাত্যা।

১লা মে দলের সকলেই তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়িলেন। ডাক্তারের নিকট ঊনানে ব্যবহারের জন্য একটু চীনদেশীয় মদ্য ছিল। অগত্যা তিনি তাহাই পান করিলেন। ইহাতে তিনি একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। ডাক্তার যাত্রিদলের পশ্চাতে পড়িলেন। তাহাদের ঘণ্টারবও ক্রমে আর শ্রুতিগোচর হয় না। কোনরূপে তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া ডাক্তার দেখিলেন, তাহারা শুইয়া পড়িয়াছে! দুই জন কাঁদিতে কাঁদিতে আল্লার করুণা প্রার্থনা করিতেছে। তখন উষ্ট্র সকলও শ্রান্ত। সেই সর্ব্বত্র বিরাজমান নিস্তব্ধতার মধ্যে কেবল উষ্ট্রগুলির নিশ্বাসের শব্দ শ্রুত হইতেছিল। সেই দিন হইতে মহম্মদ শা ও মরুপথপ্রদর্শকের আর সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

দিবাবসানসময়ে ডাক্তার অবশিষ্ট পাঁচটি উষ্ট্র লইয়া আবার অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইস্‌লাম ও কাসিম সঙ্গেই চলিল। প্রথমে তিনি উষ্ট্রারোহণে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু নৈশান্ধকারাবৃত মরুমধ্যে তাহা শীঘ্রই অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। তখন লণ্ঠন জ্বালাইয়া সকলে পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় দেখিলেন, কেবলমাত্র আড়াই মাইল পথ আসিয়াছেন। ইস্‌লাম আর চলিতে পারে না। তাহাকে একটু সুস্থ হইলে তাঁহাদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে বলিয়া, ডাক্তার কাসিমকে লইয়া সেই তিমিরাবগুণ্ঠিত নিশীথে আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। লণ্ঠন ইস্‌লামের কাছেই রহিল। সঙ্গে কিছু খাদ্য থাকিলেও আহার করা অসম্ভব;—কারণ, তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক হইলে কোনও খাদ্য গলাধঃকরণ সম্ভব নহে। দুই জন ধীরে ধীরে সারারাত্রি চলিতে লাগিলেন। পর দিন বেলা ১১টার সময় উত্তাপ এত অধিক হইল যে, আর পথ চলা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল; তখন দুই জনে উলঙ্গ হইয়া বালুকা খনন করিয়া শয়ন করিলেন। অপরাহ্ণ হইতে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত আবার পথ চলিয়া উভয়ে বিশ্রাম করিলেন। তাহার পর পথ চলিতে চলিতে কাসিম তাঁহার স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া পূর্ব্ব দিকে কি দেখাইল। ডাক্তার কিছু দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু কাসিম বৃক্ষ দেখিতে পাইয়াছিল। বহুকষ্টে তরুতলে উপস্থিত হইয়া উভয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। উভয়ে সেই রসপূর্ণ তরুপত্র চর্ব্বণ করিলেন। বহুক্ষণ বিশ্রামের পর উভয়ে কূপখননের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কাহারও আর সে সামর্থ্য নাই। তখন উভয়ে সেখানে অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন;—যদি কাসিম বাঁচিয়া থাকে, তবে সে সেই আলোক দেখিয়া আসিতে পারিবে।

তরুতলে।

৪ঠা মে তাঁহারা আবার অনুর্ব্বর ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। দিবাভাগে একটা তরু-

তলে বিশ্রাম করিয়া সাতটার সময় বেশ পরিধান করিয়া ডাক্তার কাসিমকে আসিতে বলিলেন। বহুকষ্টে অস্পষ্টস্বরে কাসিম উত্তর দিল যে, তাহার আর যাইবার শক্তি নাই! ডাক্তার একাকী চলিতে লাগিলেন। রাত্রি একটার সময় পথশ্রমে মৃতপ্রায় হইয়া এক তরুতলে উপবেশন করিলেন। কিছু ক্ষণ পরে কাসিম আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন উভয়ে একত্র চলিতে লাগিলেন। ৭ই মে তাঁহারা দূরে চক্রবালক্রোড়ে শ্যামশোভা দেখিতে পাইলেন। খোটানডারিয়ার অরণ্য তবে আর অধিক দূর নহে। তমস্বিনী রজনীতে উদয়োন্মুখ ক্ষীণচন্দ্রের ম্লান আলোকের মত, আশার জ্যোতিঃ উভয়ের হতাশ হৃদয়ে দেখা দিল।

যাতনাবসান।

উভয়ে পত্রচ্ছায়াবহুল-বন-মধ্যে উপনীত হইলেন; বুঝিলেন, সেই বহুদিনের অভিলষিত-দর্শন নদ আর অধিকদূরব্যবহিত নহে। তখন তৃষ্ণার জ্বালায় কাসিমকে উন্মত্তের মত বোধ হইতেছিল। সেই ছায়াস্নিগ্ধ বন মধ্যেও দিবাভাগে পথভ্রমণ সম্ভবপর নহে। কাজেই দিবসে তরুতলে বিশ্রাম করিয়া, সন্ধ্যা সময়ে ডাক্তার আবার যাত্রা করিলেন। কাসিম আর উঠিতে পারিল না।

সেই নিবিড় বন মধ্যে কোথাও হাঁটিয়া, কোথাও হামা দিয়া, ডাক্তার বনপ্রান্তে উপনীত হইলেন; দেখিলেন, সম্মুখে ম্লানচন্দ্রকরোদ্ভাসিত নদীগর্ভ। এখন নদী জলশূন্য; গ্রীষ্মকালে গিরিশিখরাগত বারিরাশি পাইয়া তাহার শুষ্ক হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইবে, তখন জলকেলীরম্যা স্রোতস্বিনী কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া উঠিবে।

বহুকষ্টে ডাক্তার নদীর শুষ্ক গর্ভ অতিক্রম করিয়া অপর পারে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, পাঁচ ঘণ্টায় কেবল এক ক্রোশ পথ আসিয়াছেন। সেই সময় তাঁহার মস্তকের উপর একটা মরাল উড়িয়া গেল। ডাক্তার এতক্ষণে জলোচ্ছ্বাসশব্দ শুনিতে পাইলেন। দেখিলেন, সম্মুখে স্বচ্ছ নির্ম্মল জলরাশি। এই স্থানে নদীস্রোতের একটু জল বাধিয়া আছে। আপনি জলপান করিয়া তিনি জুতায় করিয়া জল লইয়া কাসিমের নিকট উপস্থিত হইলেন। জলপান করিয়া কাসিমের মৃতপ্রায় দেহে নবজীবন সঞ্চারিত হইল। কিন্তু কাসিম তখনও পথ চলিতে অসমর্থ। ডাক্তার একাকী তিন দিন দুই রাত্রি নদীগর্ভ দিয়া উত্তরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। এ কয় দিন তিনি কেবল তৃণ ও বেঙ্গাচি আহার করিতেন। ৮ই মে তিনি কয়েক জন রাখালের নিকট উপস্থিত হইলেন; আর বিপদের আশঙ্কা রহিল না।

এ দিকে সাঙ্কেতিক অগ্নি দেখিয়া ইস্লাম বেগ ক্রমে ক্রমে অবশিষ্ট একটিমাত্র উষ্ট্র লইয়া ডাক্তারের নিকট উপস্থিত হইল।

বাঙ্গলার ইতিহাসে 'বৈকুণ্ঠ'।

জমা কামেল তুমারী অর্থাৎ মুর্শিদ কুলী খাঁর জমিদারী বন্দোবস্ত প্রবন্ধে দৃষ্ট হইয়াছে (১) যে, কুলী খাঁ বাঙ্গলার প্রায় সমগ্র জমিদারী হিন্দু জমিদারগণের

---

(১) সাহিত্য; জ্যৈষ্ঠ; ১৩০৪। ভ্রমক্রমে "জমা কামেল তুমারী" জমা কামেন তুমারী এইরূপ অদ্ভুত মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে।

সহিত বন্দোবস্ত করিয়া যান। অনায়াসসাধ্য হইলেও কুত্রাপি নূতন মুসলমান জমিদারের পত্তন করেন নাই, বরং সময়ে পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমান জমিদারগণকে অবাধ্যতার জন্য উৎখাত করা হইলে, তাঁহাদের স্থানে হিন্দুর প্রতিষ্ঠা করেন। যে জমিদারী বন্দোবস্তের জন্য বঙ্গীয় সুবাদারগণের মধ্যে তাঁহার নাম শীর্ষস্থানীয়, সেই বন্দোবস্তই আবার তাঁহার কলঙ্ক। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা বাঙ্গলার ইতিহাসের এই অংশের সমালোচনা করিব।

মুর্শিদ কুলী খাঁর প্রতিভা ও ন্যায়নিষ্ঠা ইতিহাসে একবাক্যে স্বীকৃত। যে দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান বাল্যে মুসলমান বণিকের ক্রীতদাসরূপে আরম্ভ করিয়া দিল্লীর বাদসাহের অধীন সর্ব্বোচ্চপদে আরূঢ় হন, তাঁহার প্রতিভা আদর্শস্থানীয়; যিনি ন্যায়বিচারের অনুরোধে স্বীয় একমাত্র পুত্রেরও প্রাণ-দণ্ডের আজ্ঞা দিয়া ভারতের ইতিহাসে রোমীয় বীর-চরিত্রের দ্বিতীয় অভিনয় দেখাইয়াছেন, সেরূপ এক জন ক্ষণজন্মা আদর্শ পুরুষের নিন্দাবাদ রটনা করিবার পূর্ব্বে একটু চিন্তার প্রয়োজন। ভাগ্যদোষে আমাদের দেশে নিরপেক্ষ ইতিহাস-সমালোচকের বড়ই অভাব; নতুবা এরূপ চরিত্র কখনই বর্ত্তমান ভাবে ইতিহাসে দেখা দিত না।

আজি কালি অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলার ইতিহাসের সমালোচনায় যে দুই এক জন বাঙ্গালী লেখক হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, তাঁহারা কেহই অপেক্ষাকৃত প্রাচীন মুসলমান ইতিহাস দুইখানি স্বচক্ষে দর্শন করেন নাই। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস সম্বন্ধে পারসী ভাষায় এ পর্য্যন্ত যে কয়েক-খানি গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত দুইখানি অপেক্ষাকৃত পূর্ব্ববর্ত্তী;—

(১) ইউসুফ্ আলি খাঁর লিখিত নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ের ইতিহাস; অন্য নামের অভাবে আমরা ইহাকে "তারিখ ইউসুফী" নামে অভিহিত করিয়াছি। লেখক, আলিবর্দ্দী খাঁর সমসাময়িক মুর্শিদাবাদের অন্যতম ওমরাহ। আমরা এ পর্য্যন্ত একখানিমাত্র "ইউসুফী" সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি; তাহাও কীটদষ্ট।

(২) এক জন অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের কৃত ইতিহাস। ইহাতে মুর্শিদাবাদের স্থাপনার কিছু পূর্ব্বে, অর্থাৎ শোভাসিংহের বিদ্রোহ হইতে সিরাজদ্দৌলার রাজ্য-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। গ্রন্থে কোন নাম দেওয়া নাই; আমি "তারিখ বাঙ্গলা" নামে ইহার উল্লেখ করায় দেখিতেছি, অনেকে অনুগ্রহ

করিয়া ঐ নাম গ্রহণ করিয়াছেন। গবর্ণর ভান্সিটার্ট সাহেবের আদেশে এই গ্রন্থ লিখিত হয়; সুতরাং ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ইহার সময় ধরা যাইতে পারে। খ্যাতনামা গ্লাডউইন্ সাহেব ১৭৮৮ সালে ইহার অনুবাদ প্রকাশ করেন। (১)

স্পষ্ট দেখা যায়, স্বনামখ্যাত 'সিয়ার-উল্-মুতাক্ষরীণ'-রচয়িতা সায়দ গোলাম হোসেন উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয় হইতে সাহায্য পাইয়াছেন, আলিবর্দ্দীর প্রথমাংশ-রচনায় 'তারিখ ইউসুফী'ই তাঁহার অবলম্বন; দুই এক স্থলে ইউসুফ্ খাঁর নামোল্লেখও আছে।

গোলাম হোসেন সলিমের কৃত "রিয়াজ-উস্-সালাতিন" (১৭৮৬—৮৮ খৃঃ) গ্রন্থে, গ্রন্থকার, মুর্শিদাবাদ ইতিহাসে সিরাজের রাজ্যাধিকার পর্য্যন্ত উল্লিখিত অজ্ঞাতনামা লেখকের সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়াছেন; একবারেই নকল করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মূলগ্রন্থের ভাষার অলঙ্কার মোচন করিয়া সরল করিয়াছেন; কোনও স্থলে নিতান্ত অবিশ্বাস্য বর্ণনা ত্যাগ করিয়াছেন মাত্র। সোসাইটী এখানি মুদ্রিত করিয়াছেন, এবং অনুবাদ প্রকাশেরও চেষ্টা হইতেছে। এই গ্রন্থখানিও মুসলমান-অধীন বাঙ্গলার সম্পূর্ণ ইতিহাস, তবে এখানি সংগ্রহ-গ্রন্থমাত্র।

এখন মুর্শিদ কুলী খাঁর চরিত্র সমালোচনা করিতে হইলে, উল্লিখিত ইতিহাসগুলি কোন্ সময়ে কিরূপ অবস্থায় লিখিত হয়, তাহা না জানিলে পাঠক নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন, এরূপ ভরসা করা যায় না।

---

(১) এই ইতিহাসের একখানি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি শ্রদ্ধেয় বন্ধু দেওয়ান ফজলে রব্বী খাঁ বাহাদুর সংগ্রহ করিয়া আমার হস্তে দিয়াছেন। আরও একখণ্ড সংগ্রহ করিয়া আমরা এসিয়াটিক সোসাইটীর সাহায্যে ইহা মুদ্রিত করিয়া জনসমাজে প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছি। গ্রন্থকার আপনার নাম দেন নাই। কিন্তু দেওয়ান সাহেব বলেন, তাঁহাদের অঞ্চলে লোকপরম্পরায় প্রবাদ যে, ইহা মুর্শিদাবাদের ফতেসিংহ পরগণার সুজাউদ্দীন নামক জনৈক মুন্সীর রচিত। আমাদের সংগৃহীত একখানি গ্রন্থ, জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী গওগ্রাম মঙ্গলকোটের সেখ নজিবুল্লা ১১৯৩ সালের ২১শে ফাল্গুন তারিখে বাবু সুখলালের জন্য নকল করেন। গ্লাডউইনের অনুবাদও ঠিক এই সময়ে প্রকাশিত হয়, দেখা যাইতেছে। এই অনুদিত গ্রন্থও এ দেশে দুর্লভ; মহাত্মা বেভারিজ সাহেব বিলাত হইতে লেখককে তাঁহার নিজখণ্ড পাঠাইয়া উপকৃত করিয়াছেন। ১৭৮৮ সালের 'এসিয়াটিক মিস্‌লেনী'তে এই গ্রন্থ ও ইহার আনুমানিক গ্রন্থকারের বিবরণ কিছু প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি এই প্রাচীন পত্রিকা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ অনুসন্ধান করিয়া এই বিষয় জানাইলে বিশেষ কৃতজ্ঞ হইব।

প্রথমে অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারকে দেখুন। ইনি গ্রন্থারম্ভে গবর্ণর ভান্সিটার্ট সাহেবের এক বিস্তৃত বন্দনা দিয়াছেন। এখানে ভান্সিটার্ট সাহেব সুদীর্ঘ বিশেষণ-ঘটায় বাণভট্টের রাজা শূদ্রক অপেক্ষা বড় কম নহেন। গ্ল্যাডউইন এই অংশের অনুবাদ দেন নাই। সময়ান্তরে আমরা ইহা পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিব। কোম্পানীর কর্ম্মচারী প্রভুগণের সন্তুষ্টিসাধন যে লেখকের অন্যতম উদ্দেশ্য, তাহা তিনি গোপন করেন নাই। "যাঁহারা অন্যের মন্দ দেখিয়া ভাল হইতে চান, বাঙ্গলা দেশের ভূতপূর্ব্ব নাজিমগণের কার্য্যকলাপ তাঁহাদের অবগতি ও সুবিচার জন্য আমি এই ইতিহাস রচনা করিলাম।" বিশেষ দুঃখের বিষয়, লেখক মহোদয়ের লেখনী যেরূপ ওজস্বিনী, সত্যনির্দ্ধারণের চেষ্টা তত দূর দেখা যায় না। ইনি যেখানে যাহা শুনিয়াছেন, অকাতরে তাহাই গ্রহণ করিয়া সুন্দর লিপিকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। কোথাও কতকগুলি অসম্বদ্ধ প্রবাদের সংযোগে, কোথাও বিরুদ্ধ ভাবের কথা এক স্থানে সমাবেশ করিয়া বিষম গোল করিয়া গিয়াছেন। এক বিষয়ে ইনি ঠিক আছেন; ইনি গোঁড়া মুসলমান, কাফের হিন্দুগণের নির্য্যাতনবর্ণনায় লেখকের বড়ই উল্লাস। সুতরাং হিন্দু জমিদার উৎপীড়ন সম্বন্ধে ইঁহার অতিরঞ্জিত উক্তি বিশেষ সাবধানে গ্রহণ করিতে হইবে। কুলী খাঁর হিন্দু জমিদার পীড়ন, হিন্দু দেবালয়ের বিনাশ,-কল্পনা, হিন্দুকে মুসলমান করা ইত্যাদি অবাস্তব ঘটনা সংযোগ জন্য ইনিই দায়ী—পরবর্ত্তী লেখকের তাঁহার পশ্চাৎগামী হইয়াছেন মাত্র। মুতাক্ষরীণকার, এমন কি রিয়াজ গ্রন্থকার পর্য্যন্ত তাঁহার অনেক কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারায় গ্রহণ করেন নাই। পূর্ব্বতন নাজিমগণের কীর্ত্তি ইনি সুদ সহ দেখাইয়াছেন। আলিবর্দ্দী খাঁও এ হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। এখানে আলিবর্দ্দী ঠিক মুতাক্ষরীণে চিত্রিত আলিবর্দ্দী নহেন। বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক হত্যাকাণ্ডে আলিবর্দ্দী খাঁকে ভাস্কর পণ্ডিতের কথা ভিন্ন আরও দুই এক ক্ষেত্রে লিপ্ত দেখাইয়াছেন। এখানেও কাফের হিন্দুবধে লেখকের যেন উল্লাস এবং স্ফূর্ত্তিই দেখা যায়। মুরশিদ কুলী খাঁর "হিন্দু-বিদ্বেষ" সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া আপাততঃ আমরা কেবল জমীদার পীড়নেরই সমালোচনা করিব। আমাদের সৌভাগ্য যে, ইংরেজ দপ্তরের কাগজে এই সময়ের জমিদারী বন্দোবস্তের সম্পূর্ণ ও প্রামাণিক ইতিহাস পাওয়া যাইতেছে। নতুবা লেখকের কাহিনী বাঙ্গলার ইতিহাসের এই অংশে চিরদিনের মত এই কালিমা

রাখিয়া যাইত। যেখানে প্রকৃত বস্তুর সহিত লেখকের উক্তির সামঞ্জস্য নাই, সেখানে আমরা তাহা ত্যাগ করিতে বাধ্য। এইরূপ, মুসলমান লেখকগণও ইহার অনেক উক্তি গ্রহণ করেন নাই।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, মুর্শিদাবাদের ইতিহাসলেখকগণের মধ্যে ইউসুফ আলি খাঁ সর্ব্বপ্রথম। ইনি আপন গ্রন্থের উপক্রমণিকায় স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন, পূর্ব্বতন নাজিমগণের প্রামাণিক ইতিহাস সংগ্রহ করা একরূপ অসাধ্য ব্যাপার। অথচ ইনি মুর্শিদাবাদের এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; তাঁহার পিতা এক জন উচ্চপদস্থ সৈনিক; কটক হইতে দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্র সৈন্যের সম্মুখে আলিবর্দ্দী খাঁর সুবিখ্যাত প্রত্যাবর্ত্তনের অন্যতম সঙ্গী; নানা রূপে রাজসংসারে সংস্পৃষ্ট হইয়াও ইনি সমসাময়িক ইতিহাস ভিন্ন অন্য তথ্য সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। প্রবাদে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া স্বকপোলকল্পিত ইতিহাসরচনায় অপ্রবৃত্তিই কি ইহার কারণ নহে? তবেই দেখা গেল, কুলী খাঁর বিবরণ এই সময়েই, সত্য ও মিথ্যা, এই উভয়বিধ প্রবাদে জড়ীভূত হইতে আরম্ভ হয়। আলিবর্দ্দী খাঁর শত গুণ থাকিলেও, তিনি প্রভুপুত্রের সহিত বিশ্বাসভঙ্গ করিয়া ছলে বলে রাজ্য গ্রহণ করেন; সুতরাং তাঁহার ও তৎপারিষদ-বর্গের বৈঠকে পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনের দোষসমূহ অতিরঞ্জিতভাবে সমালোচিত হইবারই কথা। এরূপ ব্যবহারের কারণও কিয়ৎপরিমাণে বর্ত্তমান না ছিল, এমন নহে। ইউসুফ্ আলি খাঁ বলেন, আত্মীয় সুজা খাঁর আশ্রয় লাভ জন্য যখন আলিবর্দ্দী দিল্লী হইতে মুর্শিদাবাদে আসিয়া পৌছেন, সেই সময়ে নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁ তাঁহার সমাদর করা দূরে থাকুক, বরং উপেক্ষাই প্রদর্শন করেন। প্রকৃতপক্ষে নবাগত অজ্ঞাতকুলশীল ভাগ্যমৃগয়ান্বেষণে ধাবমান মুসলমান সেনানীগণের উপর কোনও কালেই কুলী খাঁর বিশেষ আস্থা ছিল না। ইহারা মুসলমান রাজ্যের বলস্বরূপ না হইয়া বরং দেশের কণ্টক, দূরদর্শী মুর্শিদের এইরূপ ধরণাই ছিল। বাঙ্গলার মুসলমান সামন্তগণের সাধারণ ব্যবহারই ইহার প্রমাণ। বর্ত্তমান কালের রাজপুরুষগণের ন্যায়, কুলী খাঁর স্বজাতি-বাৎসল্য অত্যধিক প্রবল ছিল না। বঙ্গের মুসলমান জায়গীরদারগণ চিরকালই তাঁহার চক্ষুঃশূল। তাঁহাদিগকে উড়িষ্যায় স্থানান্তরিত করিয়া কুলী খাঁ নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচেন। উপরন্তু, চরিত্রহীনতানিবন্ধন জামাতা সুজার প্রতি তাঁহার বিশেষ বাৎসল্য ছিল না। তাঁহার সতীশিরোমণি কন্যারত্নের ভর্ত্তাসত্ত্বেও চিরবৈধব্যপ্রায় অবস্থা সততই তাঁহার হৃদয়ে মুর্ম্মুরদাহ উপস্থিত করিত।

এরূপ ক্ষেত্রে জামাতার দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মাদর বড় একটা আশা করা যায় না। যাহা হউক, আলিবর্দ্দী খাঁ ক্ষুণ্ণমনেই মুর্শিদাবাদ হইতে উড়িষ্যায় প্রস্থান করেন। এই সকল কারণে, সুজা খাঁর বা আলিবর্দ্দী খাঁর মুর্শিদের উপর ভাব ভক্তি বড় ভাল হওয়া সম্ভব কি না, পাঠক তাহার বিচার করিবেন। আমাদের বিশ্বাস, যেমন পরবর্ত্তী বিপ্লবের পর ইংরেজী ইতিহাসে সিরাজের চরিত্র অতিরঞ্জিত হইয়া ভীষণতর আকার ধারণ করিয়াছে, সেইরূপ আলিবর্দ্দী খাঁর সিংহাসনগ্রহণের পর, কুলী খাঁর কঠোর ন্যায়পরতা, ভীষণ অত্যাচারের ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

দেখা যাইতেছে, খ্যাতনামা মুতাক্ষরীণ-কার এই অজ্ঞাতনামা লেখকের কথায় সম্পূর্ণ আস্থাস্থাপন করিতে পারেন নাই, এবং এই জন্যই এ সময়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা যুক্তিসঙ্গত বোধ করেন নাই। তবে তাঁহার সময়ে উল্লিখিত কারণপরম্পরায় মুর্শিদ কুলী খাঁর জমিদার-পীড়নের প্রবাদ বড়ই প্রবল ছিল; এ জন্য তিনিও লিখিয়া গিয়াছেন, ঐ অত্যাচার সম্বন্ধে কাগজ কালী খরচ করাই অন্যায়। গোলাম হোসেন খাঁ অশেষ গুণ সত্ত্বেও আলিবর্দ্দী খাঁর বড়ই পক্ষপাতী; বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক শত্রুবধেও ইনি আলিবর্দ্দী খাঁর দোষ দেখেন না। কিন্তু অন্যত্র নরহত্যা বা বিশ্বাসঘাতকতার বর্ণনে তাঁহার লেখনী শতমুখী। এজন্য আলিবর্দ্দী খাঁর দরবারের মতই তাঁহার মত, এরূপ ধরিয়া লইলে বড় ভ্রম হয় না। যাহা হউক, যে দুই এক স্থানে প্রসঙ্গতঃ কুলী খাঁর উল্লেখ রহিয়াছে, সেখানেই তাঁহার প্রতিভা, কর্ম্মনিষ্ঠা ও রাজদরবারে প্রতিপত্তির কথা বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, কুলী খাঁর বন্দোবস্তে বেশীর ভাগ হিন্দু জমিদার দেখিতে পাই। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার মহোদয় স্বকপোলকল্পিত একটি মতের উল্লেখ করিয়াছেন;—ইনি বলেন, মুর্শিদ কুলী খাঁ রাজস্ব আদায় কার্য্যে বাঙ্গালী হিন্দু ভিন্ন অন্য কাহাকেও নিযুক্ত করিতেন না; কেন না, হিন্দুরা শাস্তির ভয়ে শীঘ্রই আপন দুষ্কৃতি প্রকাশ করিয়া ফেলিবে ও তাহারা ভীরুস্বভাব, সুতরাং রাজ্যের কোনরূপ ক্ষতির আশঙ্কা নাই। হিন্দু জমিদারগণকে এই প্রশংসাপত্র দিবার সময় গ্রন্থকার সম্ভবতঃ শোভাসিংহ বা রাজা উদয়নারায়ণ ও সীতারামের বিদ্রোহ ব্যাপার একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। এ কালের বাঙ্গালীর স্বভাব যাহাই হউক, সেকালে জমিদারগণ যে নিতান্ত ভালমানুষ ছিলেন, ইহা প্রমাণ করা কষ্টকর।

গ্রন্থকার গোঁড়া মুসলমান; হিন্দুরাই যে বুদ্ধিমান ও কর্ম্মকুশল ছিলেন, ইহা স্বীকার করিতে তাঁহার কষ্ট হয়। কুলী খাঁও এক জন গোঁড়া মুসলমান হইয়া হিন্দু জমিদারগণের এত পক্ষপাতী ছিলেন, ইহার একটা মন-গড়া কারণ নির্দ্দেশ না করিলে চলে কই?

এ সম্বন্ধে কোম্পানীর সেরেস্তাদার গ্রাণ্ট মহোদয়ও একটা সমীচীন ব্যাখ্যা না দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। সুবিস্তীর্ণ রাজসাহী জমিদারী ক্রমশঃ এক ব্রাহ্মণসন্তানকে দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া, তিনিও উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা এই (৩) যে, মুর্শিদ কুলী খাঁ জমিদারগণের বিভীষিকার জন্য বিদ্রূপ করিয়া 'বৈকুণ্ঠ' নাম রাখিয়া এক নরককুণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছিলেন; তিনিই আবার এক জন পৌরোহিত্যব্যবসায়ী বিষয়ানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে এই সর্ব্বপ্রধান জমিদারী অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু এই উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণের প্রবঞ্চনা ও গ্রাহকতা বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও রাজ্যের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, এক অদূরদর্শিনী-নীতি অবলম্বন করিয়া, তাঁহার হস্তের এই সর্ব্বপ্রধান দান পুরুষানুক্রমে স্থায়িভাবে থাকিবে জানিয়াও, এইরূপে দিয়া গিয়াছেন। ইহার কারণনির্দ্দেশ স্থলে কেবল এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, যথেচ্ছাচারিরাজন্যবর্গস্বভাবসুলভ সময়োচিত স্বার্থসাধিনী নীতিই তাঁহাকে এইরূপ আত্মহত্যার ব্যাপারে প্রণোদিত করিয়াছিল। পাঠক মার্জ্জনা করিবেন, গ্রাণ্ট মহোদয়ের বাক্যগুলি বড়ই লম্বা, ভাবমাত্রসঙ্কলনেই রুদ্ধশ্বাস। গ্রাণ্ট সাহেব বোধ হয় জানিতেন না, কথিত চালকলাভোজী ব্রাহ্মণসন্তান রঘুনন্দনের পদতলে বসিবার যোগ্য বিবেচিত হইলেও, অনেক রাজস্বসচিব আপনাকে ধন্য মনে করিতেন। যে কৃষ্ণনগর রাজবংশের বিদ্যোৎসাহিতা, সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে নিষ্কর ভূসম্পত্তি দান প্রভৃতির জন্য বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ চির-ঋণী, বিধর্ম্মী গ্রাণ্ট মহোদয় নিজ প্রভু বণিক কোম্পানীর সামান্য রাজস্বের ক্ষতি উপলক্ষে সেই কৃষ্ণনগর-রাজদত্ত লাখেরাজ সম্বন্ধে অযথা গালিবর্ষণে সমধিক আগ্রহ দেখাইয়াছেন। (৪) তাঁহার মতে, এই লাখেরাজের প্রাচুর্য্যবশতঃই কৃষ্ণনগর-রাজের সদর রাজস্ব পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারগণের তুলনায় অল্প হইয়াছে। তবেই স্বীকার করিতে হইল, বর্ণিত হিন্দুবিদ্বেষী মুর্শিদ কুলী খাঁ এখানে লাখেরাজ

(৩) Fifth Report; New Ed, vol I. p. 260.

(৪) Fifth Report; p. 261.

বাজেয়াপ্ত বা অযথা রাজস্ববৃদ্ধি করেন নাই। কোম্পানীর আমলের বন্দোবস্তে রাজস্বের পরিমাণ কি পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল, এবং বাকী করের জন্য কত শত জমিদারের সর্ব্বনাশসাধন ঘটে, ইহা সাধারণের অবিদিত নাই। সুতরাং তুলনায় সমালোচনা করিতে হইলে, কোন্ বন্দোবস্ত জমিদারগণের পক্ষে হিতকর, তাহা বিবেচিত হইবে। এই সঙ্গে ভারতের যে ভাগে এখনও স্থায়ী বন্দোবস্ত হয় নাই, সেগুলির বন্দোবস্তের কথা মনে রাখিলেও মন্দ হয় না।

প্রকৃত কথা, বাঙ্গলার জমিদারগণ ইতিপূর্ব্বে বিপ্লবের সুবিধায় রীতিমত রাজকর আদায় দেওয়ার পদ্ধতি একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছিলেন। মুর্শিদ কুলী খাঁ প্রথম হইতেই এই আবর্জ্জনারাশি পরিষ্কার করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। স্পষ্ট দেখা যায়, তাঁহার বন্দোবস্ত যে অরাজক অবস্থার পরে সংঘটিত, তাহাতে যত দূর সম্ভব, অল্প জবরদস্তীতে কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল। বিপ্লবের পর এরূপ সুবন্দোবস্ত বড় একটা দেখা যায় না। এরূপ সময়ে অল্পাধিক অত্যাচার অবশ্যম্ভাবী। সেকালের চক্ষে দেখিলে নিতান্ত দুষ্ট বিদ্রোহী জমিদারগণকে নজরবন্দী রাখিয়া বন্দোবস্ত করা বড় বেশী দোষের বোধ হইবে না। ফলতঃ, কুলী খাঁর বন্দোবস্তে অত্যাচার সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি বর্ত্তমানে কেডাষ্ট্রাল্ সার্ভে সম্বন্ধে এক শ্রেণীর লোকের চীৎকারের ঠিক অনুরূপ।

বাকী খাজানা আদায়ের জন্য জমিদারগণকে দেওয়ানী জেলে রাখা তৎকালে আইন ছিল। সুবিখ্যাত প্রজারঞ্জক আলিবর্দ্দী খাঁর সময়েও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে এই জন্য কারারুদ্ধ দেখা যায়। (৫) সুতরাং চিরাগত মুসলমানী আইন অনুসারে, রাজস্বদানে অশক্ত অথচ অবাধ্য জমিদারগণকে কারারুদ্ধ করিয়া, কুলী খাঁ বড় বেশী অন্যায় করিয়াছেন, বোধ হয় না। এই সুসভ্য কালেও দেনার দায়ে জেলের ব্যবস্থা রহিয়াছে। আইনের দোষ ব্যক্তিবিশেষের স্কন্ধে অর্পণ করা যুক্তিযুক্ত নহে। কুলী খাঁ এই আইন অবস্থাবিশেষেই কার্য্যে পরিণত করেন। আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ে নজরাণার টাকার জন্যও কারাবাস দেখা যায়। অতএব এ অবস্থা সেকালের পক্ষে অসাধারণ নহে। অজ্ঞাতনামা ইতিহাসলেখক এক স্থানে বলেন, কুলী খাঁ রাজস্বদানে অশক্ত হিন্দুজমিদারগণকে সপরিবারে মুসলমান করিতেন। কিন্তু জমিদারী বন্দোবস্তে এক জনও এমন জমিদার দেখা যায় না। তবে জমিদারগণকে মুসলমানও করা হইত, এবং জমিদারী কাড়িয়া লইয়া অন্য হিন্দুজমিদারকে পুনরায় ঐ জন্যই

(৫) ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত ; ২০৪ পৃঃ।

পত্তন করা হইত, এরূপ কথা যদি বলা হয়, তাহা হইলে ঐ বুদ্ধির নিকট সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করা ভিন্ন আর উপায় কি? মুর্শিদ কুলী খাঁর প্রধান রাজস্বসচিব হইতে আরম্ভ করিয়া রাজস্ববিভাগের উচ্চতর কর্ম্মচারিমাত্রই হিন্দু ছিলেন, ইহা আমরা ইতিপূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছি। হিন্দু মন্ত্রী, হিন্দু কর্ম্মচারী, হিন্দু জমিদার, চতুর্দ্দিকে হিন্দুগণে বেষ্টিত হইয়া কেবল হিন্দুর প্রতিই এই ব্যবস্থা কি করিয়া সঙ্গত হয়, লেখকই বলিতে পারেন। তিনি এক দৃষ্টান্ত দ্বারাও তাঁহার উক্তিসমর্থনের চেষ্টা করেন নাই। এরূপ ক্ষেত্রে তদানীন্তন বাঙ্গালী হিন্দুমাত্রেরই নিতান্ত কাপুরুষতা স্বীকার না করিলে, তাঁহার সঙ্গে 'ভিটো' দেওয়া যায় না।

এই সমস্ত কথিত অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা "বৈকুণ্ঠে"। অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার বলিতেছেন, "নবাবের দৌহিত্রীপতি সইদ্ রজি খাঁ বাঙ্গলার দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া বাকী কর আদায়ের জন্য জমিদার ও আমিলগণের উপর উৎপীড়নের নানাপ্রকার নূতন উপায়ের উদ্ভাবন করিতে আরম্ভ করিলেন। চর্ম্মনির্ম্মিত ঢিলা পায়জামা পরাইয়া তাহার ভিতর বিড়াল ছাড়িয়া দেওয়া হইত; কাহাকেও বা লবণমিশ্রিত মহিষদুগ্ধ পান করাইয়া দেওয়া হইত, যাহাতে উদরাময় হইয়া অচিরাৎ মৃতপ্রায় হইয়া আসেন প্রবাদ এই যে, মনুষ্যসমান একটি খাদ প্রস্তুত করাইয়া নানাবিধ পূতিগন্ধময় অকথ্য পদার্থে তাহা পূর্ণ করা হইয়াছিল। (ভদ্রতার খাতিরে লেখকের সম্পূর্ণ বর্ণনা দিতে আমরা অসমর্থ।) হিন্দুগণের প্রতি উপহাসচ্ছলে এই নরককুণ্ডের নাম 'বৈকুণ্ঠ' রাখিয়া, রাজস্ব আদায় দানে অশক্ত জমিদার ও আমিলগণকে এই হ্রদে প্রক্ষিপ্ত করিয়া টানিয়া আনার ব্যবস্থা হয়।" স্মরণ রাখা উচিত, জমিদারগণের উপর অত্যাচারের বর্ণনা এই গ্রন্থেই প্রথম।

কিন্তু এখানেই জনশ্রুতি বলিয়া আরম্ভ। পরবর্ত্তী দুই এক জন মুসলমান গ্রন্থকার এই উক্তি অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। মুতাক্ষরীণে বৈকুণ্ঠের উল্লেখ নাই। রাজস্বসচিব গ্রাণ্ট সাহেব কুলী খাঁর স্কন্ধেই ইহার পিতৃত্বের আরোপ করেন। কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া বলিতেছেন, বাস্তবিক বৈকুণ্ঠবাসের ব্যবস্থা হইত না। বিভীষিকা দেখাইয়া অনাদায়ী রাজস্বের সংগ্রহ ও ভবিষ্যতে ত্রুটী না হয়, ইহাই লক্ষ্য ছিল। গ্রাণ্ট সাহেব রাজস্ববিভাগের কার্য্যের অনুরোধে মুর্শিদাবাদে আসিয়াছিলেন; নিজামত রেকর্ড এবং মিলের ইতিহাস দৃষ্টে জানা যায়, গ্রাণ্ট সাহেব ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে মুর্শিদাবাদের প্রভিন্সিয়াল্ কাউন্সিলের

একাউন্টাণ্টের কার্য্য করিতেন। সুতরাং তিনি সমসাময়িক লোকের মুখে বৈকুণ্ঠ-ব্যাপার সবিশেষ অবগত হইয়াই রাজস্ববিবরণীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তবেই দেখা গেল, রজি খাঁ হইতে বৈকুণ্ঠ কুলী খাঁর হাতে পড়া ও জমিদার-মাত্রেরই বৈকুণ্ঠবাসের প্রবাদ ভয়প্রদর্শনমাত্রে পরিণত হওয়া, ঐ সময়ে ঘটিয়াছিল। ফল কথা, এক সময়ে নানা লোকে ঐ প্রবাদ নানা প্রকারে প্রচার করিতেছেন। কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা কে, ইহাই অনুসন্ধানের বিষয়। সুতরাং প্রবাদের এই রূপান্তর অবশ্যই সমসাময়িক লোকের মুখে শুনিয়াছেন। স্যার জন শোর সাহেব গ্লাড্‌উইনের অনুবাদ দেখিয়া সেই মতই বলিয়াছেন। সুতরাং রজি খাঁ হইতে 'বৈকুণ্ঠ' স্বয়ং মুর্শিদ কুলীর হস্তে যাওয়া, এবং জমিদার-মাত্রেরই বৈকুণ্ঠবাস হইতে ভয়প্রদর্শনমাত্রে পরিণত হওয়া, ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই ঘটে। গ্রন্থকার বলেন, রজি খাঁ বাঙ্গলার দেওয়ান হইয়া অত্যাচার আরম্ভ করেন। এখানে একটি কথা বক্তব্য আছে। এখন জমিদার-পীড়নে রজি খাঁর কতটুকু হাত ছিল, দেখা যাউক; এখানে মূলেই গোল বোধ হয়। যত দূর দেখা যায়, তাহাতে সইদ রজি খাঁ দেওয়ান-ই-আলি বা প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। আমরা একবার 'নবাবী আমলে হিন্দু কর্ম্মচারী' প্রবন্ধে দেখাইয়াছি (৬) যে, নবাবের স্বসম্পর্কীয় আত্মীয়বর্গই প্রধানমন্ত্রিত্ব-পদে বা প্রাইভেট সেক্রেটরীর কার্য্যে সাধারণতঃ নিযুক্ত হইতেন; কারণ, এ দুই পদেই মন্ত্রগুপ্তির বিশেষ প্রয়োজন। রাজস্ববিভাগের কার্য্যে বিশেষ বুৎপত্তির জন্য হিন্দুরাই সাধারণতঃ নিয়োজিত ছিলেন। মুর্শিদ কুলীর শাসনের প্রথম বর্ষেই, অর্থাৎ ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে, সইদ ইক্‌রাম খাঁ এই পদে নিয়োজিত হন, এবং ঐ সময়েই ভূপতি রায় রাজস্ব বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা হইয়াছিলেন। ইক্‌রাম খাঁর মৃত্যুর পর রজি খাঁ অতি সামান্য দিন-মাত্র দেওয়ান ছিলেন; কারণ ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে রজি খাঁর পরলোকান্তে নবাব আপন দৌহিত্র সরফরাজকে ঐ পদে নিযুক্ত করিয়া বাদশাহ ফেরোক সেরের নিকট হইতে উপাধি আনাইয়া দেন, ইত্যাদি কথা লেখক আপনি উল্লেখ করিয়াছেন, এবং ইতিহাসপাঠকমাত্রেই ইহা দেখিয়া থাকিবেন। সরফরাজ ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে বালকমাত্র; সুতরাং রাজস্ববিভাগ প্রভৃতি সমস্ত পরিদর্শনের ভার তাঁহার হস্তে ছিল, ইহা মনে করা অসঙ্গত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইক্‌রাম খাঁর সময় হইতে রাজস্ববিভাগে ভূপতি রায় হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দু

(৬) Stewart, 2nd Ed. p. 246.

কর্ম্মচারী দেখা যায়। কুলী খাঁর বন্দোবস্তের পর হইতে দেওয়ান খালসা অর্থাৎ 'রাজস্বসচিব' রায় রাইয়াঁ রঘুনন্দন। ইনিই নাটোরের রঘুনন্দন, কুলী খাঁর দক্ষিণ হস্ত। ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদ কুলীর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রিয়-পাত্র রঘুনন্দন পরলোকগত হন। অতএব রজি খাঁর জমিদার-পীড়নের অবসর কোথায়? যাঁহারা ছাপার লেখা ব্রহ্ম জ্ঞান করেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র; অন্যে ইহা বিশ্বাস করিতে ইতস্ততঃ করিবেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে অন্যত্র দেখাইয়াছি, (সাহিত্য; ১৩০২) নবাবী আমলে প্রত্যেক বিভাগে স্বতন্ত্র দেওয়ান থাকিতেন। যত দূর জানিতে পারা যায়, তাহাতে নবাবের নাতিনী-জামাতা সইদ রজী খাঁ দেওয়ান-ই-আলি বা প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। মুর্শিদ কুলী খাঁর বন্দোবস্তের পর হইতে রঘুনন্দন খালসা দেওয়ান বা রাজস্বসচিবের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার পরে এ পদে হিন্দুরাই নিযুক্ত হইতেন। ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে কুলী খাঁ এবং রঘুনন্দন, উভয়েই পরলোকগত হন। অতএব, জমিদার-পীড়নে রজি খাঁর কতটুকু হাত ছিল, ইহা চিন্তার বিষয়। বলা বাহুল্য, খালসা দেওয়ানই রাজস্ববিভাগের কার্য্যের জন্য দায়ী। তর্কস্থলে যদি স্বীকার করা যায় যে, রজি খাঁ ঐরূপ কোনও অত্যাচারের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই প্রবাদ নিতান্ত অমূলক নয়, তাহা হইলেও কুলী খাঁর স্কন্ধে উহা কিরূপে আরোপিত হইতে পারে, তাহা বিশেষ বোধগম্য হয় না।

বৈকুণ্ঠের স্থাননির্দ্ধারণের চেষ্টায় বিফলমনোরথ হইয়া জিজ্ঞাসু হইলে, পরিহাসরসিক মুর্শিদাবাদবাসী আমার কোনও বন্ধু, মুর্শিদাবাদের বর্ত্তমান নবাবী কিল্লার দক্ষিণ তোরণের নিকট ইহার কাল্পনিক স্থান নির্দ্দেশ করেন। আমি এই কথা সেই পরিহাসচ্ছলেই, যমের দক্ষিণ দ্বারই উহার উপযুক্ত স্থান বলিয়া, তিন বৎসর পূর্ব্বে "সৎসঙ্গ" মাসিকপত্রে উল্লেখ করি। এক্ষণে দেখিতেছি, আমরাই অনেককে স্বশরীরে "বৈকুণ্ঠে" লইয়া যাইবার প্রথম পথপ্রদর্শক হইলাম। এই স্থানই প্রকৃত "বৈকুণ্ঠ" বলিয়া গৃহীত হইতে চলিল। ইতিহাস-রসজ্ঞ দেওয়ান সাহেব এ কথা লইয়া বড়ই হাস্য করিয়াছেন! তিনি বহুদিন অবধি প্রাচীন লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া ইহার কোনও খোঁজ খবর পান নাই। বাস্তবিক, ব্যক্তিবিশেষের উর্ব্বর মস্তিষ্ক ভিন্ন অন্যত্র ইহার স্থান অন্বেষণ পণ্ডশ্রমমাত্র।

শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ। প্রথমে শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীর "ভাইফোঁটা" নামক একটি কবিতা। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "কাজির বিচার" একটি রহস্যপূর্ণ ক্ষুদ্র গল্প;—বিশেষত্ব নাই। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস গুপ্তের "নেপালে তিন সপ্তাহ" মনোরম ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। লেখক বিনা আড়ম্বরে নেপালের একখানি ক্ষুদ্র রেখাচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। "ভারতে সূর্য্যগ্রহণ" শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের রচিত জ্যোতির্বিষয়ক প্রবন্ধ। লেখক বর্ত্তমান বর্ষের সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষ করিয়া বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে গ্রহণ সম্বন্ধে বিবিধ সাধারণ বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের "মীর কাসিম" এখনও চলিতেছে। "শ্যাম বাউল" শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রচনা; শ্যাম, "নবদ্বীপের কোনও 'কীর্ত্তনীয়া' সম্প্রদায়ের দলপতি ছিল, সে নিজে বৈষ্ণব।"—লেখক দুঃখ করিয়াছেন, শ্যাম বাউলের নাম আর কাহারও মুখে শোনা যায় না। লেখক এই কয় পৃষ্ঠায় 'শ্যামের' যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে স্মরণ করিয়া রাখিবার মত কিছু দেখা গেল না। "স্বরলিপি"তে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত একটি নূতন গান আছে—"আমি কেবলই স্বপন করেছি বপন বাতাসে।" শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সরকার "গার্সী উৎসবে"র কাহিনী বর্ণবদ্ধ করিয়াছেন। গার্সী বাঙ্গলার প্রদেশবিশেষের গ্রাম্য উৎসব। প্রবন্ধটি দীনেন্দ্র বাবুর পল্লীচিত্রের মত,—কিন্তু সংক্ষেপে সঙ্কলিত হইয়াছে। "বড় বউ" কোনও অজ্ঞাতনামা লেখকের রচিত একটি চলনসই গল্প। "বর্ণরহস্য" শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচিত একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। লেখক বর্ণ-বিজ্ঞানের গূঢ় রহস্যের সহিত গম্ভীর দার্শনিক তত্ত্বের সন্নিবেশ করিয়াছেন। রামেন্দ্র বাবু যেমন বিজ্ঞানে, তেমনই দর্শনেও কৃতবিদ্য। তাঁহার পক্ষেই এরূপ বিষয়ের আলোচনা সম্ভব। ইহার সমকক্ষ রচনা বাঙ্গলা সাহিত্যে বিরল। "একটি পুরাতন ভয় ও তাহার অমূলকতা" প্রবন্ধে লেখক রুসিয়ার পক্ষে ভারতাক্রমণ অসম্ভব, এই পুরাতন মতটির উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কৃষিকার্য্য" প্রবন্ধটির উপযোগিতা কি, বলিতে পারি না। অদ্যাবধি প্রবন্ধে কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। এখন 'হাতে ও হাতিয়ারে' না করিলে ফল ফলিবে, বোধ হয় না।

ভারতী। পৌষ। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের "বৈকুণ্ঠদর্শন" প্রবন্ধে নূতনত্বের অভাব। বৈজ্ঞানিক রায় মহাশয় সহসা ভক্তি-পথের পথিক হইলেন কেন? শ্রীযুক্ত জলধর সেন সুদূর হিমালয় হইতে "প্রত্যাবর্ত্তন" করিতেছেন। গমনের পথে যেরূপ আগ্রহ উদ্দীপিত হইত, প্রত্যাবর্ত্তনে তাহা নাই। শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের "জর্ম্মন্ শিল্পশিক্ষা" জ্ঞাতব্য কথায় পূর্ণ;—অন্নহীন বাঙ্গালীর আলোচ্য। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় "বৈজ্ঞানিক সার-সংগ্রহে" উদ্ভিজ্জকেশ, ফটোগ্রাফি, উদ্ভিদ্‌নিদ্রা, এই তিনটি বিষয়ের বিবরণ দিয়াছেন। তিনটিই মনোরম ও শিক্ষাপ্রদ। "নিশি" শ্রীমতী সরলাবালা দাসীর গ্রথিত একটি ক্ষুদ্র সামাজিক গল্প। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "হাসির গানে" বিলাতফেরতা, বঙ্গবীর, নূতন কিছু ও দেশহিতৈষী, এই চারিটি গান আছে। "বিলাতফেরতা" গানটি তীব্র শ্লেষে অনু-প্রাণিত। ইহার এক চরণ এইরূপ,

"আমরা মা মাসীকে জ্যাকেট কামিজ পরাই।"

হাসি স্বাস্থ্যকর ও আমাদের জীবনে নিতান্ত আবশ্যক বটে, কিন্তু হাস্যরসের উদ্দীপনের জন্য বিলাতফেরতার মা মাসী প্রভৃতির উল্লেখ না করিলে বোধ করি শোভন হইত। "পোষমা"

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের পল্লীচিত্র,—বনভোজনের বৃত্তান্ত: চৌদ্দ পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া সেই পুরাতন চর্ব্বিতচর্ব্বণ! "রমণীদস্যু" একটি ক্ষুদ্র অনূদিত গল্প। গল্পটি মনোরম।

প্রদীপ। প্রথম ভাগ; প্রথম সংখ্যা; পৌষ। "দাসীর" ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদকতায়, এই নূতন মাসিকপত্র প্রকাশিত হইতেছে। সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করিতেছি,—নূতন সহযোগী দীর্ঘজীবন ও সাফল্য লাভ করুন। সম্পাদক মহাশয় সূচনায় বলিতেছেন, "আমরা নিজ ক্ষুদ্র সাধ্যানুসারে সামান্যভাবে নূতন কিছু করিবার চেষ্টা করিব।" চিত্র ভিন্ন অন্য কোনও নূতনত্ব আমরা দেখিতেছি না। "ইঙ্গিত" একটি সুন্দর সনেট; শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়ের "মরিব কি বাঁচিব?" প্রবন্ধটিতে বাঙ্গলার বর্ত্তমান সামাজিক সমস্যার আলোচনা ও তাহার মীমাংসার চেষ্টা আছে। এই উৎকৃষ্ট প্রবন্ধটি আলোচনার যোগ্য। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্তের "আগ্রা—১৮৫৭ অব্দের মধ্যভাগে" একটি ঐতিহাসিক সন্দর্ভ। প্রবন্ধের শেষে একখানি চিত্র আছে;—বোধ করি, তাহা রজনী বাবুর চিত্ররূপে কল্পিত হইয়া থাকিবে; চিরপরিচিত গুপ্তমহাশয়কে ছবিখানি দেখিয়া কিন্তু চিনিবার যো নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলির মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "মায়াবাদ"ই উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "জ্যোতিষ" নামক একটি ধারাবাহী প্রবন্ধের সূত্রপাত করিয়াছেন। "কলিকাল" শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের রচিত ক্রমশঃপ্রকাশ্য সামাজিক উপন্যাস। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের "সীমান্ত-সংগ্রাম" সময়োপযোগী রাজনৈতিক প্রবন্ধ। লেখক অনেক অনুসন্ধান করিয়া এতদ্বিষয়ক বিবিধ জ্ঞাতব্য তথ্যের সমাবেশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে লর্ড লরেন্সের সময় হইতে চিত্রল অধিকার পর্য্যন্ত সীমান্ত-সমরের পূর্ব্ব ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের "পরজীবী" একটি প্রাণিবিজ্ঞানবিষয়ক সুন্দর প্রবন্ধ। "যোদ্ধা প্যারীমোহন" প্রবন্ধে, লেখক বাঙ্গালীর শৌর্য্যবীর্য্যের অস্তিত্বপ্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের চিত্র আছে।

মুকুল। অগ্রহায়ণ। "মহারাণী স্বর্ণময়ী" একটি সুলিখিত ক্ষুদ্র প্রবন্ধ। "পিরামিড" একটি সচিত্র রচনা। "প্রভাত" একটি সচিত্র সুন্দর কবিতা। "বলবন্ত সিং" একটি সচিত্র উপকথা; মুকুলের শিশু পাঠকদের চিত্তরঞ্জন করিবে।

মুকুল। পৌষ। প্রথমে "সন্ধ্যা" নামক একটি সচিত্র কবিতা। কবিতার হিসাবে "সন্ধ্যা" মন্দ হয় নাই, কিন্তু বালকেরা ইহার কবিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে না; "উদার গগন" প্রভৃতি প্রয়োগের কবিত্ব ও সৌন্দর্য্য বুঝিবার শক্তি মুকুলের পাঠকগণের নাই, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। "ডুবুরীর কার্য্য" প্রবন্ধটি কৌতুকাবহ। "লেমার" প্রাণিতত্ত্ববিষয়ক একটি উৎকৃষ্ট রচনা। লেমারের ছবিখানিও মনোহর। "কেম্‌ব্রিজের পত্র"ও মন্দ নহে। "ভজন সিংএর বাঘ মারা" একটি সচিত্র রহস্য-কবিতা। রচনার পারিপাট্য বা কোনও বিশেষত্ব নাই, এবং বর্ণিত ঘটনা অত্যন্ত অদ্ভুত। নিতান্ত আজগুবি হইলেই রহস্য হয় না।

সখা ও সাথী। অগ্রহায়ণ ও পৌষ। "বিবিধ" মন্দ নহে। "সীমান্ত যুদ্ধে দেশীয় রাজগণ" প্রবন্ধটি বালকদের উপযোগী নহে। কিন্তু এই প্রবন্ধে পাঁচখানি উৎকৃষ্ট চিত্র আছে। "বুনো ও পশু" প্রবন্ধের বিষয় শিক্ষণীয়; কিন্তু অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। "বন্দীর কাহিনী" একটি কৌতূহলোদ্দীপক গল্প। "চানাচুর" বিবিধ বিষয়ের সঙ্কলন,—চিত্তগ্রাহী হইয়াছে। "প্রাচীন মহারাষ্ট্র জাতি" প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য; আমরা এইরূপ প্রবন্ধের পক্ষপাতী। এইরূপ রচনায় বালকদের শিক্ষা ও আমোদ ও উপকারলাভের উপায়বিধান করা যায়। "জোর জীবনচরিত" কৌতুকাবহ।

বন্ধ্যা।

১

সাগরতটে ক্ষুদ্র কুটীরে করিম ও তাহার পত্নী মিরিয়ম বাস করিত। তাহাদের কুটীরের সম্মুখে সুদূরপ্রসারিত সুনীল সিন্ধু; যত দূর দৃষ্টি যায়, কেবল নীল জলের খেলা, তাহার পর নীল নীরদ আর উদার সমুদ্র পরস্পরের আলিঙ্গন-বদ্ধ; পশ্চাতে শ্যামশষ্পশোভিত প্রান্তর, প্রান্তরের পরপারে পর্ব্বতশ্রেণী-যেন নীল মেঘের উপর গাঢ় নীলমেঘ। কুটীর হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। সাগরসলিলে ক্ষুদ্র নৌকায় ঘুরিয়া করিম যে মাছ ধরিত, গ্রামে তাহা বিক্রয় করিত। বিক্রয়লব্ধ অর্থে স্বামী স্ত্রীর স্বচ্ছন্দে দিন কাটিত। কিন্তু দুই জনেই মনে করিত, তাহারা নিঃসঙ্গ। তাহাদের সন্তান নাই। সে দুঃখ করিম অপেক্ষা মিরিয়মেরই অধিক ছিল, কর্ম্মহীন স্নেহবিকাশহীন জীবন তাহার নিতান্তই ভার বলিয়া বোধ হইত। করিম যখন মাছ ধরিতে চলিয়া যাইত, তখন সে একাকিনী সাগরতটে বসিয়া জলখেলা দেখিত, আর মনে মনে ভাবিত, যাহার সন্তান নাই, তাহার মত দুঃখ কাহার? যদি একটি ক্ষুদ্র শিশু তাহার জীবন সুখময় করিত!

কত দিন গৃহে ফিরিয়া শ্রান্ত করিম দেখিত, মিরিয়ম গৃহে নাই। মিরিয়ম কোথায় থাকিত, তাহা সে জানিত; কুটীরের সম্মুখে যেখানে কতকগুলি ঝাউ গাছ সাগরের জল পর্য্যন্ত ঘুরিয়া গিয়াছে, সেখানে একখানা পাথরের উপর বসিয়া মিরিয়ম উদাসনয়নে সম্মুখের অনন্তবিস্তৃত নীল জলরাশির দিকে চাহিয়া থাকিত। মাথার উপর ঝাউগাছের মধ্য দিয়া বাতাস সোঁ সোঁ করিয়া বহিয়া যাইত; দূরে জলচর বিহঙ্গম বৃত্তাকারে উড়িয়া উড়িয়া চীৎকার করিত, আর তাহার পদপ্রান্তে সাগরের ফেনচূড় তরঙ্গরাশি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িত, খেলা করিত;—সে কেবল সোহাগের সাদর সঞ্চলন, আদরের আনন্দ আলিঙ্গন। করিম জানিত, মিরিয়ম সেখানে বসিয়া চঞ্চল জলোচ্ছ্বাস দেখিতে ভালবাসে।

ধীরে ধীরে ঝাউগাছের পার্শ্ব দিয়া আসিয়া করিম পত্নীর স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিত। মিরিয়ম চমকিয়া তাহার দিকে চাহিত। করিম বলিত, "আজ কি গৃহকর্ম্ম করিতে হইবে না?"

মিরিয়ম বলিত, "কাহার জন্য করিব?"

করিম দেখিত, পত্নীর নয়নে অশ্রু। সে বুঝিত, হৃদয়ে কি শূন্যতা লইয়া

তাহার বন্ধ্যা পত্নী কালযাপন করে। সে তাহার পার্শ্বে বসিত, সেই শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া দুই জনে নির্ব্বাক হইয়া সম্মুখে চাহিয়া থাকিত। মিরিয়মের মস্তক করিমের বক্ষে আসিয়া পড়িত; স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া মিরিয়ম কাঁদিত। করিমের নয়নও অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিত।

তাহার পর মিরিয়ম বলিত, "চল, ঘরে যাই।"

করিম বলিত, "চল যাই।"

উঠিয়া উভয়ে গৃহে আসিত।

এমনই করিয়া তাহাদের দিন কাটিত।

সাধারণ সাংসারিক সুখের তাহাদিগের কোন অভাবই ছিল না; আবার এই এক কারণে তাহাদের দুঃখেরও অন্ত ছিল না। করিম পত্নীকে পাখী আনিয়া দিত, মিরিয়ম তাহা উড়াইয়া দিত; ভুলিয়া পিঞ্জরদ্বার মুক্ত রাখিয়া জল আনিতে গিয়াছিল, পাখী উড়িয়া গিয়াছে। করিম বিড়ালের ছানা লইয়া আসিত, মিরিয়ম তাহাকে তাড়াইয়া দিত; বিড়ালে মাছ খাইয়া যায়। সে কেবল সাগরতরঙ্গলীলা দেখিতেই ভালবাসিত।

মিরিয়ম তীরে বসিয়া সাগরের খেলা দেখিত; আর করিম সাগরের তরঙ্গোপরি তরী ভাসাইয়া মাছ ধরিতে যাইত। সাগরসলিলে চক্রবালরেখায় সূর্য্য তেমনই উদিত হইত, অস্ত যাইত; ঝাউগাছের মধ্যে দিয়া মর্ম্মাহতের দীর্ঘশ্বাসের মত বাতাস তেমনই বহিয়া যাইত; প্রভাতে সন্ধ্যায় মেঘের উপর রবিকরের উজ্জল অঞ্চল তেমনই লুটাইয়া পড়িত; কুটীরের পশ্চাতে প্রান্তরের পরপারে পর্ব্বতশ্রেণী প্রভাকরকিরণের প্রখরতার সঙ্গে সঙ্গে নানা বর্ণ ধারণ করিত; আর সাগরের নিত্যপ্রবাহিত তরঙ্গের মত দিনগুলা বহিয়া যাইত।

আষাঢ়ের আকাশে যেমন জলভরা জলধর স্বচ্ছান্ধকারাবরণে ধরণীর মুখ আচ্ছন্ন করে, তেমনই সেই এক কাতর চিন্তা বন্ধ্যা মিরিয়মের হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন করিত। সুখেই হউক আর দুঃখেই হউক, দিন যায়, থাকে না; মিরিয়ম ও করিমেরও দিন কাটিতে লাগিল।

২

বৈশাখের সন্ধ্যা। আকাশে একটিও তারকা দেখা যায় না; মসীবর্ণ মেঘমালা রজনীর অন্ধকার গাঢ়তর ও গম্ভীরতর করিয়া তুলিয়াছে। উপরে আঁধার আকাশ, আর নিম্নে আঁধার জলের অনন্ত বিস্তার,—আঁধারে আঁধার মিশিয়া গিয়াছে। সেই অন্ধকার রজনীতে, সেই অন্ধকার অম্বরতলে, সেই অন্ধকার

জলরাশি কোন্ অন্ধকার অকূলের দিকে বহিয়া যাইতেছে। চারি দিকে গভীর নিস্তব্ধতা রাজত্ব করিতেছে। বাতাস নাই; ঝাউগাছের পাতাও কাঁপিতেছে না। সমুদ্র যেন আলেখ্যে লিখিত।

রাত্রি গভীর হইতে লাগিল।

সহসা বাতাস উঠিল; সমুদ্রসৈকতে বালুকারাশি উড়াইয়া একটা ঝাপটা বাতাস বহিয়া গেল। তাহার পর বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, আর ঝড় বহিতে লাগিল।

ঝড়ের বেগ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, করিমের ক্ষুদ্র কুটীর কম্পিত হইতে লাগিল। একটা বড় ঝাউগাছ ভাঙ্গিয়া পড়িল, ফেনিল উচ্ছ্বাসে দুই একটা তরঙ্গ কুটীরের অতি নিকট পর্য্যন্ত আসিতে লাগিল। বাহিরে মেঘগর্জ্জন আর পবনের হুহু শব্দের সহিত সমুদ্রের গভীর কল্লোল মিশিয়া এক প্রকার শব্দ উৎপাদন করিতে লাগিল। আজ বড়ই দুর্য্যোগ।

ঘনশব্দবিক্লবা মিরিয়ম করিমের আরও নিকটে সরিয়া আসিল। করিম তাহাকে তাহার দৃঢ়বাহুপাশে বদ্ধ করিয়া আরও নিকটে টানিয়া লইল; যেন কিছুতেই তাহার নিকট হইতে মিরিয়মকে দূরে লইয়া যাইতে পারিবে না।

শেষ রাত্রে ঝড়ের বেগ প্রশমিত হইয়া গেল; সাগরের গর্জ্জনও মন্দীভূত হইল। প্রভাতে করিম ও মিরিয়ম কুটীরের বাহিরে আসিল। তখনও প্রান্তর-মধ্যে দূরে বৃক্ষশাখায় অল্প অল্প অন্ধকার জড়াইয়া আছে। সমুদ্র এখন শান্ত-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, দূরে তাহার বক্ষের উপর আকাশের নীলিমা নামিয়া আসিয়াছে। তীরে বৃক্ষশাখা, ছিন্নলতা, বৃক্ষপত্রাদি ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে; ইহারাই সাগরের খেলার সাক্ষী। এখন সিন্ধুবক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ মৃদুপবনে উঠিতেছে, নামিতেছে; কি পরিবর্ত্তন! এই কি সেই উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল সাগর!

তীরস্থিত বৃক্ষশাখা প্রভৃতির মধ্যে করিম খানকতক ভগ্ন কাষ্ঠ দেখিতে পাইল; সে বলিল, "রাত্রে নৌকাডুবি হইয়াছে।"

মিরিয়মের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

করিম আপনার দক্ষিণে চাহিল; তাহার পর ফিরিয়া বামে চাহিল। দূরে কি একটা দ্রব্য তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সে সেই দিকে চলিল। মিরিয়মও স্বামীর অনুসরণ করিল। দুই জনে আসিয়া দেখিল, সাগরতটে শুভ্র-সৈকতশয্যায় রমণীদেহ পড়িয়া আছে! ঝড়ের সময় তটের তত দূর পর্য্যন্ত তরঙ্গ আসিয়াছিল, এখন জলরাশি সরিয়া গিয়াছে। রমণীর আলুলায়িত কুন্তলজাল

বালুকারাশির উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে; চক্ষু মুদিত। রমণী দুই হস্তে বক্ষে কি চাপিয়া ধরিয়া আছে—করিম ও মিরিয়ম দেখিল, ক্ষুদ্র শিশু; উৎপাটিত মূল মৃণালের বক্ষে কমলকোরকের মত জননীর বক্ষে ক্ষুদ্র শিশু। মিরিয়ম কাঁদিয়া ফেলিল।

করিম দেখিল, রমণীর অঙ্গ শীতল, রমণী মৃতা। তরঙ্গোচ্ছ্বাসে, তীরে পতনের গুরু আঘাতে, রমণীর প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। করিম শিশুকে জননীর স্নেহবন্ধনচ্যুত করিল; রমণীর দুই হস্ত দুই পার্শ্বে সৈকতরাশির উপর পড়িয়া গেল; যেন আর এক জনের হস্তে পুত্রকে সমর্পণ করিয়া জননী চিন্তামুক্ত হইলেন। শিশুর অঙ্গ তখনও ঈষৎ উষ্ণ; করিম ও মিরিয়ম তাহাকে লইয়া ছুটিয়া কুটীরে গেল। জননীর মৃতদেহ সাগরতটে পড়িয়া রহিল; নবোদিত সূর্য্য সেই শুভ্রদেহ ও শুভ্র শয্যার উপরে আলোক ঢালিতে লাগিল; আর অদূরে সাগরের চলোর্ম্মিমালা তটের উপর ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।

কুটীরে গিয়া করিম শিশুর সিক্তবসন খুলিয়া ফেলিল; আর মিরিয়ম খানকতক কাষ্ঠ আনিয়া অগ্নি জ্বালিল। দুই জনে শিশুকে মৃদু মৃদু তাপ দিতে লাগিল। উভয়ে নিমেষহীন নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে শিশু নয়ন উন্মীলিত করিল। তখন করিম গ্রামে গেল ও কিছুক্ষণ পরে একটু দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিল। মিরিয়ম সেই দুগ্ধ ঈষদুষ্ণ করিয়া শিশুকে পান করাইতে লাগিল।

তাহার পর করিম আবার সাগরতীরে গমন করিল। তখন সূর্য্যকিরণ প্রখর হইয়া উঠিয়াছে, সেই কিরণজাল রমণীর মৃতদেহ ও সৈকতশয্যার উপর পড়িয়াছে; যেন জ্যোতিশ্ছটার কোন অলৌকিক দেবীমূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইয়াছে। করিম সেই মৃতদেহ তুলিয়া সাগরসলিলে নিক্ষেপ করিল, খানিকটা জল উচ্ছ্বসিত হইয়া করিমের গায়ে লাগিল।

আর এক জনের হস্তে হৃদয়ের ধন অর্পণ করিয়া জননীর মৃতদেহ কোন অকূলে ভাসিয়া চলিল।

৩

শিশু বাঁচিয়া উঠিল। বন্ধ্যা মিরিয়ম তাহার স্নেহোচ্ছ্বাসে সেই ক্ষুদ্র শিশুকে প্লাবিত করিয়া দিল। সে তাহাকে তাহার বিপুল স্নেহের মধ্য সযত্নে বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। কোরকের নিবিড় স্নেহতপ্তহৃদয়ে সৌরভের মত, মিরিয়মের স্নেহে শিশু বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

তাহাদের কুটীরের চারি পার্শ্বে যে এত সৌন্দর্য্যের উপাদান ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল, করিম বা মিরিয়ম কেহই পূর্ব্বে তাহা জানিত না। প্রান্তরের ক্ষুদ্র কুসুমে, বৃক্ষের উন্তেদোন্মুখ পত্রে, সাগরতটে অযত্নবিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ডে যে এত সৌন্দর্য্য ছিল, উভয়ের কেহই পূর্ব্বে তাহা জানিত না। এখন তাহারা তাহা জানিতে পারিল; কারণ, সে সকল পাইলে শিশু আনন্দিত হয়, তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠে। দেবতার আশীর্ব্বাদে অন্ধের চক্ষু লাভের মত, এই শিশুর প্রতি স্নেহে যেন তাহাদিগের চক্ষে জগতের শত সৌন্দর্য্য বিভাসিত হইয়া উঠিল।

এখন আর মিরিয়মের পাখী উড়িয়া যায় না; এখন আর বিড়ালে মাছ খাইয়া পলায় না। কেবল এখনও করিম মাছ ধরিতে গেলে মিরিয়ম সাগরের জলখেলা দেখিতে যায়। দুইটি ঝাউ গাছে একখানি বস্ত্র বাঁধিয়া মিরিয়ম শিশুর জন্য দোলনা প্রস্তুত করিয়া দেয়। শিশু তাহাতে শয়ন করিয়া থাকে;—পবন তাহাকে দোল দিয়া যায়; আর অদূরে সাগর তাহার নিদ্রার জন্য "ঘুমপাড়ানী" গীত গাহিতে থাকে। আর সেই শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া মিরিয়ম জলখেলা দেখে আর ভাবে, কোথা হইতে এই ক্ষুদ্র শিশু আসিয়া তাহার শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিতেছে! এখন সংসারে তাহার এই আকর্ষণ কোথা হইতে আসিল!

সে ভাবিত, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিত না।

সাগরের তরঙ্গমালা তাহার পদপ্রান্তে তেমনই লুটাইয়া পড়ে, ঝাউ গাছের মধ্য দিয়া পবন তেমনই বহিয়া যায়, আর দূরে জলচর বিহঙ্গম চক্রাকারে উড়িতে উড়িতে তেমনই ডাকিতে থাকে।

এমনই করিয়া এক বৎসর কাটিয়া গেল।

৪

আবার বৈশাখ আসিয়াছে। দিন যায় যায়; দুই একখানা ক্ষুদ্র মেঘ আকাশে খেলা করিতেছে,—বাতাসের সঙ্গে ছুটাছুটি করিতেছে। ক্রমে আরও দুই একখানা মেঘ আসিতে লাগিল। আজ আর মরণাহত তপনের করজাল আকাশের উপর সৌন্দর্য্য ছড়াইতে পারিল না; আজ মেঘের ঘন-কৃষ্ণ আচ্ছাদনের পশ্চাতে তাহারা নিবিয়া গেল।

সাগরতটে শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া মিরিয়ম ভাবিতে লাগিল, যদি আজ ঝড় উঠে! করিম আজ সাগরে গিয়াছে! সে তাহার ক্রোড়শয়ান শিশুর

দিকে চাহিল ; সেও ত আর এক বৈশাখের রাত্রি, সে দিনও সন্ধ্যার সময় মেঘমালা আকাশে এমনই সমবেত হইতেছিল! মিরিয়ম শিহরিয়া উঠিল। ক্রোড়ের শিশু কি জানি কেন তাহার বড় বড় চক্ষু তুলিয়া মিরিয়মের মুখের দিকে চাহিয়াছিল। মিরিয়ম তাহার মুখ চুম্বন করিল। তাহার পর সে আবার ভাবিতে লাগিল।

চারি দিক নিস্তব্ধ ; একটুও বাতাস নাই। ক্রমে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। মিরিয়ম উঠিয়া কুটীরে গেল। দীপ জ্বালিয়া সে শিশুকে দুগ্ধ পান করাইল ; তাহার পর তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া শয্যায় রাখিয়া আপনি কুটীর-দ্বারে বসিয়া করিমের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

বড় ঝড় উঠিল। কুটীরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া মিরিয়ম সেই এমনই আর এক রজনীর কথা ভাবিতে লাগিল ; সে রজনীতে করিম তাহাকে তাহার দৃঢ় বাহুর আশ্রয় দিয়াছিল। আজ বাহিরে তেমনই ঝড় বহিতেছিল, সমুদ্রে তেমনই তরঙ্গ উঠিতেছিল, গভীর জলরাশি তেমনই কল্লোলে ছুটিতেছিল। আজ মিরিয়মের হৃদয় সেই বাত্যাবিক্ষুব্ধ বারিধিবক্ষ অপেক্ষা অধিক বিক্ষুব্ধ। এ ঝড়ে করিম কোথায়! তিমিরাবগুণ্ঠিত নিশীথে, তরঙ্গতাড়িত সাগরতটে, স্তিমিত দীপালোকে আলোকিত কুটীরাভ্যন্তরে বসিয়া অভাগিনী মিরিয়ম বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। একটা তরঙ্গ আসিয়া কুটীরের দ্বারে পড়িল ; দ্বার ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল। মিরিয়ম উঠিয়া সুপ্ত শিশুকে ক্রোড়ে লইল ; তাহার পর তাহাকে বক্ষে লইয়া শয্যায় শয়ন করিল। বাহিরে ঝড় তেমনই বহিতে লাগিল, বাতাসে জলে তেমনই উন্মাদের খেলা চলিতে লাগিল।

* * * *

প্রায় নিশাশেষে একবার বড় বেগে ঝড় বহিল ; মড় মড় করিয়া একটা ঝাউ গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িল ; সমুদ্রে আরও বৃহৎ বৃহৎ তরঙ্গ উঠিল। উত্তাল তরঙ্গমালা সফেন আবেগে তীরের উপর আসিয়া পড়িল, যেন শতফণাময় ভুজঙ্গ ক্রোধান্ধ হইয়া সবেগে ছুটিয়া আসিতেছিল। যখন তরঙ্গ সরিয়া গেল, তখন ঝপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল। ক্রমে ঝড় থামিয়া গেল। সাগর শান্ত হইল।

৫

ঝড় উঠিবার পূর্ব্বেই করিম গ্রামের নিকটে নৌকা ভিড়াইয়াছিল। সেই দুর্য্যোগে রাত্রিতে সে আর কুটীরে ফিরিতে পারে নাই, গ্রামেই ছিল। হৃদয়ে নানাপ্রকার অমঙ্গল-আশঙ্কা লইয়া প্রত্যূষেই সে কুটীরাভিমুখে চলিল।

প্রান্তর হইতেই দেখিতে পাইল, তাহার ক্ষুদ্র কুটীরের একাংশ পড়িয়া গিয়াছে। উচ্চস্বরে করিম ডাকিল, "মিরিয়ম!" শব্দ দূরে পবন পথে মিশিয়া গেল। উত্তর না পাইয়া করিম ছুটিয়া গেল। ভগ্ন কুটীরে প্রবেশ করিয়া চারি দিকে চাহিল। মিরিয়ম কুটীরাভ্যন্তরে নাই।

বাহিরে আসিয়া করিম ব্যাকুলভাবে চারিদিকে দেখিল। সহসা সে দেখিতে পাইল, ঝাউ গাছের নিম্নে শিলাতলে পড়িয়া—ও কি!

করিম ছুটিয়া সেখানে গেল।

কিছুক্ষণ ধরিয়া করিম নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া রহিল। এমনই আর এক প্রভাতের কথা তাহার মনে পড়িল; সে দিনও দূরে আকাশের নীল জলে সাগরের নীলিমা এমনই মিশিয়াছিল; সেদিনও নবরবিকরে প্রকৃতি এমনই হাসিতেছিল; আর সে দিন আর এক জন রমণীর দেহ মরণেও পুত্রকে হৃদয়ে ধরিয়া এই সাগরতটে পড়িয়াছিল।

সম্মুখে মিরিয়ম পড়িয়া আছে। সাগরের তরঙ্গে তাহার আলুলায়িত কুন্তলজাল একবার তীরের দিকে আসিতেছে, আবার তীর হইতে ভাসিয়া যাইতেছে। যে সাগরের তীরে বসিয়া সে জলখেলা দেখিত, যে সাগর তরঙ্গ তুলিয়া আদরে সোহাগে তাহার পদপ্রান্তে খেলা করিত, আজ সেই সাগর আসিয়া তাহার পার্শ্বে বিলাপগীত গাহিতেছে। মিরিয়মের বক্ষে শিশুর মৃতদেহ। করিম আর এক দিন এই সমুদ্র তীরে জননীর বক্ষে এই শিশুকে এমনই ভাবে দেখিয়াছিল। শিশুর শীতল কপালে অযত্নবিক্ষিপ্ত কুঞ্চিত কেশরাশি ছড়াইয়া রহিয়াছে; তাহার চক্ষু মুদিত; মুখে বিকৃতির চিহ্নমাত্র লক্ষিত হয় না। যেন বৃন্তচ্যুত কমলকোরক।

করিম ডাকিল, "মিরিয়ম!"

অশ্রুপূর্ণ নয়নে করিম মরণাহতা পত্নীর দিকে চাহিল। তাহার পর সে পত্নীর নিকট হইতে শিশুর মৃতদেহ লইতে গেল।

মিরিয়ম শিশুর মৃতদেহ দৃঢ় করিয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিয়াছিল; যেন সে স্নেহবন্ধন কেহই ছিন্ন করিতে পারিবে না।

অধীরভাবে করিম আবার ডাকিল, "মিরিয়ম!"

মিরিয়ম আর চক্ষু উন্মীলিত করিল না। কেবল সাগর তেমনই বিলাপগীতি গাহিতে লাগিল।

রাণী ভবানী।

একাদশ পরিচ্ছেদ ;—নূতন নবাব।

পলাশির যুদ্ধের পর হইতেই একদল নূতন নবাবের আবির্ভাব হইয়াছিল ; ইহারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারী। কোম্পানী বাহাদুর যৎসামান্য বেতনে যে সকল ইংরাজ গোমস্তা এদেশে পাঠাইয়া দিতেন, তাঁহারা ধর্ম্মপথে থাকিয়া কোম্পানীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন না। সামান্য বেতনে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্ব্বাহ করাও কঠিন হইত ; তাহার পর যখন ভারতবর্ষের তৎকালপ্রচলিত বিলাসলালসা বৰ্দ্ধিত হইত, তখন অল্পবয়স্ক ইংরাজ যুবকগণের পক্ষে উপায়ান্তর অবলম্বন পূর্ব্বক অল্পদিনে প্রভূত ধনোপার্জ্জন করা আবশ্যক হইয়া উঠিত। তাঁহাদের ধনতৃষ্ণা নিবারণ করিবার জন্য যে উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলেও, এখন ইংরাজ ইতিহাসলেখকগণ লজ্জায় অধোবদন হইয়া থাকেন।

যথাসম্ভব অল্প মূল্যে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া তাহাই অগ্নিমূল্যে বিক্রয় করা ও তদ্দ্বারা অল্পদিনের মধ্যে প্রভূত ধনোপার্জ্জন করা অনেকেরই লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরাজেরা বঙ্গবিহার উড়িষ্যার প্রবল প্রতাপশালী নূতন নবাব হইয়া লক্ষ্যসাধনের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; তাঁহাদিগের কার্য্যে কেহ বাধা প্রদান করিতে পারিত না ; তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উপস্থিত হইত না ; কেহ অভিযোগ উপস্থিত করিলেও কে তাহার বিচার করিবে ? দেশ অরাজক, মোগল গৌরবরবি অস্তগত, জমিদারদিগের শাসনক্ষমতা পতনোন্মুখ ; ইংরাজেরা রাজ্যের সকল স্থানে প্রতাপশালী হইয়া উঠিতেছিলেন। এরূপ ক্ষেত্রে যাহা হইবার, তাহাই হইতে লাগিল। দেশের লোকে হাহাকার করিতে লাগিল ; কত লোকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নামোল্লেখ করিয়া অভিসম্পাত করিতে লাগিল ; তাহারা বলিতে লাগিল যে, তিনিই ইংরাজদিগকে আহবান করিয়া আনিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিলেন। এইরূপে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বত্র "নিমকহারাম" নামে কলঙ্কিত হইতে লাগিলেন। *

কৃষ্ণচন্দ্রের অপরাধ কি, লোকে তাহা ধীরভাবে বিচার করিবার অবসর পাইল না। ইংরাজ নবাবের অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া সকলেই নিতান্ত

---

* ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত।

অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতে লাগিল। যাঁহারা সে দিনও মুসলমানের অনুগ্রহভিক্ষার জন্য নবাবদরবারে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইতেন, এবং নবাবের শুভদৃষ্টি-লাভের আশায় হিন্দু মুসলমান আমীর ওমরাহগণকে নানারূপ স্তুতি স্তবন করিতেন, তাঁহারা যে রাষ্ট্রবিপ্লবে কত দূর ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন ও সেই ক্ষমতাবলে দেশের লোকের উপর কিরূপ অত্যাচার উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিতেও ক্লেশ বোধ হয়। সরকারী কাগজ-পত্রে এখনও যে দুই চারিটি অত্যাচারকাহিনী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই যথেষ্ট।

বিনোদরাম চট্টোপাধ্যায় এক জন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণসন্তান। তিনি বার্টন নামক এক জন সাহেবের কোপদৃষ্টিতে নিপতিত হন। সাহেব কলিকাতার ইংরাজদরবারের দ্বারদেশে বিনোদরামকে অবরুদ্ধ করিয়া ভৃত্যবর্গের সহায়তায় হস্তপদ বন্ধন করিয়া বংশখণ্ডে বিলম্বিত অবস্থায় চট্টোপাধ্যায়কে স্বগৃহে বহন করিয়া আনিলেন। তথায় স্বহস্তে নিতান্ত নির্দ্দয়রূপে চাবুক প্রহারে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিয়া মুখের মধ্যে বলপূর্ব্বক গোমাংস প্রবিষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। * বিনোদরামের এইরূপ বিচারপ্রণালীতে দেশের লোক যে কিরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তাহা এখন কল্পনা করাও অসম্ভব। যাহারা অল্পবুদ্ধি নিরক্ষর, তাহারা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রশংসা করিতে পারিল না; যাঁহারা পদস্থ ধনশালী ইংরাজবন্ধু, তাঁহারাও এরূপ কার্য্যের অন্য কোন সদুত্তর প্রদান করিতে সক্ষম হইলেন না। উত্তরকালে কবিকাহিনীতে লিখিত হইয়াছে,—

> "এক রাজা যাবে পুনঃ অন্য রাজা হবে,
> বাঙ্গালার সিংহাসন শূন্য নাহি রবে।" †

---

* Mr. Barton laying in wait seized Bnautram chattagee opposite to the door of council, and with the assistance of his bearers, and two peons tied his hands and feet, swung him upon a bamboo like a hog, carred him to his own house, there with his own hand shawbooked him in the most cruel manner, almost to the deprivation of life; endeavoured to force beaf into his month, to the irreparable loss of his Brahmin's caste, and all this without giving ear to, or suffering the man to speak in his own defence, or clear up his innocence to him.—Selections from the Records of the Government of India, vol. I. Record no. 463.

† পলাশীর যুদ্ধ কাব্য।

লোকে এই হিতকথায় সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিল না; তাহারা মনে মনে নূতন নবাবদিগের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল।

এই অসন্তোষ কালে বিলীন হইয়া গিয়াছে। অরাজকতার মূলোচ্ছেদ করিয়া, সুশিক্ষার বহুল প্রচার করিয়া, সুবিচার ও সুশাসনের বহুবিধ বিধি-ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়া, ইংরাজরাজ সভ্যসমাজে আদর্শ শাসনকর্ত্তা বলিয়া কীর্ত্তিলাভ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখন ইংরাজ শাসন প্রচলিত হয় নাই, কেবল ইংরাজবাহু দেশলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

রাণী ভবানী রাষ্ট্রবিবর্ত্তনের বিরোধী ছিলেন। তথাপি তাঁহার কথায় কেহ কর্ণপাত করেন নাই। এখন সকলেই তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া হায় হায় করিতে লাগিলেন। দেশের মধ্যে যে অভিনব উপদ্রবের সৃষ্টি হইল, তাহা এ দেশের লোকের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন।

বঙ্গদেশে বহুবার রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে; কখনও হিন্দু, কখনও বৌদ্ধ, কখনও পাঠান, কখনও মোগল, বাঙ্গালীর উপর রাজদণ্ড পরিচালন করিয়াছেন। কিন্তু সে সকল রাষ্ট্রবিপ্লবে দীনদুঃখীদিগের দুঃখ ছিল না; যাঁহারা রাজা বা জমিদার, তাঁহাদের সর্ব্বনাশ হইত; দেশের লোকে নিরুদ্বেগে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইত; যিনি রাজসিংহাসন অধিকার করিতেন, তাঁহাকেই সহাস্যবদনে করপ্রদান করিত। বর্ত্তমান রাষ্ট্রবিপ্লবে ইহার বিপরীত ঘটনা সংঘটিত হইতে লাগিল। দেশের রাজা ও জমিদারবর্গ ইংরাজের সহায়; তাঁহাদের আপাততঃ কোনও ক্ষতি হইল না; যাহারা নিতান্ত দীন দুঃখী অসহায়, তাহাদিগেরই সর্ব্বনাশ হইতে লাগিল। হাট বাজার কাঁপিয়া উঠিল; ইংরাজের গোমস্তার অত্যাচারে জোলা তাঁতি পলায়ন করিতে লাগিল; অর্থোপার্জ্জনের আশায় ইংরাজেরা ধান চাউল পান সুপারি তামাক লবণ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যের কারবার খুলিয়া দিলেন; অন্তর্বাণিজ্যে দরিদ্র বঙ্গবাসীর যে দুই পয়সা আয় হইবে, সে আশা ত ফুরাইল।

নূতন নবাবদিগের দৌরাত্ম্যে যে কেবল বাঙ্গালীরই সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল, তাহা নহে;—কোম্পানি বাহাদুরেরও বিলক্ষণ সর্ব্বনাশ হইতে লাগিল। ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ স্বার্থসাধনের জন্য কোম্পানীর বাণিজ্যোন্নতির বিষয়ে উদাসীন হইয়া আপন আপন বাণিজ্যোন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন। সহসা যুদ্ধকলহে লিপ্ত হইয়া সামরিক ব্যয় বর্দ্ধিত হইতেছিল, তাহা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে

লাগিল। বিলাতের কোর্ট অব্ ডিরেক্টারের সদস্যগণ পুনঃপুনঃ পত্র লিখিয়াও ইহার গতি রোধ করিতে পারিলেন না।

বঙ্গদেশের ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ নানা স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া ও বহুসংখ্যক সেনা নিয়োগ করিয়া আত্মপক্ষ প্রবল করিতে লাগিলেন। কোর্ট অব ডিরেক্টারের সদস্যগণ লিখিয়া পাঠাইলেন যে,—"তোমাদের প্রভু বণিক, সে কথা ভুলিয়া গিয়া তোমরা সামরিক চিন্তায় আত্মহারা হইয়াছ কেন? আমাদের মূলধনের অর্দ্ধাংশ কি দুর্গপ্রাচীরতলে প্রোথিত করিব?" *

এরূপ তীব্র তিরস্কারেও ফল হইল না। এ দেশের ইংরাজেরা লিখিয়া পাঠাইলেন যে,"তাহা না করিলে ইংরাজ বাণিজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে;—ফরাসি বা ওলন্দাজগণ ভারতবাণিজ্যে একাধিপত্য প্রাপ্ত হইবেন।" সুতরাং এ দেশের ইংরাজদিগের ইচ্ছামতই সকল কার্য্য চলিতে লাগিল।

রাণী ভবানীর জীবনকাহিনীর সহিত এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনার ঘনিষ্ঠ সংস্রব। তিনি তৎকালে বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থানের অধিশ্বরী; কেবল তাহাই নহে; তাঁহার রাজ্যমধ্যেই ইংরাজদিগের অধিকাংশ বাণিজ্যালয়। তখনও রাণী ভবানীর স্বাধীন শাসনক্ষমতা তিরোহিত হয় নাই, তখনও স্বরাজ্যের জীবন মরণের বিচারক্ষমতা তাঁহার করতলগত। সুতরাং নূতন নবাবদিগের সহিত রাণী ভবানীর নানা কারণে মনোমালিন্য সংঘটিত হইতে লাগিল।

এ দেশের রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে যে ইংরাজ লেখকগণ শতমুখে রাণী ভবানীর শাসনপ্রতিভার প্রশংসা কীর্ত্তন করিতেন, রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবামাত্র তাঁহারাই রাণী ভবানীর শাসনকলঙ্ক আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। রাণী ভবানী রমণী,—অবরোধ-কারাবাসিনী বিধবা হিন্দুরমণী; অশিক্ষিতা, কুসংস্কারাচ্ছন্না, পাত্রমিত্রপরিবেষ্টিতা, শাসনকৌশলবিহীনা, অযোগ্য ভূম্যধিকারিণী, ইত্যাদি অনেক কথা ইংরাজদরবারে উপনীত হইতে লাগিল। ভবানী সে সকল কথায় কর্ণপাত না করিয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন, এবং দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, আর্ত্তের রক্ষণ, আশ্রিতের কল্যাণসাধন করিয়া আপন পদগৌরবের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিলেন না।

---

* We can not avoid remarking that you seem so thoroughly possessed with military ideas as to forget your employers are merchants, and trade their principal object; and were we to adopt your several plans for fortify-

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ;—দেশের কথা।

প্রসঙ্গক্রমে অনেক যুদ্ধ কলহ ও রাষ্ট্রবিবর্ত্তনের কথা শুনাইতে বসিয়া, দেশের কথা বর্ণনা করা হয় নাই। রাণী ভবানী যে রাজ্যের মহারাণী ও প্রাতঃস্মরণীয়া দেবী বলিয়া পূজনীয়া হইয়াছিলেন, সে রাজ্যে শিক্ষা দীক্ষা শিল্প বাণিজ্য সকল বিষয়ের সঙ্গেই তাঁহার সংস্রব ছিল। তাহার কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।

রাণী ভবানীর সময়ে দুই শ্রেণীর রাজকর প্রচলিত ছিল ;—আসল ও আবওয়াব। আসল জমা যৎসামান্য ছিল, আবওয়াবের সংখ্যা ও পরিমাণ অনির্দ্দিষ্ট থাকায়, তাহাই অধিক বলিয়া বিবেচিত হইত। যাহারা কৃষিজীবী, তাহারা যৎসামান্য রাজকর প্রদান করিত ;—যাহারা ব্যবসায়ী, তাহাদিগকেই অধিকমাত্রায় রাজকর প্রদান করিতে হইত।

সে কালে বাস্তভূমির রাজকর বড়ই যৎসামান্য ছিল ; নিতান্ত দরিদ্র লোকেও ঘর-বাড়ী বাঁধিয়া নিরুদ্বেগে বাস করিতে পারিত। রাণী ভবানীর রাজ্যে অধিকাংশ বাস্তভূমি নানা কারণে রাজকরপ্রদানের দায়িত্ব হইতে মুক্তিলাভ করায়, প্রজাপুঞ্জের পক্ষে নিরুদ্বেগের কারণ হইয়াছিল। দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, লাখেরাজ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে অধিকাংশ বাস্তভূমিই কার্য্যতঃ নিষ্কর বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল ; রাণী ভবানীর রাজ্যে উত্তরদ্বারী গৃহের জন্য রাজকর গৃহীত হইত না বলিয়া, তদুপলক্ষেও অনেকে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল।

আসল জমার পরিমাণ যতই যৎসামান্য হউক, আবওয়াবের পরিমাণ নিতান্ত যৎসামান্য ছিল না। সেকালের শিল্প বাণিজ্যাদির লভ্যাংশের উপর আবওয়াব ধার্য্য হইত, সামাজিক ও পারিবারিক মাঙ্গলিক ব্যাপারের জন্যও আবওয়াব প্রদান করিতে হইত। এতদ্ভিন্ন বিচারকার্য্যের জন্য অর্থী প্রত্যর্থিগণকে নানারূপে অর্থ ব্যয় করিতে হইত। এই সকল উপায়ে রাণী ভবানীর প্রচুর অর্থাগম হইত। তিনি সেই অর্থের কিরূপ সদ্ব্যবহার করিতেন, তাহার নিদর্শনে, বঙ্গভূমি কেন,—ভারতবর্ষের বিবিধ পুণ্যক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

এই সকল কারণে রাণী ভবানীর রাজ্যে লোকের সুখের অবধি ছিল না। তাহারা কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে

---

ing, half our capital would be buried in stone-walls.—Courts' letter, 23 March, 1759, para 55.

সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। ইংরাজেরা রাজসাহী রাজ্যের এইরূপ উন্নত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই নানা স্থানে বাণিজ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষ আজকাল কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়াই খ্যাতি লাভ করিয়াছে; তাহার প্রধান কারণ এই যে, ভারতবর্ষের শিল্প বাণিজ্য তিরোহিত হইয়া কেবলমাত্র কৃষিকার্য্যই অবশিষ্ট রহিয়াছে। রাণী ভবানীর সময়ে এ দেশের এরূপ দুর্দ্দশা ছিল না। কার্পাস ও পট্টবস্ত্রের জন্য রাজসাহীর সবিশেষ সুখ্যাতি ছিল; কার্পাস বৃক্ষের কৃষিকার্য্যে, কার্পাস সূত্রের ক্রয় বিক্রয় ও কার্পাস বস্ত্রের বিনিময়ে, বাঙ্গালীরা সুসভ্য ইউরোপ হইতেও অর্থোপার্জ্জন করিতেন।

ইংরাজেরা বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামে জমিদারী লাভ করার পর হইতেই, তাঁহাদের অসঙ্গত অত্যাচারে ও অশিষ্ট আচরণে, বাঙ্গালীর শিল্প-বাণিজ্য উৎসন্ন হইবার সূত্রপাত হয়। ইংরাজ বণিক বামনের ন্যায় বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামে ত্রিপাদ ভূমি প্রাপ্ত হইয়া, কালক্রমে বাঙ্গালীর শিল্প ও বাণিজ্য ও কারুকার্য্যের স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল অধিকার করিয়া ফেলিয়াছিলেন। রাণী ভবানীর রাজ্যে এই উপলক্ষে কিরূপ অত্যাচার হইত, মালদহের ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী গ্রে সাহেব তাহার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। *

কলিকাতার ইংরাজ দরবারের সহৃদয় সদস্যগণ, বা বিলাতের কোর্ট অব্ ডিরেক্টারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ সহসা এই অশিষ্ট ব্যবহারের গতিরোধ করিতে না পারায়, বাঙ্গালার শিল্প বাণিজ্য দিন দিন অধোগতি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। লর্ড ক্লাইব পুনরায় বঙ্গদেশে শুভাগমন করিয়া সুশাসন সংস্থাপনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকেও প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে

---

* Mr. Gray, resident at Malda, in January 1764 wrote to the President,—"Since my arrival here, I have had an opportunity of seeing the villainous practices used by the Calcutta gomastas, in carrying on their business. The Government has certainly too much reason to complain of their want of influence in their country, which is torn to pieces by a set of rascals, who in Calcutta walk in rags, but when they ara set out on gomastaships, lord it over the country, imprisoning the ryots and merchants, and writing and talking in the most insolent, domineering manner to the fouzdars and officers.

হইয়াছিল যে, এরূপ ক্ষেত্রে অরাজক রাজ্যে দুষ্ট দমন করা একরূপ অসাধ্য ব্যাপার। *

মোগল শাসন ভাসিয়া গিয়াছে, ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই, বাহুবলই সকল তর্কের একমাত্র মীমাংসক বলিয়া পরিচিত হইয়াছে,—এরূপ ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে দস্যু তস্করের উপদ্রব প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। অরাজক রাজ্যে শান্তি সুখ তিষ্ঠিতে পারিল না;—বিধবার অশ্রুধারা, অনাথের আর্ত্তনাদ, দুর্ব্বলের কাতর ক্রন্দন, অসহায়ের হাহাকারে, রাণী ভবানী নিত্যই মর্ম্মপীড়িত হইতে লাগিলেন। অল্পদর্শী লোকে রাষ্ট্রবিবর্ত্তনের এই সকল প্রত্যক্ষ কুফল দর্শন করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের উদ্দেশে গালিবর্ষণ করিতে লাগিল।

প্রজার সুখেই জমিদারগণের সুখ;—প্রজার সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত হইয়া জমিদারদলকেও বিব্রত করিয়া তুলিতে লাগিল। তাঁহারা রাষ্ট্রবিপ্লবে লাভবান হইবেন বলিয়া সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন; কিন্তু লাভ দূরে থাকুক, অন্তর্বিপ্লবের তুমুল তরঙ্গে প্রাচীন জমিদার-বংশ নিমজ্জিত হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। রাণী ভবানীর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল;—খাল কাটিয়া কুম্ভীর আনিবার ফল ফলিল, সমুদ্রমন্থনে অমৃতকুম্ভের পরিবর্ত্তে হলাহল ভাসিয়া উঠিল!

এই সকল অপূর্ব্ব বিড়ম্বনার মধ্যে হিন্দু মহিলার পক্ষে রাজসাহীর ন্যায় বিস্তৃত রাজ্যের শাসনভার পরিচালন করা কত দূর কঠিন, তাহা বিবেচনা করিলে, সে কালের কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাণী ভবানী এরূপ

---

* "In a country where money is plenty, where fear is the principal of government, and where your arms are ever victorious, it is no wonder that the lust of riches should readily embrace the proferred means of its gratification, or that the instruments of your power should avail themselves of their authority, and procced even to *extortion* in those cases where simple corruption could not keep pace with their rapacity. Example of this sort, set by superiors, could not fail of being followed in a proportionate degree by inferiors. The evil was contageous, and spread among the civil and military, down to the writer, the ensign and the free merchant.—Clive's letter

অন্তর্বিপ্লবের মধ্যেও হতাশ হইয়া আত্মকর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিলেন না। পূর্ব্ববৎ প্রজাপালনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

রাণী ভবানীর চেষ্টায় রাজসাহী রাজ্যে কিয়ৎপরিমাণে সুশাসন বর্ত্তমান ছিল; কিন্তু তাহাও যায়-যায় হইয়া উঠিতে লাগিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ;—দেশের কথা।

রাণী ভবানীর শাসন-সময়ে এ দেশে গোব্রাহ্মণসেবার যথেষ্ট সমাদর ছিল। লোকে লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া কবচাকারে সাগ্রহে অঙ্গে ধারণ করিত; পীড়া বা যন্ত্রণার সময়ে ভক্তিভরে সর্ব্বৌষধিরূপে সেবন করিত, এবং যাত্রাকালে মস্তকে স্থাপন করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইত!

দেশের অধিকাংশ লোকেই শাক্তমতাবলম্বী হইলেও, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শিষ্যানুশিষ্যবর্গের পাদপূজার অভাব ছিল না; বরং জনসাধারণের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্মেরই প্রাদুর্ভাব অধিকমাত্রায় পরিলক্ষিত হইত।

নদীয়ার ও নাটোরের রাজবংশ শাক্তমতাবলম্বী বলিয়া, রাজসাহী ও কৃষ্ণনগর অঞ্চলে রাজানুকম্পায় তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপের প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। তদুপলক্ষে সুরার উপাসনাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এক জন লিখিয়া গিয়াছেন যে,—"রাজসাহী শাক্ত সমাজের লীলাভূমি; ইহার গ্রামে গ্রামে শক্তিপূজা প্রচলিত ছিল, এবং তদুপলক্ষে সুরার উপাসনাও বিশেষরূপে প্রচলিত হইয়াছিল!" * রাজসাহী প্রদেশে অদ্যাপিও শাক্তমতেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কৃপায় গৌরাঙ্গদেবের জন্মভূমিতেও শাক্তমতের প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। সভাপণ্ডিত আগমবাগীশ মহাশয় দীপান্বিতা-শ্যামা-পূজা ও জগদ্ধাত্রী-পূজার প্রচলন করিয়া, শাক্তোৎসবের সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

এই সময়ের সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমাজসংস্কারের চেষ্টা আজকাল নূতন প্রচলিত হয় নাই। রাণী ভবানীর সময়েও দুইটি কঠোর সমাজ-নিয়মের সংস্কার করিবার চেষ্টা হইয়াছিল।

আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তৎকালে পূর্ব্ব-বাঙ্গলায় বিক্রমপুরের পণ্ডিতসমাজ, এবং পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গে নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজ সর্ব্বপ্রকার সামাজিক আচার পদ্ধতির নিয়ামক হইয়া উঠিয়াছিলেন। পূর্ব্ববাঙ্গলায় প্রাচীন স্মৃতি ও নবদ্বীপাঞ্চলে রঘুনন্দন স্মার্ত্তশিরোমণি মহাশয়ের অষ্টাবিংশতিতত্ত্বাত্মক নব্যস্মৃতির সমাদর দেখিতে পাওয়া যাইত। এই সময়ে বাঙ্গলা দেশের

সকল স্থানেই গৌরীদান, বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণপ্রথা দৃঢ়সংস্থাপিত হইয়াছিল।

ইহাতে কোনও কোনও বিষয়ে সমাজশাসনের সুব্যবস্থা হইলেও, কোনও কোনও বিষয়ে বড়ই মর্ম্মান্তিক দুঃখ ক্লেশের কারণ সংঘটিত হইয়াছিল। অষ্টম-বর্ষীয়া বালিকার গৌরীদানের পর সে যদি দৈববশে বিধবা হইত, একাদশীর দিনে আত্মীয় বান্ধবগণকে জীবন্মৃতাবস্থায় নিশাযাপন করিতে হইত;—ধর্ম্ম-রক্ষার আশায় বালবিধবাকে গৃহাভ্যন্তরে অর্গলরুদ্ধাবস্থায় রাখিয়া, পিতা মাতা কত ক্লেশে নিশাতিপাত করিতেন, তাহা কল্পনা করিতেও সাহস হয় না!

রাণী ভবানীকে এই নিদারুণ যন্ত্রণা বহন করিতে হইয়াছিল। তিনি পরম সমারোহে তারা ঠাকুরাণীর গৌরীদান করিয়াছিলেন; কিন্তু বালিকার জ্ঞানো-দয় হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে ব্রহ্মচর্য্যের নির্ম্মম নিয়মের অধীন হইতে হইয়া-ছিল! বালিকার পক্ষে একাদশী ব্রতের কঠোর নিয়ম পরিপালন করা সহজ নহে; রাণী ভবানীকে তাহার জন্য মর্ম্মপীড়া ভোগ করিতে হইত। তিনি ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায়, মধ্যবঙ্গেও একাদশী ব্রতকে সহজসাধ্য করিবার আশায়, পণ্ডিতসমাজের ব্যবস্থা সংগ্রহের আয়োজন করিয়াছিলেন। এ কালের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ দীর্ঘাতিদীর্ঘ উপাধিলাভ করিতেছেন, অনেকেই কমলার কৃপায় মর্ম্মরখচিত হর্ম্ম্যতলে বাস করিয়া অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি পঞ্চ-যজ্ঞ সাধন করিয়া, হিন্দু সমাজের পূজার পাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। সে কালের ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের এরূপ সাংসারিক সৌভাগ্যের মুখদর্শন করি-বার উপায় ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের বিদ্যা ছিল, বুদ্ধি ছিল, উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত উন্নত জীবনে নির্ভীক স্বাধীন সত্যানুরাগ ও তেজস্বিতা ছিল। রাণী ভবানী অর্দ্ধবঙ্গাধিকারিণী প্রাতঃস্মরণীয়া দেবী হইয়াও, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে ইচ্ছানু-সারে পরিচালিত করিতে সক্ষম হন নাই;—তাঁহারা স্মার্ত্তশিরোমণির বহু-কালপ্রচলিত দেশাচারের সংস্কার করিতে সম্মতিদান করিলেন না!

এই সময়েই বিধবাবিবাহের প্রস্তাব প্রথমে উত্থাপিত হয়। বর্ত্তমান যুগের প্রাতঃস্মরণীয় পূজ্যপাদ স্বনামখ্যাত বিদ্যাসাগর মহাশয় যাবজ্জীবন যে সামা-জিক মহাসমরে লিপ্ত হইয়া বীরের ন্যায় আত্মমতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, সে কালের এক জন বাঙ্গালী জমিদার সর্ব্বপ্রথমে সেই সামাজিক মহাসমরের ঘোষণা করেন।

"বিক্রমপুর ও নবদ্বীপ প্রদেশের ভদ্রসমাজে অদ্যাপি এই প্রবাদ চলিয়া

আসিতেছে যে, বিক্রমপুরবাসী প্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভ, স্বীয় তরুণবয়স্কা কন্যার বৈধব্যযন্ত্রণাদর্শনে, যৎপরোনাস্তি ব্যথিতহৃদয় হইয়া, বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন।" *

বলা বাহুল্য যে, রাজা রাজবল্লভের এই চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। কিন্তু কি জন্য, কাহার দোষে তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল না, "ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিতে" তাহার জনশ্রুতি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমরা প্রসঙ্গক্রমে উক্ত জন-শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"বিধবাবিবাহ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নহে, ইহার ব্যবস্থা পূর্ব্ব পশ্চিম নানা অঞ্চলের পণ্ডিতগণের নিকট সংগ্রহ করিয়া, নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থার জন্য, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সন্নিধানে কতিপয় পণ্ডিত প্রেরণ করেন। রাজবল্লভ তৎকালে ঢাকার নবাব ও প্রভূতক্ষমতাশালী রাজপুরুষ ছিলেন। সুতরাং তিনি মনে করিয়াছিলেন, 'যখন অন্য অন্য অঞ্চলের পণ্ডিতদিগের নিকট অনুকূল ব্যবস্থা পাইয়াছি, তখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে অনুরোধ করিলে, অনা-য়াসেই নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতগণেরও নিকট ঐরূপ ব্যবস্থা পাইব।' তাঁহার প্রেরিত পণ্ডিতেরা রাজবাটীতে উপনীত হইলে, কৃষ্ণচন্দ্র অতীব আদরের সহিত তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন, এবং তাঁহাদের প্রভুর অভীষ্টসাধনে যথাসাধ্য যত্ন করিতে অঙ্গীকৃত হইলেন। তদনন্তর সভাস্থ ও নবদ্বীপস্থ প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণকে গোপনে রাজবল্লভের প্রেরিত ব্যবস্থা দেখাইলেন। তাঁহারা ইহা পাঠকরণান্তর 'এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত' কহিলেন। ইহা শ্রবণমাত্র কৃষ্ণচন্দ্র নিরতিশয় ঈর্ষ্যাদগ্ধচিত্ত হইয়া বলিলেন, 'এ ব্যবস্থা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ না হইলেও ব্যবহারবিরুদ্ধ বলিয়া রাজবল্লভকে নিরস্ত করিতে হইবে। এক জন বৈদ্যজাতীয় যে এই চির-অপ্রচলিত ব্যবহার প্রচলিত করিয়া যাইবেন, তাহা কোন মতেই সহনীয় নহে। কিন্তু, এক্ষণে রাজবল্লভের যেরূপ প্রভাব, তাহাতে আমি তাঁহাকে কোন মতেই বিরক্ত করিতে পারি না। অতএব তাঁহার সন্তোষার্থ আমি আপনাদিগকে এই ব্যবস্থায় স্বাক্ষর করিবার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি অনুরোধ করিব, এবং আপনারা অসম্মত হইলে আপনাদের প্রতি তাড়নাও করিব। আপনারা এই কহিবেন যে, মহারাজ বা কাহার অনুরোধে আমরা এরূপ ব্যবস্থা দিয়া পাপগ্রস্ত হইতে পারিব না'।"

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কিন্তু পণ্ডিতগণকে করতলগত করিতে পারিলেন না।

* ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত।

তখন স্বনামখ্যাত গোপাল ভাঁড় কৌশলে কার্য্যোদ্ধার করিবার জন্য বিক্রমপুরাগত পণ্ডিতবর্গের নৌকায় তাঁহাদের আহার্য্য দ্রব্য বহন করিতে লাগিলেন। পণ্ডিতেরা সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন যে, আহার্য্য মধ্যে একটি গোবৎসও আনীত হইয়াছে। জিজ্ঞাসায় গোপাল ভাঁড় বলিলেন যে, গোমাংসভক্ষণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে, অতএব ইহাও ভোজন করিতে হইবে। তখন পণ্ডিতগণ পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া স্বভাবসুলভ সংস্কারবশতঃ বলিয়া উঠিলেন—'শাস্ত্রসম্মত হউক, ব্যবহারবিরুদ্ধ কার্য্য কিরূপে সম্পাদন করিব?' গোপাল অবসর পাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—'তবে আর বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিতে আসিয়াছেন কেন? তাহাও ত ব্যবহারবিরুদ্ধ!'

অতঃপর বিক্রমপুরাগত পণ্ডিতমণ্ডলী নবদ্বীপে অবস্থান করা নিরর্থক ভাবিয়া রজনীযোগে পলায়ন করায় বিধবাবিবাহের আন্দোলন এইখানেই পরিসমাপ্ত হইল।

ইহা অবশ্যই জনশ্রুতিমাত্র। কিন্তু এই জনশ্রুতিতে সেকালের পণ্ডিতসমাজের ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের স্বভাবের যেরূপ পরিচয় রহিয়া গিয়াছে, তাহা সবিশেষ শিক্ষাপ্রদ। সে কালের পণ্ডিতমণ্ডলীর ন্যায় পণ্ডিত এখন কোথায়? কিন্তু সেকালের কৃষ্ণচন্দ্রের ন্যায় জমিদারের যে একালেও অভাব হয় নাই, স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিধবাবিবাহ বর্ত্তমান যুগের রাজবিধির কল্যাণে বৈধবিবাহমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, কিন্তু ব্যবহারবিরুদ্ধ বলিয়া আজিও ইহা হিন্দুসমাজে স্থান লাভ করিতে পারে নাই।

এ কালের বিধবাদিগের দুঃখের অবধি নাই;—তাহার প্রধান কারণ এই যে, কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যও তাহারা পরমুখাপেক্ষিণী হইয়া [illegible]নীর ন্যায় কত তাড়না সহ্য করিতে বাধ্য হয়! জীবিকার্জ্জনের উপায় না থাকায় এ কালের নিরাশ্রয়া বিধবাদিগকে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। সে কালে এ বিষয়ে কিয়ৎপরিমাণে সুবিধা ছিল। দেশে প্রচুর পরিমাণে কার্পাস উৎপন্ন হইত; বিধবাগণ তাহা হইতে সূত্র প্রস্তুত করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইত। এ দেশের তন্তুবায়গণ ব্যবসায়ান্তর অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে; কার্পাসের কথা এখন অভিধানে অধ্যয়ন করিতে হইতেছে; সুতরাং পল্লীরমণীগণের পক্ষে শ্রমলব্ধ অর্থোপার্জ্জনের সর্ব্বপ্রধান পথ অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

রাণী ভবানী জীবহিতকামনায় নানারূপ পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। হতভাগিনী বিধবাদের ভরণপোষণের জন্যও গঙ্গাতীরে আশ্রয়স্থান নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার আশ্রয়ে বহুসংখ্যক বিধবা গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হইত।

এই সময়ে রাজসাহী রাজ্যে কার্পাস ও পট্টবস্ত্রের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকগণ বাঙ্গলা দেশের নানাস্থান হইতে কার্পাস ও পট্টবস্ত্র ক্রয় করিয়া ইউরোপে বিক্রয় করিতেন, এবং যথাকালে বস্ত্র ক্রয় করিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া তন্তুবায়গণকে 'দাদন' অর্থাৎ অগ্রিম মূল্য প্রদান করিতেন। ইহাতে যাহাদের কিছুমাত্র মূলধন ছিল না, তাহারাও দাদনের কৃপায় বস্ত্রবয়নে অগ্রসর হইয়াছিল। এই সকল বস্ত্রের এক একটি আড়ং অর্থাৎ বিক্রয়স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল; তন্তুবায়গণ তথায় বিক্রয়ার্থ বস্ত্র আনয়ন করিত। রাজসাহী রাজ্যে এইরূপ বহুসংখ্যক আড়ং ছিল;—ইংরাজেরা লিখিয়া গিয়াছেন যে, প্রত্যেক আড়ং হইতেই তাঁহারা বৎসরে ১৪৮১০০ খণ্ড বস্ত্র ক্রয় করিতে পারিতেন। রাজপুরুষেরা বলেন যে,—রাণী ভবানীর রাজ্যে বিংশতি লক্ষ লোকের বসতি ছিল। যে রাজ্যে বিংশতিলক্ষ লোকের পরিধেয় প্রস্তুত হইয়া লক্ষ লক্ষ বস্ত্র ইউরোপীয় বণিকের নিকট বিক্রীত হইত, সে রাজ্যে প্রজার লক্ষ্মীশ্রী কিরূপ ছিল? সে রামও নাই—সে অযোধ্যাও নাই; এখন রাজসাহীতে বিলাতী কাপড়েরই একাধিপত্য!

রাণী ভবানীর শাসনসময়ের শেষদশায়, দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের তিরোধানের সূত্রপাত হয়। ইংরাজেরা পরাক্রান্ত হইয়া অল্পমূল্যে ক্রয় ও বহুমূল্যে বিক্রয় করিয়া কারবারে লাভবান হইবার আশায় দেশের লোকের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করায়, মীরকাশিমের সময়ে যুদ্ধানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। মীরকাশিমের পরাজয়ে ইংরাজেরাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন, সুতরাং তাঁহাদের কর্ম্মচারিবর্গ কোম্পানীদত্ত নির্দ্দিষ্ট বেতনে সন্তুষ্ট না হইয়া, গোপনে ও প্রকাশ্যে বাণিজ্যব্যাপারে অর্থোপার্জ্জনে লিপ্ত হইতে লাগিলেন। যাঁহারা রক্ষক, তাঁহারাই ভক্ষক হইয়া উঠিলেন;—বিদেশীয় বণিকসমিতির অর্থপিপাসা শান্ত করিবার জন্য দেশের লোকের শিল্পবাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল; লোকে ক্রমে ক্রমে একমাত্র কৃষিকার্য্যের উপরেই একান্ত নির্ভর করিতে বাধ্য হইল।

১১৭৭ সালের মন্বন্তরে বাঙ্গালার যে সর্ব্বনাশ সংসাধিত হইয়াছিল, ঐতি-

হাসিক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সম্প্রতি স্যর উইলিয়ম হণ্টার প্রণীত বঙ্গবিবরণীর সমালোচনায় ইহাকেই তাহার একতম কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। *

কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে রাজসাহী প্রদেশে নানাবিধ চাউল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত; তদ্ভিন্ন স্থানে স্থানে নীল, তামাক, খর্জ্জুরী শর্করা ইত্যাদিরও সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। বাঙ্গালীরা এই সকল শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্য লইয়া সমুদ্রপথে নানা দেশে বাণিজ্য করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিত। একবার ইংরাজেরা দেশীয় বণিক্‌গণের বাণিজ্যপোত লুণ্ঠন করায়, নবাব আলিবর্দ্দীর আজ্ঞায় তাঁহাদিগকে দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রা অর্থদণ্ড প্রদান করিতে হইয়াছিল। † ইংরাজেরা সর্ব্বেসর্ব্বা হওয়ায় তাঁহাদিগকে আর শাসন করিবার কেহ রহিল না; অগত্যা বাঙ্গালীর বহির্বাণিজ্য দিন দিন অবসন্ন হইতে লাগিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ;—মন্বন্তর। §

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইব বিলাতে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে,—"আমরা আরও কিছুদিন দেশীয় শাসনপ্রথার পদানত থাকিয়া, স্বেচ্ছাচারী শাসন-কর্ত্তৃগণের লুণ্ঠন ও অপমান সহ্য করিয়া, সামান্য বণিক্‌-সমিতির মতই নীরবে ভারতবর্ষে অবস্থান করিব, অথবা এখন হইতেই তরবারি হস্তে কোম্পানীর

* The appalling blunders of the first administrators, the ruin of the old aristocracy of Bengal, the ruin of internal trade under a system pursued for the profit of the Company's servants and gamastahs, and desertion of Villages and fields under the misrule of the years immediately preceding the Famine, all these were important and accelerating causes which have been darkly hinted at but not fully told by the historian of the Famine of 1770.—R. C. Dutt Eqr. C. S., Professor of Indian History, University college, London. (Quoted from 'India' 25 March, (1898).

† Long's Selections from the Records of the Government of India, Vol. I. Record No. 46.

§ এই পরিচ্ছেদের অধিকাংশ বিষয় ইতিপূর্ব্বে 'মন্বন্তর' শীর্ষক একটি পৃথক্‌ প্রবন্ধে 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছে; সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজনবোধে, ইহাতে কেবল প্রসঙ্গক্রমে মন্বন্তরের উল্লেখমাত্রই রহিল।

ক্ষমতা ও রাজ্যরক্ষায় নিযুক্ত হইব,—ইহার কোন্ পথ কোম্পানীর পক্ষে কল্যাণকর, তাহার নির্ণয় করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। পরিণামফল যাহাই হউক, একবার যখন শক্রতাসাধন করিয়া এত দূর অগ্রসর হইয়াছি, তখন প্রত্যেক যুদ্ধে, প্রত্যেক গুপ্তমন্ত্রণায়, কোম্পানীর অধিকার সঙ্কটময় হইয়া উঠিতেছে। ইহার গতিরোধ করিতে হইলে, কোম্পানীর শাসন সুদৃঢ়রূপে সংস্থাপন করা আবশ্যক, এবং আমাদিগের বিবেচনায় তাহাই যুক্তিযুক্ত।" *

লর্ড ক্লাইব এইরূপ ভণিতা করিয়া লিখিলেন,—"নবাবের সহিত কোম্পানীর কর্ম্মচারিবর্গের সর্ব্বদাই যে সকল কলহ বিবাদ উপস্থিত হইতেছে, এবং যে সকল অত্যাচার উৎপীড়নের কথা পুনঃ পুনঃ কর্ণগোচর হইতেছে, তাহাতে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার 'দেওয়ানী সনন্দ' গ্রহণ করা ভিন্ন সে সকল অসুবিধার মূলোচ্ছেদ করিবার উপায়ান্তর নাই! দিল্লীশ্বরকে বাহুবলে সিংহাসনে সংস্থাপন করায়, তিনি সিংহাসনরক্ষার আশায় কৃতজ্ঞচিত্তে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে 'দেওয়ানী সনন্দ' প্রদান করিতে চাহিতেছেন। দেওয়ানী আর কিছুই নহে,—প্রজার নিকট রাজকর সংগ্রহ করিয়া নবাব নাজিমের ব্যয় সংকুলনার্থ যাহা প্রয়োজন, তদ্ভিন্ন অবশিষ্ট রাজস্ব দিল্লীশ্বরকে পাঠাইয়া দিতে হইবে।" †

বিলাতের কোর্ট অব ডিরেক্টারের সদস্যগণ বহুদূরে,—ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা কিছুই জানেন না; তথাপি তাঁহারা শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সম্মত ছিলেন না; বাণিজ্যরক্ষাই তাঁহাদিগের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য। তাঁহারা ক্লাইবের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেও স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, "দেশশাসন ও বিচারকার্য্যে যেন লিপ্ত হইতে না হয়।" ‡

এ দেশের ইংরাজেরা সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। লর্ড ক্লাইব 'পুণ্যাহ' করিয়া প্রকারান্তরে সর্ব্বময় শাসনকর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। ইহাতে কোম্পানীর বাণিজ্যব্যাপারের দিকে কর্ম্মচারিবর্গের আর সেরূপ মনোযোগ রহিল না; তাহারা রাজ্যেশ্বর হইয়া এক একটি ক্ষুদ্র নবাব হইয়া উঠিলেন। বর্ষশেষে বিলাতে আয় ব্যয়ের বিবরণী প্রেরণ করিবার সময়ে ক্লাইবকে স্বীকার করিতে হইল যে, কোম্পানী দেওয়ানী লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি লিখি-

* Clive's letter to the Court of Directors.

† Long's Selections, Record No. 833.

‡ Ditto—Record No. 861.

লেন,—"জমিদারবর্গ রাজস্বদান না করিয়া তাহা আত্মসাৎ করিয়া থাকেন ; ইহার গতিরোধ না করিলে দেওয়ানীর আয়ে ব্যয় সংকুলন হইবে না, জমিদারেরাও স্বস্বপ্রধান হইয়া উঠিবেন !" *

ক্লাইব জমিদারদলকে করসংগ্রাহক রাজকর্ম্মচারী বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন ; সুতরাং তাঁহাদের স্থলে নূতন করসংগ্রাহক নিয়োগ করিবার কল্পনা করিতেছিলেন। এমন সময়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করায় তিনি স্বহস্তে জমিদারগণকে পদচ্যুত করিতে না পারিয়া স্বদেশ হইতে লিখিয়া পাঠাইলেন,—"বাঙ্গলা দেশে কিরূপ আকারে রাজ্যতন্ত্র গঠিত হইবে, তাহাই সর্ব্বপ্রথম কথা। দেওয়ানী-সনন্দ-বলে কোম্পানীই দেশের রাজা হইয়াছেন, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছে। নবাবের আর সে ক্ষমতা নাই,—তিনি এখন ক্ষমতা ও উপাধির পুরাতন ছায়াতলে বসিয়া বসিয়া কায়ক্লেশে দিনপাত করিতেছেন। তথাপি আমরা যে এই ছায়াকে মান্য করি, কিছুদিনের জন্য এইরূপ ভাব রক্ষা করিয়া চলাই আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে।" †

এই রাজনীতির অনুসরণ করিতে গিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ "দ্বিস্থশাসন" ‡ সংস্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। যিনি নামতঃ শাসনকর্ত্তা, কার্য্যে তাঁহার কোনই ক্ষমতা রহিল না ; যাঁহারা কার্য্যতঃ প্রভু, তাঁহাদের কোনরূপ শাসন-দায়িত্ব সংস্থাপিত হইল না ! বাঙ্গালা দেশ ক্রমেই মহাবিপ্লবে বিপর্য্যস্ত হইতে লাগিল।

প্রজাপালন সর্ব্বপ্রধান রাজধর্ম্ম,—তাহা একেবারে বিলুপ্ত হইল। ইংরাজেরা প্রজার উপর উৎপীড়ন করিলে, এবং তাহার কথা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণীকৃত হইলেও, নবাব বা জমিদারগণ তাহার নিবারণ করিতে পারিলেন না। ইংরাজ বণিক ও তাঁহাদের অগণ্য কর্ম্মচারিবর্গ যথেচ্ছাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। এক জন বিখ্যাত ইংরাজ ইতিহাসলেখক এই সকল কথার উল্লেখ করিবার সময়ে লিখিয়া গিয়াছেন যে,—"প্রজার একমাত্র অপরাধ এই যে, তাহারা গোমস্তাবর্গের অর্থলালসা পূর্ণ করিতে পারিল না ; সেই অপরাধে ইংরাজের গোমস্তাবর্গ এরূপ উচ্ছৃঙ্খলভাবে প্রজাপীড়ন আরম্ভ করিয়া দিল যে, নবাব ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণকে ভয়প্রদর্শনে বশীভূত করিয়া গোমস্তারাই

---

* Long's Selections, Record No. 885.

† Clive's letter to the Select Committee 1776.

‡ Double Government.

বিচারক সাজিয়া উৎপীড়িত প্রজাপুঞ্জকে দণ্ডদান করিতে লাগিল!" * ইংরাজ-ইতিহাসলেখক কেবল দেশীয় গোমস্তাগণের উপরেই সকল দোষ নিক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্তু ডিরেক্‌টারগণ তজ্জন্য ইংরাজ কর্ম্মচারিগণকেও অপরাধী করিয়া গিয়াছেন। †

শ্রমলব্ধ ধনধান্য নিরুদ্বেগে উপভোগ করিতে না পারিলে শ্রমে প্রবৃত্তি জন্মে না। জনসমাজের ধনবল বর্দ্ধিত করিতে হইলে শ্রমে প্রবৃত্তি দিতে হয়, তজ্জন্য শ্রমলব্ধ ধনভোগের ব্যবস্থা করিতে হয়, অপহারককে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া শ্রমের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়। অরাজকতায় রাজশাসন শিথিল হইয়া দেশের লোকের দুর্দ্দশার অবধি রহিল না। তাহারা প্রধান প্রধান শিল্প বাণিজ্যের আড়ং হইতে দূরদূরান্তরে পলায়ন করিতে লাগিল; অনেকে শিল্প বাণিজ্য পরিহার করিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া নির্জ্জনে মাথা লুকাইয়া দিনপাত করিতে লাগিল; বাঙ্গালীর গৃহস্থালীর গৌরব তিরোহিত হইয়া গেল। কৃষকপল্লীতে আর শস্যসঞ্চয়ের আড়ম্বর রহিল না; মহাজনদিগের পণ্যশালায় আর শস্যভার বাহিত হইতে পারিল না। লোকে কোনরূপে কায়ক্লেশে সশঙ্কচিত্তে দিনাতিপাত করিতে লাগিল।

বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম এবং চব্বিশ-পরগণার পুরাতন জমিদারগণকে তাড়িত করিয়া কোম্পানী বাহাদুর যে নূতন জমিদারী লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে ইংরাজের "খাসতহশিল" আরম্ভ হইল; অন্যান্য স্থান মহম্মদ রেজা-খাঁর নায়েব-দেওয়ানীর অধীন রহিল। জেলায় জেলায় রাজস্ববিভাগের কার্য্য-

---

* The Government of the country, as far as regarded the protection of the people, was dissolved. Neither the Nabob nor his officers dared to exert any authority against the English, of whatsoever injustice or oppression they might be guilty. The gomastas or Indian agents employed by the company's servants, not only practised unbounded tyranny, but overawing the Nabob and his highest officers, converted the tribunals of justice themselves into Instrument of cruelty, making them inflict punishment upon the very wretches whom they oppressed, and whose only crime was their not submitting with sufficient willingness to the insolent rapacity of those subordinate tyrants.—Mill's History of British India. vol. III. 435—436.

† Letter from the Court of Directors, 28 August, 1771.

পরিদর্শনার্থ ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দ হইতে কয়েক জন ইংরাজ "সুপারভাইজার" নিযুক্ত হইয়াছিলেন; তাঁহারা দেশের রীতি, নীতি, অবস্থা ও ইতিহাসসঙ্কলনের সঙ্গে সঙ্গে রাজস্বসংগ্রহের পরিদর্শনভার প্রাপ্ত হইলেন! *

যাঁহারা রাষ্ট্রবিপ্লবের মূল, তাঁহাদের সকলকেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল;—মীরজাফর, মীরণ, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, সকলেই নানা ক্লেশে জীবন বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; প্রজাপুঞ্জ এতদিন একরূপ নিরুদ্বেগেই কালাতিপাত করিতেছিল; কিন্তু তাহাদেরও প্রায়শ্চিত্তকাল সমুপস্থিত হইল!

বাঙ্গালীর অন্নগত প্রাণ। সাতাত্তরের 'মন্বন্তরে' সেই অন্ন দুর্ল্লভ হইয়া উঠিল; লোকে দলে দলে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। প্রাচীন জমিদারবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে লাগিল। পথঘাট নদীতীর শবদেহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। দুর্ভিক্ষশেষে স্থির হইল যে, 'মন্বন্তরে' বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ হইয়াছে,—হলকর্ষণক্ষম কৃষক জীবিত নাই, বীজধান্য ও গোবৎসের অভাব হইয়াছে, শস্যক্ষেত্র তৃণকণ্টকে পূর্ণ হইয়াছে, গ্রাম নগর বিজন বনে পরিণত হইয়াছে!

দীনপালিনী রাণী ভবানী এই দুর্দ্দিনে রাজভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া প্রজারক্ষার আয়োজন করিয়াছিলেন। বহু কোটী লোক তাঁহার কৃপায় অন্নজল লাভ করিয়াছিল; কিন্তু সকল শক্তিরই সীমা আছে। মন্বন্তরের সহিত সংগ্রাম করিতে গিয়া রাণী ভবানী আত্মশক্তির সীমা দর্শন করিলেন। রাজকোষ শূন্য হইয়া গেল, তথাপি প্রজারক্ষার উপায় হইল না। দুর্ভিক্ষাবসানে রাজসাহীর সম্পন্ন জনপদ শ্মশান হইয়া গেল। অতুল-ঐশ্বর্য্যশালিনী রাণী ভবানী শূন্যহস্তে উর্দ্ধনেত্রে দেশের দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া ভগ্নহৃদয়ে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ;—গঙ্গাবাস।

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে। তাঁহার শাসনকাহিনী অবলম্বন করিয়া কত পুস্তক রচিত হইয়াছে; তাঁহার অত্যাচারকাহিনীর বর্ণনা করিয়া কত বাগ্মী যশস্বী হইয়াছেন; তথাপি এখনও তাঁহার কথা লইয়া লেখকসমাজে কত বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছে! তাঁহার রোহিলাধ্বংসের, চেৎসিংহ-নির্য্যাতনের, বেগম-লুণ্ঠনের বা নন্দকুমার-হত্যার কাহিনীর সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে বর্ত্তমান গ্রন্থের কোনও সংস্রব নাই। তাঁহার নিকট রাণী

* Annals of Rural Bengal.

ভবানী কিরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাই একমাত্র আলোচ্য বিষয়। কারণ, হেষ্টিংসের ব্যবহারে মর্ম্মপীড়িত হইয়াই প্রতিভাশালিনী অর্দ্ধবঙ্গাধিকারিণী রাণী ভবানী পুত্রহস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া, স্বয়ং গঙ্গাবাস আরম্ভ করেন।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রেল, ওয়ারেণ হেষ্টিংস ভারতবর্ষের শাসনভার প্রাপ্ত হন। তিনি নূতন লোক নহেন; যৌবনে কাশিমবাজারের ইংরাজ কুঠীর মোহরের-রূপে এ দেশে আসিয়া, নানা সময়ে নানাবিধ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, অবশেষে ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে চিনিত, তিনিও এ দেশের প্রধান প্রধান রাজবংশের অধীশ্বরকে জানিতেন। বিলাতের লোকে ভাবিত, তাঁহার মত ভারতজ্ঞ লোক আর নাই; সেই পরিচয়ে তিনি সর্ব্বোচ্চ রাজপদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু তখন তাঁহার এমন দৈন্যদশা যে, ভারতবর্ষে আসিবার সময়ে ব্যয়-সংকুলনার্থ তাঁহাকে ঋণ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। *

ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া, ৪ঠা মে হইতে ক্লাইবের শাসননীতি প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য, ওয়ারেণ হেষ্টিংস কোম্পানীর খাস শাসনের সূচনা করিলেন। এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার সময়ে, কোম্পানী বাহাদুরকে সাক্ষাৎভাবে জমিদারদিগের সংস্রবে আসিতে হইল।

ইংরাজেরা এ দেশের শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার সময়ে জমিদারদিগের প্রকৃত মর্য্যাদা নিরূপণ করিতে পারেন নাই; তাঁহারা জমিদারগণকে কর-সংগ্রহকারী রাজকর্ম্মচারিমাত্রই মনে করিয়াছিলেন। উত্তরকালে এ বিষয়ে অনেক বাদানুবাদের সূত্রপাত হইয়াছিল; কিন্তু হেষ্টিংস যখন প্রত্যক্ষভাবে কোম্পানীর শাসন প্রচলিত করেন, তৎকালে এ বিষয়ে কোনরূপ মতদ্বৈধ উপস্থিত হয় নাই। সকলেই বুঝিয়াছিলেন যে, রাজস্ব-সংগ্রহ করাই কোম্পানীর সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য; তজ্জন্য পুরাতন জমিদারগণকে পদচ্যুত করিতে কাহারও কোনরূপ দ্বিধাবোধ হয় নাই।

কোম্পানীর "খাস তহশিল" প্রবর্ত্তিত করিয়া হেষ্টিংস রাজস্বসংগ্রহের সুব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইলেন। মিডল্টন, ডেকার, লরেল ও গ্রাহাম নামক চারি জন সদস্য লইয়া, হেষ্টিংস একটি সমিতির গঠন করিলেন; ইহারই নাম "সরকিট কমিটী"। পরগণায় পরগণায় পরিভ্রমণ করিয়া পাঁচ

* Rulers of India—Hastings.

বৎসরের জন্য সমগ্র জমিদারীর করসংগ্রাহক নিয়োগ করিবার জন্যই এই কমিটীর উৎপত্তি হয়। সেকালের লোকে ইংরাজি জানিত না; তাহারা ইংরাজি শব্দাদি সহজে স্মরণ রাখিবার জন্য উচ্চারণবিকৃতিবলে দেশীয় ভাষায় তাহার প্রতিশব্দ গঠন করিয়া লইত। অদ্যাপি এইরূপ অনেক অদ্ভুত শব্দ-গঠন-কৌশলের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই অভ্যাসদোষে সেকালে লোকে "সুপারভাইজারের" নাম করিয়াছিল, "শূয়োর ভাই"। এক্ষণে "শুরকিট" সংস্থাপিত হওয়ায় তাহার নাম রাখিল "ছুরকট"। এই শুরকিট কমিটী যেরূপে রাজস্বনির্দ্ধারণ কার্য্য সুসম্পন্ন করেন, তাহাতে অনেক "ছুরকট" সংঘটিত হইয়াছিল। ইতিহাস পড়িয়া মনে হয় যে, লোকে ব্যঙ্গ করিয়া ইহার যেরূপ নামকরণ করিয়াছিল, কার্য্যতঃ তাহা একেবারে নিরর্থক হয় নাই।

কমিটী প্রথমে নদীয়ার রাজেন্দ্র বাহাদুরকেই ধরিয়া বসিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণনগরাধিপতির রাজ্যের যে পরিমাণ রাজস্ব নির্ণয় করিয়াছিলেন, তাহাতে সম্মত না হইলে, রাজ্য অন্যের হস্তে সমর্পিত হইবে, এই সংবাদে কৃষ্ণচন্দ্র একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। পলাশির যুদ্ধাবসানে কামান ও রাজেন্দ্র বাহাদুর উপাধি লাভ করিয়া যে কৃষ্ণচন্দ্র দুই হাত তুলিয়া ইংরাজকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, তিনি এখন সেই দুইখানি হাতে কৃতাঞ্জলি হইয়াও কমিটীর মতিপরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইলেন না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া অগত্যা কমিটীর প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন, এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার শিবচন্দ্রের নামে ১৭৭৩ হইতে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চারি বৎসর মেয়াদে, জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন।*

কমিটীর সদস্যগণ নদীয়া হইতে কাশিমবাজার ও কাশিমবাজার হইতে রাজসাহীতে উপনীত হইলেন। রাণী ভবানী তাঁহাদের আদর ও অভ্যর্থনার ত্রুটি করিলেন না; কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফলোদয় হইল না। যে রাজ্যে রাণী ভবানী জীবন-মরণের বিচারকর্ত্রী অন্নদাত্রী কল্যাণবিধাত্রী মহাদেবী, সেই রাজ্যের বুকের উপর কোম্পানীর ঢোল ভীমকলরবে ঘোষণা করিল, সে রাজ্য আর রাণী ভবানীর নহে; যে অধিক রাজকর দিতে অগ্রসর হইবে, রাজমুকুট তাহারই।

অভিমানিনী রাণী ভবানীর রাজ্যাভিমান বিদূরিত হইল; তেজস্বিনী বীর-রমণীকে নানা উপায়ে হেষ্টিংসের তুষ্টিসম্পাদন করিয়া রাজ্যরক্ষার্থ

* ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত।

কমিটীর প্রস্তাবেই সম্মত হইতে হইল। কিরূপে ইহা সুসম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা হেষ্টিংসের স্বহস্তলিখিত সমসাময়িক কার্য্যবিবরণী হইতে অনুবাদিত হইল,—

"কৃষ্ণনগর প্রদেশের রাজস্বনিরূপণের সময়ে যে যে নিয়মে কার্য্য সম্পাদন করা হইয়াছিল, রাজসাহী ও ভুজুরি জেলাতেও তাহারই অনুসরণ করা হইল। রাজসাহী রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন পরগণা কে কত অধিক জমায় বন্দোবস্ত করিয়া লইতে চাহে, তাহা জানিবার জন্য প্রকাশ্য ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া উপযুক্ত সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা হইয়াছিল। পশ্চিমাঞ্চলের পরগণাগুলি অন্য লোকে যত টাকায় বন্দোবস্ত করিয়া লইতে চাহে, তদপেক্ষা রাণী ভবানীর প্রস্তাবানুযায়ী বন্দোবস্ত করাই লাভজনক বোধ হইল। সুতরাং তাঁহার সঙ্গেই পাঁচ বৎসরের জ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। তাঁহার ধনবল আছে, বিশ্বাসপাত্রী বলিয়া লোকসমাজে সু্ খ্যাতি আছে, চরিত্রগুণে তাঁহার কথায় আস্থা স্থাপন করিবারও কারণ আছে। তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত করায় আরও বিশেষ সুবিধা এই যে,—তিনি কমিটীর নির্দ্দেশানুসারে বন্দোবস্তী মহালগুলি চৌদ্দ ভাগে বিভক্ত করিয়া যথাকালে রাজকর-পরিশোধের অঙ্গীকারে নিজের ও প্রজাবর্গের কবুলিয়ত দাখিল করিতে সম্মত হইয়াছেন। পূর্ব্বাঞ্চল সম্বন্ধে অন্য কেহ বন্দোবস্তের প্রস্তাব উপস্থিত না করায়, তাহাও রাণী ভবানীকেই বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। রাণী বহু বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া এ দেশের শাসনকার্য্যে যেরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে অন্য লোকে তাঁহার অপেক্ষা অধিক জমায় বন্দোবস্ত করিয়া লইতে সাহস পায় নাই। রাজসাহীর ন্যায় বহুবিস্তৃত সম্পন্ন রাজ্য হইতে যে পূর্ণমাত্রায় রাজস্ব সংগৃহীত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। প্রাচীন রাজবংশের সহিত বন্দোবস্ত করায়, আমাদের রাজস্ব-সংগ্রহের ব্যয়বাহুল্যও হইবে না।" *

এই বন্দোবস্ত বাঙ্গলার জমিদারী সেরেস্তায় "পঞ্চসনা" বন্দোবস্ত নামে পরিচিত। ইহা সুসম্পন্ন হইলে কমিটীর সদস্য মিডল্‌টন্ সাহেবের উপর মাসে মাসে "কিস্তী কিস্তী" রাজসাহীর রাজস্ব-সংগ্রহের ভার নিক্ষিপ্ত হইল। রাণী ভবানী স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও, এই সময় হইতেই তাঁহার প্রজাপালন ও পুণ্যকীর্ত্তিসংস্থাপনের ক্ষমতা ও অর্থবল অবসন্ন হইয়া পড়িল। ইহাই রাণী ভবানীর অধঃপতনের মূলসূত্র।

হেষ্টিংসের শত্রুদল অনেক। তাঁহার শাসনসময়ের প্রায় প্রত্যেক কার্য্যের জন্যই তাঁহার নামের সঙ্গে বহু কলঙ্ক সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। রাণী ভবানীর সহিত তিনি এতদুপলক্ষে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা লইয়াও দুইটি কলঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল;—একটি উৎকোচগ্রহণ, অপরটি রাজ্যাপহরণ।

---

* F

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের শাসনসময়ের যে সকল সরকারী কার্য্য-বিবরণী সম্প্রতি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, * তাহার এক স্থানে লিখিত আছে,—

"The Governor's Banian stands foremost and distinguished by the enormous amount of his farms and contracts, to say nothing of the large sums standing in his name in the accounts of money received from the Rannies of Rajeshahy and Burdwan which have either been proved by the production of the original papers at the Board, or by witnesses upon oath; our opinion of Mr. Hastings will not suffer us to think that a participation of profits with his servant would have been *rep gnant to his principles*, to assert as he does that *it would have been opposite to his interest* seems too extravagant to deserve an answer." †

নাটোর রাজদপ্তরে রাণী ভবানীর শাসনসময়ের 'সুমার' বা হিসাবের কাগজপত্র এখন আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং হেষ্টিংসের উৎকোচ-গ্রহণের অপবাদ সম্বন্ধে তাঁহার সহযোগিগণ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার সত্যাসত্য নির্ণয় করা সহজ নহে। তবে ক্লেভারিং, মন্‌সন্‌ ও ফ্রান্সিস্‌ নামক সদস্যগণ হেষ্টিংসের শত্রু হইলেও উৎকোচগ্রাহী ছিলেন না; তাঁহারা হেষ্টিংসের সমক্ষে কৌন্সিলের প্রকাশ্য অধিবেশনে যে মন্তব্য-পত্র প্রদান করেন, তাহাতে উৎকোচগ্রহণের অভিযোগ সুস্পষ্ট লিখিত রহিয়াছে। এ দেশের জনশ্রুতিও হেষ্টিংসের অনুকূল নহে। কিন্তু আধুনিক ইতিহাসলেখকগণ এ সকল কথায় আস্থা স্থাপন না করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন।

সেকালে বাৎস্যগোত্রীয় চাঁদ রায় নামক জনৈক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বাহিরবন্দের জমিদার ছিলেন। চাঁদ রায়ের দশ আনা অংশে তাঁহার পুত্র রঘুনাথ উত্তরাধিকারী হইয়া রাণী সত্যবতী নাম্নী বিধবা পত্নী বর্ত্তমান রাখিয়া পরলোকগমন করেন। রাণী সত্যবতী বাহিরবন্দ, ভিতরবন্দ, গয়াবাড়ী, স্বরূপবাড়ী, আমবাড়ী, পাতিলাদহ, ইস্‌লামবাড়ী ও সুজানগর, এই আট পরগণার

---

* Selections from the Letters, Despatches and other State papers preserved in the Foreign Department of the Government of India 1772—1785. Edited by George W. Forrest B.A. In three volumes. Calcutta 1890.

† Minuts from General Clavering, Colonel Monson a[illegible] Francis —25 January 1776, para 11.

অধিকারিণী ছিলেন; কিন্তু নবাব-সরকারে এই সকল পরগণা রাণী ভবানীরই নামজারি ছিল। তিনি স্নেহপরবশ হইয়া রাণী সত্যবতীকে রাজ্যচ্যুত করেন নাই; পরে সত্যবতীর অভাবে এই সমস্ত পরগণা রাণী ভবানীর রাজ্যভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। হেষ্টিংসের হুকুমে বাহিরবন্দ রাণী ভবানীর হস্তচ্যুত হইয়া গেল।

হেষ্টিংসের শত কলঙ্কের মধ্যে এই রাজ্যাপহরণও একটি সর্ব্বজনপরিচিত প্রধান কলঙ্ক। বাহিরবন্দ ও তাহার বিচিত্র কাহিনী নানা স্থানে নানা ভাবে বর্ণিত হইয়াছে; বঙ্কিমচন্দ্রের "দেবী চৌধুরাণীর" কাহিনীও বাহিরবন্দের কাহিনী। আমরা "মুর্শিদাবাদ হিতৈষী"পত্রে বাহিরবন্দের যে সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছি, তাহাতে সমস্ত ঐতিহাসিক তত্ত্ব বর্ণিত রহিয়াছে। এ স্থলে তাহাই উদ্ধৃত হইল।

"বাহারবন্দ রঙ্গপুর জেলার একটি প্রসিদ্ধ পরগণা, কেবল রঙ্গপুর কেন, সমগ্র বঙ্গরাজ্যের মধ্যে এরূপ বিস্তৃত ও উর্ব্বরা পরগণা অতি অল্পই আছে বলিয়া বোধ হয়। ব্রহ্মপুত্র, ধরলা ও ত্রিস্রোতার সলিলসিক্ত হইয়া শ্যামল শস্যরাজিপরিপূর্ণ বাহারবন্দ বহুকাল হইতে বঙ্গদেশে স্বীয় নাম বিঘোষিত করিতেছে। মুসলমান রাজত্বের বহু পূর্ব্ব হইতে ইহার নাম শ্রুত হওয়া যায়। বাহারবন্দ বাঙ্গলা দেশে প্রবাদবাক্যের সহিত জড়িত। ইহার পুরাতত্ত্ব জানিতে হইলে, রঙ্গপুর দেশের কিঞ্চিৎ বিবরণ জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক, কারণ বাহারবন্দ রঙ্গপুরের অনেক অংশ অধিকার করিয়া আছে। রঙ্গপুর পূর্ব্বে প্রাগ্জ্যোতিষ রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল, প্রাগ্জ্যোতিষ কামরূপের নামান্তর। প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত রঙ্গপুর স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভগদত্ত কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বন করেন, এবং অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত হন। ভগদত্তের বংশীয়েরা অনেকদিন কামরূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পর রঙ্গপুর প্রদেশে পৃথু নামে একজন পরাক্রান্ত রাজার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বোদা ও বৈকুণ্ঠপুরের মধ্যে তাঁহার রাজধানীর ভগ্নাবশেষ লক্ষিত হয়। তিনি কীচকগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সরোবর-সলিলে জীবন বিসর্জ্জন করেন। পৃথু রাজার পরে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সুপ্রসিদ্ধ পালবংশীয়গণের রাজত্বের কথা আমরা অবগত হই। দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে পালবংশীয়দিগের অশেষ কীর্ত্তির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। রঙ্গপুর ও কামরূপ পর্য্যন্ত তাঁহাদের রাজ্যের বিস্তার ছিল। সর্ব্বপ্রথমে ধর্ম্মপালের নাম শ্রুত হয়। ধর্ম্মপালের পর গোপীচন্দ্র তাঁহার সিংহাসন অধিকার করেন। গোপীচন্দ্রের মাতা মীনাবতী ধর্ম্মপালের সৈন্যদিগকে পরাস্ত করায় ধর্ম্মপাল কোথায় অন্তর্হিত হন, তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। গোপীচন্দ্র তৎপরে শূন্যসিংহাসনে আরোহণ করেন। বাহারবন্দের প্রধান স্থান উলিপুরের পূর্ব্বে ওয়ারী নামক স্থানে গোপীচন্দ্রের ভবনের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাইত। গোপীচন্দ্রের পুত্রের নাম ভবচন্দ্র, যে ভবচন্দ্র ও তাঁহার মন্ত্রী গবচন্দ্রের বুদ্ধিমত্তার কাহিনী

সমগ্র বাঙ্গলায় প্রচলিত, সেই ভবচন্দ্রই উক্ত গোপীচন্দ্রের পুত্র। ভবচন্দ্রের উত্তরাধিকারী হইতে পালবংশের অবসান হয়, তাহার পর কোচ প্রভৃতি জাতি কর্ত্তৃক রঙ্গপুর ও কামরূপ বারম্বার আক্রান্ত হয়। পালবংশের পর অন্য একটি বংশের উল্লেখ আছে; সেই বংশে নীলধ্বজ, চক্রধ্বজ ও নীলাম্বর নামে রাজা জন্মগ্রহণ করেন। নীলাম্বর গৌড়ের বাদসাহ হোসেন সার সময় মুসলমানগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হন। মুসলমানদিগের হস্ত হইতে কামরূপ ও রঙ্গপুর অঞ্চল কোচগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। কোচবংশের স্থাপয়িতার হাজোর হীরা ও জীরা নামে দুই কন্যা ছিল, হীরার গর্ভে বিশু ও জীরার গর্ভে শিশুর জন্ম হয়। বিশু কোচ-বিহার বংশের এবং শিশু জলপাইগুড়ি রাজবংশের আদিপুরুষ। বিশু স্বীয় পুত্র শুক্লধ্বজ ও নরনারায়ণকে আপনার রাজ্য বিভাগ করিয়া দেন। শুক্লধ্বজের পৌত্র পরীক্ষিত প্রথমে মুসলমানদিগের বশ্যতা স্বীকার করেন, খৃষ্টীয় ১৬০৩ অব্দে রাজস্ব অনাদায়ের জন্য পরীক্ষিতের রাজ্য মোগলগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। পরীক্ষিত অতি অল্পমাত্র ভূভাগের অধীশ্বর থাকেন, তাঁহার অবশিষ্ট রাজ্য ঢাকার মোগল শাসনকর্ত্তার অধীন হয়। এই অধিকৃত রাজ্য চারি সরকারে বিভক্ত হয়, এবং ১৬৬২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মোগলদিগের অধীন থাকে, উক্ত চারি সরকারের মধ্যে বাঙ্গলাভূম একটি। বাহারবন্দ ও ভিতরবন্দ লইয়াই বাঙ্গলাভূম। খৃঃ ১৬৬২ অব্দে আরঙ্গজীবের প্রধান সেনাপতি মীরজুম্লা আসাম অধিকার করিতে গিয়া পরাজিত হইলে, উক্ত চারি সরকারের মধ্যে তিন সরকারের অধিকাংশ ভূভাগ মুসলমানদিগের হস্তচ্যুত হয়। কেবল সরকার বাঙ্গলাভূম তাঁহাদের অধীন থাকে। সুতরাং ১৬০৩ খৃঃ অব্দ হইতে বাহারবন্দ মুসলমান রাজত্বের অন্তর্ভূত হয়। বাঙ্গলা জয়ের সঙ্গে ইহা ইংরেজ অধিকারে প্রবেশ লাভ করে।

"মোগলগণ কর্ত্তৃক বাহারবন্দ অধিকৃত হইলে ইহা অন্যান্য পরগণার ন্যায় রাজস্ব আদায়ের জন্য জমিদারদিগের হস্তে অর্পিত হয়। তৎকালে জমিদারগণ রাজস্বসংগ্রাহকের কার্য্য করিতেন। বাহারবন্দ জমিদারগণের হস্তে অর্পিত হইলেও অনেক সময়ে ইহা জায়গীররূপে নির্দ্দিষ্ট হইত। চাঁদ রায় নামক এক ব্যক্তি ইহার প্রথম জমিদার বলিয়া উল্লিখিত হন। তাঁহার পর রঘুনাথ রায় বাহারবন্দের জমিদারী প্রাপ্ত হন। রঘুনাথের পর তাহার পত্নী পুণ্যশ্লোকা রাণী সত্যবতী বাহাবন্দের অধিকার লাভ করেন। রাণী সত্যবতীর অগণ্যকীর্ত্তি অদ্যাপি বাহারবন্দ অলঙ্কৃত করিতেছে। তাঁহার স্থাপিত দেবমন্দিরাদি আজিও তাঁহার পবিত্র নাম বিঘোষিত করিয়া থাকে। রাণী সত্যবতীর জীবনাবস্থায় বাহারবন্দ নাটোরাধিপ রাজা রামকান্তের হস্তে অর্পিত হয়। রামকান্তের পত্নী ভারতপ্রসিদ্ধা দীনপালিনী রাণী ভবানী সত্যবতীর ভগিনীতনয়া ছিলেন, সত্যবতী সংসার পরিত্যাগ করিয়া কাশীধামে গমন করায় স্বীয় ভগিনীপুত্রীকে বাহারবন্দ অর্পণ করিয়া যান। এই সময়ে বাহারবন্দ নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ মহাবৎ জঙ্গের আদেশে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা সৈয়দ আহাম্মদ খাঁ সালৎজঙ্গের নামে জায়গীররূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু সেরেস্তায় নাটোর-রাজের নামেই লিখিত থাকে। রাজা রামকান্তের মৃত্যুর পর রাণী ভবানী স্বীয় জামাতা রঘুনাথ রায়কে বাহারবন্দ প্রদান করেন। রঘুনাথের মৃত্যুর পর বাহারবন্দ পুনর্ব্বার নবাব

নজমউল্লা দৌলৎ সৈয়দ নজাবত আলি খাঁর নামে জায়গীররূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া মুর্শিদাবাদের অধীন হয়। কিন্তু রাণী ভবানীর সম্বন্ধ একেবারে দূর হয় নাই। রাজা গৌরীপ্রসাদ কিছু-কাল ইহার জমিদার নিযুক্ত হন, কিন্তু পুনর্ব্বার ইহা রাণী ভবানীর হস্তে আগমন করে। কোম্পানীর দেওয়ানী গ্রহণের পর বাঙ্গলা ১১৭৬ খৃঃ অব্দ হইতে ১১৭৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ঘন-শ্যাম সরকার নামে এক ব্যক্তি ইহার ইজারা লয়। ১১৭৯ সালে ইহা রঙ্গপুর কালেক্টরীর অন্তর্ভূত হয় ও সেই বৎসর বিষ্ণুচরণ নন্দী ইহার ইজারা লইয়া ১১৮০ পর্য্যন্ত নিজ অধিকারে রাখে, পরে ১১৮১ অব্দে কান্ত বাবুর পুত্র লোকনাথকে ৮২, ৬৩৯ টাকায় চিরস্থায়িরূপে ইজারা দেওয়া হয়। আমরা ইতিপুর্ব্বে কান্ত বাবু শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়া আসিয়াছি যে, রাণী ভবানী বাহারবন্দের জমিদার ছিলেন। কিন্তু হেষ্টিংস সাহেব বলপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে লইয়া উক্ত পরগণা বিষ্ণুচরণ ও লোকনাথকে প্রদান করেন। বিষ্ণুচরণ কান্ত বাবুর বেনামদার ও লোকনাথ তাঁহার পুত্র। মহারাজা নন্দকুমার কাউন্সিলে ইহার জন্য হেষ্টিংসের প্রতি দোষারোপ করেন, এবং কাউন্সিলের সভ্যেরা তজ্জন্য হেষ্টিংস সাহেবকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন। লোকনাথকে চিরস্থায়িরূপে বাহারবন্দ প্রদান করায় ডিরেক্টরগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার হস্ত হইতে পুনর্ব্বার লইবার জন্য লিখিয়া পাঠান। কিন্তু হেষ্টিংস সে বিষয়ে কর্ণপাত করেন নাই। বাহারবন্দ এক্ষণে কাশীমবাজার রাজবংশের সম্পত্তি। দানশীলা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়া ইহার অধিকারিণী। ইনি ইহার অগাধ আয় প্রতিনিয়ত পুণ্যকার্য্যে ব্যয়িত করিয়া বাহারবন্দকে দেশমধ্যে আরও স্মরণীয় করিতেছেন। এবং বাহারবন্দের পুরাতন নামের সহিত তাঁহার পবিত্র নাম মিশিয়া বঙ্গবাসীর হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার করিতেছে।" *

জনৈক লেখক লর্ড ক্লাইবের স্কন্ধে এই রাজ্যাপহরণের কলঙ্ক নিক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, "রাণী সত্যবতীর স্বামী রঘুনাথ রায় বাঙ্গালা ১১৩০ সালে অভাব হন, তাহার পরে রাণী সত্যবতী জমিদারী প্রাপ্ত হন, এবং ১১৮৯ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। রাণী সত্যবতীর অভাব হইলে বাহিরবন্দ পরগণা নাটোরের রাজ্যভুক্ত হয়। পরে লর্ড ক্লাইবের সময়ে কাশিমবাজারের কান্তি বাবু বাহিরবন্দ প্রাপ্ত হন।" † বলা বাহুল্য, এই বর্ণনা সত্য হইতে পারে না; লর্ড ক্লাইব সে সময়ে আদৌ এ দেশে ছিলেন না।

প্রাচীন রাজবংশের অধিকার হইতে জমিদারী কাড়িয়া লইয়া কোম্পানী লাভবান হইতে পারিলেন না। প্রাচীন রাজবংশের অধীন প্রজাপুঞ্জ নিরুদ্বেগে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, রাজস্বও যথাকালে প্রদত্ত হইত। হেষ্টিংসের আদেশে যে সকল জমিদারী নূতন লোকের হস্তে সমর্পিত হইতে লাগিল,

* মুর্শিদাবাদহিতৈষী;—৪ পৌষ; ১৩০২।
† গৌড়ে ব্রাহ্মণ।

তাহার পুরাতন অধিকারিগণকে 'পেন্সন' দিতেই অনেক ব্যয় হইতে লাগিল ; নূতন জমিদারগণও সবিশেষ শাসনকৌশলের পরিচয় দিতে পারিলেন না। ইহাতে দেশের মধ্যে অরাজকতা প্রশ্রয় পাইতে লাগিল।

ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত-লেখক এবং স্যর উইলিয়ম হণ্টার, উভয়েই এই প্রকার পরিণামফলের কথা সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। রাণী ভবানী ইহার পূর্ব্বসূচনা অনুভব করিবামাত্র দত্তকপুত্র মহারাজ রামকৃষ্ণের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া গঙ্গাবাস আশ্রয় করিলেন। সম্পদ হইতে সম্ভ্রম অধিকতর মূল্যবান ; রাণী ভবানীর হৃদয় সম্ভ্রমনাশের প্রথম আঘাতেই চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তিনি যেদিন রাজসাহীর রাজ্যভার পরিত্যাগ করিলেন, সেই দিন হইতেই রাজসাহীর গৌরব-বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ করিল। অতঃপর কেবল রাজসাহীর রাজ্যনাশকাহিনীতেই রাণী ভবানীর বংশধরদিগের ইতিহাস পরিপূর্ণ।

বাঙ্গলার জমিদারবর্গের কথা কালক্রমে ইংলণ্ডাধিপতি তৃতীয় জর্জ্জের সিংহাসনও বিচলিত করিয়াছিল। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংসের শাসনভার পরিত্যাগ করিবার সময়ে, ইংলণ্ডীয় মহাসভা হইতে নূতন রাজবিধি প্রচলিত হইয়া, দেশীয় শাস্ত্র ও ব্যবহার অনুসারে ভারতবর্ষ শাসন করিবার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। ইহাই নব্যভারতের প্রথম সূচনা, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের প্রথম স্নেহবন্ধন, এবং পরবর্ত্তী ইতিহাসের পূর্ব্বসূচনা।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

সমাপ্ত।

পিতৃহীন।

১

এখনো নিদ্রিত পিতা! এলো সন্ধ্যা হ'য়ে,
কতক্ষণ ঘুমাইবে আর?
করিবে না সন্ধ্যাহ্নিক? গঙ্গোদক ল'য়ে
রাখিয়াছি শিয়রে তোমার।
উঠ, দেখ চেয়ে, দে'ছি গবাক্ষ খুলিয়া,
সূর্য্য ওই বসেছেন পাটে;
মেঘ হ'তে মেঘে আলো পড়িছে চলিয়া,
অন্ধকার জমিতেছে মাঠে।

২

সন্ধ্যা হ'লো, উঠ পিতা! মন্দিরে মন্দিরে
আরতির বাজি'ছে বাজনা।
জ্বালিব কি দীপ? জ্বলে কুটীরে কুটীরে—
করিব কি গায়িত্রীবন্দনা?
বড় অন্ধকার গৃহ, পাইতেছি ভয়,
উঠ পিতা, কও, কথা কও।
অন্য দিন কত পাঠ কত গল্প হয়,
তুমি তো কঠোর কভু নও।

৩

কেন এ ঘর্ঘর শ্বাস, কেন এ ভ্রূকুটী?
কেন পিতা, কেন হেন রোষ?
সেই আমি আছি বসি, ল'য়ে ভাই ছুটি,
করি নাই আজ কোন দোষ।
পদাঘাত?—তাই কর্‌য়ো; পুন পদাঘাত!
বড় বাজিয়াছে পিতা বুকে।
বেজেছে তোমার পায়? বুলাব কি হাত?
কও পিতা, কও হাসি-মুখে।

৪

একি পিতা! কেন পদ তুষার-শীতল?
কেন হেন নিশ্বাস সঘন?
দিব কি উত্তাপ আমি, জ্বালিব অনল?
শীতে বুঝি করিছ এমন?—
এস ভাই বসো হেথা নিমেষের তরে,
দীপ জ্বালি' শীঘ্র অগ্নি করি।
এখনো হয়নি রাত,—দিব ভাত পরে,
কাঁদিস্ না পায়ে তোর পড়ি।

৫

পিতা! পিতা! কেন মাথা লুটায় এমন!
একি নব দেবতা-প্রণতি?
একি মুখভঙ্গী! একি ঘূর্ণিত নয়ন!
ক্ষমা কর, ভয় পাই অতি।
কি করুণ কণ্ঠে শিবা ডাকিছে বাহিরে!
পেচকের কি ঘন চীৎকার!
কি চঞ্চল দীপশিখা!—আঁকিছে প্রাচীরে
কত মূর্ত্তি বিকট-আকার!

৬

পিতা! পিতা! ঘুমালে কি? গৃহ অন্ধকার
আকুলি উঠিছে প্রাণ ত্রাসে!
আশে পাশে ঘুরিতেছে শুভ্রবাস কার!
রুদ্ধ গৃহে কেবা যায় আসে!
এ কি নিদ্রা! সর্ব্বদেহ শীতল কঠিন,
নাহি শ্বাস, বহে না ধমনী!
এ কি মৃত্যু! যে মৃত্যু মাগিতে প্রতিদিন?
লভেছেন যে মৃত্যু জননী?

৭

প্রভাতে ফিরিছে গৃহে ক্ষুধাতুর মত,
গলে শোক-উত্তরীয় দোলে।
প্রতিবাসী জনে জনে বুঝাইতে কত—
দ্বারে এসে ডাকে পিতা ব'লে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

সামাজিক সুশিক্ষা ও প্রাকৃতিক কুশিক্ষা।

মানব আপনার দোষ দেখিতে পায় না, কিন্তু পরের একটুমাত্র ছিদ্র পাইলেই তাহা লইয়া তৎক্ষণাৎ কেমন একটা ভীষণ গণ্ডগোল করে। এই অভ্যাস যে মানবসমাজে কেবল শ্রেণীবিশেষের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে। ইহা একটি ব্যক্তিগত দোষ; লোকমাত্রেরই এই অভ্যাসটি আছে। এমন কি, ইহাকে সামাজিক জীবনের একটি অনিবার্য্য নিয়ম বলা যাইতে পারে। নৈতিক-কুলতিলক, যাঁহার প্রত্যেক পদক্ষেপ প্রতি মুহূর্ত্তে নৈতিক বিচারের উপর নির্ভর করে, স্থায়,অন্যায় বিচার না করিয়া যিনি জলগ্রহণ করেন না, তিনিও অনেক সময়ে বলিবেন, "মানব সদা সত্য কহিবে, কদাচ কলহ করিবে না, কলহ করা বড় দোষ," ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তাঁহারই জীবন-পুস্তকের প্রত্যেক পংক্তি পর্য্যবেক্ষণ কর, দেখিবে, পদে পদে সত্যের অপলাপ, পদে পদে সার্ব্বভৌম কলহ। তাঁহার চক্ষে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিয়া তাঁহার দোষ দেখাইয়া দাও, তিনি বলিবেন,"অজাতশ্মশ্রু মূর্খ বালকের পক্ষে যাহা দুষ্ট, সুদীর্ঘ-শ্মশ্রু-গুম্ফ-বিরাজিত ব্যক্তির পক্ষে তাহা দোষযুক্ত নহে।" তিনিই বলিবেন, "আমরা যে অসত্যের আশ্রয় লই, তাহা তোমাদের হিতসাধনের জন্য; আমরা যে কলহ করি, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য তোমাদের হিতসাধন, স্বার্থসিদ্ধির জন্য নহে। আমাদের সকলই পরার্থ বা পরমার্থ। আর তুমি বাচাল, কাণ্ডজ্ঞানহীন, তরলমস্তিক, নির্ব্বোধ বালক, তোমার এ সকল শোভা পায় না। তোমার বিস্তর দেখিবার আছে, বিস্তর শিখিবার আছে; যাহা বলি, শুনিয়া যাও, এবং তদনুসারে কাজ কর।"

আমি মনে মনে ভাবি, আমাদের নৈতিকপুঙ্গব একটি মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান বিজ্ঞান-জগতের মতের সহিত তাঁহার মতের সামঞ্জস্য একেবারেই নাই। এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে (অথবা বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বলিলেও চলে) যে সমাজতত্ত্ববিদ্, অথবা দার্শনিক, অথবা নীতিশাস্ত্র-বিদ্, অথবা ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব না মানিয়া চলেন, তাঁহার মত যে সম্পূর্ণ বিচিত্র ও কাল্পনিক হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? আমি বলি, বিজ্ঞান স্পষ্টই বলে, মিথ্যা কথা বলা অথবা সত্যের অপলাপ করা মানবের প্রাকৃতিক ধর্ম্ম। অনেক নীতিবাগীশ হয় ত এই কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠি-

বেন, কিন্তু আমি তাঁহাদের অভয়দান করিয়া পদে পদে কারণ দর্শাইয়া আমার আপন মত সমর্থনের চেষ্টা করিব।

পাঠক! তুমি বিজ্ঞান পাঠ করিয়াছ, তুমি প্রাকৃতিক ভূগোল অথবা ভূবিদ্যা পড়িয়াছ। "ধীরে ধীরে ভূপঞ্জর-চালন" ইত্যাদি অনেক কথা শিখিয়াছ; প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র অম্লজান যবক্ষারজান, Adiabatic expansion, Hypsometer, Papin's digester ইত্যাদি কত শাস্ত্র এবং কত কথা পড়িয়াছ এবং শিখিয়াছ। আচ্ছা বল দেখি, এই সকল তথ্য কি তুমি পূর্ব্বে জানিতে? আমাদিগের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধপিতামহ, অতিবৃদ্ধপিতামহ, বৃদ্ধপ্রপিতামহ, অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ, কেহ কি এ সকল জানিতেন? না, বর্ত্তমান সভ্যতার ফলে মানবের স্বযত্নার্জ্জিত জ্ঞান স্বতঃ বিস্তৃত হইয়া আমাদের অন্ধতমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে অকস্মাৎ প্রবিষ্ট হইয়াছে? পাঠক! তুমি হয় ত পুরাতন আর্য্যঋষিদের স্মরণ করিয়া আমাদের চতুর্দ্দশ পুরুষ অতিক্রম করিয়া কি জানি কোন পুরুষের নাম করিয়া বলিবে, "হাঁ, সকল সত্যই আর্য্যঋষিদিগের জানা ছিল; নূতন কিছুই নহে।" কিন্তু যথার্থ আপন বক্ষে হস্ত স্থাপন করিয়া বল দেখি, এই সকল তত্ত্বানুসন্ধানে কত মানব প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, কত সময় কত অর্থ ব্যয় করিয়া, কত শারীরিক ও মানসিক শক্তির অপচয় করিয়া, কত ঐহিক দুঃখ স্বীকার করিয়া, মানব এই সকল সত্যানুসন্ধানে সফলকাম হইয়াছে। তুমি হয় ত বলিবে, যথার্থ সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির এই সকল কথা চিন্তা করাই উচিত নহে। ঠিক, কিন্তু একবার ভাবিয়াছ কি, কেন মানবকে ঈশ্বরের সত্য জানিতে এত চেষ্টা করিতে হয়? বাল্যকালে পড়িয়াছিলাম, "পুত্তলিকার চক্ষু আছে দেখিতে পায় না, কর্ণ আছে শুনিতে পায় না।" ভাবিয়াছিলাম, মানব বুঝি চক্ষু অথবা কর্ণ দ্বারা জগতের সত্যাসত্য সহজে নির্ণয় করিতে পারে। কিন্তু বল দেখি, সেই চক্ষু কর্ণ থাকিতেও কেন এত বৃথা চেষ্টা, কেন এত আগ্রহের বৃথা অপচয়, কেন এত আলোকতৃষার মধ্যে সূচিভেদ্য অন্ধকার? হায়, মানব আর পুত্তলিকায় কি প্রভেদ, কে বলিতে পারে?

Psychologist অর্থাৎ যিনি মনোবিজ্ঞানের সকল সত্য আপনার আয়ত্ত করিয়াছেন, তিনি বলিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? We are all short-sighted creatures and see but one side of things (Locke). সত্য বটে, কিন্তু পাঠক আমি বলি,

মনোবৈজ্ঞানিক যদি সকল মানবকে অদূরদর্শী না বলিয়া সুদূরদর্শী বলিতেন, তাহা হইলে ঠিক হইত। বাস্তবিক, মানব ত নিকটের দ্রব্য ভাল দেখিতে পায় না। কি বালক, কি বৃদ্ধ, সকলেই সুদূরদর্শী, বা Long-sighted ;—এ কথা শুনিলে অনেক চক্ষুচিকিৎসক হয় ত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবেন ; কিন্তু আমরা নাচার।

আমি বলি কি, যদি সত্যসত্যই মানব Short-sighted অথবা অদূরদর্শী হইবে, তাহা হইলে মানব আপনাকে আপনি দেখিতে পায় না কেন ? তুমি প্রতিবেশী দূরে দাঁড়াইয়া আছ, আর একজন বিদেশী আরও দূরে অবস্থিত, মানব তাহাদিগকে বেশ সুস্পষ্ট দেখিতে পায়। কাহার নাসিকায় কোথায় কি দোষ আছে, কাহার দৈহিক অথবা মানসিক সৌন্দর্য্য কোথায় কি কারণে ক্ষীণপ্রভ হইয়াছে, কাহার হৃদয়ের মর্ম্মদেশে কোন স্থানে কোন কোন দোষের প্রাবল্য আছে, সকলই আমরা দেখিতে পাই। এই বিষয়ে মানব-মণ্ডলীর সহিত তর্ক বিতর্ক করি, লোকচরিত্রের সমালোচনা করিয়া ব্যক্তি-বিশেষের চতুর্দ্দশ পুরুষের পিণ্ডদান করি, কিন্তু ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত্তমধ্যে যে হৃদয়ের প্রত্যেক স্তর পরীক্ষা করিতে পারি, তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে পাই না। পরের চক্ষে তাহাকে দেখিতে হয়। আপনার বিষয়ে আপনি অন্ধ, ইহা অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি আছে ? সেই জন্যই বলি, মানবমাত্রেই Long-sighted।

জনসাধারণের এই অন্ধতার কারণ কি, পাঠক কখনও ভাবিয়াছ কি ? আমার মনে হয়, প্রকৃতির সহিত মানবের একপ্রকার বিরোধ-ভাব আছে। আমরা ক্ষুদ্র মানব, সমগ্র প্রকৃতির তুলনায় অগাধ সমুদ্রে তৈলবিন্দুবিশেষ ; আমরা বিশাল অনন্ত প্রকৃতির হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে চাহিলে প্রকৃতি কি বলিবে ? বলিবে কি, এস হে কীটানুকীট ! হে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নগণ্য জীব! এস, তোমারই জন্য হৃদয়ের সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছি ; তোমারই জন্য আমার ক্রমসঞ্চিত অতুলনীয় রত্নরাজি সাজাইয়া রাখিয়াছি! তুমি কেবল-মাত্র হস্তপ্রসারণ কর, আর এই ব্রহ্মাণ্ড-প্রহেলিকার সারমর্ম্ম তোমার ক্ষুদ্রা-দপি ক্ষুদ্র হস্তে আমি সাদরে তুলিয়া দি ?

অথবা সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি আপন অসীমত্বের গৌরব অনুভব করিয়া তোমায় বলিবে, হে ব্রহ্মাণ্ডকীট ! হে অপদার্থ অন্তঃসারহীন গর্ব্বস্ফীত কূপমণ্ডূক, তুমি আমার পবিত্র অনন্ত হৃদয়ে প্রবেশ করিও না ; প্রবেশ করিলে আপনিই

হাবুডুবু খাইয়া মরিবে। আমার অতলস্পর্শজলধিসিঞ্চনে তুমি অক্ষম; তোমার বৃথা শ্রম, বৃথা আকাঙ্ক্ষা, বৃথা আস্ফালন। তুমি ক্ষুদ্র হইয়া মহতের সহিত সহবাস করিতে চাও, বামন হইয়া চন্দ্রের জন্য তোমার দুর্দমনীয় তৃষ্ণা, এই জন্যই প্রকৃতি তোমায় পদে পদে শাস্তি দেয়। তুমি জান না, ক্ষুদ্রের নিকট মহতের মহৎ হৃদয় কঠিন আবরণে আবৃত। কে তুমি যে তোমার সসীম মুহূর্ত্তস্থায়ী হৃদয়-বুদ্বুদের সহিত অসীম অনন্তকালস্থায়ী প্রাকৃতিক হৃদয়ের প্রেমসন্ধি হইবে?

তুমি যেমন আপন সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের সহিত ব্রহ্মাণ্ড-হৃদয়ের বিনিময়-প্রার্থী, ব্রহ্মাণ্ড-হৃদয় তেমনি তোমার গর্ব্বপূর্ণ দুরাকাঙ্ক্ষা দেখিয়া তোমার নিকট আপন হৃদয়কেন্দ্র অনাবৃত রাখিতে উৎসুক, তাহাতে তোমার দুঃখ কি বল দেখি?

মানব, তুমি আপন মস্তিষ্ক পরিচালন করিয়া সৌরজগতের কেন্দ্র নিরূপণ করিতে ব্যগ্র, আর ঐ দেখ, বিশ্বপ্রকৃতি আপন চাতুর্য্যজাল বিস্তার করিয়া কত দিন তোমায় বুঝাইয়া আসিতেছে, এই পৃথিবীই সৌরজগতের কেন্দ্র, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহ আমাদের প্রসূতি ধরণীর চতুর্দ্দিকে নিয়তই পরিভ্রমণ করিতেছ। এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতে পারে। সংসারে আমরা কারণ দেখিতে পাই না, কার্য্যই দেখিতে পাই। "The occult causes are hidden; the effects only are manifest". অথবা কারণের যে অংশটুকু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাও সকল সময়ে ভ্রমশূন্য নহে। সমস্ত বিজ্ঞান পাঠ কর,—দেখিতে পাইবে,—প্রকৃতির ইচ্ছা নহে যে, আমরা তাঁহার হৃদয়াভ্যন্তরস্থ গূঢ়মর্ম্ম সকল এক মুহূর্ত্তমধ্যে সংগ্রহ করিয়া লই।

এই সকল দেখিয়া হে পাঠক, তোমার কি স্বতঃই এই প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হয় না,—হে বিশ্বপ্রকৃতি, হে জগৎপ্রসবিনি, হে আদ্যাশক্তিরূপিণি, কেন মা তোমারই সন্তানের নিকট আপন হৃদয়ের আবরণ আজি উন্মুক্ত করিতে তুমি প্রস্তুত নহ? যাহা হইতে উৎপত্তি, যে শক্তিতে শক্তিমান, যে অনন্তজীবন-প্রস্রবণ হইতে এক মুহূর্ত্ত জন্য জীবনীশক্তি পাইয়াছি, তাহারই সহিত এত বিদ্বেষভাব কেন? কিন্তু হায়, কে এ প্রশ্নের উত্তর দিবে? যে সর্ব্বাপেক্ষা আপন, সে কেন পর হয়? যে আমার সর্ব্বস্ব জানে, সে কেন নিজের কিছুই আমায় জানিতে দেয় না? কেন তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে আজীবন প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও আমরা সফলকাম হইতে পারি না? পাঠক! এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পার কি?

সেই জন্যই বলি, প্রকৃতি আপনিই আমাদের অন্ধকারে রাখিতে চাহে। প্রকৃতি বলে, ভ্রান্ত নর, ভ্রান্তই থাক, তোমার দুরাকাঙ্ক্ষাপরিতৃপ্তির জন্য, এই দেখ, কেমন তোমায় ছায়াবাজি দিয়া ভুলাইয়া রাখিয়াছি। তুমি বালক, তোমায় মিথ্যা বলিতে আমি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নহি।

এই জন্যই মানব আপনা-আপনিই মিথ্যা বলিতে শিক্ষা করে; বাল্যকাল হইতে মানবের নিকট নানা প্রকারে সত্যের প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, কিন্তু মিথ্যা বলিতে রীতিমত শিক্ষা সামাজিক জীবনে খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। সামাজিক শিক্ষা বল, পারিবারিক শিক্ষা বল, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বগ্রাসিনী শিক্ষা বল, সকল শিক্ষাই সত্যের প্রশংসা করে। "সদা সত্য কহিবে, মিথ্যা বলা বড় দোষ" সর্ব্বদাই আমাদের কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতেছে, কিন্তু তথাপি, সঙ্কীর্ণ মানবপ্রকৃতি, অসীম বিশ্বপ্রকৃতির মিথ্যার অনুকরণ করিতে সর্ব্বদাই উৎসুক।

এখন বল দেখি পাঠক! প্রকৃতি আমাদের আপন হৃদয়ের ভাব সংগুপ্ত রাখিতে আমাদের উৎসাহিত করে কি না? সর্ব্বজননী বিশ্বপ্রকৃতির নিকট আমরা আর একটি ভীষণ কুশিক্ষা পাই। যেমন মিথ্যা বলিতে মানব প্রকৃতির অনুকরণ করে, তেমনি সংসারে আসিয়া পরস্পরের সহিত দ্বন্দ্ব করিতেও মানব প্রাকৃতিক দৃষ্টান্তের অনুসরণ করে। সংগ্রাম বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা সংসারের একটি অনিবার্য্য নিয়ম। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, দেখিবে, পরস্পরের সংঘর্ষ, ঘাতপ্রতিঘাত, পরস্পরের উন্নতির বা অবনতির অন্তরায় হইতেছে।

মানবসমাজে দেখ, ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান। আপন পারিবারিক জীবনে দেখ, সামান্য ভূসম্পত্তি লইয়া ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব, গৃহবিচ্ছেদ, আত্মীয়স্বজনগণের মধ্যে পবিত্র প্রণয়ক্ষেত্রে বিষবৃক্ষরোপণ। ভালবাসার সামগ্রী লইয়া পরস্পরের দ্বন্দ্ব, পিতাপুত্রে কলহ, স্বামীস্ত্রীর হৃদয়ের অসামঞ্জস্য, জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে যৎসামান্য কারণে আজীবন বিচ্ছেদ, এই সকল ঘটনা সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়।

সামাজিক জীবনে হীনবল প্রতিবেশীর উপর সবলের সফল চেষ্টা, কর্ম্মক্ষেত্রে মানবমাত্রেরই পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভীষণ আক্রোশ, এ সকল দৃশ্য ত প্রতিমুহূর্ত্তেই আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে।

বাহ্যজগতে চাহিয়া দেখ, দেখিবে, কোটী কোটী কীটাণুর প্রতি-মুহূর্ত্তের

জীবনসংগ্রাম লইয়া প্রাণিজগৎ আজি সজীব হইয়া আছে। নিশ্চেষ্ট জড়-জগতের প্রত্যেক অণুও এই সংগ্রামে ব্যতিব্যস্ত, সচেষ্ট আধ্যাত্মিক জীবনের প্রত্যেক unitও এই পারস্পরিক ঘাতপ্রতিঘাতে উন্নতিলাভের জন্য উৎসুক। বিশাল সৌরজগৎপানে চাহিয়া দেখি, আমাদের সূর্য্য এই সৌর-জগতের প্রণয়কেন্দ্রস্বরূপ, সমগ্র গ্রহ নক্ষত্রকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসে বলিয়া আপন বক্ষে টানিয়া লইতে চাহে, আর বিদ্বেষবুদ্ধিসম্পন্ন গ্রহনক্ষত্রগণ এই প্রণয়কেন্দ্র হইতে দূরে অবস্থান করিতে চেষ্টা করে। এই প্রেমাকর্ষণ ও বিদ্বেষপ্রণোদিত বিকর্ষণের উপর সমগ্র সৌরজগৎ সংস্থাপিত। আমাদের পার্থিব জগতের দিকে চাহিয়া দেখি, অহরহ এই সংগ্রাম চলিতেছে। উত্তাপের বিকর্ষণীশক্তি আর রাসায়নিক সংযোগের আকর্ষণীশক্তি, এই উভয়ের মধ্যে অবিরাম কলহ। আর এই কলহ হইতেই Solid, Liquid ও Gas এর উৎ-পত্তি। এক এক সময়ে ভাবি, কেন এ সংসার সংগ্রামভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইল? পূর্ণপ্রণয়ের উপর কি সংসার টিকিতে পারে না? কি উদ্দেশ্যসাধনের জন্য অনন্তভোগী মহাপুরুষ সুধার সহিত হলাহল মিশ্রিত করিলেন? হায়! কত কবি, কত প্রেমিক, কত দার্শনিক, এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই।

প্রাকৃতিক তৃতীয় কুশিক্ষা,—অপচয়শীলতা। আমরা অনেক সময়ে মানবকে অপচয়শীল বলিয়া দোষ দিয়া থাকি। মানব সময়ের যথার্থ ব্যবহার জানে না। যতটুকু খরচ করা নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষা বিস্তর অধিক খরচ করে। অবশেষে আপনার মূলধনের অভাব দেখিয়া আপনি ব্যতিব্যস্ত হয়! কিন্তু হে পাঠক, বল দেখি, অপচয়শীলতা মানব কোথা হইতে শিক্ষা করিল? তুমি হয় ত বলিবে, মানব বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া এইরূপে আপনার পায়ে আপনি কুঠারাঘাত করিতেছে। কিন্তু ইহার উত্তরে কি বলা যায় না যে, মানব এই অপচয়শীলতা বিশ্বপ্রকৃতির নিকট শিক্ষা করি-য়াছে? প্রকৃতি প্রতিমুহূর্ত্তে কত জিনিস অপচয় করিতেছে, বল দেখি? বৈশাখী নিদাঘের জ্বলন্ত তেজ আর বৈশাখী অমাবস্যার কঠিন দুর্ভেদ্য অন্ধ-কার, ইহা কি একটি নিতান্ত অপচয়শীতলতার চিহ্ন নহে? যেখানে জন-মানব নাই, প্রাণিজগতের অথবা উদ্ভিদ্জগতের লেশমাত্র যেখানে দৃষ্টিগোচর হয় না, সেই দিগন্তব্যাপী মরুভূমির মধ্যে, আলোকাধিক্যে নয়ন ঝলসিয়া যায়, কিন্তু যেখানে একটিমাত্র আলোকরশ্মির জন্য সহস্র নয়ন একত্র বিস্ফারিত

হইয়া আছে, সেইখানেই আলোকের পূর্ণাভাব। ইহা কি সংসারের Radiant energyর সম্পূর্ণ অপচয়ের দৃষ্টান্ত নহে?

উত্তাপ বা Heat energyর সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথা বলা যাইতে পারে। যেখানে উত্তাপের আর প্রয়োজন নাই, সেইখানেই উত্তাপাধিক্য; আর যেখানে ভীষণ শীতে প্রাণিজগৎ সর্ব্বদা কম্পমান, সেখানে উত্তাপের অভাব। ইহা দেখিয়া কি বোধ হয় না যে, বিশ্বপ্রকৃতির সমানুপাতজ্ঞান নিতান্তই অল্প?

বিশ্বপ্রকৃতির, একখানি বীজগণিত ক্রয় করিয়া, শীঘ্রই "নিপাত অনুপাত সমানুপাত জ্ঞান" লাভ করিবার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য!

আবার শব্দজগতের কথা ভাবিয়া দেখ। দেখিবে, পৃথিবীতে যে পরিমাণে শব্দের অপব্যয় হয়, তাহার অধিকাংশ কমাইয়া দিলে, জগৎসংসারের সুখের বৃদ্ধি বই হ্রাস হয় না। বর্ষায় বিদ্যুল্লতা যখন নয়ন ঝলসিয়া অম্বরপথে ক্রীড়া করে, তখন যদি ইন্দ্রের বজ্র শব্দবিহীন হয়, তাহা হইলে কাহার কি বিশেষ ক্ষতি,—বলিতে পার কি? জ্ঞানী পাঠক হয় ত বলিবেন, মানব, তোমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি, তুমি অনেক সময়ে আপন Domestic Economy বুঝিতে পার না, তোমার কি সাধ্য যে, তুমি Universal Economyর মর্ম্মগ্রহণ করিবে? স্বীকার করি, আমাদের সকলেরই বুদ্ধি সুদূরগামিনী নহে, কিন্তু যেটুকু আছে,—সুবুদ্ধিই বল, আর দুর্ব্বুদ্ধিই বল,—সেইটুকুর পরিচালন করিয়া কি এ কথা স্পষ্টই বোধ হয় না যে, সমস্ত শব্দজগতের সীমা, বর্ত্তমান সীমা অপেক্ষা সঙ্কীর্ণ করিলে কাহারও কোনও ক্ষতি নাই!

এইরূপ জগতের শক্তিসমষ্টির মধ্যে এক একটি লইয়া চিন্তা কর, দেখিবে, কোন শক্তিরই এ জগতে even distribution নাই। শুধু তাহাই নহে, অনেক বৈজ্ঞানিক পুঙ্গ এমন কথা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে, জগতের শক্তি-সমষ্টির প্রতিমুহূর্ত্তে অপচয় হইতেছে। আর এমন এক দিন আসিবে, যে দিন এই জগতের অপচয়শীলতার শেষ ফল আমরা দেখিতে পাইব। যে দিন জগতের জীবনীশক্তি ক্রমে ক্রমে অপব্যয়িত হইয়া একেবারেই অন্তর্হিত হইবে। ভাস্কর দিবাকর আর এ জগতে থাকিবে না;

> "গৃহমাঝে দীপপ্রায় রবি আকাশের গায়
> কালের প্রভাবে নিভে যাবে একদিন।"

গ্রহনক্ষত্রাদি কালের অনন্তগর্ভে বিলীন হইয়া যাইবে। সমগ্র সৌরজগৎ

এই বিষম অপচয়শীলা প্রকৃতির হস্তে পড়িয়া Krakatoaর isletএর ন্যায় এক মুহূর্ত্তের মধ্যে মহাশূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে।

এ কথা বিশ্বাস করিতে সহজে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু কি করিব, বৈজ্ঞানিকের কথা বিশ্বাস না করিয়াও থাকিতে পারি না। এই দেখ, তোমার পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে কি বলে,

" Although, therefore, in a strictly mechanical sense there is a conservation of energy, yet as regards usefulness or fitness for living beings, the energy of the universe in process of deterioration. Universally diffused heat forms what we may call the great wasteheap of the universe, and this is growing larger year by year.........but if we regard it (the universe) rather as a candle that has been lit, we become absolutely certain that it cannot have been burning from Eternity, and that a time will come *when it will cease to burn.*"—Balfour Stewart. Conservation of Energy.

প্রকৃতির আর একটি বিষম দোষ আমরা প্রত্যহই দেখিতে পাই। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক Heraclitus বলিয়াছেন, Change is the law of the nature; অর্থাৎ জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রধান ব্রিটিশ্ দার্শনিক মিল বলেন, "Nature is uniform"; আর জগতের সমস্ত বিজ্ঞান এই uniformityর উপর প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞান বল, দর্শন বল, ধর্ম্ম বল, সামাজিক নীতি বল, Nature's uniformity না স্বীকার করিয়া লইলে কিছুই থাকে না।

কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ সকল দেখিয়া কি বোধ হয়? মিল্ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ঠিক্? না, বৃদ্ধ Heraclitus যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ঠিক্? বুড়ার কথা আপৎকাল ব্যতীত কেহ শুনিতে চাহে না সত্য, কিন্তু আমার কেমন পক্ককেশ দেখিলেই হৃদয়ে গভীর প্রেমের সঞ্চার হয়। আমি বলি, হে Heraclitus! তুমি বিশ্বজগতের orecle হইয়া আসিয়াছিলে; আর হে মিল্, তোমার ভুল বিশ্বাস, জাগতিক জীবন প্রতিপদেই খণ্ডন করিতেছে।

এই দেখ আবার পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক কেমন আমার মত সমর্থন করিতেছেন,—

"......It seems clear that Heraclitus must have had a vivid conception of the allied in character to......that of modern philosophys who regard matter as essentially dynamical."

জাগতিক অনন্ত পরিবর্ত্তনশীলতার আর অধিক প্রমাণ চাও কি? ঐ দেখ, তোমার সমক্ষে প্রতিমুহূর্ত্তে চন্দ্রসূর্য্যের অনন্ত পরিবর্ত্তন সমগ্র ভৌতিক জগতের পরিবর্ত্তন, অন্তর্জ্জগতের অসীম ভাবস্রোত, এ সকল দেখিয়া শুনিয়াও কি জাগতিক পরিবর্ত্তনশীলতা প্রমাণ অপেক্ষা করে? প্রতি পলে, প্রতি অনুপলে, প্রতি বিপলে, অনন্ত জগতের যে অনন্ত পরিবর্ত্তন হইতেছে, Demiurgusএর নিয়ম অনুসারেই হউক, অথবা যে কোনও কারণেই হউক, কোন মূর্খ তাহা অস্বীকার করিবে? এই হাসি, এই কান্না, এই প্রেম, এই বিচ্ছেদ, এই নিদ্রা, এই জাগরণ, ইহাই সংসারের নিয়ম।

"The Eternal ups and downs of life, not of the life human, but of the life of the cosmos, this is the theme of all sound philosophy."

এ কথা অস্বীকার করিতে পার? সাধ্য কি? এই জন্যই চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ, শ্লোকের সৃষ্টি হইয়াছিল; এই জন্যই মা লক্ষ্মী চিরকালই চঞ্চলা; এই জন্যই গভীর দার্শনিক বলিয়াছেন, সর্ব্বমনিত্যং; এই জন্যই phenomenon আর noumenonএর পার্থক্য।

এখন বল দেখি, সংসার কেন এত পরিবর্ত্তনশীল? জগজ্জননীর মুখের দিকে চাহিয়া এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে কি না, কেন মা! তুমি চঞ্চলা, অধীরা পরিবর্ত্তনশীলা? প্রকৃতির মুখ পানে চাহিয়া ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব— বিশাল বিশ্বপ্রকৃতির পদরেণু—বলে, জননী স্থিরা ভব, স্থিরা ভব। মানবকে অনেক সময়ে আমরা চঞ্চল, পরিবর্ত্তনশীল, unsteady, irregular বলিয়া দোষ দিয়া থাকি। Bacon বলিয়াছেন,—

"Seek to make thy course regular, that men may know beforehand what they may expect."

কিন্তু যখন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সর্ব্বদা এই unsteadiness শিক্ষা দেয়, তখন কেমন করিয়া সুস্থির থাকি? পার্থিবজীবনে পিতামাতা আত্মীয় স্বজন যাহা করেন, আমরা তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকি। এই অনুকরণশক্তি মানবজীবনের একটি প্রধান উপকরণ। কিন্তু বল দেখি, বিশ্বজননী যাহা করেন, বিশ্বপিতা যে অভ্যাসের পক্ষপাতী, তাহার অনুকরণ কি নিন্দনীয়?

হে ক্ষুদ্র মানব, তোমার নৈতিক নিয়মাবলী গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দাও। কে তুমি যে প্রকৃতিকে পদদলিত করিয়া নিজ মস্তিষ্কসম্ভূত স্পর্দ্ধাজাত নিয়মাবলীর আশ্রয় গ্রহণ করিবে? যখন জননী বলেন, সন্তান, আমি

স্বয়ং মিথ্যার, সংগ্রামের, অপচয়শীলতার, অধৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি, প্রতি পদে তোমার সমক্ষে ধরিতেছি, যাহা যাহা দেখাইতেছি, তাহাই শিখিবে ;—তখন বিশ্বজগতের মানবমণ্ডলীর দোষ লইয়া এত কোলাহল কেন বল দেখি ?

পাঠক ! এই মহান্ প্রশ্নের উত্তর কখনও ভাবিয়াছ কি ? বিশ্বস্রষ্টার যে নৈতিক জ্ঞানের বিশেষ অভাব আমরা দেখিতে পাই, তাহার কারণ কি ? অদূরদর্শী মানব যখন অনন্তবুদ্ধিজীবী জাগতিক শক্তির দোষ দেয়, তখন ব্রহ্মাণ্ডই যে পদে পদে মানবের স্পর্দ্ধা উদ্দীপিত করে, ইহার কারণ কি ? আমি ইহার যে কারণ নির্দ্দেশ করিব, হয় ত তাহার সহিত তোমার মতের অনৈক্য হইতে পারে। কিন্তু স্মরণ রাখিও যে, অনৈক্যও একটি প্রাকৃতিক নিয়ম।

প্রকৃতির সীমা কত দূর, পাঠক একবার ভাবিয়াছ কি ? সংসারে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সকল পদার্থ, অতীন্দ্রিয়, মনোগত ভাব, যাহা হইয়াছে, হইতেছে, এবং হইবে, সকলই প্রকৃতির অন্তর্ভূত। ভৌতিক জীবন, আধ্যাত্মিক জীবন, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, এই সকলের সমষ্টি লইয়া প্রকৃতি। এখন বল দেখি, মানবের সামাজিক জীবন প্রকৃতির অন্তর্ভূত কি না ? জড় জগতের যেমন কেবলমাত্র ভৌতিক জীবন আছে, সেইরূপ আধ্যাত্মিক জগতের আবার সামাজিক জীবন আছে। দিগন্তব্যাপিনী মরুভূমির মধ্যে যে উদ্ভিদ জগতের 'একঘরে' একমাত্র তরু আজীবন বিজনশান্তি অনুভব করে, তাহার সামাজিক জীবন নাই। সমস্ত বিশ্বজগতের উত্তাপ আলোক বিদ্যুৎ ইত্যাদি শক্তিসমষ্টির সহিত ইহার কত দূর সৌহার্দ্দ্য, তাহা এখন বলিব না। কিন্তু সাধারণতঃ এ কথা বলা যাইতে পারে যে, সামাজিক জীবন মনুষ্যের একটি বিশেষ স্বত্ব ; অন্য কোনও জীব বা উদ্ভিদের এই স্বত্ব নাই।

কোনও কোনও সূক্ষ্মদর্শী দার্শনিক অথবা সমাজতত্ত্ববিৎ হয় ত বলিবেন, সামাজিক জীবন convential, artificial ; মানব নিজে গড়িয়া লইয়াছে মাত্র। বিশ্বপ্রকৃতি আমাদের সামাজিক জীবন দেন নাই। বাস্তবিক ভাবিতে গেলে ইহা অস্বীকার করা দুষ্কর বলিয়া বোধ হয়। অস্বীকার করা দুষ্কর বোধ হয় বলিয়া উপরি-উক্ত মহান্ তথ্য স্বীকার করিয়া লইলাম, কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, কোথায় human convention science বা বিজ্ঞানের উপর সংস্থাপিত নহে ? আর কোথায় বিজ্ঞান প্রকৃতির প্রতিমূর্ত্তি নহে ? যদি প্রতি পদে বিজ্ঞান প্রাকৃতিক শক্তির যথাযথ বর্ণনা হয়, আর যদি প্রত্যেক art বিজ্ঞান-

ভিত্তির উপর গঠিত হয়, তাহা হইলে আজি তুমি যাহাকে অনৈসর্গিক বলিয়া ঘৃণা কর, তাহা কি প্রাকৃতিক ভিত্তির উপর সংস্থিত নহে?

Nature আর artএর পার্থক্য নির্দ্দেশ করা বড়ই কঠিন। এই জন্যই কবি বলিয়াছেন,—

"All nature is but art unknown to thee,
All chance direction which thou caust not see".

স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে, মানবের ভৌতিক জীবন ও সামাজিক জীবন, উভয়ই প্রাকৃতিক বলিয়া বোধ হয়। আমাদের সামাজিক জীবন যে প্রাকৃতিক, এই কথা ধরিয়া লইয়া, পাঠক একবার ভাবিয়া দেখ, দেখিবে সামাজিক শিক্ষা ও প্রাকৃতিক শিক্ষা, এই উভয়ের মধ্যে যথার্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতা আদৌ নাই।

প্রাকৃতিক জীবন বলে, (আত্মরক্ষা বা self conservationএর জন্য শত্রুর নিকট) সদা মিথ্যা বলিবে, (যে সকল দস্যু বা তস্কর তোমার সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়া তোমায় জীবনসংগ্রামে পরাজিত করিতে সর্ব্বদা উৎসুক তাহাদের সহিত) সদা কলহ করিবে, সর্ব্বদা আপন আয়ত্তাধীন দ্রব্য (কাঙ্গাল প্রতিবেশীর হিতের জন্য) অপব্যয় করিবে, (শত্রুভয় নিবারণের জন্য) কদাচ স্থির থাকিবে না। সামাজিক জীবন বলে, হে মানব! সদা সত্য বলিবে, কলহ করা বড় দোষ, আয়ত্তাধীন দ্রব্যমাত্রেরই সদ্ব্যবহার করিবে, বিপদি স্থৈর্য্যম্, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কিন্তু এই যে প্রাকৃতিক ও সামাজিক শিক্ষার পার্থক্য, মানবের অদূরদর্শিতাই ইহার মূলীভূত কারণ। উপরি-উক্ত মতের সমর্থনে কি এই কথা বলা যায় না যে, আমাদের সামাজিক জীবনও প্রাকৃতিক? প্রকৃতির দয়ার ইয়ত্তা নাই, প্রকৃতি অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ দিয়া থাকে। ভৌতিক জীবনে যে উপদেশ, সামাজিক জীবনে তাহা নহে। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে ব্যক্তিবিশেষের কর্ত্তব্য ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। এই শিক্ষাই আমরা জগন্মাতার নিকট জন্মজন্মান্তরে প্রাপ্ত হই।

বিশ্বমাতা স্পষ্টই বলেন, মানব, তোমার জীবনের ভিন্ন ভিন্ন ভাব আছে; তোমার ভৌতিক জীবনের আইন এক, আর সামাজিক জীবনের আইন এক। যখন একাকী বাস করিবে, তখন কেবলমাত্র আপনার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিবে; আর যখন তোমারই ন্যায় প্রতিবেশিমণ্ডলীর মধ্যে বাস

করিবে, তখন আপনাকেই সর্ব্বেসর্ব্বা ভাবিও না; তোমার ন্যায় আরও অসংখ্য জীব আছে; সকলেই সমান; সকলে একত্রীভূত হইয়া The golden rule of the Jesus of Nazarath অনুসারে কাজ কর।

হে বিশ্বপ্রকৃতি, আমরা ক্ষুদ্র, অন্ধতমসাচ্ছন্ন; আমাদের হৃদয় অহঙ্কার-পূর্ণ; আমরা গর্ব্বস্ফীত; পাপের বোঝা আপনার দুর্ব্বল স্কন্ধে লইয়া, আপন গৌরবে আপনি আত্মহারা হইয়া, সর্ব্বদা আপন মূর্খতার পরিচয় দিই।

হে ব্রহ্মাণ্ড-জননি! স্নেহ-প্রস্রবিণি! পূর্ণপ্রেমরূপিণি! তোমারই ইয়ত্তাধীন ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবের নিত্য নৈমিত্তিক ভ্রম দূর করিয়া দাও। আর যেন বিশ্ব-জগতে তোমারই সন্ততি তোমার সহিত সংগ্রাম না করে!

শ্রীলালগোপাল চক্রবর্ত্তী।

মগধের পুরাতত্ত্ব।

মগধের রাজধানী গিরিব্রজপুর নামে মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে। দুর্গপ্রাচীরের ন্যায় পঞ্চ পর্ব্বত গিরিব্রজপুরকে পরিবেষ্টিত করিয়া অবস্থিত ছিল। মহাপরাক্রান্ত অসুরপতি জরাসন্ধ এখানে রাজত্ব করিতেন। মহাবীর ভীমসেনের সহিত বাহুযুদ্ধে জরাসন্ধ নিহত হন। মহাভারতের সভা-পর্ব্বে এই ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সার উইলিয়াম জোন্সের মতে, কলিযুগের আরম্ভে ৩০০১ খৃষ্টাব্দে যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক জরাসন্ধ বর্ত্তমান ছিলেন। রাজতরঙ্গিণীর মতে কলিযুগের ৬৫৩ অব্দে, ২৪৪৮ খৃঃ-পূঃ-অব্দে যুধিষ্ঠির আবির্ভূত হন। (১) তখন শকাব্দের পূর্ব্বতন ২৫২৬ বৎসর প্রবহমান ছিল। জরাসন্ধের পুত্র সহদেবের সময়ে কুরুক্ষেত্রের ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সহদেব কৌরব-পক্ষে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। মহাভারতীয় কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের অবসানে, অর্জ্জুনের পৌত্র ও অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণুপুরাণের

(১) শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভুবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ ॥ ৫১ ॥
'আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়-দ্বিক-পঞ্চ-দ্বি-যুতঃ শককালঃ তস্য রাজ্যস্য' ॥ ৫৬ ॥—রাজতরঙ্গিণী।

মতে, মহারাজ পরীক্ষিতের ১০১৫ বৎসর পরে নন্দবংশ মগধে প্রতিষ্ঠালাভ করে। (২) বায়ু ও মৎস্যপুরাণের মতে, পরীক্ষিতের ১০৫০ বর্ষ পরে নন্দবংশ মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। শত বৎসর রাজত্বের পর ব্রাহ্মণ-জাতীয় কৌটিল্য বা চাণক্যের যত্নে নন্দবংশ উন্মূলিত হয়, এবং মৌর্য্য-বংশীয় চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে সংস্থাপিত হন। অতএব বিষ্ণুপুরাণের মতে পরীক্ষিতের জন্মলাভের ১১১৫ বৎসর পরে মগধে চন্দ্রগুপ্ত অভ্যুদিত হইয়া, পাটলীপুত্র নগরে মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ডাক্তর কারণ ও রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের মতে খৃষ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্বতন ৩২২, সুপণ্ডিত কর্ণেল টড্ ও রমেশচন্দ্র দত্তের মতে ৩২০, সার উইলিয়ম জোন্সের মতে ৬০০, কর্ণেল উইলফোর্ডের মতে ৩৫০, এবং ডাক্তর উইলসন ও হুরনলি ও রিস্ ডেভিড সাহেবের মতে ৩১৫ অব্দে, চন্দ্রগুপ্ত পাটলীপুত্রের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ৩১৫ খৃঃ পূঃ অব্দে চন্দ্রগুপ্তের পাটলীপুত্রে প্রতিষ্ঠালাভের সময় অনুমান করিলে, খৃঃ পূঃ ১৪৩০ (১১১৫+৩১৫) অব্দে পরীক্ষিতের জন্ম ও কুরুক্ষেত্রের ভীষণ যুদ্ধের কাল পাওয়া যাইতেছে। বিষ্ণুপুরাণের এই সময়নির্দ্দেশকে অভ্রান্ত বলিয়া বঙ্গের লেখকচূড়ামণি বঙ্কিমচন্দ্র স্বপ্রণীত 'কৃষ্ণ-চরিত্রে' গ্রহণ করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণের মত সত্য হইলে, শকাব্দের পূর্ব্বতন ২৭০৮ (১২০০+১৫০৮) অব্দে কলিযুগের আরম্ভ গণনা করিতে হয়। বরাহ-মিহিরের মতে শকাব্দের পূর্ব্বতন ৩১৭৯ অব্দে কলির কাল-গণনা আরব্ধ হয়। এই মত সর্ব্বত্র গৃহীত ও প্রচারিত হইয়াছে। অতএব, বিষ্ণুপুরাণের মত ভ্রান্ত ও সুপ্রচলিত মতের বিরোধী। বিষ্ণুপুরাণের মত প্রামাণিক বিবেচনায় উইলসন জরাসন্ধের পুত্র সহদেবের সময় খৃষ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্বতন ১৪০০

---

(২) "যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনং।
এতদ্ বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরং॥ ৩২॥
তে তু পরীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম।
তদা প্রবৃত্তশ্চ কলের্দ্বাদশাব্দঃ শতাত্মকঃ॥ ৩৪॥—বিষ্ণুপুরাণ, ৪।২৪।

বরাহমিহিরের মত, 'রাজতরঙ্গিণীতে' গৃহীত হইয়াছে। বরাহমিহিরের মতে, শকাব্দের পূর্ব্বতন ৩১৭৯ অব্দে কলির আরম্ভ, এবং শকাব্দের পূর্ব্বতন ২৫২৬ বর্ষ পূর্ব্বে মহাভারতীয় যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির রাজত্ব করেন। বিষ্ণুপুরাণের মতে, কলিযুগের ১২০০ অব্দে পরীক্ষিতের জন্ম হয়, এবং শকাব্দের পূর্ব্বতন ২৭০৮ অব্দে (১২০০+১৫০৮) কলিযুগ আরব্ধ হয়।

অব্দ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। সুপণ্ডিত রমেশচন্দ্র দত্তের মতে জরাসন্ধ খৃঃ পূঃ ১২৮০ অব্দে, এবং সহদেব খৃঃ পূঃ ১২৫৯ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

সহদেবের পুত্র সোমাপি। এই সোমাপির একবিংশতিতম বংশধর রিপুঞ্জয় বৃহদ্রথের প্রতিষ্ঠিত বংশের শেষ নরপতি। জরাসন্ধের পিতা চন্দ্রবংশীয় বৃহদ্রথ গিরিব্রজপুরে এই রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। রমেশ বাবু প্রতি নরপতির রাজত্বকাল ২১ বৎসর ধরিয়া, জরাসন্ধের সময় ১২৮০ খৃঃ পূঃ অব্দ, এবং রিপুঞ্জয়ের সময় ৭৯৭ খৃঃ পূঃ অব্দ, অনুমান করিয়াছেন। প্রিন্সেপ সাহেবের মতে খৃঃ পূঃ ৯১৫ অব্দে, উইলফোর্ডের মতে খৃঃ পূঃ ৭০০ অব্দে, এবং রমেশ বাবুর মতে খৃঃ পূঃ ৭৭৫ অব্দে, রিপুঞ্জয়ের রাজত্ব-অবসানের পর, শৌনকবংশীয় প্রদ্যোত মগধে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণের মতে, বৃহদ্রথের বিংশতি বংশধরগণ সহস্র বৎসর, বায়ুপুরাণের মতে ৯২১, মৎস্য-পুরাণের মতে ৯৩৫, এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে ৯১৯ বৎসর,—মগধে রাজত্ব করেন।

বিষ্ণুপুরাণের মতে শৌনক-বংশীয়েরা পাঁচ পুরুষে ১৩৮ বৎসর মগধে রাজত্ব করেন। উইলসন সাহেবের মতে খৃঃ পূঃ ৯১৫ হইতে ৭৭৭ অব্দ পর্য্যন্ত ১২৮ বৎসর, এবং রমেশ বাবুর মতে খৃঃ পূঃ ৭৭৫ হইতে ৬৩৮ অব্দ পর্য্যন্ত ১৩৮ বৎসর, শৌনকবংশ মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

অনন্তর বিদেহবংশীয় শিশুনাগ মিথিলা হইতে রাজগৃহে আগমনপূর্ব্বক বিদেহবংশের আধিপত্য মগধে প্রতিষ্ঠিত করেন। বিষ্ণু, ভাগবত, মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের মতে, এই বংশ ৩৬২ বৎসর মগধে রাজত্ব করেন। বায়ুপুরা-ণের মতে, এইবংশ ৩৩২ বৎসর মগধে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মহারাজ অজাত-শত্রু এই শিশুনাগের অধস্তন পঞ্চম বংশধর। ইতিপূর্ব্বে শিশুনাগের মগধের রাজধানী রাজগৃহে প্রতিষ্ঠার কাল খৃঃ পূঃ ৬৩৮ বর্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। শিশুনাগের চতুর্থতম বংশধর ভাতীয়ের নাম সিংহলদ্বীপের প্রামাণিক ইতি-হাস মহাবংশে উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। বিষ্ণুপুরাণে এই ভাতীয় 'ক্ষেত্রজ' নামে পরিচিত হইয়াছেন।

বিদেহবংশীয় এই ভাতীয়ের রাজত্বকালে বুদ্ধদেব কপিলবস্তুতে জন্মগ্রহণ করেন। খৃষ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্বতন ৫৫৮ অব্দে বুদ্ধদেব ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন। এই ঘটনার পাঁচ বৎসর পরে খৃঃ পূঃ ৫৫৩ অব্দে, রাজগৃহের রাজ-প্রাসাদে মহারাজ ভাতীয়ের পুত্র বিম্বিসার জন্মগ্রহণ করেন। এই বিম্বিসারের

মতে, মহারাজ পরীক্ষিতের ১০১৫ বৎসর পরে নন্দবংশ মগধে প্রতিষ্ঠালাভ করে। (২) বায়ু ও মৎস্যপুরাণের মতে, পরীক্ষিতের ১০৫০ বর্ষ পরে নন্দবংশ মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। শত বৎসর রাজত্বের পর ব্রাহ্মণ-জাতীয় কৌটিল্য বা চাণক্যের যত্নে নন্দবংশ উন্মূলিত হয়, এবং মৌর্য্য-বংশীয় চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে সংস্থাপিত হন। অতএব বিষ্ণুপুরাণের মতে পরীক্ষিতের জন্মলাভের ১১১৫ বৎসর পরে মগধে চন্দ্রগুপ্ত অভ্যুদিত হইয়া, পাটলীপুত্র নগরে মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ডাক্তর কারণ ও রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের মতে খৃষ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্বতন ৩২২, সুপণ্ডিত কর্ণেল টড্ ও রমেশচন্দ্র দত্তের মতে ৩২০, সার উইলিয়ম জোন্সের মতে ৬০০, কর্ণেল উইলফোর্ডের মতে ৩৫০, এবং ডাক্তর উইলসন ও হরনলি ও রিস্ ডেভিড সাহেবের মতে ৩১৫ অব্দে, চন্দ্রগুপ্ত পাটলীপুত্রের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ৩১৫ খৃঃ পূঃ অব্দে চন্দ্রগুপ্তের পাটলীপুত্রে প্রতিষ্ঠালাভের সময় অনুমান করিলে, খৃঃ পূঃ ১৪৩০ (১১১৫+৩১৫) অব্দে পরীক্ষিতের জন্ম ও কুরুক্ষেত্রের ভীষণ যুদ্ধের কাল পাওয়া যাইতেছে। বিষ্ণুপুরাণের এই সময়নির্দ্দেশকে অভ্রান্ত বলিয়া বঙ্গের লেখকচূড়ামণি বঙ্কিমচন্দ্র স্বপ্রণীত 'কৃষ্ণ-চরিত্রে' গ্রহণ করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণের মত সত্য হইলে, শকাব্দের পূর্ব্বতন ২৭০৮ (১২০০+১৫০৮) অব্দে কলিযুগের আরম্ভ গণনা করিতে হয়। বরাহ-মিহিরের মতে শকাব্দের পূর্ব্বতন ৩১৭৯ অব্দে কলির কাল-গণনা আরব্ধ হয়। এই মত সর্ব্বত্র গৃহীত ও প্রচারিত হইয়াছে। অতএব, বিষ্ণুপুরাণের মত ভ্রান্ত ও সুপ্রচলিত মতের বিরোধী। বিষ্ণুপুরাণের মত প্রামাণিক বিবেচনায় উইলসন জরাসন্ধের পুত্র সহদেবের সময় খৃষ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্বতন ১৪০০

---

(২) "যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনং।
এতদ্ বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরং॥ ৩২॥
তে তু পরীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম।
তদা প্রবৃত্তশ্চ কলের্দ্বাদশাব্দঃ শতাত্মকঃ॥ ৩৪॥—বিষ্ণুপুরাণ, ৪।২৪।

বরাহমিহিরের মত, 'রাজতরঙ্গিণীতে' গৃহীত হইয়াছে। বরাহমিহিরের মতে, শকাব্দের পূর্ব্বতন ৩১৭৯ অব্দে কলির আরম্ভ, এবং শকাব্দের পূর্ব্বতন ২৫২৬ বর্ষ পূর্ব্বে মহাভারতীয় যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির রাজত্ব করেন। বিষ্ণুপুরাণের মতে, কলিযুগের ১২০০ অব্দে পরীক্ষিতের জন্ম হয়, এবং শকাব্দের পূর্ব্বতন ২৭০৮ অব্দে (১২০০+১৫০৮) কলিযুগ আরব্ধ হয়।

অব্দ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। সুপণ্ডিত রমেশচন্দ্র দত্তের মতে জরাসন্ধ খৃঃ পূঃ ১২৮০ অব্দে, এবং সহদেব খৃঃ পূঃ ১২৫৯ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

সহদেবের পুত্র সোমাপি। এই সোমাপির একবিংশতিতম বংশধর রিপুঞ্জয় বৃহদ্রথের প্রতিষ্ঠিত বংশের শেষ নরপতি। জরাসন্ধের পিতা চন্দ্রবংশীয় বৃহদ্রথ গিরিব্রজপুরে এই রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। রমেশ বাবু প্রতি নরপতির রাজত্বকাল ২১ বৎসর ধরিয়া, জরাসন্ধের সময় ১২৮০ খৃঃ পূঃ অব্দ, এবং রিপুঞ্জয়ের সময় ৭৯৭ খৃঃ পূঃ অব্দ, অনুমান করিয়াছেন। প্রিন্সেপ সাহেবের মতে খৃঃ পূঃ ৯১৫ অব্দে, উইলফোর্ডের মতে খৃঃ পূঃ ৭০০ অব্দে, এবং রমেশ বাবুর মতে খৃঃ পূঃ ৭৭৫ অব্দে, রিপুঞ্জয়ের রাজত্ব-অবসানের পর, শৌনকবংশীয় প্রদ্যোত মগধে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণের মতে, বৃহদ্রথের বিংশতি বংশধরগণ সহস্র বৎসর, বায়ুপুরাণের মতে ৯২১, মৎস্য-পুরাণের মতে ৯৩৫, এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে ৯১৯ বৎসর,—মগধে রাজত্ব করেন।

বিষ্ণুপুরাণের মতে শৌনক-বংশীয়েরা পাঁচ পুরুষে ১৩৮ বৎসর মগধে রাজত্ব করেন। উইলসন সাহেবের মতে খৃঃ পূঃ ৯১৫ হইতে ৭৭৭ অব্দ পর্য্যন্ত ১২৮ বৎসর, এবং রমেশ বাবুর মতে খৃঃ পূঃ ৭৭৫ হইতে ৬৩৮ অব্দ পর্য্যন্ত ১৩৮ বৎসর, শৌনকবংশ মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

অনন্তর বিদেহবংশীয় শিশুনাগ মিথিলা হইতে রাজগৃহে আগমনপূর্ব্বক বিদেহবংশের আধিপত্য মগধে প্রতিষ্ঠিত করেন। বিষ্ণু, ভাগবত, মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের মতে, এই বংশ ৩৬২ বৎসর মগধে রাজত্ব করেন। বায়ুপুরা-ণের মতে, এইবংশ ৩৩২ বৎসর মগধে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মহারাজ অজাত-শত্রু এই শিশুনাগের অধস্তন পঞ্চম বংশধর। ইতিপূর্ব্বে শিশুনাগের মগধের রাজধানী রাজগৃহে প্রতিষ্ঠার কাল খৃঃ পূঃ ৬৩৮ বর্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। শিশুনাগের চতুর্থতম বংশধর ভাতীয়ের নাম সিংহলদ্বীপের প্রামাণিক ইতি-হাস মহাবংশে উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। বিষ্ণুপুরাণে এই ভাতীয় 'ক্ষেত্রজ' নামে পরিচিত হইয়াছেন।

বিদেহবংশীয় এই ভাতীয়ের রাজত্বকালে বুদ্ধদেব কপিলবস্তুতে জন্মগ্রহণ করেন। খৃষ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্বতন ৫৫৮ অব্দে বুদ্ধদেব ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন। এই ঘটনার পাঁচ বৎসর পরে খৃঃ পূঃ ৫৫৩ অব্দে, রাজগৃহের রাজ-প্রাসাদে মহারাজ ভাতীয়ের পুত্র বিম্বিসার জন্মগ্রহণ করেন। এই বিম্বিসারের

রাজত্বের ষোড়শতম বর্ষে ৩৫ বৎসর বয়সে বুদ্ধদেব বোধিদ্রুমের মূলে সিদ্ধি লাভ করিয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। ৫২৩ খৃঃ পূঃ অব্দে বুদ্ধদেব বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া ধর্ম্মপ্রচারের জন্য বারাণসীতে গমন করেন। সেই সময়ে 'মহাবংশের' মতে বিম্বিসারের রাজত্বের ষোড়শ বর্ষ গত হইতেছিল। ইহা হইতে বিম্বিসারের রাজ্যারম্ভকাল খৃঃ পূঃ ৫৩৮ অব্দ বলিয়া জানা যাইতেছে। বিম্বিসার হইতে শিশুনাগ চারি পুরুষ অন্তর। চারি পুরুষে এক শতাব্দী ধরিয়া বিম্বিসারের শত বর্ষ পূর্ব্বে শিশুনাগের রাজত্বের আরম্ভকাল খৃঃ পূঃ ৬৩৮ অব্দ পাওয়া যাইতেছে।

মহাবংশের মতে বিম্বিসার ৫২ বৎসর, অজাতশত্রু ৩২, উদয়িভদ্রক ১৬, অনুরাধক ও মুণ্ড ৮, নাগদশক ২৪, দ্বিতীয় শিশুনাগ ১৮, কালাশোক মহানন্দ ২৮, সুধন্বা নন্দ ২২, নবনন্দ ২২, চন্দ্রগুপ্ত ৩৪, বিন্দুসার ২৮, এবং অশোক ৩৭ বৎসর মগধে রাজত্ব করেন। ৮০ বৎসর বয়সে ৪৫ বৎসর ধর্ম্ম-প্রচারে অতিবাহিত করিয়া, অজাতশত্রুর রাজত্বের অষ্টম বর্ষে, বুদ্ধদেব কুশী-নগরে নির্ব্বাণ লাভ করেন। সেই বৎসর রাজগৃহে প্রথম বৌদ্ধ মহাসঙ্ঘের অধিবেশন হয়। কালাশোকের রাজত্বের দশম বর্ষে ও বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-লাভের শত বৎসর পরে, দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসংঘ বৈশালী নগরে অধিবিষ্ট হয়। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণলাভের ২১৮ বৎসর পরে এবং রাজপদপ্রাপ্তির ৪ বৎসর পরে মহারাজ অশোক পাটলীপুত্রের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। মহারাজ অশোকের সাম্রাজ্যপদে অভিষেকের অষ্টাদশতম বর্ষে ও বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণলাভের ২৩৬ বৎসর পরে, অশোকের পুত্র মহেন্দ্র বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের জন্য সিংহলদ্বীপে গমন করেন। এই সকল সময়নির্দ্দেশ হইতে অনায়াসে শিশুনাগের প্রতিষ্ঠিত বিদেহবংশ, নন্দবংশ ও মৌর্য্যবংশের সময় নিরূপিত হইতে পারে। কিন্তু 'মহাবংশের' নির্দ্দেশ-অনুসারে খৃষ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্ব-তন ৫৪৩ অব্দে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করেন। তদবধি মগধের সম্রাট অজাত-শত্রুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধাব্দের কালগণনা আরব্ধ হয়। এই বৌদ্ধাব্দ সিংহল ও ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত হয়। এই কালগণনায় ৬৫ বৎসরের ভ্রম প্রবিষ্ট হইয়াছে; পশ্চাৎ তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। (১)

(১) "It appears to me to be impossible for any unbiassed examiner of these records to follow up the links of this well connected chain of chro-

বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণলাভের ২১৮ বৎসর পরে মহারাজ অশোক পাটলী-পুত্রের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ৫৪৩ হইতে ২১৮ বৎসর বাদ দিয়া ৩২৫ খৃঃ পূঃ অব্দে অশোকের রাজ্যাভিষেকের কাল পাওয়া যাইতেছে। অশোক ৩৭ বৎসর মগধ সাম্রাজ্য শাসন করেন। খৃঃ পূঃ ৩২৫ হইতে ২৮৮ খৃঃ পূঃ অব্দ পর্য্যন্ত অশোক মহাবংশের মতে মগধে রাজত্ব করেন; গ্রীক ইতিহাস-বিৎগণের নির্দ্দেশ অনুসারে, ৩২১ খৃঃ পূঃ সুবিখ্যাত গ্রীক সম্রাট আলেক-জাণ্ডার পঞ্জাব আক্রমণ করিয়া পুরুরাজকে পরাজিত করেন। মগধের রাজ-কুমার চন্দ্রগুপ্ত সম্রাট আলেকজাণ্ডারের শিবিরে উপনীত হইয়া সমাদরের সহিত গৃহীত হন। চন্দ্রগুপ্তের গর্ব্বিত ব্যবহারে গ্রীক সম্রাট বিরক্ত হইলে, চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক শিবির হইতে পলায়ন করেন। ৩২৩ খৃঃ পূঃ অব্দে ব্যাবি-লন নগরে গ্রীক সম্রাটের মৃত্যু হয়। পর বৎসর চন্দ্রগুপ্ত পঞ্জাবে বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিয়া গ্রীক সম্রাটের প্রতিষ্ঠিত পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তাকে ব্যতিব্যস্ত করেন। জাষ্টিনের মতে ৩১৭ খৃঃ অব্দে চন্দ্রগুপ্তের দ্বারা গ্রীক শাসনকর্ত্তা নিহত হন, এবং পঞ্জাব চন্দ্রগুপ্তের পদানত হয়। ইহার প্রতি-শোধগ্রহণমানসে সিরিয়ার সম্রাট সেলিউকাস নাইকেটর ব্যাবিলন ও ব্যাক-

---

nological evidence, and arrive at the specific date of 218 A. B., assigned to the inauguration of *Asoka*, without acknowledging that that date is designedly a cardinal point in the history....If the *Buddhistical* evidence is to be sustained, the invasion of Alexander, must, as the necessary consequence, be considered to have taken place in the early part of the reign of *Asoka*, and not during the commotions which preceded the usurpation of the Indian Empire by his grandfather *Sandracottus*; and the embassy of Megasthenes and the treaty of Seleucus must also necessarily fall to a more subsequent period of the reign of *Asoka*, instead of their occurring during the rule of *Sandracottus*....I admit myself to be persuaded of the correctness of the conclusions which identifies *Sandracottus* with *Chandra Gupta*; and by my adherence to that persuation, I am necessarily compelled to acknowledge that there is a discrepancy of about 68 years between the Western and *Buddhistical* chronologies, at the particular point at which this identity takes place."

G. Inmour in the "*Journal of Asiatic Society of Bengal*." VI. 716.

ট্রিয়া অধিকার করিয়া ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর প্রান্তে উপনীত হন। চন্দ্রগুপ্তের সহিত মিত্রতা সংস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার পরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী এণ্টিগোনাসের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ৩১২ খৃঃ পূঃ অব্দে ব্যাবিলন নগরে প্রত্যাবৃত্ত হন। চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলীপুত্র নগরে ৩১২—৩০৭ খৃঃ পূঃ অব্দে মিগাস্থিনিস গ্রীক সম্রাটের দূতরূপে অবস্থিতি করিয়া, ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। মেগাস্থিনিস 'সেণ্ড্রেকোটাস' নামে চন্দ্রগুপ্তের এবং 'পালিবোথ্র' নামে পাটলীপুত্রের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। গঙ্গা ও হিরণ্যবাহু শোনের সঙ্গমস্থলে এই পাটলীপুত্র অবস্থিত ছিল। সংস্কৃত পুরাণ ও 'মুদ্রারাক্ষস' অধ্যয়নকালে সার উইলিয়াম জোন্স মগধেশ্বর চন্দ্রগুপ্তের নাম অবগত হন। তদবধি মেগাস্থিনিসের বর্ণিত সেণ্ড্রেকোটাস ও চন্দ্রগুপ্ত অভিন্ন বলিয়া তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মে। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি এই অভিন্নতা ইউরোপীয় পণ্ডিতসমাজে সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত করেন। মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তের নাম, সময় ও রাজধানী নিঃসন্দিগ্ধরূপে অবধারিত করিয়া, কল্পনার রাজ্য হইতে ভারতীয় ঘটনাপুঞ্জ ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে আনয়ন করেন। তদবধি ভারতীয় পুরাতত্ত্বের কালনির্ণয়ের সূত্রপাত হয়। (১)

---

(১) "I cannot help mentioning a diseovery, which accident threw in my way....To fix the situation of that *Palibothra* which was visited and described by Megasthenes, had always appeared a very difficult problem. ...We could not confidently decide that it was *Pataliputra*, though names and most circumstances nearly correspond, because that renowned capital extended from the confluence of the *Sone* and the *Ganges* to the city of *Patna*, while *Palibothra* stood at the junction of the Ganges and *Erannobous*...But this only difficulty was removed, when I found in a classical Sanskrit near 2000 years old, that *Hiranyabahu*, which the Greeks changed into *Erannobous*, was in fact another name for the *Sone* itself... This discovery led to another of greater moment; for *Chandra Gupta*, who from a military adventurer, became like *Sandracottus*, the sovereign of upper Hindustan, actually fixed the site of his empire at *Pataliputra*, where he received ambassadors from foreign princes, and was no other than that very *Sandracottus* who concluded a treaty with Seleucus Nicator."—Sir William Jones in "Asiatic Researches", IV. 10—11.

পালী 'মহাবংশের' নির্দ্দিষ্ট খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দকে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণলাভের সময় বলিয়া গ্রহণ করিলে, মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক ঘটনা তাঁহার পৌত্র অশোকের সময়ে সংঘটিত হয় বলিয়া নির্ণয় করিতে হয়। 'মহাবংশে'র মতে অশোক ও চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে ৬২ বৎসর অন্তর; অতএব পূর্ব্বোল্লিখিত কারণ হইতে স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হইতেছে যে, 'মহাবংশে'র সময়নির্দ্দেশে অন্ততঃ ৬২ বৎসরের ভ্রম প্রবিষ্ট হইয়াছে। টার্ণার সাহেবের মতে ৬৮, ওয়েবারের মতে ৬৬, এবং আমাদের বিবেচনায় ৬২ বৎসরের ভ্রমপ্রমাদ মহাবংশের সময়-নির্ণয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছে। মহাবংশের নির্দ্দিষ্ট সময় হইতে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-লাভের কাল ৬৫ বৎসর পরবর্ত্তী। খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দের পরিবর্ত্তে খৃঃ পূঃ ৪৭৮ অব্দে বুদ্ধদেব পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে কানিংহাম সাহেবের দ্বারা বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণলাভের এই প্রকৃত সময় প্রথমতঃ অনুমিত হয়। (১) পালীভাষায় সুপণ্ডিত রিজ ডেভিড সাহেবের মতে, বুদ্ধদেব ৪১২ খৃঃ পূঃ অব্দে বা তৎসন্নিহিত কালে নির্ব্বাণ লাভ করেন, এবং অশোক বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ লাভের ১৫০ বৎসর পরে প্রাদুর্ভূত হন। সুবিখ্যাত পণ্ডিত ওয়েবার সাহেবের মতে বুদ্ধদেব খৃঃ পূঃ ৩৭০ অব্দে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। (২) লাসেনের মতে বৌদ্ধ-নরপতি কনিষ্ক ৪০ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হন বলিয়া তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রা-লিপি হইতে জানা যায়। তিব্বতীয় ও চৈনিক বৌদ্ধ গ্রন্থের মতে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের ৪০০ পরে এই কণিষ্কের সময় চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসংঘের অধিবেশন হয়।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাব ও নির্ব্বাণকাল সম্বন্ধে সিংহলের ন্যায় অন্যান্য দেশেও ভ্রান্ত মত প্রচলিত আছে। চীন ও জাপানদেশীয় বৌদ্ধগণের মতে, ১০২৭ খৃঃ পূঃ অব্দে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়, এবং ৯৪৯ খৃঃ পূঃ অব্দে নির্ব্বাণলাভ ঘটে। তিব্বতীয় বৌদ্ধ গ্রন্থের মতে খৃঃ পূঃ ৯৬২ অব্দে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়, এবং খৃঃ পূঃ ৮৮২ অব্দে তিনি পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধগণের মতে ৬২৮ খৃঃ পূঃ অব্দে গৌতমের জন্ম, এবং ৫৪৪ খৃঃ পূঃ অব্দে নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি সংঘটিত হয়। সিংহলীয় মহাবংশের মতে খৃঃ পূঃ ৬২৩ অব্দে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়া খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে পরিনির্ব্বাণ করেন। (৩)

(১) *Journal of Asiatic Society of Bengal*, xxiii. 704.

(২) Rhys David's "*Buddhism*". (1880). A. Weber's "*History of Indian Literature*". (1878), p. 287.

(৩) "With reference to the tradition as to *Buddha's* age, the various

ইতিপূর্ব্বে বিস্তারিতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বুদ্ধদেব ৫৫৮ খৃঃ পূঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া খৃঃ পূঃ ৪৭৮ অব্দে পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। এই সময় নিরূপণের সত্যতা ও অভ্রান্ততা সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে বিবিধ কারণ প্রদর্শিত হই-হইয়াছে। ইহা হইতে পূর্ব্বতম ও পরবর্ত্তী সময় নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হইতে পারে। পালী 'মহাবংশের' নির্দ্দিষ্ট রাজত্বকাল অবলম্বনে নিম্নে মগধরাজ অজাতশত্রুর পূর্ব্বতন ও পরবর্ত্তী বিভিন্নবংশীয় নরপতিগণের সময় নির্দ্দেশ করিব। বিদেহবংশীয় মগধের নরপতিদিগের উর্দ্ধতন পৌরাণিক কালের সময়গণনার আবশ্যকতা দৃষ্ট হইতেছে না।

বিদেহবংশ।

১। শিশুনাগ (খৃঃ পূঃ ৬৩৮)
২। কাকবর্ণ („ „ ৬১৩)
৩। ক্ষেমধর্ম্ম („ „ ৫৮৮)
৪। ক্ষাতৌর („ „ ৫৬৩)
৫। বিম্বিসার („ „ ৫৩৮)
৬। অজাতশত্রু („ „ ৪৮৬)
৭। উদয়িভদ্রক („ „ ৪৫৪)
৮। অনুরাধকমুণ্ড („ „ ৪৩৮)
৯। নাগদশক („ „ ৪৩০)
১০। শিশুনাগ (২) („ „ ৪০৬)

Buddhist eras which commence with the date of his death exhibit the widest divergence from each other. Among the Northern Buddhists 14 different accounts are bound, ranging from B. C. 2242 to B. C. 546; the eras of the Southern Buddhists on the contrary, mostly agree with each other, and all of them start from B. C. 544 or B. C. 543. This latter chronology has been recently adopted as the correct one, on the ground that it accords best with historical conditions, although even it displays a discrepancy of 66 years as regards the historically authenticated date of *Chandra Gupta*."—

A. Weber's "*History of Indian Literature*", (1878), p. 287.

নন্দবংশ।

১১। কালাশোক মহানন্দ („ „ ৩৮৮)
১২। সুধন্বা নন্দ („ „ ৩৬০)
১৩। নব নন্দ („ „ ৩৩৮)

মৌর্য্যবংশ।

১। চন্দ্রগুপ্ত („ „ ৩১৬)
২। বিন্দুসার („ „ ২৯২)
৩। ধর্ম্মাশোক প্রিয়দর্শী („ „ ২৬৪)
৪। সুযশ (কুণাল) („ „ ২২৩)
৫। দশরথ („ „ ২১৫)
৬। সঙ্গত („ „ ২০৭)
৭। শালিশুক („ „ ২০০)
৮। সোমাশ্রম („ „ ১৯৪)
৯। শতধন্বা („ „ ১৯০)
১০। বৃহদ্রথ („ „ ১৮৩)

বিম্বিসার হইতে অশোক পর্য্যন্ত মগধের নরপতিগণের রাজত্বকালের পরিমাণ 'মহাবংশ' হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই বিষয়ে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রাচীন ও প্রামাণিক ইতিহাসের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিবার অণুমাত্রও কারণ দেখিতে পাইতেছি না। মহাবংশের মতে চন্দ্রগুপ্ত ৩৪ বৎসর এবং বুদ্ধঘোষের রচিত 'অর্থকথা' মতে ২৪ বৎসর মগধে রাজত্ব করেন। আমরা চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের পরিমাণ ২৪ বৎসরই সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিলাম। খৃঃ পূঃ ৩২৬ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত পঞ্জাব প্রদেশে নন্দবংশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করেন। মহাবংশে সেই সময় হইতে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল পরিগণিত হইয়া থাকিবে। ইহার দশ বৎসর পরে নন্দবংশের উচ্ছেদসাধন-পূর্ব্বক তিনি পাটলীপুত্রে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। নন্দবংশ সুপ্রাচীন বিদেহবংশ হইতে উদ্ভূত হয়। সচরাচর নন্দবংশের রাজত্বকাল শত বর্ষ বলিয়া গণিত হয়। সিংহলীয় প্রাচীন ইতিহাসের মতে, নন্দবংশ তিন পুরুষে ৭২ বৎসর রাজত্ব করেন। এই বংশীয় প্রথম রাজা কালাশোকের রাজত্বের দশম বর্ষে ও বুদ্ধদেবের তিরোভাবের শতবর্ষ পরে খৃঃ পূঃ ৩৭৮ অব্দে বৈশালী নগরে দ্বিতীয় বৌদ্ধমহাসংঘের অধিবেশন হয়। কালাশোকের পর তাঁহার পুত্র নন্দ রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হন। তাঁহার পিতা মহানন্দ নামে বিষ্ণু-

পুরাণে বর্ণিত হইয়াছেন। অনন্তর নন্দের নয় জন পুত্র (১) সমবেতভাবে মগধের শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। তাঁহাদের শাসনকালের মধ্যভাগে খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার পঞ্জাব আক্রমণ করিয়া পর বৎসর স্থলপথে ব্যাবিলন নগরে প্রত্যাবৃত্ত হন। এই সময়েই চন্দ্রগুপ্ত পঞ্জাবে নন্দবংশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া থাকিবেন। অবশেষে চাণক্যের (২) বুদ্ধিকৌশলে নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া, খৃঃ পূঃ ৩১৬ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত মগধে মৌর্য্যবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন।

চন্দ্রগুপ্ত মহারাজ নন্দের নাপিতজাতীয়া উপপত্নীর গর্ভজাত বলিয়া জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। তাঁহার মাতার নাম মুরা। নীচজাতীয়া মুরার গর্ভজাত বলিয়া নন্দের পুত্রগণ চন্দ্রগুপ্তকে অত্যন্ত ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিতেন। এই

---

(১) ১৮৭৫ খৃঃ কর্ণূল নগরে একটি মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়। তাহাতে পালী অক্ষরে কুনন্দের নাম লিখিত দৃষ্ট হয়। উহাতে কুনন্দ 'মহারাজ' ও 'অমোঘভ্রাতৃক' বিশেষণে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা হইতে ডাক্তার মিত্র তাঁহাকে নব নন্দের অন্যতম বলিয়া অনুমান করেন। Journal of Asiatic Society for 1875.

(২) বিশাখদত্তের রচিত 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকে চাণক্যের বুদ্ধিকৌশল এবং চন্দ্রগুপ্তের প্রতি তাঁহার অপার স্নেহ ও অসীম অনুগ্রহ বর্ণিত হইয়াছে। কোন্ সময়ে এই রাজনৈতিক নাটক প্রণীত হয়, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। অনন্ত কবির দ্বারা এই নাটকের একখানি পূর্ব্বপীঠিকা বা ভূমিকা রচিত হয়। তাহাতে সুধন্বা নন্দের নয় পুত্রের কাল্পনিক নাম প্রদত্ত হইয়াছে। রাজমহিষী রত্নবতীর গর্ভে সুধন্বা নন্দের নয় পুত্র জন্মে। উদগ্রধন্বা, তীক্ষ্ণধন্বা, বিকটধন্বা, উৎকটধন্বা, প্রকটধন্বা, সংঘটধন্বা, বিম্বধন্বা, শিখরধন্বা ও প্রখরধন্বা নামে নন্দের নয় পুত্র সম্মিলিতভাবে মগধ সাম্রাজ্য শাসন করেন। বিষ্ণুপুরাণে সুমাল্য এই নবনন্দের জ্যেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; মুদ্রালিপি হইতে কুনন্দের নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। চাণক্যরচিত নীতিশাস্ত্র 'চাণক্য-শতক' নামে প্রসিদ্ধ; ন্যায়সূত্রের প্রাচীনতম ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ও চাণক্য অভিন্ন ব্যক্তি। চন্দ্রগুপ্তের গুরু ও মন্ত্রী চাণক্য পক্ষিল স্বামী নামে পরিচিত। তিনি বাৎস্যগোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম চণক। মহর্ষি গৌতমের প্রণীত ন্যায়সূত্রের ভাষ্য পণ্ডিতশিরোমণি চাণক্যের দ্বারা রচিত হয়। 'ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্য' বাচস্পতি মিশ্র এবং সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে মাধবাচার্য্য পক্ষিল স্বামীকে ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জৈন আচার্য্য হেমচন্দ্র সূরির মতে চাণক্যই কৌটিল্য, বাৎস্যায়ন, মল্লনাগ, দ্রামিল, অঙ্গুল, বিষ্ণুগুপ্ত ও পক্ষিল স্বামী নামে পরিচিত ছিলেন।

"বাৎস্যায়নো মল্লনাগঃ কুটিলশ্চণকাত্মজঃ।
দ্রামিলঃ পক্ষিলস্বামী বিষ্ণুগুপ্তোঽঙ্গুলশ্চ সঃ॥"—অভিধানচিন্তামণি।

নিমিত্তই চন্দ্রগুপ্ত মগধ হইতে পলায়নপূর্ব্বক* পঞ্জাবে গ্রীক সম্রাটের শিবিরে উপনীত হইয়া সম্রাটকে মগধ সাম্রাজ্য আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করেন। গ্রীক সম্রাটের প্রত্যাবর্ত্তনের পর পঞ্জাবে বিদ্রোহী হইয়া মগধ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। তাঁহার নীচজাতীয়া মাতার নাম-অনুসারে চন্দ্রগুপ্তের প্রতিষ্ঠিত বংশ মৌর্য্যবংশ নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। নীচ শূদ্রকুলে উৎপন্ন বলিয়া চন্দ্রগুপ্ত প্রাচীন অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারবর্গের অধিষ্ঠিত রাজগৃহ পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গা ও শোণের সঙ্গমস্থলস্থ পাটলীপুত্র নগরে আপনার রাজধানী সংস্থাপিত করিয়া থাকিবেন। মৌর্য্যবংশ নন্দবংশেরই শাখামাত্র। সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে চন্দ্রগুপ্তের আধিপত্য প্রসারিত হইয়া মগধের অধিকার বিস্তারিত হয়। তাঁহার ন্যায় মহাপরাক্রান্ত সম্রাট ঐতিহাসিককালে ভারতবর্ষে ইতিপূর্ব্বে আবির্ভূত হন নাই। গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিসের মতে, আর্য্যাবর্ত্তের ১১৮টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য চন্দ্রগুপ্তের পদানত হয়। চন্দ্রগুপ্তের সৈনিকবিভাগে ছয় লক্ষ পদাতিক, ত্রিশ সহস্র অশ্বারোহী ও নয় হাজার রণহস্তী নিযুক্ত ছিল।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে খৃঃ পূঃ ৩০৫ অব্দে তাঁহার স্বনামখ্যাত পৌত্র অশোকের জন্ম হয়। অশোকের চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু হয়, এবং অশোকের পিতা বিন্দুসার খৃঃ পূঃ ২৯২ অব্দে মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। অষ্টাবিংশতি বৎসর বয়সে ২৭৭ খৃঃ পূঃ অব্দে অশোক পিতার অধীনে উজ্জয়িনীর শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হন। তাঁহার অশিষ্ট ও দুর্বৃত্ত ব্যবহারে বিন্দুসার অশোককে উজ্জয়িনীতে নির্ব্বাসিত করেন। ডাক্তার মিত্রের মতে অশোক তক্ষশীলায় বিদ্রোহ দমন উপলক্ষে প্রেরিত হন। (১) তাঁহার মাতা সুভদ্রাঙ্গী ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। সুভদ্রাঙ্গীর গর্ভে বিন্দুসারের দুই পুত্র অশোক ও বীতাশোকের জন্ম হয়। বিন্দুসারের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুসীম বিদ্রোহী হইয়া পিতার বিরাগভাজন হন, এবং অশোকের স্থলে তক্ষশীলায় প্রেরিত হন।

---

* "*Asoka* was uncomely in his person, and that was the cause of his not winning the affection of his father. His conduct too was repulsive. He was so very unruly and troublesome that it was deemed adviseable to get rid of him by deputing him to quell a muting which had broken out a *Takshasila*."—Dr. R. L. Mitra's Indo-Aryans," II. 411.

ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান সম্রাটের সম্বন্ধে ডাক্তার মিত্রের গবেষণা কতকগুলি অবিশ্বাস্য ও অমূলক উপাখ্যান সন্নিবিষ্ট করিয়া মহারাজ অশোকের বিকৃত প্রতিকৃতি প্রকাশ করিয়াছে। অশোকের সম্বন্ধে এরূপ অসার ও সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ ডাক্তর মিত্রের ন্যায় পুরাতত্ত্ববিদের লেখনীর উপযুক্ত হয় নাই। মহারাজ অশোকের জীবনী সম্বন্ধে দুই তিনখানি সংস্কৃত গ্রন্থ নেপাল হইতে পুরাতত্ত্ববিদ হগ্‌সন সাহেবের দ্বারা সংগৃহীত হয়। তন্মধ্যে 'দিব্যাবদান' নামক গদ্য গ্রন্থের সারমর্ম্ম প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত বার্ন্নুফের দ্বারা প্রকাশিত হয়, এবং 'অবদানশতক' নামে আর একখানি গ্রন্থের নামমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে। 'অশোকাবদান' নামে পদ্যময় তৃতীয় গ্রন্থ অবলম্বনে ডাক্তর মিত্রের প্রবন্ধ ১৮৭৯ খৃঃ রচিত হয়। ইহার এক তৃতীয়াংশে অশোকের উপাখ্যান বর্ণিত আছে, এবং অপরাংশে তাঁহার গুরু উপগুপ্তের বর্ণিত বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিবিধ উপাখ্যান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পাটলীপুত্রের কুক্কুটবিহারের অন্তর্গত 'উপকথিকারাম' উদ্যানে উপবিষ্ট হইয়া বৌদ্ধযতী জয়শ্রী আপনার শিষ্যবর্গের নিকট এই সকল উপাখ্যান বর্ণনা করেন। অশোকের পিতামহ চন্দ্রগুপ্তের নাম পর্য্যন্ত এই সকল গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই।

উজ্জয়িনী নগরে অবস্থানকালে খৃঃ পূঃ ২৭৪ অব্দে অশোকের পুত্র মহেন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। এই ঘটনার দশ বৎসর পরে অষ্টাবিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়া মহারাজ বিন্দুসার কালগ্রাসে পতিত হন। সেই সময় হইতে মগধ সাম্রাজ্যের সিংহাসন অধিকারের জন্য রাজকুমারদিগের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হয়। চারি বৎসর পর্য্যন্ত আত্মকলহে বিন্দুসারের সাম্রাজ্য উৎসন্ন হইবার উপক্রম হয়। চারি দিকে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া সাম্রাজ্যের আয়তন হ্রাস হইতে থাকে। এই ভ্রাতৃবিরোধে অশোক জয়লাভ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতৃগণ যুদ্ধে নিহত হন। চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহ প্রশমিত করিয়া অশোক সাম্রাজ্যমধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বিবাদে বৃদ্ধ মন্ত্রী রাধগুপ্তের উপদেশ ও মন্ত্রণা হইতে অশোক বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হন। অনন্তর ২৬০ খৃঃ পূঃ অব্দে ৪৫ বৎসর বয়সে মহাসমারোহে মহারাজ অশোক পাটলীপুত্রের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। টার্ণার সাহেবের মতে খৃঃ পূঃ ২৪৭ অব্দে অশোকের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয়। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণলাভের ২১৮ বৎসর পরে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। চন্দ্রগুপ্ত ও বিন্দুসার উভয়েই হিন্দুধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন; হিন্দুধর্ম্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বলিয়া মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের নাম

পর্য্যন্ত 'অশোকাবদান' এবং 'দিব্যাবদান' নামক সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থদ্বয়ে উল্লিখিত হয় নাই।

রাজ্যাভিষেকের চতুর্থ বর্ষে ২৫৭ খৃঃ পূঃ অব্দে মহারাজ অশোক পৈতৃক হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধাচার্য্য উপগুপ্তের নিকট অশোক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন; উরুমুণ্ড পর্ব্বতের আশ্রম হইতে আগমন করিয়া উপগুপ্ত পাটলীপুত্রের বেণুবন বিহারে আপনার বাসস্থান মনোনীত করেন। উপগুপ্ত মথুরা নগরে এক ধনবান শ্রেষ্ঠির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। অশ্বগুপ্ত ও ধনগুপ্ত নামে দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত উপগুপ্ত উরুমুণ্ড পর্ব্বতে বৌদ্ধযতী সোনবাসীর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। অশোকের ভ্রাতুষ্পুত্র নিগ্রোধ এই সময়ে বৌদ্ধাচার্য্যের পদে নিযুক্ত হন। এই নিগ্রোধই অশোকের বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণের প্রধান প্রবর্ত্তক। অশোকের জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সুসীম, ভ্রাতৃবিরোধে নিহত হইলে, তাঁহার অন্তঃস্বত্বা পত্নী পাটলীপুত্রের রাজপ্রাসাদ হইতে পলায়ন করেন। এই রাজমহিষীর গর্ভে নিগ্রোধের জন্ম হয়। মাতার যত্নে নিগ্রোধ মহারাজ অশোকের অনুষ্ঠিত ভীষণ হত্যাকাণ্ড হইতে রক্ষা পান। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নিগ্রোধ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধযতীর বেশ ধারণ করেন। এইরূপে মৌর্য্যবংশীয় মগধের রাজকুলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশাধিকার লাভ করে। ভিক্ষা আহরণের ছলে তিনি পাটলীপুত্রের রাজপ্রাসাদের পার্শ্ব দিয়া গমনকালে মহারাজ অশোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। অশোক তাঁহার পূর্ব্ব পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া জিতেন্দ্রিয় বৌদ্ধযতীর দিব্য কান্তি ও রূপলাবণ্যদর্শনে মোহিত হন। নিগ্রোধ মহারাজের সমীপে আহূত হইয়া পিতৃব্যের সহিত পরিচিত হন: অশোক তাঁহার উপদেশে প্রীতিলাভ করিয়া পাটলীপুত্র নগরের বহির্ভাগে তাঁহার আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করেন। অবিলম্বে গঙ্গাতীরে কুক্কুটবিহার নির্ম্মিত হইয়া নিগ্রোধের বাসস্থলে পরিণত হয়। এই নিগ্রোধের উপদেশে ও প্ররোচনায় অশোক বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়া উপগুপ্তের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তদবধি পাটলীপুত্র বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। পাটলীপুত্রের বিহার হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ ও তাহার চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়া পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ অধিবাসীকে কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত করে।

খৃঃ পূঃ ২৫৬ অব্দে মহারাজ অশোকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিষ্য বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। রাজসিংহাসনে অভিষেকের পর, মহারাজ অশোক আপনার

কনিষ্ঠ সহোদরকে উপরাজের পদে অভিষিক্ত করেন। সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারীকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া, অশোক মগধে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বৎসর সিরিয়ার সম্রাট্ দ্বিতীয় এণ্টিয়োকাসের (২৫৯-২৪৪ পূঃ খৃঃ) সহিত সন্ধি ও মিত্রতা সংস্থাপিত করিয়া, ভারতবর্ষের বহির্ভাগে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের বন্দোবস্ত করেন। সিরিয়া দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম গৃহীত ও আদৃত হইতে থাকে। বৌদ্ধভিক্ষুগণ সিরিয়ায় "এসিনি" নাম ধারণ করিয়া দলে দলে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অহিংসা, দয়াদাক্ষিণ্য, পবিত্রাচার ও নির্ম্মল চরিত্রের জন্য বৌদ্ধযতিগণ সিরিয়ার সর্ব্বত্র সমাদৃত ও সম্মানিত হইতে থাকেন। সিরিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্ম ও নীতি সবিশেষ প্রচারিত হয়। মহাত্মা খৃষ্টদেব পেলেষ্টিনে জন্মগ্রহণ করিয়া, স্বদেশীয় বৌদ্ধযতিগণের নিকট ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা করেন। খৃষ্টের আবির্ভাবকালে রোমের পণ্ডিত প্লিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বরচিত গ্রন্থে বৌদ্ধ 'এসিনি'গণের উল্লেখ করিয়াছেন। খৃষ্টের দ্বারা বৌদ্ধনীতি ও পবিত্রতা খৃষ্টধর্ম্মের অঙ্গীভূত হয়।

খৃঃ পূঃ ২৫৪ অব্দে রাজকুমার মহেন্দ্র ও তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী সঙ্ঘমিত্রা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। সঙ্ঘমিত্রার স্বামী রাজজামাতা অগ্নিবর্ম্মা পত্নীর সহিত বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। মহারাজ অশোকের বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণের পর হইতে, বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। মহারাজ অশোকের যত্নে বৌদ্ধধর্ম্ম রাজকীয় ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতম আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে থাকে। সেই সময় হইতে আট নয় শত বর্ষ পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে একাধিপত্য লাভ করে। দেশে ও বিদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়া, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মগধ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র, সাম্য, মৈত্রী ও অহিংসার প্রশংসাগীতি প্রচারিত হইতে থাকে। হিন্দুধর্ম্মের অনুমোদিত ক্রিয়াকাণ্ড, যাগযজ্ঞ ও পশুবধ রহিত হয়। অশোকের রাজপ্রাসাদে প্রত্যহ বহুতর ব্রাহ্মণ সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্যে ও মাংসাহারে উদর তৃপ্ত করিতেন। বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণের পর, মাংসাহারী ব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তে, নিরামিষাশী ও ফলমূলভোজী বৌদ্ধযতিগণকে সযত্নে প্রত্যহ আহার করাইয়া, মহারাজ পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করিয়া, রাজকীয় মহাধর্ম্মে পরিণত হয়। হিন্দুশাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণপণ্ডিতের পরিবর্ত্তে ভিক্ষুবেশী বৌদ্ধযতিগণ মগধ সম্রাটের পূজনীয় ও আদরণীয় হইয়া উঠেন। বৌদ্ধধর্ম্মের স্থূল মর্ম্ম প্রিয়দর্শী মহারাজ

অশোকের নামে মগধ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে থাকে। সাম্রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে প্রস্তর-স্তম্ভে ও পর্ব্বত-গাত্রে সম্রাটের আদেশলিপি উৎকীর্ণ হইয়া, শোভা পাইতে থাকে। (১)

মহারাজ অশোকের দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্ম রাজকীয় ধর্ম্মে পরিণত হইলে, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ভারতবর্ষে সবিশেষ আধিপত্য লাভ করে। মগধ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র বৌদ্ধধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়। হিন্দুর চিরপূজ্য ব্রাহ্মণজাতি অপেক্ষা বৌদ্ধ শ্রমণ ও যতিগণের সমাদর ও সম্মাননা সর্ব্বত্র বর্দ্ধিত হয়; ইহাতে জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত পতিত হয়। জন্ম ও জাতির প্রভাব তিরো-হিত হইয়া, নীতি ও চরিত্রের সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিনির্বিশেষে সচ্চরিত্র, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও ধর্ম্মভীরু বৌদ্ধযতিগণ সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতে থাকেন। ধর্ম্মজগতের চিরপ্রচলিত নিয়ম-অনুসারে এই সময়ে অনেক ধূর্ত্ত ও ভণ্ড হিন্দু বৌদ্ধযতির বেশধারণপূর্ব্বক সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে থাকে। যতীর বেশ-ধারী এই সকল প্রবঞ্চক ও অধার্ম্মিকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। এই সকল ধূর্ত্ত প্রতারকের আবির্ভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের মহত্ত্বে ও পবিত্র-তায় কলঙ্ককালিমার রেখাপাত হইতে থাকে। বৌদ্ধধর্ম্মের নামে এই সকল ভণ্ড যতিগণ নানাবিধ গর্হিত ও অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে থাকে। অত্যাচার ও উৎপীড়নের সময়ে বিশ্বাসী ও প্রকৃত ধার্ম্মিকের আবির্ভাবে ধর্ম্মের গ্লানি ও মলিনতা দূরীভূত হয়। অত্যাচরিত হইয়া, ধর্ম্ম মহত্ত্ব ও পবিত্রতার দীপ্তিতে সর্ব্বত্র উদ্ভাসিত হয়। উৎপীড়নে প্রকৃত ও বিশ্বাসী

(১) বৌদ্ধ সম্রাট্ প্রিয়দর্শী অশোকের নামাঙ্কিত চতুর্দ্দশটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হই-য়াছে। পশ্চিমে গান্ধার ও সৌরাষ্ট্র হইতে পূর্ব্বে কলিঙ্গ, উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে অপরান্ত (উত্তর কঙ্কণ) ও রাষ্ট্রিক (মহারাষ্ট্র) পর্য্যন্ত অশোকের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। অশোকের আদেশলিপি তাহা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতেছে। জুনাগড়ের সন্নিহিত গির্ণার (জীর্ণ নগর), কটকের সন্নিহিত ধৌলি (ধবলগিরি), আফ্‌গানিস্থানের নিকটবর্ত্তী সাহবাজগিরি, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের অন্তর্গত খলসী, দিল্লী, গাজীপুর ও আলাহাবাদ, মিথিলার অন্তঃপাতী বখরা, লৌরিয়া অররাজ, নবন্দগড়, সরিয়া এবং কেশরিয়া, মগধের অন্তর্গত বরাবর পর্ব্বত, এবং মধ্যভারতের অন্তর্গত রূপনাথ ও সাহসরামে আশোকের শিলালিপি ও প্রস্তরস্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ২৫১ খৃঃ পূঃ অব্দে এই সকল লিপি সর্ব্বপ্রথম ক্ষোদিত হয়। বরাবর পর্ব্বতের একখানি শিলালিপি ২৫৮ খৃঃ পূঃ এবং দ্বিতীয়লিপি ২৪১ খৃঃ পূঃ অব্দে উৎকীর্ণ হয়। গির্ণারের শিলালিপি অশোকের রাজত্বের দ্বাদশতম (২৪৮ খৃঃ পূঃ) এবং অষ্টাবিংশতম (২৩২ খৃঃ পূঃ) ক্ষোদিত হয়।

ধার্ম্মিকের সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়। অত্যাচার ও উৎপীড়ন না থাকিলে, ধর্ম্মে মলিনতা ও অপবিত্রতার ছায়া পতিত হইবার অবকাশ পায় না; ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও প্রবঞ্চকের আবির্ভাব ও ধর্ম্মের উজ্জ্বল প্রভায় কালিমাপাত হইতে পারে না। কিন্তু কোনও ধর্ম্ম পরাক্রান্ত এবং ক্ষমতাশালী নরপতির বিশেষ আশ্রয় ও অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলে, ধার্ম্মিকের বেশধারী, ধর্ম্মদ্বেষী প্রতারকের আবির্ভাবে, তাহার লাঞ্ছনা ও অবমাননা সাধিত হয়। ধর্ম্মজগতের সর্ব্বত্র এই নিয়ম প্রচলিত। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির ইতিহাস এই বিষয়ে স্পষ্টাক্ষরে সাক্ষ্য দিতেছে। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস হইতেও এই তত্ত্ব প্রমাণিত হইতেছে।

ভণ্ড ও ধূর্ত্ত বৌদ্ধভিক্ষুর বেশধারী প্রতারকগণের হস্ত হইতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মহত্ব ও পবিত্রতা অব্যাহত রাখিবার জন্য, ২৪২ খৃঃ পূঃ অব্দে তৃতীয় মহাসঙ্ঘের অধিষ্ঠান হয়। মহারাজ অশোকের রাজত্বের অষ্টাদশতমবর্ষে পাটলীপুত্র নগরে তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্ঘের অধিবেশন হয়। বৌদ্ধাচার্য্য মোগালীপুত্র তিষ্য এই মহাসভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েন। তিনি এই সময়ে ৭২ বৎসর বয়সে পদার্পণ করেন। ষষ্টি সহস্র ভণ্ড বৌদ্ধযতী বৌদ্ধা-চার্য্য তিষ্যের পরামর্শে মহারাজ অশোকের দ্বারা দূরীভূত হয়। অশোকারাম বিহার হইতে এই সকল পীতবেশধারী ভণ্ড যতী শুভ্রবস্ত্রে আবৃত হইয়া রাজা-দেশে নিষ্কাশিত হয়। অবিলম্বে তাহারা পাটলীপুত্রপরিত্যাগে বাধ্য হয়। এই উপলক্ষে পাটলীপুত্র নগরে ষষ্টিলক্ষ বৌদ্ধভিক্ষু সমবেত হয়। তন্মধ্যে এক সহস্র মহাজ্ঞানী ও প্রবীণ বৌদ্ধযতী বৌদ্ধাচার্য্য তিষ্যের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়া তৃতীয় মহাসঙ্ঘের অধিবেশনে বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রের সংস্কারে ও পরিশোধনে নিযুক্ত হন। নয় মাস কাল এই মহাসঙ্ঘের অধিবেশনে বৌদ্ধ 'ত্রিপিটক' সংশোধিত হয়। এই মহাসভায় দেশবিদেশে ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণের কর্ত্তব্যতা স্থিরীকৃত হয়। তদনুসারে বর্ষাকালের অবসানে বৌদ্ধাচার্য্য মহেন্দ্র ধর্ম্মপ্রচা-রের জন্য সিংহল দ্বীপের অভিমুখে জলযান আরোহণ পূর্ব্বক যাত্রা করেন। (১)

(১) মহেন্দ্র স্বীয় ভগিনী সঙ্ঘমিত্রার সহিত সিংহলে যাত্রা করেন। উজ্জয়িনী নগরে অবস্থানকালে যুবরাজ অশোক বৈশ্যনগরে কার্য্যোপলক্ষে গমন করিয়া, এক পরমসুন্দরী শ্রেষ্ঠীকন্যাকে দৈবাৎ দর্শন করেন। অশোক উক্ত বণিকতনয়ার রূপে মুগ্ধ হইয়া, বণিকের নিকট আপন বিবাহের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। বণিক এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, অশোকের হস্তে স্বীয় দুহিতাকে পরম আহ্লাদে সমর্পণ করেন। এই শ্রেষ্ঠীর তনয়া 'দেবী' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই রমণীর গর্ভে অশোকের পুত্র মহেন্দ্র ও তনয়া সঙ্ঘমিত্রার জন্ম হয়।—Journal of A. St. Bengal, vii, 930.

বৌদ্ধাচার্য্য মহেন্দ্রের দ্বারা সিংহল দ্বীপ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। সিংহল রাজ্যের সর্ব্বত্র বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়। সিংহলের রাজধানী অনুরাধপুরে মহাবিহার নির্ম্মিত হইয়া, তাহা বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। ২৩৪ খৃঃ পূঃ অব্দে মহেন্দ্র সিংহলে মহাসমারোহে প্রধান ধর্ম্মাচার্য্যের পদে অভিষিক্ত হন। ১৯৪ খৃঃ পূঃ অব্দে অশীতি বৎসর বয়সে আচার্য্য মহেন্দ্র সিংহল দ্বীপে তনুত্যাগ করেন। তিনি ৪৮ বৎসর কাল সিংহলে অবস্থিতি করিয়া, তথায় বৌদ্ধধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

২২৩ খৃঃ পূঃ অব্দে মগধের সম্রাট অশোক ৩৭ বৎসর রাজত্বের পর কালগ্রাসে পতিত হন। সিংহলের প্রাচীন ইতিহাসে অশোকের পরবর্ত্তী মগধের কোনও নরপতির উল্লেখ দেখা যায় না। অশোকের অধস্তন মৌর্য্য-বংশীয় নরপতিগণের নামমালার জন্য বিবিধ পুরাণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই সকল পুরাণের মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ ও বায়ুপুরাণ অতি প্রাচীন। বিষ্ণু-পুরাণের মতে মৌর্য্যবংশীয় দশ জন নৃপতি ১৩৭ বৎসর মগধে রাজত্ব করেন। বায়ুপুরাণ ও ভাগবত পুরাণে এই রাজত্বকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মৌর্য্যবংশের পূর্ব্বতন নন্দবংশীয় নয় জন রাজা ১০০, শিশুনাগবংশীয় দশ জন ৩৬২, প্রদ্যোত-বংশীয় পাঁচ জন ১৩৮, এবং বার্হদ্রথ-বংশীয় ২৪ জন নরপতি ১০০০ বৎসর রাজত্ব করেন। (১) বিষ্ণুপুরাণের নির্দ্দিষ্ট নামমালা অধিকতর প্রামাণিকবোধে ইতিপূর্ব্বে গৃহীত হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্ত হইতে অশোক পর্য্যন্ত মৌর্য্যবংশীয় তিন জন নরপতি ৩১৬—২২৩ খৃঃ পূঃ অব্দ পর্য্যন্ত ৯৩ বৎসর রাজত্ব করেন; বিষ্ণুপুরাণ মৌর্য্যবংশের রাজত্বকাল ১৩৭ বৎসর নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, অশোকের অধস্তন সাত জন মৌর্য্যনরপতি ৪৫ বর্ষকাল মগধে শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। গড়ে অশোকের বংশধরেরা ৭ বৎসরেরও ন্যূনকাল রাজত্ব করেন। বিষ্ণুপুরাণে মৌর্য্যবংশীয় বিভিন্ন নৃপতি-দিগের রাজত্বকালের পরিমাণ প্রদত্ত হয় নাই।

বায়ুপুরাণের মতে মৌর্য্যবংশীয় নয় জন নরপতি ১৩৭ বৎসর মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। বায়ুপুরাণের মতে চন্দ্রগুপ্ত ২৪, ভদ্রসার ২৫, অশোক ২৬, কুণাল ৮, বন্ধুপালিত ৮, ইন্দ্রপালিত ১০, দেবধর্ম্মা ৭, শতধর ৮, এবং বৃহদ্রথ ৭ বৎসর মগধে রাজত্ব করেন। (২) চন্দ্রগুপ্ত, অশোক ও বৃহ-

(১) বিষ্ণুপুরাণ; চতুর্থ অংশ; ২৩।২৪ অধ্যায়।

(২) "চন্দ্রগুপ্তং নৃপং রাজ্যে কৌটিল্যঃ স্থাপয়িষ্যতি।
চতুর্ব্বিংশৎসমারাজা চন্দ্রগুপ্তো ভবিষ্যতি॥ ৩২৫॥

দ্রথের নাম ভিন্ন বিষ্ণুপুরাণের সহিত বায়ুপুরাণের নামমালার কোনও সাদৃশ্য নাই। বায়ুপুরাণের নির্দ্দিষ্ট বিভিন্ন নৃপতিদিগের রাজত্বকালের সমষ্টি ১২৩ বৎসর মাত্র পাওয়া যাইতেছে। ইহা হইতে বায়ুপুরাণের ভ্রান্তি স্পষ্টাক্ষরে অনুমিত হইতেছে। মৎস্যপুরাণের মতে মৌর্য্যবংশীয় চারি জন রাজা মগধে আবির্ভূত হন।

অশোকের মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধর মৌর্য্যকুলজাত নরপতিগণ ক্রমশঃ হীনবল হইতে থাকেন। অশোকের পর মৌর্য্যবংশ ৪৫ বৎসরকালমাত্র মগধে প্রতিষ্ঠিত থাকে। বিষ্ণুপুরাণের ন্যায় বায়ুপুরাণ ও ভাগবত পুরাণ মৌর্য্য বংশ ১৩৭ বৎসর মগধে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। বৃহদ্রথ মৌর্য্যবংশীয় দশম নরপতি। সেনাপতি পুষ্পমিত্র (পুষ্য মিত্র) আপনার প্রভু বৃহদ্রথকে নিধন করিয়া পাটলীপুত্রের সিংহাসনে আরোহণপূর্ব্বক মগধে সুঙ্গ (মিত্র) বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। (১) খৃঃ পূঃ ১৭৯ অব্দে সুঙ্গবংশের আধিপত্য মগধে সংস্থাপিত হয়, এবং মহারাজ পুষ্পমিত্রের নাম অনুসারে রাজধানী পাটলীপুত্র 'কুসুমপুর' নামে পরিচিত হইতে থাকে।

ভবিতা ভদ্রসারস্তু পঞ্চবিংশৎসমানৃপঃ।
ষড়বিংশৎসমারাজা অশোকো ভবিতা নৃষু॥ ৩২৬॥
তস্য পুত্রঃ কুণালস্তু বর্ষাণ্যষ্টৌ ভবিষ্যতি।
কুণালসূনুরষ্টৌ চ ভোক্তা বৈ বন্ধুপালিতঃ॥ ৩২৭॥
বন্ধুপালিতদায়াদো দশমানীন্দ্রপালিতঃ।
ভবিতা সপ্তবর্ষাণি দেবধর্ম্মা নরাধিপঃ॥ ৩২৮॥
রাজা শতধরশ্চাষ্টৌ তস্য পুত্রো ভবিষ্যতি।
বৃহদশ্চ বর্ষাণি সপ্ত বৈ ভবিতা নৃপঃ॥ ৩২৯॥
ইত্যেতে নব ভূপা যে ভোক্ষ্যন্তি চ বসুন্ধরাং।
সপ্তত্রিংশচ্ছতং পূর্ণং তেভ্যস্তু গৌ ভবিষ্যতি॥ ৩৩০॥
পুষ্পমিত্রস্তু সেনানীরুদ্ধৃত্য বৈ বৃহদ্রথং।
কারয়িষ্যতি বৈ রাজ্যং সমাঃ ষষ্টিং সদৈব তু॥ ৩৩১॥

বায়ুপুরাণ। উত্তর ভাগ। ৩৭ অধ্যায়।

(১) ডাক্তর কারণ সাহেবের মতে ৩২২ খৃঃ পূঃ অব্দে চন্দ্রগুপ্তের দ্বারা মগধে মৌর্য্যবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ সাহেবের এই অনুমানকে প্রামাণিক বলিয়া বোম্বের বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ ডাক্তর রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর গ্রহণ করিয়াছেন। তদনুসারে তিনি ৩২২—১৮৫ খৃঃ পূঃ অব্দ পর্য্যন্ত ১৩৭ বৎসর মৌর্য্যবংশের রাজত্বকাল অবধারণ করিয়াছেন। তাঁহার

মহারাজ অশোকের পৌত্র দশরথের নামাঙ্কিত এক শিলালিপি বরাবর পর্ব্বতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, মহারাজ দশরথ বৌদ্ধ ছিলেন। বৌদ্ধযতীদিগের বিশ্রামার্থ দশরথ রাজত্বের প্রথম বর্ষে পর্ব্বতগাত্রে যে মনোরম প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করান, তাহা 'গোপী গুহা' নামে অদ্যাপি প্রসিদ্ধ। অশোকের রাজত্বের দ্বাদশতম (২৪৮ খৃঃ পূঃ) ও উনবিংশতিতম (২৪২ খৃঃ পূঃ) বর্ষে বৌদ্ধযতীদিগের নিবাসের জন্য তিনটি বৃহত্তর প্রকোষ্ঠ নির্ম্মিত হয়। তাহা এক্ষণে 'কর্ণচৌপর', 'সুদাম' ও 'বিশ্ব' গুহা নামে পরিচিত। পিতামহের পদানুসরণ করিয়া দশরথ নাগার্জ্জুনী পর্ব্বতগাত্রে এই প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করিয়া, অবিনশ্বর কীর্ত্তি ও অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। কানিংহাম সাহেবের মতে, ২১৪ খৃঃ পূঃ অব্দে দশরথের রাজত্ব আরব্ধ হয়। (১) ইহা হইতে আমাদের অনুমিত সময়ের সত্যতা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে। মৌর্য্যবংশীয় মহারাজ দশরথ ও তাঁহার বংশধরগণের ন্যায় সুঙ্গবংশ বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহাদের নামাঙ্কিত বহুতর মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই সকল মুদ্রায় বৌদ্ধসঙ্ঘ, বোধিদ্রুম ও ধর্ম্মচক্রের প্রতিকৃতি দৃষ্টে, মিত্রবংশীয় নরপতিদিগের বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরক্তি-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

মতে ১৮৫—১১৮ খৃঃ পূঃ অব্দ পর্য্যন্ত ৬৭ বৎসর সুঙ্গবংশ ও ১১৮—৭৩ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত কাণ্ব-বংশ ৪৫ বর্ষ কাল মগধে রাজত্ব করেন। ৭৩ খৃঃ পূঃ অব্দ হইতে ২১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২৯১ বৎসর কাল অন্ধ্রভৃত্য বংশ দক্ষিণাপথে রাজত্ব করেন। রমেশ বাবুর মতে সুঙ্গবংশ ১৮৩ খৃঃ পূঃ অব্দে, কাণ্ববংশ ৭১ খৃঃ পূঃ অব্দে ও অন্ধ্রভৃত্য বংশ ২৬ খৃঃ পূঃ অব্দে আধিপত্য লাভ করেন। প্রিন্সেপ সাহেবের মতে ২১ খৃঃ অব্দে এবং উইলফোর্ডের মতে ১৯০ খৃষ্টাব্দে অন্ধ্রভৃত্যবংশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রিন্সেপ ও কালেইল সাহেবের মতে ১৭৮ খৃঃ পূঃ অব্দে সুঙ্গবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

(১) "The two groups of *Barabar* caves are separated by date as well as by position, *Satghara* caves having been excavated in the 12th and 19th year of *Rajah Piyadasi* or *Asoka*, while those of Nagarjune were excavated in the first year of *Dasarath*, the beloved of the *Devas*. According to the Vishnu-Purana, *Dasarath* was the grandson of *Asoka* and the son of *Suyasas*. As the son of *Asoka*, according to the Vayu-Purana, reigned only 8 years, the accession of *Dasarath* must have taken place in 214 B.C."—A. Cunningham's "Archa-eological Survey Reports, for 1861-62, p. xlviii-xlix in J.A.S.B. for 1863.

বিষ্ণুপুরাণের মতে সুঙ্গ (মিত্র) বংশের আধিপত্য ১১২ বৎসর এবং কাণ্বংশের অধিকার ৪৫ বর্ষ প্রতিষ্ঠিত থাকে। বায়ুপুরাণে উভয় রাজবংশের অবস্থিতিকাল সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণের সহিত কোনও অনৈক্য দৃষ্ট হয় না। উভয়বংশীয় নরপতিদিগের নামমালা সম্বন্ধে বিষ্ণু ও বায়ুপুরাণের বিশেষ কোনও বিভিন্নতা লক্ষিত হয় না। সুঙ্গবংশে ১০ জন ও কাণ্বংশে ৪ জন নৃপতি আবির্ভূত হন। ক্ষত্রিয়জাতীয় সুঙ্গবংশ যেমন সেনাপতির পদ হইতে রাজপদে অধিষ্ঠিত হন, সেইরূপ ব্রাহ্মণজাতীয় কাণ্বংশ মন্ত্রিত্বপদ হইতে রাজত্ব লাভ করেন। ব্রাহ্মণজাতীয় মন্ত্রী বালাজী বিশ্বনাথ খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যেরূপ মহারাষ্ট্রপতি শিবাজীর পৌত্রের হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক শাসনদণ্ড আচ্ছিন্ন করিয়া সেতারারাজের নামে স্বয়ং রাজত্ব করিতে থাকেন, সেইরূপ সুঙ্গবংশের দশম নরপতির হস্ত হইতে মন্ত্রী বাসুদেব স্বহস্তে রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করেন। বাসুদেব কাণ্বংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বংশ চারি পুরুষ পর্য্যন্ত প্রবল পরাক্রমের সহিত শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। সুঙ্গবংশীয় শেষ রাজা দেবভূতিকে রাজ্যশাসনে সম্পূর্ণ অক্ষম ও অপারগ দেখিয়া, বাসুদেব স্বহস্তে যাবতীয় ক্ষমতা গ্রহণপূর্ব্বক রাজত্ব করিতে থাকেন। সুঙ্গবংশ হীনপ্রভ অবস্থায় কালযাপন করিতে বাধ্য হন। ডাক্তর ভাণ্ডারকর পুরাণের উল্লিখিত সুঙ্গবংশীয় দশ জন নরপতির রাজত্বকাল ৬৭ বৎসর, এবং কাণ্বংশীয় চারি জন ভূপতির শাসনসময় ৪৫ বর্ষ বলিয়া অনুমান করেন। (১) তাঁহার

(১) The *Kanvas* are poinedly spoken of as *Sunga-Vhrtys* or servants of the *Sungas*. It therefore appears likely that when the princes of *Sunga* family became weak, the *Kanvas* usurped the whole power and ruled like the *Peshwas* in modern times, not uprooting the dynasty of their master, but reducing them to the character of nominal sovereigns; and this supposition is strengthend by the fact that like the Peshwas they were *Brahmans* and not *Kshatriyas*. Thus then, these dynasties reigned contemporaneously, and henee the 112 years, that tradition assigns to the *Sungas*, include the 45 assigned to the *Kanvas*. The *Snngas* and *Kanvas* therefore were uprooted and the families of the *Andhra-Vhrityas* came to power in B.C. 73."—Dr. R. G. Bhandarkar's "Early History of Deccan," (Bombay, 1884) p. 24.

অনুমানের কোনও বিশিষ্ট কারণ প্রদর্শিত হয় নাই। তাঁহার অনুমান একান্ত অমূলক বলিয়া প্রতীত হইতেছে। নিম্নে "বায়ুপুরাণ" (২) হইতে শুঙ্গ (মিত্র) ও কাণ্বংশের পৌরাণিক বিবরণ উদ্ধৃত হইতেছে। অতঃপর আমাদের মন্তব্য প্রদান করিব।

"পুষ্পমিত্রন্তু সেনানীরুদ্ধৃত্য বৈ বৃহদ্রথং।
কারয়িষ্যতি বৈ রাজ্যং সমাঃ ষষ্টিং সদৈব তু ॥ ৩৩১ ॥
পুষ্পমিত্রসুতশ্চাষ্টৌ ভবিষ্যতি সমা নৃপঃ।
ভবিতা চাপি সুজ্যেষ্ঠঃ সপ্তবর্ষাণি বৈ ততঃ ॥ ৩৩২ ॥
বসুমিত্রঃ সুতো ভাব্যো দশবর্ষাণি পার্থিবঃ।
ততোহর্দ্রক সমা হেতু ভবিষ্যতি সুতশ্চ বৈ ॥ ৩৩৩ ॥
ভবিষ্যতি সমাস্তস্মাত্তিস্র এব পুলিন্দকঃ।
রাজা ঘোষবসুশ্চাপি বর্ষাণি ভবিতা ত্রয়ঃ ॥ ৩৩৪ ॥
ততো বৈ বজ্রমিত্রস্তু সমারাজা ততঃ পুনঃ।
দ্বাত্রিংশদ্ ভবিতা চাপি সমাভাগবতো নৃপঃ ॥ ৩৩৫ ॥
ভবিষ্যতি সুতস্তস্য দেবভূতিঃ সমাদশ।
দশৈতে শুঙ্গরাজানো ভোক্ষ্যন্তীমাং বসুন্ধরাং ॥
শতং পূর্ণং দশ দ্বে চ তেভ্যঃ কিংবা গমিষ্যতি ॥ ৩৩৬ ॥
নিপাত্য দেবভূতিং তু বাল্যাদ্ ব্যসনিনং নৃপং।
বসুদেবস্ততোহমাত্যঃ শুঙ্গেষু ভবিতা নৃপঃ।
ভবিষ্যতি সমারাজা নব কাণ্বায়নস্তু সঃ ॥ ৩৩৭ ॥
ভূমিমিত্রঃ সুতস্তস্য চতুর্ব্বিংশদ্ ভবিষ্যতি।
ভবিতা দ্বাদশ সমাস্তস্মান্নারায়ণো নৃপঃ ॥ ৩৩৮ ॥
সুশর্ম্মা তৎসুতশ্চাপি ভবিষ্যতি সমাদশ।
চত্বারঃ শুঙ্গভৃত্যাস্তে নৃপাঃ কাণ্বায়না দ্বিজাঃ ॥
ভাব্যা প্রণতসামন্তাশ্চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ ॥ ৩৩৯ ॥
তেষাং পর্য্যায়কালে তু নৃপোহন্ধ্রো হি ভবিষ্যতি ॥ ২৪০ ॥
কাণ্বায়নমথোদ্ধৃত্য সুশর্ম্মাণং প্রসহ্য তং।
শুঙ্গানামপি যচ্ছিষ্টং ক্ষয়য়িত্বা বলং ততঃ।
সিন্ধুকোহন্ধ্রজাতীয়ঃ প্রাপ্যতীমাং বসুন্ধরাং ॥ ৩৪২ ॥
ইত্যেতে বৈ নৃপা ত্রিংশদন্ধ্রা ভোক্ষ্যন্তি যে মহীং।
সমাঃ শতানি চত্বারি পঞ্চবড় বৈ তথৈব চ ॥ ৩৫১ ॥

বায়ুপুরাণের মতে কাণ্বংশের পর অন্ধ্রভৃত্যবংশ আধিপত্য লাভ করে। কাণ্বংশীয় রাজা সুশর্ম্মাকে পরাজিত করিয়া সিন্ধুক অন্ধ্রভৃত্যবংশের অধিকার সংস্থাপিত করে। শুঙ্গবংশের ক্ষয়াবশিষ্ট শক্তি সিন্ধুকের পদানত হয়। অন্ধ্রভৃত্যবংশীয় সিন্ধুকের বংশধর ৩০ জন নরপতি ৪৫৬ বৎসর কাল

---

(২) কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর অর্থব্যয়ে ও ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদকতায় প্রকাশিত বায়ুপুরাণ অতি ভ্রমপূর্ণ দেখিয়া তাহা স্থানে স্থানে সংশোধিত হইল।

রাজত্ব করেন। বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণের মত অনুসারে অন্ধ্রভৃত্যবংশীয় ৩০ জন নৃপতি ৪৫৬ বর্ষ রাজ্যশাসন করেন। মৎস্যপুরাণের মতে ২৯ জন ভূপতি ৪৬০ বৎসর রাজত্ব করেন। অন্ধ্রভৃত্যবংশের সহিত মগধের ইতিহাসের বিশেষ সম্পর্ক নাই।

পুষ্পমিত্রের পুত্র অগ্নিমিত্র মহাকবি কালিদাসের রচিত "মালবিকাগ্নিমিত্র" নামক ঐতিহাসিক নাটকের নায়ক। অগ্নিমিত্রের নামাঙ্কিত এক মুদ্রা ১৮৫২ খৃঃ কানিংহাম সাহেবের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়। "মালবিকাগ্নিমিত্র" নাটক হইতে নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া যায়। অগ্নিমিত্র বিদিশা নগরে অবস্থিতি করিতেন। বিদিশা এক্ষণে ভিল্সা নামে পরিচিত। বেত্রবতীর তীরে অবস্থিত এই বিদিশা দশার্ণ রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই নগর হইতে অগ্নিমিত্র পিতার প্রতিনিধিরূপে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত শাসন করিতেন। এই সময়ে যজ্ঞসেন নামে নরপতি বিদর্ভ দেশে রাজত্ব করিতেন। প্রাচীন বিদর্ভ এক্ষণে বেরার নামে পরিচিত। যজ্ঞসেনের পিতৃব্যের পুত্রের নাম মাধবসেন। মালবিকা নামে মাধবসেনের এক রূপবতী কনিষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। অগ্নিমিত্রের শৌর্য্যবীর্য্য ও গুণানুবাদশ্রবণে মালবিকা তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরাগিনী হইয়া উঠেন। মাধবসেন স্বীয় ভগিনী মালবিকার সহিত বিদিশা অভিমুখে যাত্রা করেন। বিদর্ভের সীমান্তদেশে যজ্ঞসেনের সেনাপতি দ্বারা মাধবসেন ধৃত ও কারারুদ্ধ হন। ইহাতে মালবিকা সহচরী সুমতির সহিত ছদ্মবেশে বিদিশার অভিমুখে পলায়ন করেন। অগ্নিমিত্র বিদর্ভরাজের নিকট মাধবসেনের কারামুক্তি প্রার্থনা করেন। মৌর্য্যবংশীয় শেষ নরপতি বৃহদ্রথের মন্ত্রী বিদর্ভরাজ যজ্ঞসেনের শ্যালক ছিলেন। বৃহদ্রথের নিধনের পর পুষ্পমিত্র মন্ত্রীকে কারারুদ্ধ করিয়া পাটলীপুত্রের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। মৌর্য্যরাজমন্ত্রীর কারামুক্তির পর মাধবসেনকে মুক্তি দিতে যজ্ঞসেন প্রতিশ্রুত হন। অগ্নিমিত্র এই প্রস্তাবে একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, বিদর্ভে এক দল সেনা প্রেরণ করেন। বিদর্ভরাজ যজ্ঞসেন যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, অগ্নিমিত্রের প্রস্তাব অনুসারে, পিতৃব্যপুত্র মাধবসেনকে বিদর্ভের অর্দ্ধাংশের আধিপত্য প্রদান করিতে বাধ্য হন। বরদা নদী, বিভক্ত রাজ্যদ্বয়ের সীমারূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। "মালবিকাগ্নিমিত্রে" এই ঐতিহাসিক ঘটনা বিবৃত হইয়াছে।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

তীর্থযাত্রীর সঙ্গে।

একবার মহরমের ছুটিতে বহরমপুরে গিয়াছিলাম। আমার প্রকৃতি ভ্রমণ-পরায়ণ নয়, সুতরাং অনেক দিন পরে হঠাৎ কয়েক দিনের মত আমার আড্ডা-ত্যাগের প্রস্তাবে হিতৈষী বন্ধুবর্গ শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের আশঙ্কা দূর করিবার অভিপ্রায়ে আমি একটু কূট নীতির অবতারণা করিলাম; অর্থাৎ হিন্দুবন্ধুবর্গকে বলিলাম, "ভাই হে, পাপের বোঝাটা মাথার উপর বড় ভারি হইয়াছে, এই যোগ উপলক্ষে গঙ্গায় একটা ডুব দিয়া খানিক হাল্কা করিয়া আসি।"—ইতিমধ্যে এক জন মুসলমান বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আদাব, হঠাৎ এখন মুর্শিদাবাদ যাবার মরজি হ'লো কেন?" স্মিতমুখে প্রত্যভিবাদন জানাইয়া উত্তর করিলাম, "মুসলমান নবাবদের আসল ভিটেটাতে যদি মহরমের কাণ্ড কারখানা না দেখ্‌লাম ত দেখ্‌লাম কি?" হিন্দু বান্ধব এবং খাঁ সাহেব, উভয়েই আমার শুভ-যাত্রা (bon-voyage) কামনা করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে প্রস্থান করিলেন।

১৮ই জুন বেলা তিনটের সময় আফিসের কাজে অর্দ্ধ পথেই যবনিকা ফেলিয়া বাসায় রওনা হইলাম। আমার জনৈক উকীল বন্ধুও কিছু দূর পর্য্যন্ত আমার ষ্টীমারের সহযাত্রী হইবেন, এইরূপ কথা ছিল; তিনি বেলা ছটো পর্য্যন্ত তাগাদা দিয়াও আমাকে সঙ্গে লইতে না পারিয়া অগত্যা একাকীই বাসায় আসিয়াছেন। প্রায় চারটের সময় আসিয়া দেখিলাম, তিনি একটা বিছানায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছেন। দেখিয়া "সকল পথ তাড়াতাড়ি, নদীর ধারে গড়াগড়ি" এই প্রাচীন প্রবাদটা মনে পড়িয়া গেল। তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "ষ্টীমার এখনো আসে নাই; আমি ভাবিয়াছিলাম, দামুকদিয়া ঘাট হইতে ষ্টীমার আসিয়া যাত্রী ও মাল নামাইয়া দিয়া পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে।"

ভরসা পাইয়া আমি আমার জিনিষপত্র গুছাইতে লাগিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে পদ্মার খাড়ীতে কিয়ৎক্ষণ নৌবাহন করা গেল, কিন্তু ষ্টীমারের দেখা নাই। গঙ্গাস্নান উপলক্ষে শত শত যাত্রী নৌকায় চলিয়াছে; এক একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় পঞ্চাশ ষাট জন যাত্রী, ততোধিক পুঁটুলি পোঁটলা। কোনও বন্ধু পরামর্শ দিলেন, অধিক সময় নষ্ট না করিয়া নৌকায় যাত্রা করাই

কর্ত্তব্য। কিন্তু এরূপ নৌ-যাত্রা বিড়ম্বনামাত্র; গঙ্গাস্নানের পুণ্যফলের ওজনে এই কষ্টটুকুর ভার অনেক বেশী! অগত্যা ষ্টীমারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

রাত্রি নয়টার সময় ষ্টীমার আসিল। কিন্তু ষ্টীমার বোঝাই যাত্রী; সে ষ্টীমারে বোয়ালিয়া হইতে একটি যাত্রীও লইল না; অবশ্য এক জনেরও তাহাতে স্থান ছিল না। সে রাত্রে আরও দু'খানি অতিরিক্ত ষ্টীমার যাত্রী লইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু পুণ্যপ্রয়াসী যাত্রিগণের আমদানীতে রাত্রিকালে আর ষ্টীমারে উঠিবার সুবিধা করিতে পারিলাম না; বিশেষতঃ রাত্রি দশটা হইতে ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। পর দিন অতি প্রত্যূষে একখানি ক্ষুদ্র ষ্টীমার যাত্রী লইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ঘাটে দাঁড়াইল; আমরা অবিলম্বে তাহাতে উঠিয়া একখানি ক্ষুদ্র বেঞ্চি দখল করিয়া বসিলাম।

পাঁচটার সময় ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। পদ্মার সুবৃহৎ চড়া ঘুরিয়া ক্ষুদ্র ষ্টীমারখানি যখন নদীর প্রশান্ত বক্ষে গিয়া পড়িল, তখন ষ্টীমারের যাত্রিগণ মহাহর্ষে হুলুধ্বনি ও হরিবোলের রোল তুলিল। সুন্দর প্রভাত! রাত্রে প্রচুর বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, সেই বর্ষণে সমস্ত প্রকৃতি স্নাত হইয়া শ্যাম স্নিগ্ধ বিমল বেশ ধারণ করিয়াছে। তাহার পর পূর্ব্বাকাশে তরুণ সূর্য্য হাসিতে হাসিতে যখন তাহার লাল আলো নদীর জলে, আকাশের খণ্ডবিখণ্ড ভাসমান অভ্রশুভ্র মেঘে, দূরবর্ত্তী শ্যামল প্রান্তরে ও উচ্চ তরুশিরে উজ্জ্বল প্রাভাতিক শ্রী প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিল, এমন কি, নদীচরের বালুকারাশি পর্য্যন্ত কনকচূর্ণের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল, তখন মনে হইল, এমন সুন্দর দৃশ্য সচরাচর দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। তাহার উপর এই যে এত গুলি তীর্থযাত্রী নদীর উন্মুক্ত হৃদয়ে ভাসমান হইয়া আপনাদিগের অকৃত্রিমভক্তিপূর্ণ হৃদয়োচ্ছ্বাস উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিতেছে, ইহাও অতি মধুর। এই সুন্দর দৃশ্যের মধ্যে আপনার ক্ষুদ্র জীবনের সুখ দুঃখ সম্প্রসারিত করিয়া আমরা ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

ষ্টীমারের উপর যাত্রীদের কলরবের আর বিরাম নাই। তাহারা এক একটা বোঁচকা পাশে লইয়া বসিয়া গিয়াছে, আর নিজ নিজ সুখ দুঃখের গল্প করিতেছে। তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক,—কাহারও নাকে নথ, কানে পাশা, দাঁতে মিশি, ওষ্ঠে উল্কি। যে কয়েক জন পুরুষ যাত্রী ছিল, তাহারা কেহ এদিকে ওদিকে দাঁড়াইয়া তামাক টানিতেছে, কেহ ঘটীতে দড়ি বাঁধিয়া

জল তুলিতেছে, কেহ একটা তুচ্ছ কথা লইয়া খালাসীর সঙ্গে তুমুল ঝগড়া বাধাইয়া দিয়াছে।

ষ্টীমারের আগে পাছে অসংখ্য নৌকা পাল উড়াইয়া চলিয়াছে; এক-খানি নৌকা হইতে হরিবোল শব্দ উঠিলেই, নিকটবর্ত্তী অন্যান্য নৌকা হইতেও অনুরূপ শব্দ উঠিতেছে; ইলিশমারা জেলেডিঙ্গিতে বসিয়া জাল টানিতে টানিতে জেলেরা অবাক হইয়া এই সকল নৌকার দিকে চাহিয়া আছে।

বেলা প্রায় আটটার সময় আমরা মরিচার দেয়াড়ে নামিলাম। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, ষ্টীমার ছাড়িবার পূর্ব্বে আমরা অনেকে টিকিট পাই নাই; এক জন কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "যে টিকিট আমদানি হইয়াছিল, তাহা সমস্ত ফুরাইয়া গিয়াছে, আপনারা নামিবার সময় টিকিটের দাম দিলেই চলিবে।" আমরা নামিবার সময় তাহাই করিলাম। ষ্টেশনমাষ্টার টিকিটগুলি সংগ্রহ করিতে করিতে টিকিটের মূল্যস্বরূপ যাহা নগদ পাইলেন, তাহা গরদের কোটের পকেটে ফেলিতে লাগিলেন; জানি না, তাহা ষ্টীমারের স্বত্বাধিকারী ইণ্ডিয়ান জেনেরাল ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পা-নীর ভোগে লাগিবে কি না।

রাজসাহী হইতে বহরমপুরে যাইবার এই পথ। নামিয়া দেখিলাম, মরি-চার দেয়াড়ে অসংখ্য যাত্রী সম্মিলিত হইয়াছে। এখানে কয়েকখানি ময়রার দোকান আছে, সেই সকল দোকানে কতকগুলি যাত্রী বসিয়া কেহ বিশ্রাম করিতেছে, কেহ শুমো চিঁড়ে ও গুড়ে মুড়কি কিনিয়া জল দিয়া ভিজাইয়া ফলার করিতেছে। নদীর ধারে ভিজে মাটীতে কতকগুলি স্ত্রীলোক পা মেলিয়া বসিয়া গিয়াছে; তাহাদের সঙ্গে দড়ী-বাঁধা এক একটা ঘটী, এবং প্রত্যেকের গাঁটরির সঙ্গে তৈলপূর্ণ এক একটা শিশি, কচিৎ কাহারও কাছে মুখ-সরু মৃণ্ময় 'তাড়ি'; কেহ তেল মাখিতেছে, কেহ গল্প করিতেছে, কেহ কেহ বা যাত্রার উদ্যোগ করিতেছে। দেখিলাম, একটি যুবতী তাহার শিশু সন্তান লইয়া বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। শিশুটির বয়স দুই মাসের অধিক নহে, রৌদ্র বাতাসে খোলা মাঠের মধ্যে পড়িয়া ছেলেটির সুন্দর মুখখানিতে নীল পড়িয়া গিয়াছে, এতটুকু শিশুর কি এত অনিয়ম সহ্য হয়? মায়ের পরিধানবস্ত্র ভিন্ন তাহার গায়ে দ্বিতীয় আচ্ছাদন নাই। হয় ত তাহার মাতা জল ঝড় মাথায় করিয়া তাহার স্নেহের ধনটুকুকে বস্ত্রাঞ্চলে বুকের মধ্যে ঢাকিয়া পদব্রজেই যাত্রা করিবে। হায় অন্ধ নিষ্ঠা! নির্ব্বোধ জননী বুঝিতে

পারিতেছে না যে, তাহার এই গঙ্গাস্নানজনিত পুণ্যটুকুর মূল্য তাহার বক্ষঃপঞ্জর অপেক্ষা অধিক আদরণীয় এই ক্ষুদ্র শিশুর জীবনের অপেক্ষাও অধিক ; কে বলিবে, এই ক্ষুদ্র শিশুর ক্ষীণ প্রাণের পরিবর্ত্তে তাহা ক্রীত হইবে কি না ?

মরিচার দেয়াড়ে গো-শকটের অভাব নাই। অনেক গাড়ী যাত্রী লইয়া বালুচরে চলিয়া গেলেও, দেখিলাম, তখনও বিশ পঁচিশখানি গাড়ী নদীতীরে ভাড়ার অপেক্ষা করিতেছে। আজ গাড়োয়ানেরা দু'পয়সা পাইবার প্রত্যাশায় গাড়ীর ভাড়া বাড়াইয়া দিয়াছে। অন্য সময় বারো চৌদ্দ আনা হইলেই বালুচর যাইবার গাড়ী পাওয়া যায় ; আজ সুবিধা বুঝিয়া তাহারা দ্বিগুণ ত্রিগুণ ভাড়া হাঁকিতেছে। তিন চারি জন লোক পথশ্রম হইতে অব্যাহতি পাইবার লোভে একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহারই মধ্যে বহু কষ্টে গাদাগাদি হইয়া বসিয়াছে। দেড় টাকায় একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া আমিও সেই যাত্রিপ্রবাহের অনুগমন করিলাম। দুই পাশে যাত্রী চলিতেছে ; আমার আগে পাছে পাঁচ ছয়খানি গাড়ী চলিতে লাগিল। যাত্রীরা কেহ মাথায়, কেহ কাঁকে পুঁটুলী লইয়া চলিয়াছে ; হাতে গঙ্গাজলসংগ্রহের জন্য ঘটি ঝুলিতেছে, পুঁটুলীর সঙ্গে তেলের শিশি দুলিতেছে,—সেকালে আধ পয়সা দামের তেলের ভাড়িতেই যাত্রীদের তেল লওয়া চলিত, এখন তৎপরিবর্ত্তে শিশির চলন হইয়াছে। সকল বিষয়েই এই রকম ; সেকালে ছয় পয়সা দামের তালপাতার ছাতি হইলেই চাষার বর্ষা কাটিয়া যাইত, কিন্তু একালে আট পয়সার মজুরের হাতেও পাঁচ শিকার কঞ্চির দামাটওয়ালা স্প্রীংয়ের ছাতি ; পানাইয়ের পরিবর্ত্তে চাষারাও কে. এম্., দাসের চটি পায়ে দিতে আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া, সেকাল অপেক্ষা একালে সাধারণের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে ভাবিয়া দেশের শাসনকর্ত্তৃগণ প্রচুর আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

কোনও কোনও পুরুষ যাত্রীর কাঁধে লাঠি, তাহার দুই দিকে ভার ঝোলান, চাউল ডাউল হইতে আরম্ভ করিয়া এ কয় দিনের ব্যবহার্য্য সকল জিনিষই তাহাদের কাঁধে চলিতেছে। পথের এক স্থানে একটি বাবাজীকে দেখিলাম ; তাঁহার পরিধানে কৌপীনের উপর বহির্ব্বাস, মস্তকে নামাবলী জড়ানো, গলায় মোটা তুলসীর কাঠের মালা, হাতে হরিনামের ঝোলা, ললাটে দীর্ঘ তিলক, সর্ব্বাঙ্গে রাধাকৃষ্ণের পদাঙ্কলেখা। বাবাজী প্রায় বিশ জন স্ত্রীযাত্রীর পথপ্রদর্শক হইয়া চলিয়াছেন, তিনি আগে আগে যাইতেছেন, আর স্ত্রীলোকেরা

গড্ডলিকাপ্রবাহের ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিতেছে, দৈবাৎ কেহ যূথভ্রষ্ট হইয়া পড়িলে বাবাজী তাহাদিগকে গুছাইয়া লইতেছেন।

আমার সঙ্গের গাড়ীগুলির অধিকাংশই স্ত্রীযাত্রী বোঝাই, দৈবাৎ তাহার মধ্যে এক আধজন পুরুষ অভিভাবক; গাড়ীর মধ্যে যাত্রীদের অতি কষ্টে বসিয়া যাইতে হইতেছে। উঁচু নীচু পথ দিয়া গাড়ী হটর হটর করিয়া চলিতেছে, আর আরোহীরা গাড়ীর ভিতর বসিয়া ছৈয়ের বাতা ধরিয়া দুলিতেছে। আমার গাড়ীর পশ্চাৎভাগ খোলা। দেখিলাম, আমার পশ্চাতের গাড়ীতে দুই তিনটি যুবতী অতি সঙ্কুচিত হইয়া বসিয়া আছেন; বোধ হইল, আমার দৃষ্টিপথে পড়াতেই তাঁহাদের এরূপ সঙ্কোচ। আমার গাড়ী খানিক আগে চালান হইল; আমার পশ্চাতে আর একখানি গাড়ী পড়িল, তাহাতে এক জন বৃদ্ধ ও একটি যুবতী বসিয়াছিল; দেখিলাম, তাহারা দু'জনে অসঙ্কোচে হাস্যালাপে রত, চারি দিকের লোকের প্রতি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই দেখিয়া আমার মনে হইল, বুঝি বৃদ্ধটি এই যুবতীর পিতামহ, মাতামহ, অথবা সেইরূপ-সম্পর্ক-বিশিষ্ট আর কেহ; আদরিণী নাতিনীকে গঙ্গাস্নান করাইতে লইয়া যাইতেছে। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলাম, পথপ্রান্তবর্ত্তী একটি অল্পবয়স্কা বৈষ্ণবী (তিলক ও রসকলি দৃষ্টে ইহাকে কোনও বাবাজীর সেবাদাসী বলিয়া অনুমান হইল—) একটা বাঁধা হুকাতে তামাক খাইয়া হুকাটি আনিয়া উক্ত যুবতীর হস্তে অর্পণ করিল, সেও অসঙ্কোচে তাহাতে দম দিয়া তামাকটুকু নিঃশেষ করিয়া গজভুক্ত কপিত্থবৎ হুকাটি পরিত্যাগ করিল, তাহার পর যেরূপ প্রগল্‌ভতার সহিত বৃদ্ধের সহিত আলাপ করিতে লাগিল, তাহাতে সহজেই অনুমান হইল যে, এই যুবতীর সঙ্গে বৃদ্ধের সম্বন্ধ হয় ত অন্যরূপ।

কিছু দূরে আসিয়া গাড়োয়ান গাড়ী ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেল। খানিক পরে বলদ দুটির জন্য এক বোঝা কাঁচা ঘাস আনিয়া গাড়ীতে বিছানার নীচে পাতিয়া পুনর্ব্বার গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

আমরা পদ্মাতীরবর্ত্তী পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলাম; এই পথটি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গিয়াছে। আমাদের দক্ষিণ পার্শ্বে পদ্মার চড়া, নদী অনেক দূর সরিয়া গিয়াছে। পদ্মার চড়ায় বন-ঝাউ ও বড় বড় খড় জন্মিয়াছে, প্রাভাতিক বায়ুতে সেগুলি হিল্লোলিত হইতেছে; রাখালেরা গরু ছাড়িয়া দিয়া নির্ভাবনায় খেলা করিতেছে, মধ্যে একটা খোলা বায়গায় আসিয়া মাথার 'মাথাল'

ছাড়িয়া দিতেছে, আর প্রবল বাতাসে 'মাপাল'গুলি উড়িয়া গড়াইতে গড়াইতে নিকটস্থ খাড়ির মধ্যে গিয়া পড়িতেছে।

বেলা এগারটার সময় আমরা 'পাতিবোনা' আসিয়া আড্ডা ফেলিলাম। বহরমপুরের পথে 'পাতিবোনা' একটি সমৃদ্ধ গণ্ডগ্রাম। সেদিন এই গ্রামে কোনও উৎসব ছিল কি না, জানি না; কিন্তু দেখিলাম, পথের ধারে একটি বৃহৎ বটগাছের নীচে হাট বসিয়াচে, সেখানে লোকে লোকারণ্য, বোধ হয়, আজ যাত্রীদিগের উপস্থিতিতেই এখানে এরূপ সমারোহ। যাত্রীরা পুঁটুলীগুলি পাশে ফেলিয়া বসিয়া গিয়াছে। কোনও রমণী কোনও বর্ষীয়সীর মুক্তকেশে বিলি দিয়া উকুন তুলিতেছে; কোনও যুবতী নিকটবর্ত্তী দিঘী হইতে কলসীতে করিয়া জল আনিতেছে,—পরিধানে গুলবাহার শাড়ী, প্রকোষ্ঠে কালো বেলোয়ারি চুড়ি, নাকে নথ। হাটের মধ্যে ছোট ছোট চালা, যাত্রীরা সেই সকল চালায় ও গাছের ছায়ায় বসিয়া ভাত রাঁধিতেছে, অনেকে কদলীপত্রে স্তূপাকার লোহিতবর্ণ কদন্ন ঢালিয়া পরিবেশনের যোগাড় করিতেছে; নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা কালোজাম, আম, কাঁটাল, বিক্রয় করিতেছে; কেহ তাহা কিনিয়া খাইতেছে, কেহ কতকগুলি লইয়া পুঁটুলির মধ্যে পুরিতেছে।

বাজারের মধ্যে অনেকক্ষণ ঘুরিয়া দেখিলাম। বিলক্ষণ ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল, এবং উদরকে বঞ্চিত করিবারও অভিপ্রায় ছিল না। দেখিলাম, বাজারে চারি পাঁচখানি ছোট ময়রার দোকান, এই সকল দোকানে চিঁড়া, মুড়ী, মুড়কী ও সাধারণ রকমের সন্দেশ বিক্রয় হইতেছে। একটি দোকানে গিয়া বসিলাম। ময়রা মহাশয় ভরসা দিলেন যে, তাঁহার দোকানে অতি উৎকৃষ্ট সন্দেশ প্রস্তুত আছে, কিন্তু কার্য্যকালে অতি জঘন্য তেলেভাজা কালো জিলাপী ও গুড়ের রসে সিক্ত দুর্গন্ধময় ছানাবড়া ভিন্ন আর কিছু মিলিল না; অগত্যা তদ্দ্বারা দগ্ধোদর কথঞ্চিৎ পূর্ণ করিয়া গাড়ীতে চড়া গেল।

গাড়ী আবার চলিতে লাগিল। আকাশে মেঘ হইয়াছিল, অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল। আমার গাড়ীর ছৈ ভাল ছিল বলিয়া বৃষ্টিধারা হইতে শরীররক্ষা হইল বটে, কিন্তু বিছানার কিনারা ভিজিতে লাগিল; অগত্যা বিছানাটি গুটাইয়া বসিলাম।

আমরা তখন একখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র পল্লীর ভিতর দিয়া চলিতেছিলাম, গ্রামমধ্যবর্ত্তী মেটে রাস্তা দিয়া চলিতেছিলাম; রাস্তাটি বেশ প্রশস্ত। রাস্তার পূর্ব্বধারে ক্ষুদ্র গ্রামখানি, পশ্চিম ধারে মাঠ, নীলের জমী, দূরে দূরে

ছোট ছোট বাবলা গাছ, গ্রামের কুটীরগুলি বিক্ষিপ্ত, কৃষকের কুটীরের পাশে বেড়া দিয়া ঘেরা, জমীর মধ্যে পাট, ভুট্টা বা গেমা জন্মিয়াছে, পথের দিকে মাটীর 'আল' উচু করিয়া দেওয়া, গোশৃঙ্গাঘাতে 'আইল'গুলি ক্ষতবিক্ষত। ঘরের পাশে কলাবাগান, জাক্রির মধ্যে ছোট ছোট আম কাঁঠালের চারা; লাউ ও শশার গাছ লতাইয়া চালের উপর উঠিয়াছে; নিকটে কচুবনের কাছে সবুজ ঘাসের জমীতে কতকগুলা সাদা ও কালো রঙ্গের ছাগল চরিতেছিল, দুটি কালো ছাগশিশু, গলায় ঘুঙুর বাঁধা, এক বার মাথা নীচু করিয়া নবোদ্ভিন্ন কচি কচি ঘাসের ডগা কাটিয়া খাইতেছে, লাফাইয়া খেলা করিতেছে, দৌড়িয়া গিয়া মায়ের বাঁটে চু মারিতেছে, এমন সময় কৃষকদের তিন চারি বৎসরের একটি ছেলে নগ্নদেহে ছুটিয়া আসিয়া একটি ছাগবৎসের সমুখের পদদ্বয় ধরিয়া বুকের উপর টানিয়া তুলিল; ছাগী উর্দ্ধ দোলাইতে দোলাইতে দূরে পালাইল; তাহার পর ছাগশিশু বালকের বক্ষে বন্দী হইয়া যখন 'ব্যা ব্যা' করিয়া ডাকিতে লাগিল, তখন সে দূর হইতে মুখ ফিরাইয়া করুণনেত্রে তাহার শিশুর দিকে চাহিয়া রহিল।—সেই অবোলা জীবের চক্ষে সন্তানের বিপদাশঙ্কায় যে একটা সকরুণ উদ্বেগ ফুটিতে দেখিয়াছিলাম, তাহা বুঝি বিশ্বজগতে চিরপ্রাচীন মাতৃহৃদয়ের অপরিবর্ত্তনীয় সুধাময় অক্ষয় সম্পত্তি; সৃষ্টির প্রথম প্রভাত হইতে তাহা মূক ধরণীর বক্ষঃস্থ প্রত্যেক জীবের চক্ষে মৃত্যুঞ্জয়ী সুধারূপে সঞ্চিত হইয়াছিল, এবং চির দিন তাহা হিংসা, ক্রূরতা, উৎপীড়ন ও অত্যাচার, বিষ ও ছুরিকার কুটিল আবর্ত্তের মধ্যে অমর মহিমায় বিরাজ করিবে; ক্ষুদ্র পুষ্পের মধ্যে অনন্ত বিশ্বসৌন্দর্য্যের আভাস কল্পনা করিয়া কবির চক্ষে জল আসিয়াছিল; ছাগীর চক্ষে মাতৃস্নেহের গভীর উদ্বেগ লক্ষ্য করিয়া আমার মনেও ভারি একটা দার্শনিক তত্ত্বের উদয় হইতেছিল, এমন সময় কোথা হইতে এক জন গৃহস্থের একটা সাদা বকনা বাছুর গোঁজ উপড়াইয়া লেজ উর্দ্ধে তুলিয়া দড়িসমেত আমার গাড়ীর সম্মুখে ছুটিয়া আসিয়া আমার চিন্তাস্রোত বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল।

বেশ মিষ্ট বাতাস বহিতেছিল। আমি গাড়ীর মধ্যে শুইয়া পড়িলাম, এবং শীঘ্রই নিদ্রাকর্ষণ হইল। হঠাৎ যখন ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তখন দেখিলাম, আমাদের গাড়ী ভৈরব নদের গর্ভে প্রবেশ করিতেছে। নদীর পাড় হইতে নদীগর্ভ খুব ঢালু; বর্ষা আসন্নপ্রায়, কিন্তু এখনও সেখানে জল নাই, শুভ্র বালুকারাশিতে চারি দিকে ঢাকা, মধ্যে মধ্যে স্বচ্ছ জল; সেই অপরিসর জলে

বড় বড় মহাজনী নৌকা বাঁধা রহিয়াছে, নৌকার উপরের খড়ের ছাউনী জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, মাঝি মাল্লারা নৌকা ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে; শুনিলাম, ভৈরবগর্ভে এরূপ অসংখ্য নৌকা স্থানে স্থানে আটকাইয়া গিয়াছে; বর্ষাকালে পদ্মার জল বর্দ্ধিত হইয়া এই নদীতে বন্যা আসিলে মাঝি মাল্লারা স্ব স্ব নৌকায় প্রত্যাগমনপূর্ব্বক নৌকাগুলিকে অভীষ্ট স্থানে লইয়া যাইবে।

এই ভৈরব আমাদেরই বাসগ্রামের প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। সেখানে ইহার বিস্তার ইহা অপেক্ষাও সঙ্কীর্ণ, কিন্তু বারো মাসই সেখানে অল্পপরিমাণে জল থাকে; সে কত দূরে! আজ আমার সেই আজন্মের মধুর-স্মৃতিবিজড়িত চিরপরিচিত ভৈরবের উৎপত্তিস্থলে সমাগত হইয়া তাহার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না। ভৈরব অতি প্রাচীন নদ, এক সময়ে তাহার আকার, তাহার ভীষণ তরঙ্গভঙ্গ ও সঙ্কট-সঙ্কুল গভীর আবর্ত্ত তাহার নামের উপযুক্ত ছিল; কিন্তু একালে শুধু এই নামটি ও অতিবিস্তীর্ণ শুষ্ক বালির চড়া তাহার অতীত গৌরবের নির্ব্বাক্ সাক্ষিরূপে পড়িয়া আছে।

ভৈরবের বুকের উপর ওয়াটসন কোম্পানীর নীলের ক্ষেত। নীল গাছগুলি বেশ সতেজ, এবং বড় হইয়াছে; ক্ষেতের মধ্য দিয়া গাড়ী যাইবার পথ। সেই পথে গাড়ী চলিতে লাগিল, প্রবল বাতাসে বালি উড়িয়া বিছানা ঢাকিয়া ফেলিল, বালুকাকণা চোখে মুখে প্রবেশপূর্ব্বক একেবারে অস্থির করিয়া তুলিল, কিন্তু নিরুপায়। অল্প দূর না যাইতেই মাথার মধ্যে এত বালি জমিয়া গেল যে, মাথাটাকে নদীর চড়া, আর কালো চুলগুলাকে নীল গাছ বলিয়া ভ্রম হইবার কোনও কারণ রহিল না।

নীলের ক্ষেত প্রায় ছাড়াইয়াছি, এমন সময় ওয়াটসন কোম্পানীর যমদূতের মত চারি জন মুসলমান 'তাকাতগিরি' (নীলরক্ষক) আমাদের গাড়ীগুলি আটক করিল। শুনিলাম, নীলের ক্ষেতের মধ্য দিয়া গাড়ী লইয়া যাওয়া তাহাদের মনিব কোম্পানীর অভিপ্রায়বিরুদ্ধ, কিন্তু সরকারী পথ দিয়া গাড়ী লইয়া যাওয়ার আপত্তি কিরূপ মূল্যবান হইতে পারে, তাহা বুঝিলাম না; বোধ হয়, গাড়োয়ানদের কাছে দুই চারি পয়সা আদায় করিবার অভিপ্রায়েই তাহারা এরূপ করিতেছিল, কিন্তু গাড়োয়ানেরা দলে পুরু ছিল, তাহারা রণে ভঙ্গ দিল না, তাকাতগিরিদের সঙ্গে তাহাদের তুমুল বচসা আরম্ভ হইল, অনন্তর জোর করিয়া গাড়ী লইয়া চলিল; তাকাত-

গিরিরা ব্যর্থমনোরথ হইয়া নিষ্ফল আক্রোশে গাড়োয়ানদিগকে ভয় দেখাইতে লাগিল।

বেলা প্রায় দুইটার সময় আমরা একটা প্রকাণ্ড দীঘীর ধারে আসিয়া পড়িলাম। দীঘীর চারি দিকে উচু পাড়ে অশ্বত্থ ও বটের গাছ, দুই একটি আম কাঁঠাল গাছে এখনও আম কাঁঠাল ঝুলিতেছে; বটগাছের নীচে একখান ছোট মুদীর দোকান, বৃক্ষতলে অসংখ্য যাত্রী বিশ্রাম করিতেছে। আমার সঙ্গে ষ্টিমারে যে সকল যাত্রী আসিয়াছিল, তাহাদিগের অনেককেই এখানে উপবিষ্ট দেখিলাম। গাড়োয়ানেরা বলদগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া তামাক খাইতে লাগিল। আমি গাড়ীর মধ্যে বসিয়া চারি দিকে চাহিয়া দেখিতেছি,—গাড়ীর মধ্যে বিছানার উপর একখানি নূতন সংস্করণের 'ইন্দিরা' পড়িয়াছিল; 'ইন্দিরা'র শ্বশুরবাড়ীযাত্রার কথা তখনও মনে জাগিতেছিল; এই স্থানে আসিয়া কালা-দীঘীর সেই ডাকাইতির কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। দীঘীর পাড় তেমনি উচু, তেমনি ঘনবিন্যস্ত বট পাকুড়ের সারি, এবং তেমনি একখান ছোট দোকান, কেবল দীঘীতে তেমন কালো গভীর জল নাই, আর নাই তীরে সালঙ্কারা, সযৌবনা, তাম্বূলরাগরঞ্জিতাধরা, রূপাভিমানিনী, পতিসন্দর্শনাভি-লাষিণী সেই ইন্দিরা সুন্দরী, বেহারা দারোয়ান সমন্বিত রূপা-বাঁধানো হাঙ্গর-মুখো-দাণ্ডাবিশিষ্ট পাল্কী এবং মোটা মোটা সোণার দানা গলায়, তসর-পরিহিতা নূতন বড়মানুষের বাড়ীর সেই ঝি;—তৎপরিবর্ত্তে শত শত যাত্রী বৃক্ষমূলে বসিয়া কলরব করিতেছে। আজ এখানে যতই জনসমাগম হউক, স্থানটি যেরূপ নিভৃত এবং পথ যেমন দুর্গম, তাহাতে কে বলিতে পারে, এখানে এক দিন ডাকাতেরা পথিকের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাহাদিগকে মারিয়া এই দীঘীতে প্রোথিত করিয়া রাখে নাই?

কত ঘাট, কত তরুতল, বাঁশ-বন অতিক্রম করিয়া আমাদের গাড়ী চলিতে লাগিল। অবশেষে আমরা একটি ক্ষুদ্র নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই নদীতে অধিক জল নাই, এবং পার হইবার জন্য নদীবক্ষে কোনও নৌকাও নাই; কতকগুলি বাঁশের উপর মাটি ফেলিয়া নদীর উপর জমীদারেরা একটা সামান্য সাঁকো নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। সাঁকো পার হইবামাত্র জমীদারের সিপাহী আমাদের কাছে পারাণীর পয়সা চাহিল। শুনি-লাম, সাঁকো প্রস্তুতের ব্যয় বাবদ ইহারা প্রত্যেক পথিকের নিকট এক পয়সা এবং প্রত্যেক গাড়ীর জন্য চারি পয়সা হিসাবে মাশুল আদায় করে; পূর্ব্বাপর

নাকি এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। বর্ষাকালে নদীতে জল বাড়িলে পারের নৌকা রাখা হয় ; কিন্তু পয়সা দিবার ভয়ে যে সকল যাত্রী সাঁকো দিয়া নদী পার না হইয়া জল কাদা ভাঙ্গিয়া নদীগর্ভস্থ অন্য অপ্রশস্ত স্থান দিয়া পারে যাইতেছে, তাহাদের নিকট হইতেও কেন পয়সা আদায় করা হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ইহা যথেচ্ছাচার ভিন্ন আর কিছুই নহে ; এইরূপ গণ্ডগ্রামেই জমীদারের এরূপ অত্যাচার শোভা পায়, কিন্তু তাহা নিবারণ করিবার কোনও উপায় নাই।

নদী পার হইয়া দুই পাশের ধানের জমীর উপর দিয়া আমরা যাইতে লাগিলাম। এই সকল জমী বর্ষাকালে জলে ডুবিয়া যায় কি না জিজ্ঞাসা করায়, গাড়োয়ানের নিকট জানিতে পারিলাম, সহজে এ সকল জমী ডুবিবার কোনও সম্ভাবনা নাই, তবে যে বৎসর বর্ষার প্রকোপে ললিতাকুঁড়ীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়, সে বৎসর এ সকল জমী রক্ষা পায় না ; এমন কি, যে স্থান দিয়া আমাদের গাড়ী চলিতেছিল, সেখানে বড় বড় নৌকা চলে ; তবে ললিতা-কুঁড়ীর বাঁধ ভাঙ্গিলে মুর্শিদাবাদ নহে, ভাগীরথীর জলে নদীয়ার যশোহরের এমন কি, চব্বিশপরগণার কিয়দংশও জলমগ্ন হইয়া বহু লক্ষ বিঘা জমীর ধান একেবারে নষ্ট হইতে পারে বলিয়া, বর্ষাকালে কর্ত্তৃপক্ষগণ অতি সতর্ক-তার সহিত এই বাঁধ রক্ষা করেন। তথাপি কোনও কোনও বৎসর ইহা ভাঙ্গিয়া যায়।

তখন প্রায় অপরাহ্ণ হইয়াছিল। গাড়োয়ানেরা একবার দক্ষিণে একবার বামে হেলিয়া গরু খেদাইতে খেদাইতে ও তাহাদের লেজ মলিতে মলিতে মেঠো গান গাহিতেছিল ; চাষারা গামছা পরিয়া মাথায় মাথাল আঁটিয়া ধানের ক্ষেতে ঘাস নিড়াইতেছিল ; তাহাদের ছেলে মেয়েরা গামছায় ভাত তরকারী বাঁধিয়া তাহাদের জন্য লইয়া যাইতেছিল ; এবং দুই একটি রাখাল যমকে বাহনচ্যুত করিয়া তাহাদের লাঙলা মহিষের পিঠে চড়িয়া এ মাঠ হইতে ও মাঠ যাইতেছিল।

আমরা চলিতে চলিতে এমন একটা যায়গায় আসিয়া পড়িলাম, যাহার এক দিকে ধানের জমী, অন্য দিকে নীলের ক্ষেত, মধ্যে ভয়ানক পঙ্কিল পথ। আমাদের গাড়ী সেই মহাপঙ্কে নিমজ্জিত হইল, পাঁকের ভিতর হইতে আর কিছুতেই চাকা উঠে না। গাড়োয়ান নির্দ্দয়রূপে বলদ দুটোকে ঠেঙ্গাইতে লাগিল, কিন্তু তাহারা গতিশক্তিহীন। গাড়ীর জোয়াল কাঁধে লইয়া সিং নীচু

করিয়া অক্ষমভাবে দাঁড়াইয়া রহিল;—ভাবখানা এই যে, "তোমরা যত ঠেঙাও, এ পাঁক হইতে গাড়ী তোলা আমাদের কর্ম্ম নয়।" আমার কিন্তু তখন মনে হইতে লাগিল,—

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।"

কত আনন্দে উৎসাহে বুক বাঁধিয়া কয়েক দিনের জন্য বহরমপুরে বেড়াইতে যাইতেছি, ও হরি, শেষে বুঝি এক গলা পাঁকে নামিয়া গাড়ী ঠেলিতে হয়! ব্যতিব্যস্ত হইয়া বিপদ্‌ভঞ্জন মধুসূদনের নাম স্মরণ করিতে লাগিলাম। ভাগ্যে আমাকে আর গাড়ী হইতে নামিতে হইল না, সঙ্গের গাড়োয়ানেরা আসিয়া গাড়ীর চাকার কাছে কাঁধ বাধাইয়া পাঁক হইতে গাড়ীর চাকা টানিয়া তুলিল; সঙ্গে সঙ্গে বলদের পিঠে আর দু পাঁচটা পাঁচনের বাড়ি পড়িবামাত্র গরুগুলা গাড়ী টানিয়া শুষ্ক পথের উপর উঠিয়া পড়িল, আমার বুক হইতেও পাষাণভার নামিয়া গেল।

পথের দুই দিকে আম্রকানন। পথের ধারে বড় বড় বাবলা গাছের সারি। হঠাৎ দেখিলাম, ছেলে কোলে লইয়া, দীর্ঘ লেজ পথের উপর প্রসারিত করিয়া দিয়া, পাঁচ সাতটা হনুমান পথ আলো করিয়া বসিয়াছে। দেখিয়া, গাড়োয়ানদের বড় আমোদ বোধ হইল, তাহারা তাড়া করিবামাত্র হনুমানগুলা লাফাইয়া বাবলা গাছে গিয়া উঠিল; কিন্তু গাড়োয়ানেরাও ছাড়িবার পাত্র নহে, ঢিল ছুড়িয়া তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কেহ কেহ দীর্ঘ লম্ফে অদূরবর্ত্তী আম্রশাখায় আশ্রয় লইল, এবং 'হুপ হাপ' শব্দে কাননভূমি ধ্বনিত করিতে লাগিল। কোনও কোনও দুষ্ট বানর গাড়োয়ানদের লোষ্ট্র নিক্ষেপে উত্যক্ত হইয়া গাছের আড়াল হইতে তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে দাঁত বাহির করিয়া বিকট মুখভঙ্গী করিতে লাগিল;—দেখিয়া, যাত্রীদের মধ্যে হাসির ধূম পড়িয়া গেল! এই সকল যাত্রীর মধ্যে যাহারা ইতিপূর্ব্বে বৃন্দাবনে তীর্থপর্য্যটনে গিয়াছিল, তাহারা বৃন্দাবনে মর্কটদিগের অত্যাচার ও বুদ্ধির গল্পে সহযাত্রীদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিতে লাগিল।

বেলা প্রায় পাঁচটার সময় আমরা একটি ইষ্টকরচিত পথে আসিয়া পড়িলাম। এই পথ ভগবানগোলা হইতে বালুচর পর্য্যন্ত গিয়াছে। পথটি অতি সুন্দর, পরিষ্কার, লোহিতবর্ণ। শুনিলাম, বালুচর এখান হইতে দেড় ক্রোশের অধিক নহে। এখান হইতেই কিন্তু নগরের আভাস পাওয়া গেল। মধ্যে মধ্যে সুদৃশ্য

বাংলো, ছোট ছোট কলমের আমবাগান, শাক সবজীর সুন্দর ক্ষেত। বেলা সাড়ে ছয়টার সময় প্রায় এগারো ক্রোশ পথ অতিক্রমপূর্ব্বক এবং সমস্ত দিন গরুর গাড়ীর মধ্যে পড়িয়া সর্ব্বাঙ্গ বেদনাপ্লুত করিয়া বালুচরের পারঘাটার সম্মুখে আসিয়া নামিলাম।

গাড়োয়ান তৎক্ষণাৎ আমার জিনিষপত্র নামাইয়া দিয়া বিদায় হইয়া গেল। আমি কিন্তু কি উপায়ে এখন খাগড়া যাই, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম; এখান হইতে খাগড়া প্রায় সাত ক্রোশ। আকাশে ভয়ানক মেঘ, অবিলম্বেই ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা। আগামী কল্য সকালে দশহরা গঙ্গাস্নানের যোগ। চারি দিক হইতে অসংখ্য যাত্রী আসিয়া এ দিকে ও দিকে ঘুরিতেছে, আড্ডা খুঁজিতেছে, সঙ্গীদের ডাকাডাকি করিতেছে, কোন সঙ্গীর অনুসন্ধান না পাইয়া তাহার উদ্দেশে গালিবর্ষণ করিতে করিতে, পুঁটুলী কাঁকালে লইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া তিন চারি জন যাত্রী মুখোমুখি হইয়া ঝগড়া করিতেছে। কিন্তু এই জনস্রোতের মধ্যে আমি একখানিও পরিচিত মুখ দেখিতে পাইলাম না। পথের ধারে পানের দোকানে পান বিক্রয় হইতেছে, সন্দেশের দোকান সুন্দররূপে সাজাইয়া দোকানী প্রচুর বিক্রয়ের সুখস্বপ্নে মগ্ন। আমি শুধু একাকী এই জনপূর্ণ যাত্রিকোলাহলমগ্ন ভাগিরথীতীরে বসিয়া ভাবিতেছি, করি কি? একবার আমাদের সেই হাস্যকল্লোলমুখরিত বন্ধুবান্ধবপরিবেষ্টিত রাজসাহীর বাসার কথা মনে পড়িতেছে, একবার আমার সেই বহুদূরের বৃক্ষলতামধ্যবর্ত্তী স্নেহময় আত্মীয়স্বজনপূর্ণ ক্ষুদ্র গৃহের ক্ষুদ্র সুখ ও সন্তোষের কথা, ঐ মেঘাবৃত আকাশের বিদ্যুৎছটার ন্যায় অতীত স্মৃতির সুখালোকময় চাঞ্চল্য উৎপাদন করিতেছে। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। এদিকে সমস্ত দিন প্রায় অনাহার; আকাশের অবস্থা অত্যন্ত সংশয়াপন্ন। আমি খাগড়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। শুনিলাম, এখন ষ্টীমার লালবাগ পর্য্যন্ত যাইতে পারে, তাহার ওদিকে যায় না। ডাক-গাড়ী সকালে আটটার সময় বালুচর ছাড়ে, এখন তাহাও পাইবার উপায় নাই। গরুর গাড়ীতে রওনা হইলে সমস্ত রাত্রি লাগিবে, আবার রাত্রেও অনাহার। সমস্ত রাত্রি 'হটর হটর হট্'! একখানি হাড়ও তাহা হইলে বাড়ী ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পারিব না। এখানে দুই একখানি ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য। অগত্যা নৌকার সন্ধানে লোক পাঠাইলাম। বুঝিলাম, এমন দুর্দ্দিনে এই ঝড় বৃষ্টি মাথায় করিয়া ছয় সাত ক্রোশ পথ নৌকাপথে যাওয়া

বিড়ম্বনা, তবে এক ভরসা, গঙ্গায় বেশী জল নাই! আর যাহাই হউক, ডুবিয়া মরিব না।

নৌকার সন্ধানে লোক পাঠাইয়া নদীতীরে বসিয়া থাকিলাম। অপর পারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর আফিস, রেলের গাড়ী, গুদাম ঘর, দেখা যাইতেছে। রেলের ঘাটে এখনও ছোট ছোট ষ্টীমার বাঁধা আছে, দক্ষিণে অদূরে জৈন ও মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদিগের প্রকাণ্ড অট্টালিকা; নদীবক্ষে জেলে ডিঙ্গীর সংখ্যাও অল্প নহে; কিন্তু বালুচরের পারে ডিঙ্গী একেবারেই নাই, সকলগুলিই আজিমগঞ্জের পারে বাঁধা আছে।

আমি নদীতীরে বসিয়া বসিয়া বহুদেশ হইতে আগত যাত্রিগণের কাণ্ড দেখিতে লাগিলাম। এরূপ দৃশ্য আর কখনও দেখি নাই।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে স্ত্রী পুরুষ বহুসংখ্যক যাত্রী ধীরে ধীরে নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং জলের ধারে বোঁচকা ও পুঁটুলীগুলি নামাইয়া রাখিয়া হরিধ্বনিপূর্ব্বক সারি দিয়া বসিয়া মৃত্তিকায় মস্তক স্পর্শ করিল, তাহার পর সর্ব্বাঙ্গ মাটিতে লুটাইয়া নদীতীরে গড়াগড়ি দিতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গ ধূলিধূসরিত হইলে তাহারা উঠিয়া বসিয়া প্রেমগদ্গদভাবে মস্তক, ওষ্ঠ এবং কণ্ঠে গঙ্গামৃত্তিকা স্পর্শ করিল। দেখিলাম, কত অন্ধ, কত খঞ্জ, কত অস্থিচর্ম্মসার চিররোগী, যষ্টিহস্তে বহুকষ্টে অনেক দুর হইতে জননী জাহ্নবীর পবিত্র উৎসঙ্গে আপনাদের তাপদগ্ধ জীবনের দীর্ঘসঞ্চিত পাপতাপ এবং অবসাদ ধৌত করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। জানি না, তাহাদের কামনা পূর্ণ হইবে কি না। তাহাদের আশা, তাহাদের উৎসাহ, তাহাদের অমার্জ্জিত হৃদয়ের এই অসীম অন্ধ বিশ্বাসের পরিণাম যাহাই হউক, আমি কিন্তু বিশ্বাসহীন, নিরাশ, শুষ্ক হৃদয় লইয়া, বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে এই দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। একটি বৃদ্ধা উদরী রোগে বড় কষ্ট পাইতেছিল, সে বহুকষ্টে পবিত্র গঙ্গামৃত্তিকায় উদর ন্যস্ত করিয়া স্থিরভাবে শুইয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিল; তাহার মুখে শান্তি এবং প্রসন্নতার ভাব ফুটিয়া উঠিল দেখিয়া বোধ হইল, তাহার অর্দ্ধেক যন্ত্রণা দূর হইয়াছে।

অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সন্ধ্যার অন্ধকার এবং বাতাসের বেগ বাড়িয়া উঠিল। আমি অগত্যা পারঘাটার মাশুল আদায়ের ঘরে আশ্রয় লইলাম। যাঁহাকে নৌকার সন্ধানে আজিমগঞ্জের পারে পাঠাইয়াছিলাম, তিনি ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, এই ঝড় বৃষ্টি মাথায়

করিয়া কোনও মাঝিই নৌকা ছাড়িতে প্রস্তুত নহে, বিশেষতঃ বিপরীত বায়ুতে নৌকা চালানও কঠিন। আমি উপায়ান্তর না দেখিয়া ঘোড়গাড়ীর সন্ধানে বাহির হইলাম; এবং অনেক ভাড়া দিয়া একখানি গাড়ী স্থির করিয়া সন্ধ্যার পর থাগড়া রওনা হইলাম।

বালুচরের আঁকা বাঁকা পথ ঘুরিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। প্রায় দুই ঘণ্টা ক্রমাগত চলিয়া চকের নিকট আসিয়া গাড়ী থামিল। গাড়োয়ান ঘোড়াকে 'দানাপানি' খাইতে দিল। তখন রাত্রি প্রায় দশটা। আমি গাড়ী হইতে নামিয়া এদিক ওদিক ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। মহরম আরম্ভ হইয়াছে; তাই এই প্রাচীন মুসলমান রাজধানীতে উৎসবের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল। দোকানগুলি সুসজ্জিত, চারি দিকে উজ্জ্বল আলোকমালা, নানা জিনিসের অনেক দোকান। হঠাৎ গম্ভীরস্বরে ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল; কিন্তু এই ব্যাণ্ডের সুর কানে নূতন ঠেকিতে লাগিল। মহরম মুসলমানগণের বিষাদোৎসব, তাই এই ব্যাণ্ডের সুরে একটা আকুল বেদনা, একটা নিরাশা-প্লুত বিষাদের রেখা অঙ্কিত ছিল; বোধ হইতেছিল, কে যেন কোন মহাপুরুষের বিস্মৃতপ্রায় অতীত-সমাধির উপর বসিয়া গভীর শোকে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে, এবং অশ্রুধারায় জগতের বক্ষ হইতে কোমল সহানুভূতি এবং বেদনা বহন করিয়া সেই কণ্টকময় সমাধি সিক্ত করিতেছে।

অনেকক্ষণ পরে ব্যাণ্ড থামিয়া গেল। আমার গাড়ী আবার চলিতে আরম্ভ করিল। এবার আমরা নগরের বক্ষ ভেদ করিয়া চলিতে লাগিলাম। দুই দিকে প্রকাণ্ড অট্টালিকাশ্রেণী বঙ্গের প্রচীন রাজধানীর অতীত গৌরবের পরিচয় প্রদান করিতেছে। কত গির্জ্জাঘর, কত মসজিদ, মুসলমানদের সেকেলে ধরণের জীর্ণবাড়ী,—মহরম উপলক্ষে সেগুলি নূতন চূণকাম করা হইয়াছে,—মুসলমানদের খোলা উপসনালয়ে লাল, নীল, সবুজ ফানুসে আলো জ্বলিতেছে, উন্মুক্ত বাবুর্চিখানা হইতে পলাণ্ডুখচিত মোগলাইখানার সুগন্ধ উঠিতেছে, দ্বারপ্রান্তে মুসলমান বালক ও যুবকেরা দাঁড়াইয়া কলরব করিতেছে। কোন কোন দোকানে মহরমের তাজিয়া, সুরঞ্জিত সোলার বাগান প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে। পথে অধিক লোক নাই, দূরে দূরে দুই একটি আলো, আকাশ মেঘপূর্ণ, তাহারই মধ্যে রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া দুই চারি জন মুসলমান যুবক গল্প করিতেছে, তুচ্ছ কথায় উচ্চ হাসিতেছে; তাহারা উৎসবের পরিচ্ছেদে সজ্জিত।—পায়ে জরির জুতা, পরিধানে ঢিলা পায়জামার

উপর সূক্ষ্মকারুকার্য্যখচিত আচকান, তাহার উপর জাফ্‌রান বা বেগুনি রঙ্গের ফতুয়া, মাথায় চূড়াদার টুপী। দুই এক জন শুভ্র-দাড়ী-গোঁফ-মণ্ডিত, শুভ্র পরিচ্ছদে আবৃতদেহ, সৌম্যমূর্ত্তি, বৃদ্ধ মুসলমান ইতস্ততঃ পদচারণ করিতেছে; দেখিয়া বোধ হয়, যেন তাহারা আরব্য-উপন্যাস-বর্ণিত সেকালের দরবেশ বা মৌলবী। সুবেশিনী মুসলমান রমণীগণ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া গোলাপবাসিত পীত কিম্বা ভায়োলেট রঙ্গের ক্রেপের ওড়নায় ক্ষীণ তনু আবৃত করিয়া বর্ত্তিকাহস্তে অভীপ্সিত স্থানে গমন করিতেছে; তাহাদের করতল মেদী-রঞ্জিত, তাহাদের পদপ্রান্তের ভূষণশিঞ্জন ধরণীর মূক বক্ষে সুখস্বপ্নের ন্যায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। এই সুবৃহৎ, ভগ্নপ্রায়, সমৃদ্ধিশালীন, প্রাচীন নগরের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে আমার বোধ হইতে লাগিল, যেন আমি এই অর্দ্ধরাত্রে রহস্যপরিবৃত, কুহকস্বপ্নমগ্ন, আলোকান্ধকারময় প্রাচীন মুসলমান রাজধানী বোগ্দাদের রাজপথ বহিয়া চলিতেছি; এ যেন সত্য নহে, স্বপ্ন; এখনি যেন আরব্য উপন্যাসের কি একটি অলৌকিক দৃশ্য আমার নয়নসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইবে।

রাত্রি ১১টার সময় খাগড়ায় উপস্থিত হইলাম। যাঁহার গৃহে আমার আতিথ্যগ্রহণের কথা ছিল, দেখিলাম, তাঁহার সদর দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অনেক ডাকাডাকির পর এক জন লোক আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। দেখিলাম, বহিঃপ্রাঙ্গণে বহুসংখ্যক লোক। বুঝিলাম, গঙ্গাস্নানের যাত্রীরা আসিয়া এখানে আশ্রয় লইয়াছে। অন্ধকারময় সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া আলোকপ্লাবিত দ্বিতলের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, প্রায় সকলেই নিদ্রামগ্ন; আমার মধুরহৃদয়, স্নেহময়ী Hostess নিদ্রোত্থিত হইয়া অনুযোগ পূর্ব্বক কহিলেন যে, আমার সকালে পঁহুছিবার কথা ছিল, এবং তদনুসারে তিনি আহারাদির আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমার আসা হইল না মনে করিয়া, তিনি রাত্রির জন্য আর কোনও আয়োজন করেন নাই; সুতরাং রন্ধনশালায় যে কিছু অন্নব্যঞ্জন উদ্বৃত্ত আছে, তদ্দ্বারাই আমাকে জঠরানল নির্ব্বাপিত করিতে হইবে। আমি অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইলাম। কিন্তু আসন গ্রহণ করিয়া দেখিলাম, তিনি আমাকে পরিহাস করিয়াছেন। আমার জন্য সে রাত্রে যে খাদ্যসামগ্রী রক্ষিত হইয়াছিল, তাহা তিন জন ঔদরিকের পরিপূর্ণ খোরাক!

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

রত্নাবলীর রচয়িতা শ্রীহর্ষ।

"রত্নাবলী" নাটিকা সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারের একটি অমূল্য রত্ন। ইহার রচয়িতার দেশ, কাল ও চরিত্র জানিবার জন্য পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু লোকমাত্রেরই স্বভাবতঃ নিতান্ত কৌতূহল হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইতিহাসহীন প্রাচীন ভারতে রত্নাবলী-কারের দেশ, কাল ও চরিত্রের তত্ত্ব অপেক্ষা, বোধ হয়, অন্য কোনও কবির ঐতিহাসিক তত্ত্ব অধিক জটিল ও সন্দিগ্ধ নহে। বিষয়টি জটিল ও সন্দিগ্ধ বলিয়াই, এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ও ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতমণ্ডলী যে পরিমাণে চিন্তা ও গবেষণা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অন্য কোনও কবির সম্বন্ধে প্রায় সেরূপ দৃষ্ট হয় না।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রথমতঃ পণ্ডিতপ্রবর উইলসন্ সাহেব তাঁহার "হিন্দুজাতির দৃশ্যকাব্য" নামক সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকে এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তৎপরে পণ্ডিতপ্রবর হল্ সাহেব, স্বপ্রকাশিত "বাসবদত্তা"র উপক্রমণিকায়, উইল্‌সন্ সাহেবের মত পরিত্যাগ করিয়া, নিজে একটি অভিনব মত স্থাপন করেন। তৎপরে স্বপ্রকাশিত "কাব্যপ্রকাশের" বিজ্ঞাপনে, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রসঙ্গতঃ এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন; তিনি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদ্বয়ের উভয়ের মতই খণ্ডন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় পর-মত-খণ্ডন ব্যতীত এ সম্বন্ধে নিজে কোনও মত স্থাপন করেন নাই। ডাক্তার শ্রীযুক্ত রামদাস সেন মহাশয় এ সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি রত্নাবলীর রচয়িতা সম্বন্ধে উইল্‌সন্ সাহেবের সিদ্ধান্তেরই অনুসরণ করিয়াছেন; কিন্তু উইল্‌সন্ সাহেব রত্নাবলীর রচনাকাল যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিলে, একটি অসামঞ্জস্য ঘটে,—ইহা দেখিয়া, তিনি কোনও প্রমাণ-প্রয়োগ না করিয়াই, রত্নাবলীর রচনাকাল সম্বন্ধে উইল্‌সনের মতটি ভ্রান্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ফলতঃ, রত্নাবলীর ঐতিহাসিক তত্ত্বের সমালোচনা-বিষয়ে, আমাদিগের স্বদেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত ন্যায়রত্ন মহাশয়ই সমধিক চিন্তা ও তার্কিকতা শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সমালোচনায় উইল্‌সনের মতখণ্ডনবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে ন্যায়রত্ন মহাশয়েরই মতানুসরণ করিয়াছেন; তবে তিনি ন্যায়রত্ন মহা-

শয়ের ন্যায় কেবল পরমতখণ্ডন করিয়াই ক্ষান্ত না হইয়া, রত্নাবলী-কার সম্বন্ধে নিজেও একটি মত প্রকাশ করিয়াছেন। রাজকৃষ্ণ বাবুর মতের সহিত হল্ সাহেবের মতের অনেকাংশে সৌসাদৃশ্য আছে; তবে রাজকৃষ্ণ বাবু এ সম্বন্ধে নিজে একটি সুন্দর ও সুকৌশলময় যুক্তি দেখাইয়াছেন।

রত্নাবলীর ঐতিহাসিক তত্ত্ব সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ও স্বদেশীয় পণ্ডিতগণের অনেকেই এইরূপ অনেক চিন্তাপূর্ণ সমালোচনা করিয়া থাকিলেও, বিষয়টি যে আশানুরূপ বিশদ ও নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছে, এরূপ বলা যায় না। পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত ও যুক্তিগুলির আলোচনা করিলেই ইহা প্রতীত হইবে।

সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডার সমুদ্রবিশেষ; যত্ন ও গবেষণা দ্বারা ইহা হইতে যে কত অমূল্য রত্ন সমুদ্ধৃত হইতে পারে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। পূর্ব্বোক্ত সমালোচনা সকল প্রকাশিত হইবার পরে, রাজসাহায্যে পণ্ডিত-প্রবর ডাক্তার পিটর্সন্ ও বুলার প্রভৃতি মহোদয়গণ কর্ত্তৃক কাশ্মীরাদি দেশ-স্থিত প্রাচীন পুস্তকাগার হইতে যে সকল দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন সংস্কৃত হস্তলিখিত পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা হইতে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক নূতন তত্ত্বই আবিষ্কৃত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত সমালোচনাগুলির পরে রত্নাবলীর ঐতিহাসিক তত্ত্ব সম্বন্ধে অপর কোনও মৌলিক সমালোচনা প্রকাশিত হয় নাই। বোধ হয়, সেইরূপ সমালোচনার উপযুক্ত উপকরণও বর্ত্তমান ছিল না; কিন্তু এখন এই নবাবিষ্কৃত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকলের সাহায্যে, রত্নাবলী সম্বন্ধে নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে কয়েকটি তত্ত্ব আমরা অবগত হইতে পারি, তদ্দ্বারা রত্নাবলীর ভূতপূর্ব্ব সমালোচনার অনেকাংশেরই অভ্রান্তরূপে খণ্ডন ও কোনও কোনও বিষয় অভ্রান্তযুক্তিপ্রদর্শনে নিঃসন্দিগ্ধ-রূপে প্রমাণিত করা যাইতে পারে। আমরা এই উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধটি লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমরা প্রথমতঃ রত্নাবলী সম্বন্ধে ভূতপূর্ব্ব পাশ্চাত্য ও স্বদেশীয় সমালোচকগণের মতের সমালোচনা করিয়া, পরে আমাদিগের নিজ মত ব্যক্ত করিব।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করিলে, দুই জন সুপ্রসিদ্ধ রাজা শ্রীহর্ষের বিষয় অবগত হওয়া যায়। ইঁহাদের প্রথম কান্যকুব্জাধিপতি রাজা হর্ষবর্দ্ধন বা শ্রীহর্ষ। ইনি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা চীনদেশীয় বিখ্যাত পরিব্রাজক হুয়েন্থসঙের ভ্রমণবৃত্তান্তপাঠে জানা যায়। দ্বিতীয় কাশ্মীররাজ শ্রীহর্ষ; ইনি অধ্যাপক উইল্‌সন্ সাহেবের মতে ১১১৩

খৃষ্টাব্দ হইতে ১১২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কাশ্মীর রাজ্য শাসন করেন ; কিন্তু মহা-মহোপাধ্যায় স্থায়রত্ন মহাশয়ের কৃত রাজতরঙ্গিণীর ব্যাখ্যা অনুসারে দেখা যায় যে, তিনি ১০৯১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৯৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কাশ্মীরের রাজ-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। এই দুই জন রাজা শ্রীহর্ষের মধ্যে কোনও এক জন যে রত্নাবলীর রচয়িতা, ইহা ভূতপূর্ব্ব সমালোচকগণ প্রায় সকলেই একরূপ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। বস্তুতঃ, এই দুই জন শ্রীহর্ষ ভিন্ন প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে অপর কোনও রাজা শ্রীহর্ষের প্রসিদ্ধি দেখা যায় না। যিনি রত্নাবলীর রচয়িতা, তিনি রাজা না হইয়া দরিদ্র হইলেও কেবল কবি বলিয়াই সাহিত্যসমাজে অতিশয় প্রসিদ্ধিলাভের নিতান্ত সম্ভাবনা দেখা যায় ; তাহাতে রত্নাবলীর রচয়িতা যে পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, তাহা রত্নাবলীর প্রস্তাবনাতেই স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় এই প্রসিদ্ধ শ্রীহর্ষদ্বয় ব্যতীত অপর কোনও অপ্রসিদ্ধনামা শ্রীহর্ষ যে রত্নাবলীর রচয়িতা হইবেন, এরূপ অনুমান সম্ভবপর বোধ হয় না।

অধ্যাপক উইল্‌সন্‌ সাহেব এই দুই জন শ্রীহর্ষের মধ্যে কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষকেই রত্নাবলী-কার বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে, কহ্লণপণ্ডিতকৃত রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে কাশ্মীররাজ শ্রীহর্ষদেব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটি দৃষ্ট হয় ;—

"সোঽশেষদেশভাষাজ্ঞঃ সর্ব্বভাষাসু সৎকবিঃ।
কৃৎস্নবিদ্যানিধিঃ প্রাপ খ্যাতিং দেশান্তরেষপি॥"

—রাজতরঙ্গিণী ; ৭ম তরঙ্গ ; ৬১১ শ্লোক।

রত্নাবলী-কার যে রাজা ছিলেন, তাহা রত্নাবলীর প্রস্তাবনাতেই প্রকাশ পাই-তেছে। কাশ্মীররাজ শ্রীহর্ষ ভিন্ন অপর কোনও রাজা শ্রীহর্ষের কবিত্বের খ্যাতি যে সংস্কৃত সাহিত্যে আছে, বোধ হয়, তাহা উইল্‌সন্‌ সাহেব জানিতেন না ; সুতরাং তিনি রাজতরঙ্গিণীর পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটি দেখিয়া কাশ্মীররাজ শ্রীহর্ষকেই রত্নাবলী-কার বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

পণ্ডিতপ্রবর হল্‌ সাহেব দেখিলেন যে, কাশ্মীররাজ শ্রীহর্ষকে রত্নাবলী-কার বলিয়া স্বীকার করিলে, কতকগুলি অসামঞ্জস্য অনিবার্য্য হইয়া উঠে। কেবল রাজতরঙ্গিণীর এইরূপ একটি প্রশংসাশ্লোকদর্শনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইলে, বাণভট্টরচিত শ্রীহর্ষচরিতে কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের তদ্রূপ বা তদপেক্ষাও অধিক প্রশংসাদর্শনে তাঁহাকেও রত্নাবলীর রচয়িতা বলা

যাইতে পারে। বিশেষতঃ, কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনকে রত্নাবলী-কার স্বীকার করিলে, কোনও অসামঞ্জস্য ঘটে না। বোধ হয়, ইহা দেখিয়াই হল্ সাহেব অন্য কয়েকটি যুক্তির আশ্রয়ে কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের সভাপণ্ডিত বাণভট্টকেই রত্নাবলী-কার বলিয়া স্থির করিয়াছেন। হল্ সাহেবের সেই যুক্তিবিন্যাস এই ;—

১ম। "কাব্যপ্রকাশনিদর্শন" নামক কাব্যপ্রকাশের প্রাচীন টীকাপুস্তকে, "শ্রীহর্ষাদের্বাণাদীনামিব ধনং" এইরূপ পাঠভেদ দৃষ্ট হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বাণভট্ট প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া শ্রীহর্ষ প্রভৃতি রাজগণের নিকট হইতে প্রচুর ধন লাভ করিয়াছিলেন।

২। রত্নাবলীস্থিত "দ্বীপাৎ" ইত্যাদি শ্লোকটি বাণভট্টের হর্ষচরিতেও দৃষ্ট হয় ; এতদ্দ্বারা উভয়ের রচয়িতা যে এক ব্যক্তি, তাহা প্রতীত হইতেছে।

৩। "শার্ঙ্গধরপদ্ধতি" নামক প্রাচীন সংগ্রহপুস্তকে—

"অহো প্রভাবো বাগ্দেব্যা যন্মাতঙ্গদিবাকরঃ।
শ্রীহর্ষস্যাভবৎ সভ্যঃ সমো বাণময়ূরয়োঃ॥"

এই কবিতাটি দৃষ্ট হয় ; ইহা দ্বারা বাণভট্ট যে শ্রীহর্ষের সভ্য ছিলেন, তাহা জনা যায়।

হল্ সাহেবের পরে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়, স্বপ্রকাশিত কাব্যপ্রকাশের বিজ্ঞাপনে, প্রসঙ্গতঃ উইল্সন্ সাহেব ও হল্ সাহেবের মতের সমালোচনা করিয়াছেন। কাশ্মীরাধিপতি হর্ষদেব রত্নাবলীর রচয়িতা, উইল্সন্ সাহেবের এই মতের বিরুদ্ধে ন্যায়রত্ন মহাশয় নিম্নলিখিত আপত্তিগুলি উত্থাপিত করিয়াছেন ;—

১ম। রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে হর্ষদেবচরিত সবিস্তরে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু রত্নাবলী যে হর্ষদেব-রচিত, কুত্রাপি এইরূপ উক্তি দেখা যায় না ; সুতরাং কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষ রত্নাবলী-কার নহেন।

২য়। রত্নাবলী-কারের নাম শ্রীহর্ষ ; কিন্তু হর্ষ নহে। সুতরাং "শ্রিয়া যুক্তো হর্ষঃ শ্রীহর্ষঃ" এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়া, কাশ্মীরপতি হর্ষদেবকে রত্নাবলী-কার শ্রীহর্ষ বলিয়া স্থির করা সঙ্গত নহে।

৩য়। মালবাধিপতি ভোজদেব স্বকৃত "সরস্বতীকণ্ঠাভরণ" নামক অলঙ্কার নিবন্ধে রত্নাবলী হইতে অনেকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। কাশ্মীরাধিপতি হর্ষদেবের পিতামহ অনন্তদেবের রাজ্যকালে ভোজদেব মালব রাজ্য

শাসন করিতেছিলেন। ইহা কহ্লণকৃত রাজতরঙ্গিণীর নিম্নলিখিত শ্লোকে জানা যায়,—

"মালবাধিপতির্ভোজঃ প্রহিতৈ রত্নসঞ্চয়ৈঃ।
অকারয়ৎ যেন কুণ্ডযোজনং কটকস্বরে॥"
—৭ম তরঙ্গ; ১৯০ শ্লোক।

অনন্তদেব ১০৬৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কাশ্মীররাজ্যের রাজা ছিলেন; সুতরাং তাঁহার সমকালে বা কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক সময়ে যে ভোজদেব বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা নিঃসন্দেহে স্থির করা যাইতে পারে। উইল্সন্ সাহেবের মতানুসারে হর্ষদেব ১১১৩ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। সুতরাং হর্ষদেব রত্নাবলী-কার হইলে, তাঁহার পিতামহের সমকালীন ভোজদেব কর্ত্তৃক রত্নাবলীর শ্লোক সমুদ্ধৃত হওয়া কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? সুতরাং রত্নাবলী যে কাশ্মীররাজ হর্ষদেবের অনেক পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, এবং তিনি যে রত্নাবলীর রচয়িতা হইতে পারেন না, ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে।

৪র্থ। ধনিক, ওরফে ধনঞ্জয় পণ্ডিত, "দশরূপ" নামক অলঙ্কার-গ্রন্থে রত্নাবলী হইতে অনেকগুলি উদাহরণ গ্রহণ করিয়াছেন। ধনিক মালবাধিপতি মুঞ্জ নৃপতির সভ্য ছিলেন; ইহা দশরূপ চতুর্থ পরিচ্ছেদের অন্তে "বিষ্ণোঃ সুতেনাপি ধনঞ্জয়েন" ইত্যাদি শ্লোকটি পাঠ করিলেই জানা যাইতে পারে। মুঞ্জ নৃপতি ভোজদেবের পূর্ব্বে মালবদেশের রাজা ছিলেন। ইহা ভোজপ্রবন্ধ, ভোজচরিতাদি গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়। ইতিহাসবেত্তারা ১০৩০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে মুঞ্জের রাজ্যকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মুঞ্জের রাজ্যকালে হর্ষদেবের জন্ম হইবারও কথা নহে। এরূপ অবস্থায় তাঁহার রচিত রত্নাবলী যে সে সময়ে প্রচলিত থাকিবে, ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? ইহা দ্বারা হর্ষদেবের পূর্ব্বেও রত্নাবলীর অস্তিত্বের প্রমাণ হইতেছে; সুতরাং কাশ্মীররাজ হর্ষদেব কোনরূপেই রত্নাবলীর রচয়িতা হইতে পারেন না।

৫ম। "শ্রীহর্ষাদের্ধাবকাদীনামিব ধনং" কাব্যপ্রকাশের এইরূপ পাঠ ও "প্রথিতযশসাং ধাবকসৌমিল্লকবিপুত্রাদীনাং" ইত্যাদিরূপ মালবিকাগ্নিমিত্রের পাঠ স্বীকার করিলে, ধাবক কবি মালবিকাগ্নিমিত্রকার কালিদাসেরও পূর্ব্বে রত্নাবলী লিখিয়া শ্রীহর্ষ হইতে ধন লাভ করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রতীত

হয়। সুতরাং এরূপ অবস্থায় কাশ্মীররাজ হর্ষদেব যে রত্নাবলীকার হইতে পারেন না, এ সম্বন্ধে আর কি বক্তব্য আছে?

পণ্ডিতপ্রবর রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কেবল ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ৩য় ও ৪র্থ যুক্তি অবলম্বন করিয়াই উইল্‌সনের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সুতরাং আমরা তাঁহার যুক্তির স্বতন্ত্র সমালোচনা না করিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়ের যুক্তিগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় যুক্তি কেবল অনুমানমূলক; কোনও ব্যক্তি কর্ত্তৃক কোনও বিষয়ের অনুল্লেখ যে সেই বিষয়ের অস্তিত্বাভাবের নিশ্চিত প্রমাণরূপে গণ্য হইতে পারে না, ইহা বোধ হয়, বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না।] এইরূপ অনুল্লেখদর্শনে কেবল সন্দেহেরই উদয় হইতে পারে, কিন্তু সেই সন্দেহের মূলেও নিঃসন্দিগ্ধরূপে কোনও অনুমান করা যাইতে পারে না। ন্যায়রত্ন মহাশয়, বোধ হয়, এই দুইটি যুক্তির উপর বিশেষ কোনও নির্ভর করেন নাই। সুতরাং আমরা এইরূপ অনুমানমূলক যুক্তির সন্দিগ্ধতা বিশেষ করিয়া দেখাইতে ইচ্ছা করি না। আমাদিগের বিবেচনায় নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ দ্বারা কোনও বিষয়ের তথ্য নির্ণীত হইলে, এইরূপ অনুমানমূলক যুক্তি তাহার পোষকতাস্থলে গ্রহণ করিলেও কোনও ক্ষতি নাই; বোধ হয়, ন্যায়রত্ন মহাশয় সেই ভাবেই এই যুক্তি দুইটির উল্লেখ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ৩য় ও ৪র্থ যুক্তি প্রতিপাদ্য বিষয়ের চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীমধ্যে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। রাজকৃষ্ণ বাবু কেবল এই যুক্তি দুইটিই উইল্‌সন্ সাহেবের মতখণ্ডনবিষয়ে যথেষ্ট মনে করিয়াছেন, ইহা দ্বারাই যুক্তি দুইটির সারবত্তা বিলক্ষণ প্রতীত হইবে। কিন্তু এই যুক্তি দুইটির সম্পূর্ণতাবিষয়ে আমাদের মনে যে গুরুতর সন্দেহের উদয় হইয়াছে, তাহা এ স্থলে ব্যক্ত করিতেছি।

হর্ষদেব ১১১৩ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। উইল্‌সন্ সাহেবের এই উক্তিটি যে ভ্রান্ত, রাজতরঙ্গিণীর প্রমাণানুসারে যে অন্যরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয়, তাহা ন্যায়রত্ন মহাশয় কাব্যপ্রকাশের বিজ্ঞাপনে উত্তমরূপে প্রমাণিত করিয়াছেন। রাজতরঙ্গিণীর মতানুসারে ন্যায়রত্ন মহাশয় স্থির করিয়াছেন যে, হর্ষদেব ১০৯১ খৃষ্টাব্দের পরে ও ১০৯৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে, কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। উইল্‌সন্ সাহেব কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া ১০০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে মালবরাজ ভোজ-

দেবের রাজ্যকাল নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয় পূর্ব্বোক্ত রাজতরঙ্গিণীর প্রমাণানুসারে ভোজদেবের রাজ্যকাল কাশ্মীররাজ অনন্তদেবের সমকালে, অর্থাৎ ১০৬৫ খৃষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা পরে, স্থির করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার স্বীকৃত হর্ষদেব ও ভোজদেবের রাজ্যকালের মধ্যে ২৬ বৎসরের অন্তর দেখা যাইতেছে। উইল্‌সনের স্বীকৃত ভোজদেব ও হর্ষদেবের রাজ্যকালের মধ্যে শতাধিক বৎসরের অন্তর দেখা যায়। সুতরাং উহা যথার্থ হইলে, এইরূপ সুদীর্ঘকালের পরবর্ত্তী হর্ষদেবের রচিত রত্নাবলী ভোজদেব কর্ত্তৃক দৃষ্ট হওয়া একপ্রকার অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু উইল্‌সন্ সাহেবের নির্ণীত ভোজ ও হর্ষদেবের রাজ্যকাল অপ্রামাণ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া, ন্যায়রত্ন মহাশয় রাজতরঙ্গিণীর মতানুসরণে তাঁহাদের যে রাজ্যকাল স্থির করিয়াছেন, যদি তাহা প্রকৃত হয়, তবে ভোজদেব ও হর্ষদেবের রাজ্যকালের মধ্যে ২৬ বৎসরের অন্তর দেখা যায়। এরূপ অবস্থায় হর্ষদেব-রচিত রত্নাবলী ভোজদেব কর্ত্তৃক পঠিত হওয়া নিতান্তই অসম্ভব বলা যায় কি? পণ্ডিতবর রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এই যুক্তিটির উপর নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন যে, যখন ভোজদেব হর্ষদেবের পিতামহ অনন্তদেবের সমকালীন লোক, তখন তিনি যে হর্ষদেবের রচিত রত্নাবলী পাঠ করিতে পারিবেন, ইহা সম্ভবপর নহে। রাজতরঙ্গিণীর পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটির প্রমাণানুসারে ভোজদেব যে হর্ষদেবের পিতামহ অনন্তদেবের সমকালীন ব্যক্তি ছিলেন, এ সম্বন্ধে কাহারও কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। কিন্তু রাজতরঙ্গিণীর গ্রন্থকার ভোজদেবের রাজ্যকালের কোনও সীমানির্দ্দেশ করেন নাই। এরূপ অবস্থায় যখন ন্যায়রত্ন মহাশয়ের স্বীকৃত ভোজদেব ও হর্ষদেবের রাজ্যকালমধ্যে ২৬ বৎসরের অন্তর দেখা যাইতেছে, তখন ভোজ-দেব যে দীর্ঘজীবী হইয়া হর্ষদেবের রাজ্যকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন না, ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে? আমরা জিজ্ঞাসা করি, পিতামহের পক্ষে পৌত্রকে কৃতবিদ্য দেখিয়া যাওয়া, বা পৌত্রের রচিত কোনও গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া যাওয়া কি নিতান্তই অসম্ভব? তাহা না হইলেও পিতামহের সমকালীন লোক বলিয়াই যে কোনও ব্যক্তি তাঁহার সমকালীন কোনও ব্যক্তির পৌত্রের লিখিত কোনও গ্রন্থাদি পাঠ করা অসম্ভব, এ কথা প্রমাণান্তরের অভাবে কিরূপে বলা যাইতে পারে? একটি দৃষ্টান্ত দেখুন না কেন? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পূজ্যপাদ স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমকালীন

ব্যক্তি; তিনি এখন পর্য্যন্তও জীবিত আছেন। তিনি কি তাঁহার সমকালীন ব্যক্তি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পৌত্র কি দৌহিত্রাদির লিখিত গ্রন্থাদি পাঠ করিতে পারেন না? যদি ইহা অসম্ভব না হয়, তাহা হইলে ভোজদেবের পক্ষে তাঁহার সমকালীন ব্যক্তি অনন্তদেবের পৌত্র হর্ষদেবের রচিত রত্নাবলী পাঠ করিতে পারা কি জন্য অসম্ভব হইবে? আমরা যে একটি দৃষ্টান্ত দেখাইলাম, সমসাময়িক ইতিহাস হইতে কি এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় না? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতানুসারে ভোজদেব ও হর্ষদেবের রাজ্যকাল স্থির করিলেও, তাহা হইতে কোনরূপে নিঃসন্দেহে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না।

ন্যায়রত্ন মহাশয় হর্ষদেবের যে রাজ্যকাল স্থির করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কাহারও কোনও সন্দেহ নাই; কিন্তু ভোজদেবের রাজ্যকাল সম্বন্ধে নবাবিষ্কৃত কতকগুলি অনুশাসনপত্রের সাহায্যে, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এই যুক্তিটির প্রতিকূলে একটি নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায়। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বেবর, লাসেন ও কোলব্রুক সাহেব ভোজদেব ও তাঁহার পরবর্ত্তী রাজগণের রাজ্যকালের কয়েকখানি নবাবিষ্কৃত অনুশাসনপত্রের সাহায্যে স্থির করিয়াছেন যে, ভোজদেব ১০৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন। * বস্তুতঃ, এইরূপ প্রমাণ কোনরূপেই অস্বীকার করা যাইতে পারে না। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, ভোজরাজ ও হর্ষদেবের রাজ্যকালের মধ্যে বিশেষ কোনও অন্তর নাই। সুতরাং এরূপ অবস্থায় রাজতরঙ্গিণীর সহিত অনুশাসনগুলির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, ভোজদেব অনন্তদেবের সমকালবর্ত্তী লোক হইলেও যে তিনি হর্ষদেবের রাজ্যকাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই ত অধিকতর সঙ্গত বোধ হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রত্নাবলী কাশ্মীররাজ হর্ষদেবের রচিত হইলেও, ভোজদেব কর্ত্তৃক তাহা পঠিত হইতে পারা আপাততঃ যেরূপ অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিক সেরূপ অসম্ভব নহে। বরং প্রমাণান্তরদর্শনে ইহাই প্রকৃত ঘটনা বলিয়া বোধ হয়।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ৪র্থ যুক্তিটি আপাততঃ নিতান্তই গুরুতর বলিয়া বোধ হয়। ভোজদেব হর্ষদেবের পিতামহ অনন্তদেবের সমকালীন ব্যক্তি হইলেও, যেন তাঁহার দীর্ঘজীবন অনুমান করিয়া লইলেও কোনরূপে বিষয়টির সামঞ্জস্য

---

* Weber সাহেবের কৃত "The History of Indian Literature" নামক সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকের ২০১ পৃষ্ঠা দেখুন।

রক্ষা করা যাইতে পারে। কিন্তু মুঞ্জ ও তাঁহার সভাপণ্ডিত ধনঞ্জয় সম্বন্ধেও সেইরূপ কথা খাটে না। ন্যায়রত্ন মহাশয় ভোজপ্রবন্ধ, ভোজচরিতাদি গ্রন্থ হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, মুঞ্জ ভোজদেবেরও পূর্ব্বে মালবের রাজা ছিলেন। তিনি কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতানুসরণ করিয়া ১০৩০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে মুঞ্জের রাজ্যকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মুঞ্জের সভাপণ্ডিত ধনঞ্জয়েরও তাহা হইলে এই সময় স্থির হইতেছে। রাজতরঙ্গিণীর মতে হর্ষদেব ১০৯১ খৃষ্টাব্দের পরে কাশ্মীরের রাজপদে সমারূঢ় হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং ধনঞ্জয় যে তাঁহার ৬১ বৎসরকাল পরবর্ত্তী রাজা হর্ষদেবের রত্নাবলী উদ্ধৃত করিয়া যাইবেন, ইহা ত আরও অবিশ্বাস্য কথা। মুঞ্জরাজের রাজ্যকালের যে একখানি অনুশাসনপত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্দর্শনে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নির্ণীত কাল হইতে আরও ৫৬ বৎসর পূর্ব্বে মুঞ্জের রাজ্যকাল স্থির হয়। * মুঞ্জের আর একটি নাম বাক্‌পতিরাজ ছিল। অনুশাসনপত্রখানিতে মুঞ্জের পরিবর্ত্তে বাক্‌পতিরাজ নাম দেখা যায়। বাক্‌পতিরাজ যে মুঞ্জেরই নামান্তর ছিল, তাহা বোধ হয়, জয়পুর-নিবাসী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদই প্রথমে প্রমাণ করেন। তাঁহার সম্পাদিন "প্রাচীনলেখমালা" পুস্তকখানি এতদ্দেশে বিরল প্রচার বলিয়া আমরা পণ্ডিতপ্রবরের সেই যুক্তিগুলির নিম্নে উল্লেখ করিতেছি,—

১ম। ধনিক পণ্ডিত স্বকৃত দশরূপালোক গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে এক স্থলে "প্রণয়কুপিতাং দৃষ্ট্বা দেবীং" ইত্যাদি শ্লোকটি বাক্‌পতিরাজের নামে উদ্ধৃত করিয়া, পুনরায় সেই শ্লোকটি অন্যত্র মুঞ্জের নামে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা ধনিকের মতে বাক্‌পতিরাজ মুঞ্জের নামান্তর বলিয়া প্রতীত হইতেছে।

২য়। হলায়ুধ পণ্ডিত তাঁহার কৃত পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের বৃত্তিতে নিম্নলিখিত তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"ব্রহ্মক্ষত্রকুলীনঃ প্রলীনসামন্তচক্রনুতচরণঃ।
সকলসুকৃতৈকপুঞ্জঃ শ্রীমান্ মুঞ্জশ্চিরং জয়তি॥"
"জয়তি ভুবনৈকবীরঃ গৌরায়ুধতুলিতবিপুলবলবিভবঃ।
অনবরতবিত্তবিতরণনির্জ্জিতচম্পাধিপো মুঞ্জঃ॥"

---

* "Indian Antiquary" নামক সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকার ৬ষ্ঠ খণ্ড ৫১—৫২ পৃষ্ঠা, অথবা বোম্বাই নির্ণয়সাগর যন্ত্রালয় হইতে মুদ্রিত "প্রাচীনলেখমালা" পুস্তকের ১—৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

"স জয়তি বাক্‌পতিরাজঃ সকলার্থিমনোরথৈককল্পতরুঃ।
প্রত্যর্থিভূতপার্থিবলক্ষ্মীহঠহরণদুর্ললিতঃ॥"

এই শ্লোকগুলির প্রথম দুইটিতে মুঞ্জ ও তৃতীয়টিতে বাক্‌পতিরাজ নাম দেখা যায়।

৩য়। জৈনধর্ম্মাবলম্বী অমিতগতি নামক যতির প্রণীত "সুভাষিতরত্ন-সন্দোহ" নামক গ্রন্থের শেষে নিম্নলিখিত শ্লোক দেখা যায়,—

"সমারূঢ়ে পূতত্রিদিববসতিং বিক্রমনৃপে
সহস্রে বর্ষাণাং প্রভবতি হি পঞ্চাশদধিকে।
সমাপ্তং পঞ্চম্যাং অবতি ধরণীং মুঞ্জনৃপতৌ
সিতে পক্ষে পৌষে বুধবিহিতমিদং শাস্ত্রমনঘম্॥"

ইহা দ্বারা ১০৫০ সংবৎ, অর্থাৎ ৯৯৩ খৃষ্টাব্দে মুঞ্জের রাজ্যকাল প্রমাণিত হয়। পূর্ব্বোক্ত অনুশাসনপত্র ৯৭৪ খৃষ্টাব্দে বাক্‌পতিরাজের রাজ্যকালে লিখিত হইয়াছিল; এই উভয় কালের মধ্যে অধিক অন্তর দেখা যায় না। সুতরাং মুঞ্জ যে বাক্‌পতিরাজেরই নামান্তর, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বোক্ত অনুশাসনপত্র-অনুসারে দেখা যাইতেছে যে, মুঞ্জ বা বাক্‌পতি-রাজ, ৯৭৪ খৃষ্টাব্দে মালবরাজ্য শাসন করিতেছিলেন। সুতরাং যখন ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নির্ণীত কাল হইতেও ৫৬ বৎসর পূর্ব্বে মুঞ্জের রাজ্যকাল স্থির হইল, তখন তাঁহার সভাপণ্ডিত ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক শতাধিক বৎসরের পরবর্ত্তী হর্ষদেবের রত্নাবলী কিরূপে উদ্ধৃত হইতে পারে?

আমরা এ যাবৎ যাহা বলিলাম, তদ্দ্বারা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের চতুর্থ যুক্তি-টিরই নিতান্ত পোষকতা হইতেছে; তাঁহার এই যুক্তিটি যে কারণবশতঃ আমাদিগের নিকট সন্দিগ্ধ বলিয়া বোধ হয়, তাহা নিম্নে লিখিতেছি।

বিষ্ণুর পুত্র ধনঞ্জয় পণ্ডিত যে মুঞ্জরাজার সভাপণ্ডিত থাকিয়া দশরূপ-নামক অলঙ্কার গ্রন্থের রচনা করিয়াছেন, তাহাতে কাহারও কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না;—কেন না, তিনি দশরূপের শেষে "বিষ্ণোঃ সুতেনাপি ধনঞ্জয়েন" ইত্যাদি শ্লোকে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু দশরূপের বৃত্তি অংশ, যাহা "দশরূপাবলোক" বলিয়া খ্যাত, তাহার শেষে প্রত্যেক পরিচ্ছেদান্তে—"ইতি শ্রীবিষ্ণুসূনোর্ধনিকস্য কৃতৌ দশরূপাবলোকে" ইত্যাদিরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয়। এখন সকলের মনেই স্বভাবতঃ এই সন্দেহ উদিত হইতে পারে যে, "দশ-রূপ"-গ্রন্থকার ধনঞ্জয় ও "দশরূপাবলোক"-কার ধনিক, একই ব্যক্তি কি না? তাঁহারা এক ব্যক্তি হইলে, তাঁহাদের ও তাঁহাদের রচিত কারিকা ও বৃত্তি অংশের

নাম বিভিন্ন লক্ষিত হয় কেন? রত্নাবলী ও অন্যান্য গ্রন্থাদি হইতে যে সকল উদাহরণ গৃহীত হইয়াছে, তাহা "দশরূপাবলোক" নামক বৃত্তি অংশেই পাওয়া যায়। স্মায়রত্ন মহাশয় এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই করেন নাই; তিনি ধনিক ধনঞ্জয়েরই নামান্তর বলিয়া স্থির করিয়াছেন। পক্ষান্তরে দেখা যায় যে, প্রাচীনলেখমালা পুস্তকের সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ দশরূপাবলোক-কার ধনিককে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়াই মনে করিয়াছেন। ধনঞ্জয় যে ধনিক হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি, তিনি অবশ্য অপ্রাসঙ্গিক স্থলে সে সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই। কিন্তু এইরূপ বিভিন্ন-গ্রন্থকার বিভিন্ন-নামধারী ব্যক্তিগণের একত্ব প্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত যে তাঁহা-দিগকে স্বতন্ত্র বলিয়াই ধরিতে হইবে, কার্য্যতঃ ইহার আভাস দিয়াছেন। বস্তুতঃ আমাদিগের বোধ হয় যে, নিরপেক্ষভাবে সত্যের অনুসন্ধান করিতে হইলে, এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সুতরাং আমা-দিগকে সন্দিগ্ধচিত্তে জিজ্ঞাসা করিতে হইতেছে যে, ধনঞ্জয় ও ধনিক যে অভিন্ন, এ সম্বন্ধে কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আছে কি? ধনঞ্জয় ও ধনিক উভয়েই আপনাকে বিষ্ণুর পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, কেবল ইহার উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহাদিগকে অভিন্ন বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে কি? যদি প্রকৃতপ্রস্তাবে এই ধনিক বিষ্ণুর পুত্র ধনঞ্জয় বা তাঁহার ভ্রাতা না হইয়া অপর কোনও বিষ্ণুর পুত্র হয়েন, তাহা হইলে এই ধনিকের সময় নির্দ্ধারণ না করিতে পারিলে তাঁহার রচিত দশরূপাবলোকে রত্নাবলীর শ্লোকদর্শনে হর্ষদেব কর্ত্তৃক রত্নাবলী রচিত হওয়ার প্রতিকূলে কোনও তর্কই উত্থাপিত করা যাইতে পারে না। আমরা ইতিপূর্ব্বে মুঞ্জ নৃপতির যে অনুশাসনপত্রের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, তাহা পাঠ করিলে জানা যায় যে, মুঞ্জ নৃপতি তদ্দ্বারা ধনিক পণ্ডিতের পুত্র বসন্তাচার্য্যকে কতকগুলি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। যদি এই ধনিক পণ্ডিতই দশরূপাবলোকের রচয়িতা ধনিক হয়েন, তাহা হইলে তিনি ধনঞ্জয়, বা ধনঞ্জয়ের ভ্রাতা না হইলেও যে অন্ততঃ ধনঞ্জয়ের সমকালীন ব্যক্তি ছিলেন, তাহা অনায়াসেই স্থির করা যাইত। কিন্তু এই অনুশাসনপত্রের উল্লিখিত ধনিক পণ্ডিতই যে দশরূপাবলোকের রচয়িতা ধনিক, এ সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ আছে কি? যদি সেরূপ কোনও প্রমাণ না থাকে, তাহা হইলে যতই সম্ভবপর হউক না কেন, কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এ বিষয়ে কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে

না। সুতরাং আমাদিগকে অগত্যা বলিতে হইতেছে যে, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এই যুক্তিটিও নিশ্চয়াত্মিকা নহে।

অতঃপর আমরা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ৫ম ও শেষ যুক্তিটির আলোচনা করিব।

"শ্রীহর্ষাদের্ধাবকাদীনামিব ধনং" কাব্যপ্রকাশের এইরূপ পাঠ, "প্রথিতযশসাং ধাবকসৌমিল্লকবিপুত্রাদীনাং" ইত্যাদি মালবিকাগ্নিমিত্রের পাঠ, এবং কাব্যপ্রকাশের কোনও কোনও টীকাকারের ব্যাখ্যা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে, ধাবক কবি যে কালিদাসেরও পূর্ব্বে রত্নাবলী নাটিকা লিখিয়া শ্রীহর্ষের নিকট হইতে ধন লাভ করিয়াছিলেন, ইহাও যেন স্বীকার করিতে হইল। কিন্তু কাব্যপ্রকাশ ও মালবিকাগ্নিমিত্রের পূর্ব্বোক্ত পাঠগুলি যে অভ্রান্ত, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে কি? ন্যায়রত্ন মহাশয়ই কাব্যপ্রকাশের বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন যে, মালবিকাগ্নিমিত্রের এই পাঠের 'ধাবক' শব্দের পরিবর্ত্তে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাগারস্থিত দুইখানি প্রাচীন সংস্কৃত হস্তলিখিত পুস্তকেই 'ভাসক' এই পাঠ দেখা যায়। বস্তুতঃ, এ স্থলে 'ধাবক' অথবা 'ভাসক', ইহার কোনটি যে প্রকৃত পাঠ, তাহা বলা কঠিন বলিয়াই, ন্যায়রত্ন মহাশয় এই বিষয়টির এইরূপ সন্দিগ্ধভাবে উল্লেখ করিয়াছেন: ফলতঃ, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অধিকাংশ এ স্থলে 'ভাস' বা 'ভাসক' পাঠ বিশুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। * ইহার প্রধান কারণ এই যে, কাব্যপ্রকাশ ও মালবিকাগ্নিমিত্রের কোনও কোনও হস্তলিখিত পুস্তকেই কেবল ধাবকের নাম দেখা যায়। ধাবক যে এক জন খ্যাতনামা কবি ছিলেন, বা কোনও কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, এ সম্বন্ধে সুবিস্তীর্ণ সংস্কৃত সাহিত্যে অপর কোনও প্রমাণই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পক্ষান্তরে দেখা যায় যে, 'ভাস' প্রাচীন সংস্কৃত কবি বাণভট্টকর্ত্তৃক হর্ষচরিতের প্রারম্ভে কালিদাসাদিরও পূর্ব্ববর্ত্তী বিখ্যাত নাটককার বলিয়া অত্যন্ত প্রশংসিত হইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতগণ মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনায় 'ধাবকের' পরিবর্ত্তে 'ভাস' বা 'ভাসক' পাঠটিই সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কাব্যপ্রকাশের "শ্রীহর্ষাদের্ধাবকাদীনামিব ধনং" এই পাঠ সম্বন্ধেও এইরূপ বা ইহা অপেক্ষা অধিক পাঠভেদ দৃষ্ট হয়। ন্যায়রত্ন মহাশয়ই উল্লেখ করিয়াছেন, কাব্যপ্রকাশের টীকা "কাব্যপ্রকাশনিদর্শনে" "শ্রীহর্ষাদের্বাণাদীনামিব ধনং" এইরূপ

---

* Weber সাহেব কৃত "The History of Indian Literature" পুস্তকের ২০৫ পৃষ্ঠা।

পাঠ কল্পিত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হল্ সাহেব এই পাঠ-দর্শনেই অপর কয়েকটি যুক্তির সাহায্যে বাণভট্টকে রত্নাবলীকার বলিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। হল্ সাহেবের এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য যথাস্থানে ব্যক্ত হইবে ; এক্ষণে কাব্যপ্রকাশের হল্ সাহেব কর্ত্তৃক সমাদৃত এই পাঠভেদের সম্বন্ধে কাশ্মীর হইতে বুলার সাহেব কর্ত্তৃক যে প্রয়োজনীয় তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। "কাব্যপ্রকাশের" রচয়িতা মম্মট ভট্ট যে কাশ্মীরদেশীয় ছিলেন, পণ্ডিতপ্রবর বুলার কাশ্মীর হইতে এ সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। মম্মট ভট্ট সম্বন্ধে প্রাচীন পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তীও এইরূপই বটে। এরূপ অবস্থায় মম্মট-রচিত কাব্যপ্রকাশের কোনও পাঠবিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হইলে, তাঁহার স্বদেশীয় প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকে কিরূপ লিখিত আছে, তাহা জানিবার জন্য সত্যানুসন্ধিৎসু লোকমাত্রেরই স্বভাবতঃ আগ্রহ হইয়া থাকে। পণ্ডিতবর বুলার সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তক ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহের জন্য কাশ্মীরদেশে গমন করিয়া তথা হইতে অন্যান্য গ্রন্থ ও তত্ত্বের সহিত মম্মটকৃত কাব্যপ্রকাশেরও অনেকগুলি অতি প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহার সকলগুলিতেই "শ্রীহর্ষাদের্বাণাদীনামিব ধনং" এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কাব্যপ্রকাশের সন্দিগ্ধপাঠবিবেকস্থলে মম্মট ভট্টের স্বদেশীয় হস্তলিখিত পুস্তকের পাঠই যে সমধিক প্রামাণ্য, এ বিষয়ে, বোধ হয়, কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। ফলতঃ, বুলার সাহেবের এই আবিষ্কার দ্বারা কাব্যপ্রকাশনিদর্শনের ধৃত ও হল্সাহেবের সমাদৃত পাঠেরই সমীচীনতা আশ্চর্য্যরূপে প্রমাণিত হইতেছে। মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনার "ভাসসৌমিল্লকবিপুত্রাদীনাং" ইত্যাদি পাঠের সমীচীনতা দ্বারাও এই বিষয়ের পোষকতা হইতেছে। কেন না, মালবিকাগ্নিমিত্রে যদি প্রকৃতপক্ষে ধাবকের নাম না থাকে, তাহা হইলে কেবল কাব্যপ্রকাশের এতদ্দেশপ্রচলিত পুস্তকের পাঠদর্শনে ধাবক কবির অস্তিত্বই নিঃসন্দেহে অনুমিত হইতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের উল্লিখিত কাব্যপ্রকাশ ও মালবিকাগ্নিমিত্রের পাঠগুলি পরীক্ষক পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক অসমীচীন বলিয়া পরিত্যক্ত হওয়ায়, সেই পাঠভেদমূলক ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ৫ম যুক্তিটিও নিশ্চয়াত্মিকা হইতেছে না। এক্ষণে সত্যানুরোধে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, ন্যায়রত্ন মহাশয় ও তাঁহার

মতানুসরণ করিয়া রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে যুক্তিগুলির সাহায্যে উইল্‌সন্‌ সাহেবের মতটি খণ্ডন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, বস্তুতঃ সেই যুক্তিগুলি দ্বারা উইল্‌সন্‌ সাহেবের মত নিঃসন্দিগ্ধরূপে খণ্ডিত হইতে পারে না।

"কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের সভাপণ্ডিত বাণভট্টই রত্নাবলীর রচয়িতা", হল্‌ সাহেব যে যুক্তিগুলির সাহায্যে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, আমরা ইতিপূর্ব্বেই সেই যুক্তিগুলির উল্লেখ করিয়াছি; এক্ষণে দেখা যাউক, ন্যায়রত্ন মহাশয় সেই যুক্তিগুলির সম্বন্ধে কি বলেন।

হল্‌ সাহেবের প্রথম যুক্তিটি সম্বন্ধে ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন যে, হল্‌ সাহেব কাব্যপ্রকাশনিদর্শনের যে একটিমাত্র পাঠ অবলম্বন করিয়া রত্নাবলী বাণভট্ট-রচিত, এইরূপ প্রমাণ করিতে চাহেন, বস্তুতঃ তাহা এইরূপ একটি বিষয়ের চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না;—এইরূপ পাঠভেদদর্শনে কেবল মনে সন্দেহেরই উদয় হইতে পারে। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এই উক্তিটি যে নিতান্ত সুবিবেচনাসিদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ নাই। হল্‌ সাহেব কাব্যপ্রকাশ-নিদর্শনের যে পাঠটি যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী গবেষণার ফলে যে কাশ্মীর হইতে তৎসম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ সংগৃহীত হইবে, ইহা বোধ হয়, সে সময়ে কেহই কল্পনা করেন নাই। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্বোল্লিখিত বুলার সাহেবের আবিষ্কার দ্বারা হল্‌ সাহেবের সমাদৃত পাঠটিই বিশেষরূপে সমর্থিত হইতেছে। সুতরাং একটি পাঠভেদদর্শনে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মনে যে সন্দেহের উদয় হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয়ই এখন শতগুণে বর্দ্ধিত হইতে পারে। সে যাহা হউক, আমাদিগের বিবেচনায়, সকল কাব্য-প্রকাশেই যদি হল্‌ সাহেবের স্বীকৃত পাঠের অনুরূপ পাঠ থাকিত, তাহা হইলেও তদ্দ্বারা রত্নাবলী যে বাণভট্ট-রচিত, এই বিষয়টি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় না। আমরা যথাস্থলে তাহা দেখাইব। এ স্থলে ইহা বলা কর্ত্তব্য যে, এ সম্বন্ধে যতই সম্ভাবনা থাকুক না কেন, ন্যায়রত্ন মহাশয় এইরূপ সম্ভাবনা-মূলক অনুমানকে নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া নিজের বিলক্ষণ সুবিবেচনা ও তার্কিকতা শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

হল্‌ সাহেবের দ্বিতীয় যুক্তিটি সম্বন্ধে ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন যে, কেবল একটিমাত্র শ্লোক দুইখানি গ্রন্থে একরূপ দেখিয়া, ঐ দুইখানি গ্রন্থ এক জনের রচিত বলিয়া স্থির করা যুক্তিসিদ্ধ নহে; কেন না, সংস্কৃত কবিগণ

অনেকে অনেক সময়ে নিজের উক্তির সমর্থন করিবার জন্য, অথবা অপরের একটি উক্তি দ্বারা নিজের বক্তব্য বিষয়টি উত্তমরূপে প্রকাশ পায় দেখিয়া, অপরের কৃত গ্রন্থ হইতে দুই চারিটি শ্লোক অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এই উক্তিটি নিতান্ত সত্য; সংস্কৃত সাহিত্য হইতে এরূপ আরও অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। কেবল সংস্কৃত সাহিত্য কেন, এই বিষয়টি এরূপ স্বাভাবিক যে, সকলদেশীয় সাহিত্য হইতেই এই-রূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। আমাদিগের বিবেচনায়, এইরূপ শ্লোকগুলি পরবর্ত্তী লেখকগণ কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত না হইয়া থাকিলে, দুইখানি গ্রন্থে এইরূপ অবিকল শ্লোকদর্শনে নিঃসন্দেহে এই অনুমান করা যাইতে পারে যে, গ্রন্থকারদ্বয়ের এক জন অন্যতরের নিকট হইতে, অথবা তাঁহারা উভয়েই কোনও তৃতীয় ব্যক্তির নিকট হইতে শ্লোক গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ, এই অনুমানদ্বয়ের কোনটি সত্য, তাহা প্রমাণান্তর দ্বারা স্থির করিতে পারিলে, ইহা দ্বারা গ্রন্থকারগণের পৌর্ব্বাপর্য্য অবধারিত করা যাইতে পারে। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাবে দুইখানি গ্রন্থ এক ব্যক্তির রচিত কি না, ইহা স্থির করিতে হইলে, গ্রন্থদ্বয়ের ভাষা, রচনাপদ্ধতি, ভাব ও কবিত্বাদির পরস্পর তুলনা ব্যতীত ইষ্টসিদ্ধির অপর কোনও প্রকৃষ্ট উপায় নাই। সুতরাং এরূপ অবস্থায় হল্ সাহেবের যুক্তিটি যে নিতান্তই সন্দিগ্ধ, তৎসম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য।

হল্ সাহেবের তৃতীয় যুক্তিটি সম্বন্ধে ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন যে, হল্ সাহেব "শার্ঙ্গধরপদ্ধতি"র যে শ্লোকটি দ্বারা বাণভট্ট শ্রীহর্ষের সভ্য ছিলেন, এইরূপ প্রমাণ করিতে চাহেন, বস্তুতঃ তাহাতে সেইরূপ বুঝায় না; ঐ শ্লোকটি দ্বারা মাতঙ্গ দিবাকর যে বাণ ও ময়ূরের সদৃশ ছিলেন, এবং বাগ্দেবীর প্রভাবে শ্রীহর্ষের সভ্য হইয়াছিলেন, ইহাই জানা যায়। কিন্তু কোনরূপেই এরূপ অর্থ প্রকাশ পায় না যে, মাতঙ্গ দিবাকর বাণ ও ময়ূরের সহিত শ্রীহর্ষের সভ্য হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ, মূলে 'সমঃ' পাঠটি থাকিলে তদ্দ্বারা 'সদৃশ' ভিন্ন 'সহিত' অর্থ প্রকাশ পায় না। হল্ সাহেবের উক্তি সম্বন্ধে এ কথাই যথেষ্ট প্রত্যুত্তর বটে। কিন্তু যখন হর্ষচরিতের প্রমাণ-অনুসারে বাণভট্ট-যে শ্রীহর্ষের সভ্য ছিলেন, এই বিষয়টি নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইতেছে, তখন আমাদিগের বিবেচনায় এই শ্লোকটি আরও একটু ভাল করিয়া আলো-চনা করা আবশ্যক ছিল। ফলতঃ, নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে গেলে বলিতে

হয় যে, হল্ সাহেব এই শ্লোকটির পাঠগ্রহণস্থলে ভ্রান্ত হইয়াছেন। প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তক সকলের মধ্যে অনেক সময়েই এরূপ গুরুতর পাঠভেদ দৃষ্ট হয় যে, অনেক স্থলেই কোনটি যে বিশুদ্ধ পাঠ, তাহা স্থির করিতে গিয়া মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণেরও মতভেদ ঘটিয়া থাকে। কালিদাসের জগৎ-বিখ্যাত অভিজ্ঞানশকুন্তলের বঙ্গদেশ ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলপ্রচলিত পুস্তক সকলের মধ্যে এরূপ গুরুতর পাঠবৈষম্য দেখা যায় যে, পূজ্যপাদ স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন যে, উহার একবিধ গ্রন্থ পাঠ করিলে অন্যবিধ গ্রন্থ-পাঠের সম্যক্ ফল লাভ করা যাইতে পারে না। সে যাহা হউক, বর্ত্তমান বিষয়ে আমাদিগের বোধ হয় যে, শার্ঙ্গধরপদ্ধতির পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটিতে 'সমঃ' পদের পরিবর্ত্তে 'সমং' পাঠটি সমীচীন বটে। 'সমং' পাঠটি দ্বারা শ্লোকটির তাৎপর্য্য ও অন্যান্য ঐতিহাসিক প্রমাণের সহিত সামঞ্জস্য উত্তমরূপে রক্ষিত হয়। এইরূপ হইলে, 'সমং' পদটি 'সদৃশ' অর্থ না বুঝাইয়া, 'সহিত' অর্থই বুঝাইয়া থাকে। বস্তুতঃ, বাণভট্ট যে শ্রীহর্ষের সভ্য ছিলেন, তাহা বাণ-রচিত হর্ষচরিতপাঠেই নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানা যাইতে পারে। হর্ষচরিতের অষ্টম উচ্ছ্বাস পাঠে ইহাও জানা যায় যে, হর্ষদেবের রাজ্যকালে দিবাকর নামক এক জন সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন ও হর্ষদেব পিতৃরাজ্য নিষ্কণ্টক করিয়া এই দিবাকরের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। * শ্রীহর্ষ যে জীবনের শেষভাগে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েন্থসাঙের ভ্রমণবৃত্তান্তেই স্পষ্ট উল্লিখিত হই-য়াছে। প্রাচীন কিংবদন্তী অনুসারে সূর্য্যশতক-রচয়িতা ময়ূর কবি বাণভট্টের সমকালীন ও সম্পর্কিত ব্যক্তি ছিলেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা যে এক সময়ে অসামান্য গুণগ্রাহী সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের সভ্য ছিলেন, শার্ঙ্গধরপদ্ধতির এই উক্তি, বোধ হয়, অযথার্থ নহে। আর এইরূপ স্বীকার করিলেই শার্ঙ্গ-ধরপদ্ধতির শ্লোকটির ভাব-বৈচিত্র্য সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। কেন না, মাতঙ্গ দিবাকরকে বাণ ও ময়ূরের সদৃশ বলিলে, তিনি যে শ্রীহর্ষের সভ্য হইবেন, ইহাতে আর বাগ্দেবীর কি আশ্চর্য্য প্রভাব দেখা যায়? কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত প্রমাণানুসারে মাতঙ্গ দিবাকর বৌদ্ধ; অতএব হিন্দু

---

* বোম্বাই নির্ণয়সাগর যন্ত্র হইতে প্রকাশিত সটীক হর্ষচরিতের দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস ৯৯—৯১ পৃষ্ঠা ও অষ্টম উচ্ছ্বাস ২৭২ ও ২৮৮ পৃষ্ঠায়, "ইয়ং তু গ্রহীষ্যতি" ইত্যাদি বাক্য দ্রষ্টব্য।

সমাজের বহির্ভূত ও বিগর্হিত হইয়াও যে বিদ্যাপ্রভাবে দ্বিজকুলাবতংস বহুমানাস্পদ বাণ ও ময়ূর কবির সহিত সমভাবে সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, ইহা দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে বাগ্দেবীর অলৌকিক মহিমা বুঝা যাইতে পারে। সুতরাং শার্ঙ্গধরপদ্ধতির শ্লোকটির এইরূপ তাৎপর্য্যই অধিক সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। সে যাহা হউক, তর্কস্থলে এই বিষয়ের যথার্থতা স্বীকার না করিলেও দেখা যাইতেছে যে, কেবল হর্ষচরিতের প্রমাণানুসারেই বাণভট্ট শ্রীহর্ষদেবের সভ্য ছিলেন, হল্ সাহেবের এই অনুমানটি সত্য বলিয়া স্থির হইতেছে। সে যাহা হউক, বাণভট্ট হর্ষদেবের সভ্য ছিলেন, এইরূপ স্থির হইলেও, ইহা দ্বারা তিনি যে রত্নাবলী রচনা করিয়াছেন, এরূপ কোনও কথা প্রকাশ পায় না। সুতরাং হল্ সাহেবের সিদ্ধান্তটি যে কেবল অনুমানমূলক, সে বিষয়ে, বোধ হয়, কাহারও মতভেদ হইবে না।

আমরা উইল্‌সন্ সাহেবের মতাবলম্বী নহি। তবে উক্ত সাহেবের মত খণ্ডন করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত সমালোচকগণ এ যাবৎ যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাঁহার মত যে তদ্দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে খণ্ডিত হইতে পারে না, সত্যানুরোধে আমরা ইহা বলিতে বাধ্য। কাশ্মীররাজ হর্ষদেব যে রত্নাবলীর রচয়িতা নহেন, এ সম্বন্ধে আমরা যে একটি প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তদ্দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে এই বিষয়টি প্রমাণিত ও উইল্‌সনের মত খণ্ডিত হইতে পারে। আমরা সেই প্রমাণটি নিম্নে লিখিতেছি।

ডাক্তার পিটরসন্ সাহেব দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন সংস্কৃত হস্তলিখিত পুস্তকের সংগ্রহার্থ ভারতবর্ষের নানা স্থানে পর্যটন করিয়া খম্ভায়েৎ নগর হইতে একখানি তালপত্রলিখিত জীর্ণ ও অসম্পূর্ণ "শম্ভলীমতম্" নামক দামোদর-গুপ্ত-বিরচিত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বোম্বাই-নগরীস্থিত নির্ণয়সাগর যন্ত্রের সত্বাধিপতির যত্নে স্থানান্তর হইতে আরও দুইখানি জীর্ণ অসম্পূর্ণ দামোদর-গুপ্ত-রচিত "কুট্টনীমতম্" নামক হস্তলিখিত পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছিল। "শম্ভলী" ও "কুট্টনী" এই দুইটি পর্য্যায়-শব্দ; বস্তুতঃ, পূর্ব্বোক্ত তিনখানি পুস্তকই দামোদর-গুপ্ত-রচিত "কুট্টনীমতম্" বটে। এই পুস্তকখানি লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং নির্ণয়সাগরযন্ত্রাধিপতি অনেক যত্ন ও অনুসন্ধান করিয়া সম্পূর্ণ পুস্তকলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সুতরাং অগত্যা ঐ তিনখানি অসম্পূর্ণ গ্রন্থ অবলম্বনেই "কুট্টনীমতম্" পুস্তকখানি স্বপ্রকাশিত "কাব্যমালা" নাম্নী মাসিকপত্রিকায় অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই মুদ্রিত

করিয়াছেন। দামোদর গুপ্ত বহু প্রাচীন কবি; রাজতরঙ্গিণীর চতুর্থ তরঙ্গে জয়াপীড় রাজার বর্ণনাবসরে দামোদর গুপ্ত সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটি দৃষ্ট হয়,—

"স দামোদরগুপ্তাখ্যং কুট্টনীমতকারিণম্।
কবিং কবিং বলিরিব ধূর্য্যং ধীসচিবং ব্যধাৎ॥"

—রাজতরঙ্গিণী; ৪র্থ তরঙ্গ; ৪৯৫ শ্লোক।

ইহার অর্থ এই যে, "বলি যেরূপ কবিকে (অর্থাৎ শুক্রাচার্য্যকে) মন্ত্রসচিব করিয়াছিলেন, তিনি-(জয়াপীড়)-ও সেইরূপ 'কুট্টনীমত' গ্রন্থের রচয়িতা, কবি ও ধুরন্ধর দামোদর গুপ্তকে মন্ত্রসচিব করিয়াছিলেন।" জয়াপীড় রাজা ক্ষীরস্বামী নামক সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণাচার্য্যের নিকট শিক্ষা পাইয়া শব্দবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন; তিনি বিদ্যোৎসাহিতাবশতঃ পতঞ্জলিমুনি-কৃত, লুপ্তপ্রায় ও বিচ্ছিন্ন মহাভাষ্য স্বদেশে প্রচারিত করিয়াছিলেন; ভট্ট উদ্ভট নামক সুপ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিকাচার্য্য তাঁহার সভাপতি এবং মনোরথ, শঙ্খদত্ত, চটক, সন্ধিমান প্রভৃতি আরও কয়েক জন কবি তাঁহার সভ্য ছিলেন; রাজতরঙ্গিণী হইতে জয়াপীড় সম্বন্ধে এই ঐতিহাসিক তত্ত্বগুলি জানা যায়। * রাজতরঙ্গিণীর মতে, জয়াপীড় নৃপতি ৭৫৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাশ্মীররাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার মন্ত্রী দামোদর গুপ্তও সেই সময়ের লোক, এ সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। কাব্যমালায় প্রকাশিত "কুট্টনীমত" গ্রন্থের ২য় শ্লোকটি এইরূপ; যথা,—

"অবধীর্য্য দোষনিচয়ং গুণলেশে সন্নিবেশ্য মতিমার্য্যাঃ।
কুট্টন্যা মতমেতৎ দামোদরগুপ্তরচিতং শৃণুত॥" †

ইহার দ্বারা রাজতরঙ্গিণীর বর্ণিত দামোদর গুপ্তের রচিত কুট্টনীমত গ্রন্থ ও কাব্যমালায় প্রকাশিত কুট্টনীমত গ্রন্থ যে একই গ্রন্থ, সে সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

এই কুট্টনীমত গ্রন্থে যে কোনও বিশেষ ঐতিহাসিক তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে, কাব্যমালার সম্পাদকগণের মনে তাহা উদিত হয় নাই। গ্রন্থখানির প্রাচীনতা, দুষ্প্রাপ্যতা ও কাব্যাংশে উপাদেয়তা দেখিয়াই তাঁহারা সযত্নে ইহা

---

* রাজতরঙ্গিণীর চতুর্থ তরঙ্গের ৪৮৭। ৪৮৮। ৪৯৪। ৪৯৫। ৪৯৬ সংখ্যক শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য।

† বোম্বাই নির্ণয়সাগর যন্ত্র হইতে প্রকাশিত কাব্যমালার তৃতীয় গুচ্ছ দেখুন।

প্রকাশিত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক তত্ত্ব অবগত হইয়াছি। তন্মধ্যে কেবল বর্ত্তমান-প্রবন্ধবিষয়ক তত্ত্বেরই এ স্থলে উল্লেখ করিতেছি।

কুট্টনীমত গ্রন্থের ৯২৫ সংখ্যক শ্লোকে রত্নাবলী নাটিকার প্রশংসাসূচক নিম্নলিখিত শ্লিষ্ট কবিতাটি দৃষ্ট হয়,—

"আশ্লিষ্ট-সন্ধি-বন্ধং সৎপাত্রসুবর্ণযোজিতং সুতরাম্।
নিপুণপরীক্ষকদৃষ্টং রাজতি রত্নাবলীরত্নম্ ॥"

সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক দেখিবেন যে, এই শ্লোকটি শ্লেষালঙ্কারঘটিত বলিয়া ইহার বিশেষণপদগুলি নাটিকা ও রত্নপক্ষে তুল্যভাবে অন্বিত হইতেছে! কেবল কুট্টনীমত গ্রন্থে এইরূপে রত্নাবলী নামটির উল্লেখ থাকিলে, ইহা শ্রীহর্ষদেবের রত্নাবলীবিষয়ক কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারিত। কিন্তু কুট্টনী-মতের ৮৫৭ হইতে ৯০৬ সংখ্যক আর্য্যা শ্লোকগুলিতে প্রসঙ্গক্রমে শ্রীহর্ষদেবের রত্নাবলী নাটিকার প্রথমাঙ্কের তাবৎ অভিনয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে; কুট্টনী-মতের বর্ণনা আর্য্যাচ্ছন্দে সংক্ষেপে রত্নাবলীর তাৎপর্য্যানুবাদ বলিলেও হয়। এমন কি,—কুট্টনীমতের ৯০৩ সংখ্যক শ্লোকে রাজা উদয়নের মুখে রত্নাবলীর প্রথমাঙ্কের শেষভাগের,—

"উদয়নাগান্তরিতমিয়ং প্রাচী সূচয়তি দিঙ্ নিশানাথম্।
পরিপাণ্ডুনা মুখেন প্রিয়মিব হৃদয়স্থিতং রমণী ॥"

এই কবিতাটি অবিকল দেখা যায়। রত্নাবলীর এই শ্লোকটি আর্য্যাচ্ছন্দে রচিত বলিয়া দামোদর গুপ্ত তাঁহার আর্য্যাচ্ছন্দে বিরচিত কুট্টনীমত গ্রন্থে এই শ্লোকটি অবিকল উদ্ধৃত করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু অন্য স্থলে সেই-রূপ না পারিয়া সংক্ষেপে আর্য্যাচ্ছন্দে তাৎপর্য্যানুবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, কুট্টনীমত পাঠে এইরূপ অনুমান হয়। সে যাহা হউক, কুট্টনীমতের বর্ণিত এই বিষয়টি ইহার উপাখ্যানভাগের সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ যে, কোনরূপেই এই সকল বর্ণনা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে না। সুতরাং ইহা দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে যে, কুট্টনীমত-রচয়িতা দামোদর গুপ্তের সময়ে রত্নাবলী নাটিকা বর্ত্তমান আকারে প্রচলিত ছিল। দামোদর গুপ্ত যে ৭৫৫ হইতে ৭৮৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং কাশ্মীররাজ হর্ষদেবের রাজ্যকালের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে যে রত্নাবলী নাটিকার প্রসিদ্ধি ছিল, এবং এ জন্য কোনরূপেই

যে তাহা কাশ্মীররাজ হর্ষদেবের রচিত হইতে পারে না, ইহা নিঃসন্দিগ্ধ-রূপে প্রমাণিত হইল।

রত্নাবলী-কার সম্বন্ধে হল্ সাহেবের মত ও ন্যায়রত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক তাহার সমালোচনা সম্বন্ধে আমাদিগের যাহা বক্তব্য, তাহা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি; একণে রত্নাবলী-কার সম্বন্ধে পণ্ডিতবর রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতের সমালোচনা করা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে আমাদিগের নিজের যাহা মত, তাহা বলিয়া উপসংহার করিব।

রাজকৃষ্ণ বাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ধাবক কবি রত্নাবলী রচনা পূর্ব্বক কান্যকুব্জাধিপতি শ্রীহর্ষের নামে প্রচারিত করিয়া প্রচুর ধন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, এই শ্রীহর্ষের কথাই মম্মট ভট্ট কাব্যপ্রকাশে "শ্রীহর্ষাদের্ধাবকাদীনামিব ধনং" এই বাক্যে বলিয়া গিয়াছেন। রাজকৃষ্ণ বাবু এই পাঠের অনুকূল কতকগুলি টীকাকারের ব্যাখ্যাও উদ্ধৃত করিয়াছেন। কাব্যপ্রকাশের এই পাঠ সম্বন্ধে যে নূতন তত্ত্বের বিষয় আমরা পূর্ব্বে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিয়াছি, তদ্দ্বারাই রাজকৃষ্ণ বাবুর এই অনুমানটি নিরাকৃত হইতেছে। তবে তিনি যে যুক্তির সাহায্যে কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনকেই রত্নাবলীর রচয়িতৃরূপে খ্যাত শ্রীহর্ষ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, সেই যুক্তিটি বিলক্ষণ সুবিবেচনার পরিচায়ক; আমরা নিম্নে তাঁহার সেই যুক্তিটি অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি;—

"একণে দেখা যাউক, অন্য কোন শ্রীহর্ষের প্রতি রত্নাবলীর আরোপ করা যায় কি না? রত্নাবলী ও নাগানন্দ এই দুইখানি সংস্কৃত নাটক রাজা শ্রীহর্ষের রচিত বলিয়া উভয় গ্রন্থের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত হইয়াছে। নান্দ্যন্তে সূত্রধারের উক্তি উভয় গ্রন্থেই প্রায় এক প্রকার। নান্দীতে দেখা যায় যে, রত্নাবলীতে হরপার্ব্বতী ও নাগানন্দে বুদ্ধদেবকে নমস্কার করা হইয়াছে। ইহাতে জানা যায় যে, যে রাজার নামে গ্রন্থদ্বয় পরিচিত, তিনি এক সময়ে হিন্দু ও অপর সময়ে বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন। কান্যকুব্জাধিপতি শ্রীহর্ষ বা হর্ষবর্দ্ধন, যিনি একটি অব্দ সংস্থাপন করেন, তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ কথা এক প্রকার বলা যাইতে পারে। যখন কাদম্বরী-কার বাণভট্ট হর্ষচরিত নামে তদীয় জীবনচরিত রচনা করেন, তখন বোধ হয়, তিনি হিন্দু ছিলেন। নতুবা হিন্দু গ্রন্থকার তাঁহাকে বাড়াইতে যাইবেন কেন? যখন চীনদেশীয় পর্য্যটক হুয়েন্থসাঙ্ এতদ্দেশে ভ্রমণে আগমন করিয়া তাঁহাকে সমুদয় আর্য্যা-

বর্ত্তের সম্রাট্‌পদে প্রতিষ্ঠিত দেখেন, তখন তিনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। মধুসূদন ভাববোধিনী নাম্নী ময়ূরশতকের টীকায় লিখিয়াছেন যে, বাণভট্ট যে হর্ষের সভাপণ্ডিত ছিলেন, সেই শ্রীহর্ষই রত্নাবলীর রচয়িতা। মধুসূদনের গ্রন্থ সংবৎ ১৭১১ অর্থাৎ ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত। সুতরাং আমরা যে মতের সমর্থনের জন্য চেষ্টা পাইতেছি, তাহা অন্ততঃ দুই শত বৎসরের পূর্ব্বে এতদ্দেশের পণ্ডিতসমাজের গ্রাহ্য ছিল, এরূপ বোধ হয়।"

"শ্রীহর্ষ এক জন দিগ্বিজয়ী রাজা; তিনি নাটকাদি লিখিবেন, ইহা সম্ভবপর নহে। কিন্তু রাজ্যবিস্তার দ্বারা তিনি যদ্রূপ যশোলাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ স্বনামে গ্রন্থপ্রচার দ্বারা যশস্বী হইতে চেষ্টা পাইবেন, এবং তজ্জন্য লেখকদিগকে প্রচুর অর্থ দ্বারা সন্তুষ্ট করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে।"

ধাবকের সম্বন্ধে রাজকৃষ্ণ বাবুর অনুমান অগ্রাহ্য হইলেও, তিনি যে যুক্তির সাহায্যে হর্ষবর্দ্ধনকে রত্নাবলী-কার-রূপে খ্যাত শ্রীহর্ষ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহার কোন ক্ষতি হয় না। রাজকৃষ্ণ বাবুর এই যুক্তিটির অনুকূল যে তত্ত্বগুলি জানা যায়, আমরা তাহাও এ স্থলে বলিতেছি,—

দিগ্বিজয়ের পূর্ব্বে যে শ্রীহর্ষ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাহা কেবল এইরূপ অনুমান কেন, হর্ষচরিত হইতেই সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। হর্ষবর্দ্ধন কান্যকুব্জের সম্রাটপদে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, পরিব্রাজক হুয়েন্‌সাঙ্‌ যে তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী দেখিয়াছিলেন, হর্ষচরিত হইতে এই বিষয়টিরও সত্যের পোষকতা করা যাইতে পারে। কেন না, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হর্ষচরিতের অষ্টম উচ্ছ্বাস পাঠে জানা যায় যে, হর্ষবর্দ্ধন তাঁহার সমকালীন দিবাকর নামক সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধসন্ন্যাসীর নিকট বৌদ্ধমতে দীক্ষিত হইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। রত্নাবলী ও নাগানন্দ যে এক ব্যক্তির রচিত, তৎসম্বন্ধে পণ্ডিতগণমধ্যে কোনও মতভেদ দৃষ্ট হয় না। রত্নাবলী-কার সম্বন্ধে দুই শত বৎসর পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণমধ্যে যে কি মত প্রচলিত ছিল, তাহাও রাজকৃষ্ণ বাবুর উল্লিখিত ভাববোধিনী টীকাকার মধুসূদনের উক্তি দ্বারাই জানা যাইতেছে; এরূপ অবস্থায় রাজকৃষ্ণ বাবু যে "ধাবক" সম্বন্ধে একটি অনুমানের উপর আত্যন্তিক বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ধাবককে রত্নাবলী-কার বলিয়া স্থির করিয়াছেন, ইহা আমাদিগের মতে যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই। রাজকৃষ্ণ বাবু যে কারণে হর্ষবর্দ্ধন বা শ্রীহর্ষ কর্ত্তৃক রত্নাবলী রচিত হওয়া অসম্ভবপর বলিয়াছেন, তাহা কোনরূপেই বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। দিগ্বিজয়ী রাজা

ছিলেন বলিয়া যে হর্ষবর্দ্ধন বা শ্রীহর্ষ নাটকাদির রচনা করিতে পারেন না, এইরূপ অনুমানের কোনও মূল আছে কি? বাণভট্ট হর্ষদেবের জীবনচরিত লিখিতে গিয়া তাঁহাকে বাড়াইয়া থাকিতে পারেন, এই আশঙ্কায় আমরা প্রমাণস্থলে এ সম্বন্ধে হর্ষচরিতের কোনও উক্তির উল্লেখ করিব না। নতুবা হর্ষবর্দ্ধন যে সর্ব্ববিদ্যায় ও কলাশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, হর্ষচরিত হইতে এইরূপ অনেক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারিত। সে যাহা হউক, হর্ষবর্দ্ধনও নিতান্ত ধার্ম্মিক ও জিতেন্দ্রিয় রাজা ছিলেন; তিনি যে অলীক যশোলাভের আশায় অপরের দ্বারা নিজের নামে কাব্যপ্রচার করাইতে যাইবেন, ইহা কত দূর সম্ভবপর, সহৃদয় ব্যক্তিগণই বিবেচনা করিবেন। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, বিস্তীর্ণ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস হইতে এইরূপ আর দুই একটি দৃষ্টান্তও কেহ দেখাইতে পারেন কি? বিক্রমাদিত্য, শালিবাহন, জয়াপীড়, মুঞ্জ, ভোজ, লক্ষ্মণসেন প্রভৃতি বিদ্যোৎসাহী রাজগণ বহুসংখ্যক কবি ও পণ্ডিতগণকে প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা অপরের দ্বারা নিজের নামে কোনও গ্রন্থ প্রচার করাইয়াছেন কি? বস্তুতঃ, এই বিষয়টি এরূপ অভূতপূর্ব্ব, অস্বাভাবিক ও প্রকৃত গুণগ্রাহিজনের অযোগ্য যে, আমরা সন্তোষের সহিত বলিতে পারি,—প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তের বিষয় আমরা অবগত নহি।

হল্ সাহেবের মতাবলম্বী কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, বুলার সাহেবের আবিষ্কৃত ও আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনুমোদিত কাব্যপ্রকাশের "শ্রীহর্ষাদের্বাণাদীনামিব ধনং" এইরূপ পাঠদর্শনে জানা যায় যে, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি রাজগণ হইতে বাণ প্রভৃতি কবিগণ ধনলাভ করিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে আমরা বলি যে, কাব্যপ্রকাশের মতে কেন, স্বয়ং বাণভট্টই হর্ষচরিতে সবিস্তরে লিখিয়াছেন যে, তিনি হর্ষবর্দ্ধন বা শ্রীহর্ষ কর্ত্তৃক সাদরে পরিগৃহীত ও পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা দ্বারা তিনি যে রত্নাবলী রচনা করিয়াছিলেন, এরূপ বুঝায় কি? বিদ্যোৎসাহী রাজগণ চিরকাল কবি ও পণ্ডিতগণের সমাদর ও আনুকূল্য করিয়া আসিতেছেন। এ সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস হইতে শত শত প্রমাণের প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রাজতরঙ্গিণীর চতুর্থ তরঙ্গের ৪৯৪ সংখ্যক শ্লোকে লিখিত আছে, জয়াপীড় নৃপতি প্রত্যহ লক্ষ দীনার (মুদ্রাবিশেষ) বেতন প্রদান করিয়া পণ্ডিত উদ্ভট ভট্টকে সভাপতি করিয়াছিলেন। উদ্ভট ভট্ট ত রাজা জয়াপীড়ের নামে কোনও গ্রন্থের

প্রচার করেন নাই; সুতরাং যদি তাঁহার ও অন্যান্য পণ্ডিতগণের সম্বন্ধে এইরূপ কোনও কথা না থাটে, তবে বাণভট্ট সম্বন্ধে কাব্যপ্রকাশের এইরূপ একটি সহজবোধ্য উক্তির এরূপ দুর্ব্বোধ্য ও অস্বাভাবিক অর্থ করিবার প্রয়োজন কি? সুতরাং আমাদিগের বিবেচনায় প্রমাণান্তরের অভাবে কাব্য-প্রকাশের এইরূপ পাঠ হইতে, বাণভট্ট কর্ত্তৃক রত্নাবলী রচিত হওয়ার অনুকূলে কোনও প্রমাণই পাওয়া যায় না। ফলতঃ, রাজকৃষ্ণ বাবুর যুক্তিটির সমালোচনাস্থলে আমরা যে কতকগুলি তত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছি, তদনুসারে, আমাদিগের বিবেচনায়, রত্নাবলী কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন বা শ্রীহর্ষদেবের রচিত বলিয়াই স্থির করা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে অনুকূল যুক্তিগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহার বিরুদ্ধে আরও যে দুই একটি আপত্তি উত্থাপিত করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব।

প্রথমতঃ, অনেকে হয় ত বলিবেন যে, কান্যকুব্জাধিপতির নাম যে হর্ষবর্দ্ধন ছিল, বাণরচিত হর্ষচরিতপাঠে তাহা অবগত হওয়া যায়। রত্নাবলী ও নাগানন্দের প্রস্তাবনায় রাজা শ্রীহর্ষ উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। এক্ষণে হর্ষবর্দ্ধনকে কিরূপে শ্রীহর্ষ বলা যাইতে পারে? রাজকৃষ্ণ বাবু কোনও প্রমাণ প্রয়োগ না করিয়াই হর্ষবর্দ্ধনকে শ্রীহর্ষ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে?

আমাদিগের বিবেচনায় এই আপত্তিটি বিশেষ গুরুতর নহে; সহজেই ইহার খণ্ডন করা যাইতে পারে। হর্ষচরিতে যদিও কান্যকুব্জাধিপতির হর্ষবর্দ্ধন এই সম্পূর্ণ নামটি দেখা যায়, তথাপি বাণভট্ট অনেক স্থলেই ইহার পরিবর্ত্তে কেবল "হর্ষ" নামটির ব্যবহার করিয়াছেন। * "হর্ষচরিত" এই গ্রন্থনামটি হইতেও ইহা বুঝা যাইতে পারে। এই "হর্ষ" নামের পূর্ব্বে চিরপ্রচলিতরীত্যনুসারে "শ্রী" শব্দের যোগ করিয়াই "শ্রীহর্ষ" নামটি হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আরও একটি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। আমরা হল্ সাহেবের মতের সমালোচনাকালে শার্ঙ্গধরপদ্ধতির "অহো প্রভাবো বাগ্দেব্যাঃ" ইত্যাদি যে শ্লোকটির উল্লেখ করিয়াছি, তাহার যেরূপ পাঠভেদই থাকুক, ঐ শ্লোকের "শ্রীহর্ষস্য" পদটি যে কান্যকুব্জাধিপতিকে বুঝায়, তৎসম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই। বস্তুতঃ, হর্ষচরিতের সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে গেলে

* বোম্বাই নির্ণয়সাগর যন্ত্র হইতে প্রকাশিত সটীক হর্ষচরিতের প্রথম উচ্ছ্বাসের একবিংশ শ্লোক এবং ৮৫ ও ১৬৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

নিশ্চিতই বলিতে হইবে যে, শার্ঙ্গধরপদ্ধতির "শ্রীহর্ষ" দ্বারা হর্ষবর্দ্ধনকে বুঝাইতেছে. সুতরাং এরূপ অবস্থায় আমাদের বিবেচনায় হর্ষবর্দ্ধনকে শ্রীহর্ষ বলার বিরুদ্ধে কোনও আপত্তি হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, বাণভট্ট হর্ষচরিত লিখিতে গিয়া শ্রীহর্ষের চরিত্র যে কিয়ৎপরিমাণে অতিরঞ্জিত করিবেন, ইহা সম্ভবপর বটে। ফলতঃ, বাণভট্ট শ্রীহর্ষের চরিত্র অতিরঞ্জিত করিয়াছেন কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু তাঁহাকে যে অতিশয় প্রশংসাভাজন করিয়াছেন, হর্ষচরিতেই তাহার সমুজ্জ্বল প্রমাণ দেখা যায়। এরূপ অবস্থায় তিনি রত্নাবলী রচনা করিয়া থাকিলে বাণভট্ট তাঁহাকে সাধারণভাবে "সর্ব্ব বিদ্যায় ও কলাশাস্ত্রে পারদর্শী" বলিয়া ক্ষান্ত না থাকিয়া, রত্নাবলীর রচয়িতা বলিয়া কি উল্লেখ করিতেন না? যাঁহারা এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে বোধ হয়, এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কোনও বিষয়ের অনুল্লেখ সেই বিষয়ের অস্তিত্বাভাবের নিশ্চিত প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। সে যাহা হউক, আমাদিগের বিবেচনায়, বাণভট্ট কর্ত্তৃক হর্ষচরিতে রত্নাবলীর অনুল্লেখের একটি বিশিষ্ট কারণ অনুমিত হইতে পারে। আমরা নিম্নে তাহা লিখিতেছি।

রাজকৃষ্ণ বাবু রত্নাবলী ও নাগানন্দের নান্দীদর্শনে স্থির করিয়াছেন যে, শ্রীহর্ষ পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী থাকার সময়ে রত্নাবলী ও পরে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলে নাগানন্দ রচিত হইয়াছিল। কিন্তু অনেক তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সহৃদয় সমালোচক পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিয়া ইহার বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। পূজ্যপাদ স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় রত্নাবলী নাটিকার কবিত্বের সমালোচনায় যেরূপ অসাধারণ সহৃদয়তা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন, বঙ্গসাহিত্যে সেরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল; তিনি পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ের পরস্পর তুলনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, "নাগানন্দ কবির প্রথম প্রসূত ও বোধ হয়, তাঁহার নবীন বয়সেরই সন্তান।" আমাদিগের বিশ্বাস, ভূদেব বাবুর এই অনুমানটি অমূলক নহে। এই কথাটি মনে রাখিলে, বাণভট্ট যে কি জন্য হর্ষচরিতে রত্নাবলীর উল্লেখ করেন নাই, এই রহস্যটি সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাইতে পারে। হর্ষচরিতপাঠে জানা যায় যে, হর্ষদেবের পিতা ও অগ্রজের মৃত্যু হওয়ায়, অতি অল্প বয়সেই সাম্রাজ্যের শাসনভার তাঁহার হস্তে পতিত হয়। বাণভট্ট হর্ষদেবের জীবনচরিত লিখিতে গিয়া অষ্টম উচ্ছ্বাসে হর্ষদেবের দিগ্বিজয়াস্তে

বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণের প্রতিজ্ঞা ও তাঁহার দিগ্বিজয়ের উদ্যোগের বর্ণনা করিয়াই গ্রন্থ পরিসমাপ্ত করিয়াছেন। নাগানন্দ নাটকখানি যে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বনের পরে রচিত হইয়াছিল, রাজকৃষ্ণ বাবুর এই অনুমান সম্বন্ধেও মতভেদ দেখা যায় না। দিগ্বিজয়ান্তে বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণকালে যে হর্ষদেবের নবীন বয়স ছিল, তাহা হর্ষচরিতপাঠেই বেশ বুঝা যায়। এরূপ অবস্থায় নাগানন্দ নাটকখানি হর্ষদেবের প্রথম প্রসূত হইলে, তাহা যে তাঁহার নবীন বয়সেরই রচনা, তাহা বেশ বুঝা যায়। ইহা যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে বাণভট্ট কিরূপে হর্ষচরিতে নাগানন্দ অথবা রত্নাবলী হর্ষদেবের রচিত বলিয়া উল্লেখ করিতে পারেন? বাণভট্ট ত শ্রীহর্ষের বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণ ও তাহার পরবর্ত্তী জীবনচরিতের বর্ণনা করেন নাই। বোধ হয়, বাণভট্টের ন্যায় হিন্দুকবির পক্ষে ঐরূপ বিষয়ের বর্ণনা করা অপ্রীতিকর বলিয়াই বাণভট্ট শ্রীহর্ষের দিগ্বিজয়ের উপক্রমেই গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এরূপ অবস্থায় বাণভট্ট নাগানন্দ বা রত্নাবলীর উল্লেখ করিতে পারেন না। তবে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, শ্রীহর্ষ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া প্রথমেই নাগানন্দ রচনা করিয়াছিলেন, এইরূপ স্বীকার করিলে, তিনি পরে বৌদ্ধ অবস্থায় থাকিয়া রত্নাবলী রচনা করিতে গিয়া হিন্দুদেবদেবী হরপার্ব্বতীকে কি জন্য নান্দীতে নমস্কার করিবেন? আমাদিগের বিবেচনায়, ইহার দুইটি সদুত্তর দেওয়া যাইতে পারে।

১ম। হুয়েন্থসাঙের ভ্রমণবৃত্তান্তপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, শ্রীহর্ষের রাজ্যকালে হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও বিশেষ বিদ্বেষভাব ছিল না। শ্রীহর্ষ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বন করিয়াও হিন্দু ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণকে তুল্যরূপে সমাদর ও দানাদি করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায়, হিন্দুদেবদেবীগণের প্রতি যে তাঁহার অশ্রদ্ধা ছিল, ইহা কিরূপে বুঝা যাইতে পারে? বিশেষতঃ, লৌকিক বৌদ্ধধর্ম্মে হিন্দুদেবদেবীগণের সত্তা অস্বীকৃত হয় নাই। তবে স্বর্গাদি সুখফলের দাতা ইন্দ্রাদি দেবগণ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মে নির্ব্বাণফলদাতা বুদ্ধদেবের প্রতি সমধিক শ্রদ্ধা অর্পিত হইয়াছে। সুতরাং এরূপ অবস্থায় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও শ্রীহর্ষের পক্ষে হরপার্ব্বতীর নমস্কার অসম্ভবপর নহে।

২য়। ভূদেব বাবু তাঁহার রত্নাবলীর সমালোচনায় দেখাইয়াছেন যে, রত্নাবলীর নান্দীর শ্লোকগুলি অপূর্ব্ব কৌশলে রচিত হইয়াছে; তাহাতে হরপার্ব্বতীর নমস্কার অর্থ ভিন্ন কৌশলক্রমে রত্নাবলীর সমুদায় অঙ্কের বর্ণনীয়

প্রধান বিষয়গুলির আভাষ প্রদত্ত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় রত্নাবলীর নান্দীর শ্লোকগুলি অভিনিবেশসহকারে পাঠ করিলে প্রতীত হইবে যে, দেবতার নমস্কারচ্ছলে এইরূপে বর্ণনীয় বিষয়ের আভাষ দিতে হইলে, কবি হিন্দুদেব-দেবীগণের সাহায্য ভিন্ন, কেবল বুদ্ধদেবের নমস্কারসূচক শ্লোকে কোনরূপেই তাহা সম্পন্ন করিতে পারিতেন না। উদয়ন রাজার প্রণয়িনী বাসবদত্তা ও রত্নাবলী বা সাগরিকা ; তাঁহাদের কার্য্যের আভাস দিতে হইলে হয় শিবের পত্নী পার্ব্বতী ও গঙ্গা; না হয় বিষ্ণুর পত্নী লক্ষ্মী ও সরস্বতীর কথা আনিতে হইবে। কিন্তু বুদ্ধদেব বা তাঁহার এক স্ত্রী গোপার কথা বলিয়া ত রত্নাবলীর তৃতীয়াঙ্কের বর্ণনীয় বিষয়ের আভাস কোনরূপেই দেওয়া যাইতে পারে না। সুতরাং এরূপ অবস্থায় কবি যে ইষ্টসিদ্ধির জন্যই এইরূপ নান্দীর রচনা করিয়াছেন, ইহাও ত বলা যাইতে পারে।

যখন "অন্বয়ী" হেতু দ্বারাই হর্ষবর্দ্ধন বা শ্রীহর্ষকে রত্নাবলী-কার বলিয়া স্থির করা যাইতেছে, তখন আর অধিক "ব্যতিরেকী" হেতু দেখাইবার আবশ্যক কি? বস্তুতঃ, বাণভট্ট-রচিত হর্ষচরিত, কাদম্বরী, চণ্ডীশতক ও পার্ব্বতী-পরিণয় নামক গ্রন্থগুলির রচনার সহিত রত্নাবলী ও নাগানন্দের তুলনা করিলে, এই গ্রন্থগুলি যে এক ব্যক্তির রচিত নহে, তাহা উত্তমরূপে প্রমাণিত করা যাইতে পারে।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

সমালোচনা।

সাহিত্যে সমালোচনার উপযোগিতা ও উপকারিতা অস্বীকার করা যায় না। শিল্পী শিল্প-কার্য্য শেষ করিয়াই নিরস্ত হয়েন, সমালোচক তাহার দোষগুণের বিচার করেন; সেই দোষ-গুণের বিচারফলে শিল্পীর ভবিষ্যৎ শিল্প উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়; তবেই এ কথা স্বীকার করিতে হয় যে, সাহিত্যে সমালোচনার উপকারিতা যথেষ্ট। কেহ কেহ দৃষ্টান্তস্বরূপ এ কথাও বলিয়া থাকেন যে, ইংরাজী সাহিত্যে প্রকৃত সমালোচনার অভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভাল রচনারও অভাব হইয়া পড়িতেছে। যখন "কোয়ার্টার্লি রিভিউ", "এডিনবরা রিভিউ"

প্রভৃতি পত্রে তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হইত, তখন ইংরাজী সাহিত্যে যত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, এখন আর তেমন হয় না। কেন? কেহ কেহ বলেন, ইহার কারণ সমীচীন সমালোচনার অভাব। কেহ কেহ ইহাও মনে করেন যে, "কোয়ার্টার্লির" অতিরিক্ত তীব্র সমালোচনাই কিট্‌সের অকালমৃত্যুর কারণ। সেই সমালোচনার উপসংহারভাগে সমালোচক যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার ভাবার্থ এইরূপ,—যদি কোনও পাঠক সাহস করিয়া এই পুস্তক (Endymeon) ক্রয় করেন, আমাদিগের অপেক্ষা অধিক সহিষ্ণুতাবশতঃ প্রথম সর্গের অধিকও পাঠ করেন, এবং যদি ইহার কোনরূপ অর্থ বুঝিতে পারেন, তবে যেন সে কথা অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে জ্ঞাপন করেন; তাহা হইলে, এবার যাহা পারিব না বলিয়া হতাশ হইয়াছি, ইহার পর তাহা সম্পাদন করিবার চেষ্টা করিব। অস্মদ্দেশে সাহিত্যসেবা নিতান্তই সখের জিনিষ; তজ্জন্য সাহিত্যসেবীরাও অসাধারণ সুক্ষ্মচর্ম্মী। কেহ আমাদিগের রচনার সমালোচনা করিয়া কেবল প্রশংসা না করিয়া কোনরূপ দোষ দেখাইলে, আর আমাদিগের সুখ হয় না। আমরা তাহার প্রতিবাদে সমালোচকের যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি না দেখাইয়া তাঁহার উপর কেবল গালি বর্ষণ করি। আমাদিগের আত্মীয়, বন্ধু বা আশ্রিত অনুগতদিগের মধ্যে কেহ সমালোচককে গালি দিবার ভার গ্রহণ না করিলে, আপনারাই মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া, বা সভা ডাকিয়া, সমালোচককে গালি দিয়া, আদর্শের ক্ষুদ্রতা, উদ্দেশ্যের হীনতা ও হৃদয়ের নীচতার পরিচয় প্রদান করি, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিতৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকি। আবার আমাদিগের "লিটারারী" মোসাহেবগণ আমাদিগের এইরূপ কার্য্যকেও মহৎ কার্য্য বলিয়া আমাদিগকে আত্মদোষের বিষয়ে অন্ধ করিতে ত্রুটী করে না। ক্রমে আমরা আপনারাই মনে করিতে আরম্ভ করি যে, আমাদিগের কোথাও কোনরূপ অসম্পূর্ণতা নাই। স্তাবকদিগের মিথ্যা প্রশংসা শুনিতে শুনিতে অবস্থা এমনই দাঁড়ায় যে, মন আপনার কাছে আপনি মিথ্যা কথা কহে ও আপনি সেই মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করে।

সম্প্রতি ইংলণ্ডের অন্যতম খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক মিষ্টার মারে তাঁহার সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদিগের সম্বন্ধে যে পুস্তক লিখিয়াছেন, (My Contemporaries in Fiction) তাহা পাঠ করিলে, এবং যদি তাঁহাদিগের বিচারশক্তি একেবারে বিলুপ্ত না হইয়া থাকে, তবে তাঁহার কথাগুলি বিচার করিয়া দেখিলে, অস্মদ্দেশীয় সুক্ষ্মচর্ম্মী সাহিত্যসেবকদিগের অনেক উপকার হইতে পারে।

লেখক বলিয়াছেন, আজ কাল ইংরাজী সাহিত্যের প্রকৃত সমালোচনার অত্যন্ত অভাব। এখন সমালোচক আর সমালোচক নহেন, পেশাদার স্তাবকমাত্র। লেখকের এই কথা

সমালোচনার অভাব।

হইতে করেলি প্রভৃতি ঔপন্যাসিকদিগের সমালোচকদিগের প্রতি ঘৃণার কারণ বুঝিতে পারা যায় না। এখন সমালোচনা সাধারণতঃ নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসামাত্র, কচিৎ—"না মিষ্ট, না টক।" এরূপ সমালোচনায় সাহিত্যের যথেষ্ট ক্ষতি ভিন্ন কিছুমাত্র লাভ নাই, হওয়া সম্ভবও নহে। সমালোচক স্বভাবতঃই পাঠকদিগের মতামত অবগত থাকেন, থাকিয়াও লেখকদিগের নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসামাত্র করিলে এ কথা স্বীকার করিতে হয় যে, তিনি আপনার কর্ত্তব্য অবহেলা করিতেছেন। লেখক বলেন যে, অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে "কোয়ার্টার্লি" প্রভৃতি পত্রের সুতীক্ষ্ণ বাণও সাহিত্যের পক্ষে মঙ্গলকর ছিল, কিন্তু আজকালকার সমালোচকদিগের নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসা বড়ই অমঙ্গলজনক। সেই জন্য মিষ্টার মারে তাঁহার সহযোগীদিগের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি প্রশংসনীয় পুস্তকের প্রশংসা করিতে ত্রুটী করেন নাই,

কিন্তু তিনি দোষের প্রতিও দৃষ্টিহীন নহেন। তাঁহার সমালোচনায় উদারতা ও মৌলিকতা দেখিয়া প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। কিন্তু বক্ষ্যমাণ পুস্তকের বিশেষ গুণ এই যে, যে সকল অযোগ্য লেখক কেবল সংবাদপত্রের সমালোচনার কৃপায় পাঠকদিগকে ঠকাইয়া খাইতেছে, তাহাদিগের আসল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। আজকালকার সমালোচনার একটা দৃষ্টান্ত এইরূপ,—

আজকালকার সমালোচনায় সচরাচর দেখা যায়, "এই পুস্তকখানি স্কটের উপন্যাসের অপেক্ষা যদি উৎকৃষ্টও না হয়, তবে যে তাহার সমান, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।" ঔপন্যাসিক ব্যারির একখানি উপন্যাস পাঠ করিয়া তাঁহার মধুর হাস্যরস ও কোমল করুণরসে মুগ্ধ কোনও পাঠকের পক্ষে সন্তোষাধিক্যে এ কথা বলা অসম্ভব নহে যে, ব্যারির A Window in Threems স্কটের উপন্যাসের সমান।

একটা দৃষ্টান্ত।

কিন্তু তাহা গুণমুগ্ধ পাঠকের কথা, সমালোচকের কথা নহে। দোষগুণের বিচার না করিয়া সহসা একটা কথা বলা সময় সময় স্বাভাবিক হইলেও, তাহা সমালোচকের কার্য্য নহে। সেরূপ কথা বৈঠকখানায় বসিয়া বন্ধুবান্ধবের কাছে বলিলে শোভা পায়, কিন্তু সমালোচনা-স্থলে সাধারণসমক্ষে সেরূপ কথা প্রকাশ করিলে অন্যায় হয়। কোনও এক জন লেখকের সম্বন্ধে এরূপ কথা বলিলেও না হয় চলিত, কিন্তু পুনঃপুনঃ নানা লেখক সম্বন্ধে সেই একই কথা বলিলে সন্দেহের কারণ জন্মে। আবার আজ ব্যারির সম্বন্ধে যে কথা বলা হইল, কাল ক্রোকেটের সম্বন্ধে ঠিক সেই কথাই বলিলে, ব্যাপারখানা কি, তাহা বুঝা কঠিন হইয়া উঠে। লেখক বলেন, এই সকল সমালোচক বা স্তাবকদিগের প্রশংসাবাদ ছাড়িয়া দিয়া, প্রকৃতপক্ষে বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, মিষ্টার ক্রোকেট শ্রমশীল লেখক, এই পর্য্যন্ত; স্কটের মুকুট পরিবার মত ক্ষমতা তাঁহার নাই। ক্রোকেট আপনি ব্যারির প্রদর্শিত পথে তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছেন; কিন্তু যে প্রতিভা ও যে মানবচরিত্রজ্ঞান থাকিলে স্বভাবতঃ নীরস বস্তুকে সরস করিয়া, যে উপাখ্যানবস্তুতে (Plot) স্বভাবতঃ মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না, সেই আখ্যানবস্তুতেও পাঠকের অবধান আকৃষ্ট করা যায়, সে প্রতিভা, সে মানবচরিত্রজ্ঞান ক্রোকেটের নাই। এইটুকুই সমালোচকগণ দেখিতে পান না, বা ইচ্ছা করিয়া দেখেন না।

আমাদিগের আলোচ্য পুস্তকে মিষ্টার মারে আর একটা কথা বলিয়াছেন। আজ কাল কোনও কোনও ঔপন্যাসিক ইংরাজী উপন্যাসে ফরাসী উপন্যাসের উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতার আমদানি করিতেছেন। লেখকের মতে ইহা কোনও ক্রমেই সমীচীন নহে। এই ঔপন্যাসিকদিগের দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই জনের নাম উল্লিখিত

শ্লীল ও অশ্লীল।

হইয়াছে,—টমাস হার্ডি ও জর্জ্জ মুর। দুই জনের রচনা দুই প্রকারের হইলেও, উভয়ের পুস্তকে একই অনিষ্ট হইতেছে; ফরাসী উপন্যাসের উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতা ইংরাজী উপন্যাসে প্রবেশলাভ করিতেছে। হার্ডি নিপুণ চিত্রকর; তাঁহার চিত্রিত চিত্রে যদি বা কোনও ছবি একটু আবৃত থাকে, মুর শিল্পকুশল ফটোগ্রাফার,—তাঁহার চিত্রে—পাপেরই হউক আর পুণ্যেরই হউক, কোনও অংশই বাদ পড়িবে না। তিনি বুঝেন, কিসে চিত্র আদর্শের অনুরূপ হয়। উভয়েরই উপন্যাসে এমন সকল বিষয় আলোচিত হয়, যাহা আলোচিত না হইলেই ভাল হইত। ফরাসী উপন্যাস বালকবালিকার জন্য রচিত হয় না, তাহা প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর জন্য কল্পিত হইয়া থাকে। পাঠক মনে রাখিবেন, ইংরাজীতে অনুবাদ করিবার সময় অনুবাদকদিগকে বহু ফরাসী উপন্যাসের অনেকাংশ পরিহার করিয়া পুস্তক প্রকাশ করিতে হয়। বহু ফরাসী ঔপন্যাসিক পাপের পূতিগন্ধবর্জ্জিত পাপের চিত্র চিত্রিত করিতে পারেন না। তদ্ভিন্ন জমা

হইতে অনেট পর্য্যন্ত উপন্যাসিকদিগের উপন্যাসে ফরাসী সমাজের যে চিত্র চিত্রিত দেখিতে পাই, তাহা নিতান্তই শোচনীয়। বিলাসের বিষম ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সত্য সত্যই কি ফরাসী সমাজে পাপের বিষ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে? ইংরাজী উপন্যাসে সাধারণতঃ ফরাসী উপন্যাসের উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতার অভাব; তাই কোনও ইংরাজ উপন্যাসলেখিকাই বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন যে, যে প্রেম ধর্ম্মমন্দিরের বা অন্ততঃ রেজেষ্টারী আফিসের "সার্টিফিকেট" না পাইয়াছে, ইংরাজী উপন্যাসে সে প্রেমের স্থান নাই। তাঁহার মতে, ইহা ভাল নহে। মিষ্টার মারে বলেন যে, যাহাতে ফরাসী উপন্যাসের আবিলতা ইংরাজী উপন্যাস কলুষিত করিতে না পারে, তাহাই করা কর্ত্তব্য; আর হার্ডিপ্রমুখ লেখকগণ ইচ্ছা করিয়া খাল কাটিয়া ইংরাজী উপন্যাসে সেই আবিলতা আনয়ন করিতেছেন; ইহা কোনও ক্রমেই উচিত নহে।

মিষ্টার মারে তদীয় পুস্তকে তাঁহার সহযোগীদিগের যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ সারসংগ্রহ প্রদান করা সম্ভব নহে। তবে তাঁহার সমালোচনার আর দুই একটি

শেষ কথা।

সংবাদ প্রদান করিয়াই আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। তিনি কিপ্লিং ও হল্ কেনের প্রশংসা করিয়াছেন; মেরি করেলির আকুলতাও তাঁহার নিকট প্রশংসনীয়। লেখকের মতে, মেরিডিথ পাঠকদিগকে তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র সকলের সহিত অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত করাইয়া দেন, এবং তাঁহার হাস্যরসবহুল রচনায় দর্শনের অন্তঃসলিল প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া থাকে।

যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ের Society novels অপেক্ষা প্রাচীন উপন্যাস সকলেরই অধিকতর পক্ষপাতী, তাঁহাদিগের নিকট মিষ্টার মারের গ্রন্থ বিশেষ আদৃত হইবে, সন্দেহ নাই। এ গ্রন্থে মিষ্টার মারে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা সকল দেশের সাহিত্যসেবকদিগের বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

জীবনচরিত।

সারা গ্র্যাণ্ড।

সম্প্রতি সারা গ্র্যাণ্ডের নূতন উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে। নানা সংবাদপত্রে Beth Book তীব্ররূপে সমালোচিত হইয়াছে। সারা গ্র্যাণ্ড তাঁহার উপন্যাসে সমাজের কোন-না-কোন কলঙ্ককাহিনী ঘোর অন্ধকার হইতে উজ্জ্বল আলোকে আনিয়া, তাহার বীভৎসতা ও হীনতা প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করেন। তাহার ফল Heavenly Twins গ্রন্থের পর Beth Book। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থে তিনি দেখাইয়াছেন যে, এখনকার সমাজে পুরুষের দোষ গণ্যই হয় না। অতি পাপপরায়ণ পুরুষও সমাজে আদৃত, কিন্তু সামান্যমাত্র পাপে লিপ্তা রমণীর পক্ষে সমাজের দ্বার রুদ্ধ। অতি পাপপরায়ণ পুরুষও পবিত্রচিত্তা রমণীকে বিবাহ করা আপনার ন্যায়সঙ্গত অধিকার বলিয়া মনে করে; আর সামান্যমাত্র পাপে লিপ্তা রমণীর পক্ষে পাপপরায়ণ পুরুষকে বিবাহ করিবার আশাও দুরাশামাত্র। তাহার উপর আবার যদি পুরুষের কিছু অর্থ থাকে, তবে ত কথাই নাই; কারণ, এখন "Every door is barr'd with gold, and opens but to golden keys!" সে পুস্তকে লেখিকা দেখাইয়াছেন যে, সমাজের এই ভীষণ প্রথার উচ্ছেদ আবশ্যক। পাপপরায়ণ পতির হস্তে পড়িয়া কোমলপ্রাণা পত্নীর কি দুর্দ্দশা হয়, তাহাই চিত্রিত করিয়া লেখিকা বলিয়াছেন,—এইরূপে নিত্য নিত্য শত শত নারীর প্রাণ-বলিদান হইতেছে। মদ্যপ, প্রবৃত্তির উত্তেজনায়

দাস পত্নির দোষে নিত্য নিত্য শত শত বালিকার কোমল হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে;—এ প্রথা পরিত্যক্ত হওয়া নিতান্তই আবশ্যক। বর্ত্তমান পুস্তকে তিনি দেখাইয়াছেন যে, সমাজে জনন্যীর খেয়ালে, দুর্ব্বলতায়, বা স্বার্থপরতায়, অনেক দুহিতার সর্ব্বনাশ হয়; জননীর পাপ-দৈত্যের প্রীতিকামনায় দুহিতাকে বলিদান করা হয়; জনকজননীর অনুরোধে বা আজ্ঞায় দুহিতার সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে। এমন কথা কেহ অস্বীকার করে না যে, সময় সময় যুবক যুবতীরা জনকজননীর আজ্ঞা তুচ্ছ করিয়া আপনাদিগের উপর দেবতার অভিসম্পাত টানিয়া আনে; কিন্তু তাহা সকলেই জানেন; সে কথায় উপন্যাসোপযোগী নূতনত্ব কিছুমাত্র নাই। কিন্তু আর একটা কথা আছে, সেটা লোককে বুঝান আবশ্যক;—জননী যত সত্বর সম্ভব, কন্যার বিবাহ দিবার অভিপ্রায়ে, পাত্রের যোগ্যতাযোগ্যতা বিচার করেন না। সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞা বালিকা জননীর কথায় ভুলিয়া আজীবন নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। কন্যার বিবাহ হইলেই জননীর কর্ত্তব্য শেষ হইল, তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন; কিন্তু অযোগ্য পাত্রে কন্যাসমর্পণ করিয়া, সেই অভাগিনী বালিকাকে চিরদুঃখিনী করিবার অপেক্ষা তাহাকে বিষপান করাইয়া তাহার সকল যন্ত্রণা শেষ করাও যে তাহার পক্ষে মঙ্গলজনক, তাহা জননী বুঝেন না, বা বুঝিতে চাহেন না। কন্যাকে বিষদান করিলে সে পাপের জন্য ফাঁসি-কাঠের ব্যবস্থা আছে; আর কন্যাকে অযোগ্য পাত্রে দান করিলে লজ্জাও নাই।

তাঁহার Beth book নামক পুস্তকে সারা গ্র্যাণ্ড এই কথাই বুঝাইয়াছেন। কিন্তু সারা গ্র্যাণ্ড উপন্যাসে বক্তৃতা করিবার পক্ষপাতী নহেন; তাই এ পুস্তক এমন করিয়া লিখিত যে, যিনি পড়িতে পড়িতে চিন্তা না করিবেন, তিনি পুস্তকের এ উদ্দেশ্য বুঝিতেই পারিবেন না। সেই জন্যই ভিন্ন ভিন্ন সমালোচক পুস্তকের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য স্থির করিয়া, বিভিন্ন-রূপ সমালোচনা করিয়াছেন। ইহারই নাম Art to conceal art.

সারা গ্র্যাণ্ডের নবপ্রকাশিত পুস্তকের (Beth Book) নায়িকা চরিত্রে লেখিকার আপনার জীবনের অনেকটা প্রতিবিম্ব লক্ষিত হইবে। লেখিকার জনকজননী ইংরাজ। পিতা নৌবিভাগে কার্য্য করিতেন। কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে আয়ারল্যাণ্ডের একটি সাগরতীরবর্ত্তী স্থানে থাকিতে হইত। সেইখানেই কন্যার জন্ম হয়। কাজেই সারা গ্র্যাণ্ডের শৈশবস্মৃতির সহিত তরঙ্গচঞ্চল সাগরের দৃশ্য ও অনন্তপ্রসারিত নীল বারিরাশির মৃদু গীতি অবিচ্ছিন্নভাবে বিজড়িত। সারা গ্র্যাণ্ড আপনি বলিয়াছেন যে, ইংরাজ হইলেও, আয়ারল্যাণ্ড তাঁহার জন্মভূমি; তিনি আয়ারল্যাণ্ড বড় ভালবাসেন। বস্তুতঃ, আয়ারল্যাণ্ডে কিছু দিন থাকিলে, সে ভালবাসা আপনি আইসে। সেখানে ভৃত্যেরা সকলেই আইরিশ। আবার লেখিকা দরিদ্র কৃষকদিগের পর্ণকুটীরে নানা উপকথা শুনিয়া সময় কাটাইতেন। শৈশবে উপকথার একটা মাধুরী থাকে। শিশুর কাছে উপকথার সকল চরিত্রই যেন জীবন্ত চরিত্র,—তাহাদিগের সুখে বা দুঃখে শিশুও সুখ বা দুঃখ অনুভব করিতে আরম্ভ করে। সারা গ্র্যাণ্ড আপনি বলিয়াছেন যে, শৈশবে তিনি বড় দুরন্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মত অধ্যয়নে রত ছিলেন না; সকলের কথা শুনায় অভ্যাসও তাঁহার বড় ছিল না। লোকের সহিত কথা কহিয়া যখন এত আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন গৃহে বসিয়া পাঠ করায় যে কি অধিক আনন্দ, তাহা তিনি বুঝিতেন না। তাঁহাকে প্রায়ই ভৃত্যদিগের ঘরে বা কোনও দরিদ্রের কুটীরে পাওয়া যাইত। দরিদ্রকুটীরে দরিদ্রের নিত্য-আহার গোল আলু আর লবণ খাইতে তাঁহার ভাল লাগিত। এই সকল হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, অল্প বয়স হইতেই দরিদ্রদিগের সহিত সারা গ্র্যাণ্ডের সবিশেষ সহানুভূতির অভাব ছিল না; অর্থাৎ, ঔপন্যাসিকের উপযোগী গুণের মধ্যে অন্ততঃ একটির অভাব তাঁহার ছিল না,—

হৃদয়ের অভাব ছিল না। তিনি বলেন যে, আজও তাঁহার সমাজের নিম্নস্তরের সহিত অধিক সহানুভূতি আছে; এখনও সহরের "সোসাইটী"র ফেনিলোচ্ছ্বসিত ঘূর্ণাবর্ত্তে তিনি তত আনন্দ অনুভব করেন না, পক্ষান্তরে দরিদ্রকুটীরে কোনও বৃদ্ধার সহিত গল্প করিয়া প্রচুর আনন্দ সম্ভোগ করেন। পুস্তকপাঠ অপেক্ষা মানব-চরিত্রের অধ্যয়নেই তাঁহার অধিক আনন্দ। জগতে সর্ব্বত্রই "সোসাইটী" আছে; সকল স্থানেই কৃষকসম্প্রদায়ের মধ্যে এমন অনেক লোক দেখা যায়, যাহাদিগের চরিত্র অধ্যয়ন করিলে আনন্দ ও শিক্ষা উভয়ই লাভ করা যায়। কাজেই দেখা যাইতেছে, ঔপন্যাসিকের আর একটি বিশেষ আবশ্যক সম্বলও সারা গ্র্যাণ্ডের ছিল,—তাঁহার মানব-চরিত্র-অধ্যয়নস্পৃহা অত্যন্ত বলবতী।

শৈশবের পর।

সারা গ্র্যাণ্ডের বয়স যখন সাত বৎসর মাত্র, তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার বালিকাহৃদয়ে সে শোক বড়ই লাগিয়াছিল। পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আয়ারল্যাণ্ড-বাসও শেষ হইয়া গেল; বিধবা জননী সন্তানদিগকে লইয়া ইংলণ্ডের একটি সাগরতীরবর্ত্তী ক্ষুদ্র সহরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই সময় সারা গ্র্যাণ্ডের শিক্ষা বড়ই অনিয়মে সম্পন্ন হইয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী নিয়মিত পাঠে ব্যস্ত থাকিতেন, আর তিনি যে পুস্তক পাইতেন, তাহাই পাঠ করিতেন। তাঁহার জননী

পাঠ ও রচনা।

সুশিক্ষিতা ছিলেন, তাঁহার অনেক পুস্তক ছিল; কাজেই দুহিতার পক্ষে পুস্তক পাইবার কোনও অসুবিধাই ছিল না। ঔপন্যাসিকদিগের মধ্যে স্কট, ডিকেন্স ও থ্যাকারের উপন্যাসপাঠেই বালিকার অধিক সময় অতিবাহিত হইত। প্রান্তর-ভ্রমণে, অশ্বারোহণে ও নৌকাবাহনে তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ হইত। সে সময়ের রচনার মধ্যে একাদশ বর্ষ বয়সে তিনি একটা সঙ্গীত রচনা করিয়া তাহাতে সুরসংযোগ করিয়াছিলেন।

গল্প বলিবার অভ্যাস।

এই সময় তাঁহার গল্প বলিবার খুব অভ্যাস ছিল। রাত্রিকালে দুই ভগিনী শয্যায় শয়ন করিবার পর সারা গ্র্যাণ্ড গল্প বলিতে আরম্ভ করিতেন। সে গল্প সুদীর্ঘ; রাত্রির পর রাত্রি, এইরূপে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, এমন কি, মাসের পর মাস বহিয়া যাইত, তথাপি গল্প সমাপ্ত হইত না। যত প্রকার ভীষণ ঘটনা থাকিতে পারে, তাহার প্রায় সকলই সেই গল্পে সন্নিবিষ্ট হইত; ভীতিপ্রদ ঘটনার প্রাচুর্য্যে শ্রোতার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিত। সারা গ্র্যাণ্ডের ভগিনী বলেন, তিনি আজও সে ধাক্কা সামলাইতে পারেন নাই। সারা গ্র্যাণ্ডের বালিকা-বয়স হইতেই গল্প বলিবার অভ্যাস ছিল।

বিদ্যালয় ও বিবাহ।

চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সারা গ্র্যাণ্ড প্রথম বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, সে বয়সে সাধারণতঃ বালিকারা নানা বিষয়ে যে শিক্ষা লাভ করে, সারা গ্র্যাণ্ডের তখনও তাহার কিছুই হয় নাই। ইহার দুই বৎসর পরেই তিনি সৈনিকবিভাগের এক জন কর্ম্মচারীকে বিবাহ করেন। বিবাহান্তে স্বামীর সহিত তিনি প্রাচ্য ভূখণ্ডে চলিয়া আইসেন; সিঙ্গাপুর, হংকং প্রভৃতি স্থানে বহুদিন অতিবাহিত করেন। তখন তিনি বিবাহিত জীবনের সুখ দুঃখ ও চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন; সে সময় তিনি অবসরমত ছোট গল্প লিখিতেন, কিন্তু তাহার অধিকাংশই দুর্ভাগ্যক্রমে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতেন। ইহার পর তিনি নানা মাসিকপত্রে ছোট ছোট গল্প লিখিতেন। তখন চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞান জন্মিয়াছে। রমণীদিগের কোনও বিষয় লইয়া একখানি উপন্যাস রচনার ইচ্ছা এই সময়েই তাঁহার মনে উদিত হয়,—তাহার ফলে Ideala গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়।

সমালোচনা সম্বন্ধে মতামত।

তাঁহার পুস্তকের সমালোচনা লইয়া সারা গ্র্যাণ্ডের মাথা ব্যথা নাই। তিনি বলেন যে, সময় সময় পুস্তকের এমন সমালোচনা হইয়া থাকে, যাহা পাঠ করিলে উপকারের সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু সেরূপ সমালোচনা নিতান্তই দুষ্প্রাপ্য। কাজেই সেরূপ সমালোচনার অনুসন্ধানে সময়ব্যয় করা অনাবশ্যক। তাঁহার মতে সমালোচনা সম্বন্ধে নিতান্ত উদাসীন হইয়া রচনা করাই ভাল; কারণ, সর্ব্বদা কিরূপ সমালোচনা হইবে এই ভয় করিলে, রচনা করা দুষ্কর হইয়া উঠে। তবে দুঃখের বিষয়, সারা গ্র্যাণ্ড এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্কল্প রক্ষা করিতে পারেন নাই। "ডেলী টেলিগ্রাফ্" পত্রে প্রকাশিত Beth Book গ্রন্থের সমালোচনা পাঠ করিয়া, নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, তিনি সেই সমালোচনার একটা জবাব লিখিয়া, কয়েকটি কথা বুঝাইয়াছেন।

মক্ষিকা-সমাচার।

আমরা সচরাচর যে সকল মক্ষিকা দেখিতে পাই, তাহারা সকলেই এক শ্রেণীর অন্তর্গত নয়; ইহাদের মধ্যে নানা বিভাগ আছে, এবং প্রত্যেকবিভাগভুক্ত মক্ষিকার কার্য্য ও আকার প্রভৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। গ্রীষ্মকালে প্রতিগৃহে যে জাতীয় মক্ষিকার আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য।

পতঙ্গ জাতির মধ্যে নানা বিভাগ আছে। প্রাণিতত্ত্ববিদ্গণ ইহাদের পক্ষসংখ্যার অনুসারে কতকগুলিকে দ্বিপক্ষ, এবং কয়েক জাতিকে চতুঃপক্ষ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। সাধারণ মক্ষিকা দ্বিপক্ষ শ্রেণীর অন্তর্গত। এই শ্রেণীর স্ত্রীমক্ষিকাগুলি ক্ষুদ্র জীবনে সাধারণতঃ চারি বার অণ্ড প্রসব করে; প্রত্যেক মক্ষিকার অণ্ডসংখ্যা প্রতি বারে প্রায় শতাধিকসংখ্যক হইতে দেখা যায়।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রসবের পর সন্তানপালনের জন্য মক্ষিকাকে অণুমাত্র কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। পুরীষময় দুর্গন্ধপূর্ণ স্থানে পূর্ব্বপ্রসূত অণ্ডগুলি বিনা যত্নে পরিণতি লাভ করিতে থাকে, এবং কয়েক দিবসের মধ্যেই ডিম্বভেদ করিয়া এক প্রকার ঈষৎ-দীর্ঘ বর্ত্তুলাকার কীট বহির্গত হয়। আবার এই কীট কালসহকারে যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইলে, তাহা হইতে সাধারণ মক্ষিকার পতঙ্গ উৎপন্ন হয়। মক্ষিকার সহিত ইহার আকারগত পার্থক্য লক্ষ্য করিলে, এই কীট হইতেই যে মক্ষিকার উৎপত্তি হয়, তাহা সহজে বিশ্বাস হয় না।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মক্ষিকা-কীট পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, ইহাদের শরীর কতকগুলি অঙ্গুরীয়াকার পদার্থে নির্ম্মিত। এই অঙ্গুরীয়-সংখ্যা সাধারণতঃ দ্বাদশটি থাকে। প্রথম অঙ্গুরীয়কে মস্তক; ও তাহার সহিত দুইটি অতিক্ষুদ্র ডিম্বাকার মাংসপিণ্ড সংলগ্ন থাকে। এই অবস্থায় মক্ষিকা-কীটের চক্ষু ইত্যাদি অপর কোনও ইন্দ্রিয় থাকে না। পূর্ব্বোক্ত পুরোবর্ত্তী অণ্ডাকার অংশ দ্বারা কেবল নিকটস্থ পদার্থ স্পর্শ করিয়া আহারাদি সম্পন্ন করে। পাঠকপাঠিকাগণ দেখিয়া থাকিবেন, এই জাতীয় কীটমাত্রই সর্প প্রভৃতি পদহীন সরীসৃপের ন্যায় বুকে হাঁটিয়া চলা ফেরা করে; মক্ষিকা-কীটের গতিবিধির ব্যবস্থা প্রায় তদ্রূপ। ইহাদের শরীরাবরণের দ্বিতীয় অঙ্গুরীয়কে দুইখানি অতি ক্ষুদ্র পদ সংলগ্ন থাকে; কিন্তু এই পদযুগলের অনুপাতে শরীর অত্যন্ত বৃহৎ বলিয়া, গমনাগমন কার্য্যে ইহারা পদের বিশেষ সাহায্য পায় না।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, পূতিগন্ধময় স্থানে গলিত পদার্থ আহার করিয়া কীট সকল বর্দ্ধিত হইলে, কয়েক দিবসের মধ্যে, তাহারা অঙ্গুরীয়াবরণ ভেদ করিয়া, সাধারণ মক্ষিকারূপ প্রাপ্ত হয়। মক্ষিকাশাবক এই প্রকারে আবরণনির্ম্মুক্ত হইয়াই শরীরস্থ বায়ুকোষ হইতে বায়ুনিষ্কাশন করিয়া, আপনাদের পক্ষযুগলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নলিকাগুলি বায়ুপূর্ণ করিতে থাকে। এই উপায়ে পক্ষদ্বয় কিঞ্চিৎ লঘু হইয়া উঠিলেই, দুই চারি বার পক্ষ আন্দোলন করিয়া, ইহারা জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যগুলির সূত্রপাত করিতে থাকে।

পতঙ্গ ও অপরাপর প্রাণীদিগের শারীরিক গঠনাদি বিষয়ে অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়; তন্মধ্যে অস্থিসংস্থানের পার্থক্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অধিকাংশ জীবের অস্থিই চর্ম্মাবরণের মধ্যে মাংসের সহিত জড়িত থাকে, কিন্তু পতঙ্গশরীরের অভ্যন্তরে প্রায়ই অস্থি দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদের দেহের উপরিভাগে যে কঠিন আবরণ দৃষ্ট হয়, তাহাই পতঙ্গ-শরীরে এককালে চর্ম্ম ও অস্থির কার্য্য সম্পাদন করে। মক্ষিকাদেহের এই অস্থিময় আবরণ কেবল একই পদার্থে নির্ম্মিত নয়। বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, এই কঠিন আবরণে তিনটি পৃথক পৃথক স্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রথম স্তরটি একপ্রকার স্বচ্ছ পদার্থে নির্ম্মিত। মক্ষিকার সর্ব্ব গাত্র ও পক্ষদ্বয় কেবল এই উপাদানে গঠিত। ইহাদের পক্ষযুগলে যে শিরাময় অস্বচ্ছ রেখা দৃষ্ট হয়, বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলেন, কেবল উক্ত স্বচ্ছপদার্থ পক্ষের স্থানে স্থানে ঘনীভূত হইয়া তাহা উৎপন্ন করে। মক্ষিকাদেহাবরণের দ্বিতীয় স্তরটি তন্নিম্নস্তরের সহিত প্রায়ই

দৃঢ়রূপে আবদ্ধ থাকে; এই জন্য এ উভয় একই স্তর বলিয়া অনেক সময় ভ্রম হয়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। ঊর্দ্ধতন স্তরটি প্রায়ই এক প্রকার রঞ্জিত উপাদানে নির্ম্মিত; ভ্রমরের ঘোরকৃষ্ণ শরীর ও মক্ষিকার ঈষৎপাটল অঙ্গ, উল্লিখিত দ্বিতীয়স্তরস্থ বিশেষ বর্ণ দ্বারা উৎপন্ন হয়।

মক্ষিকার মুখাকৃতি কিছু নূতন ধরণের। পিপীলিকা প্রভৃতি কীটের ন্যায় ইহারা দংশন বা কোনও কঠিন দ্রব্য ভক্ষণ করিতে পারে না। যে সকল পদার্থ তরল, বা যাহা ঈষৎ লালার সংযোগে দ্রব হইয়া যায়, তাহাই ইহাদের আহার্য্য। এই সকল দ্রব্যে হস্তিশুণ্ডাকার একটি হুল প্রবেশ করাইয়া দিয়া মক্ষিকা সকল আহার্য্য টানিয়া উদরসাৎ করে। শুণ্ডাকার অঙ্গটির দৈর্ঘ্য নির্দ্দিষ্ট করা যায় না, মক্ষিকা সকল যথেচ্ছ ইহার হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারে।

প্রকৃতির শিল্পনৈপুণ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা নৈসর্গিক ঘটনায় প্রতিনিয়তই আমাদের নয়নগোচর হইতেছে; অতি সূক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদণু হইতে অনন্ত গ্রহনক্ষত্রখচিত বিশাল আকাশমণ্ডল পর্য্যন্ত সকলই প্রকৃতিদেবীর অলৌকিক শিল্পচাতুর্য্যের নিত্যপরিচায়ক। ক্ষুদ্র মক্ষিকার অতিক্ষুদ্র চক্ষুর নির্ম্মাণ-ব্যাপার ইহার আর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পাঠকপাঠিকাগণ, বোধ হয়, অবগত আছেন, প্রাণিচক্ষুমাত্রেরই গঠনকৌশল অতি সুনিয়ন্ত্রিত। যেমন ফেটোগ্রাফ যন্ত্রে একখানি স্থূলমধ্য কাচ দ্বারা যন্ত্রের মধ্যস্থ পরদায় বাহ্য পদার্থের নিখুঁত ছবি পাতিত করা যায়, চক্ষেও সেই প্রকার এক খণ্ড স্থূলমধ্য স্বচ্ছকোষ (crystaline-lens) আছে, এবং ঠিক তাহারই পশ্চাদ্ভাগে একখানি স্নায়ুব্যাপ্ত পরদা থাকে। ফটোগ্রাফ যন্ত্রের ছবির ন্যায় দর্শনীয় বাহ্য পদার্থের ছবি সেই স্নায়ুময় পরদায় পতিত হইলে, স্নায়ু ও মস্তিকের যোগে দর্শন-জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। সাধারণ প্রাণিদেহে এই প্রকার সুব্যবস্থিত দুইটি চক্ষু দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়া থাকেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রত্যেক মক্ষিকার মস্তকে উক্তরূপ চারি হাজার চক্ষু সংলগ্ন আছে, এবং এতদ্ব্যতীত ইহাদের ললাটদেশে আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু দৃষ্ট হয়। পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এই অসংখ্য মক্ষিকাচক্ষুগুলির মধ্যে একটিও দর্শনকার্য্যের উপযোগিতা বা গঠনকৌশলে মানবচক্ষু অপেক্ষা অণুমাত্র হীন নহে।

সাধারন জীবমাত্রেরই দেহস্থ স্নায়ুমণ্ডলী মস্তিকের এক নির্দ্দিষ্ট অংশে আসিয়া মিলিত হয়; এই জন্য মস্তিকস্থ স্নায়বিক কেন্দ্রে কোনও প্রকার

আঘাত প্রদান করিলে, বা মস্তক দেহচ্যুত হইলে, তৎক্ষণাৎ জীবের প্রাণ-বিয়োগ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। মক্ষিকাদেহে কেবলমাত্র মস্তিষ্কেই স্নায়বিক কেন্দ্র থাকে না; সাধারণতঃ ইহাদের মস্তক ও দেহের মধ্যাংশ, এই দুই স্থানে দুইটি পৃথক স্নায়বিক কেন্দ্র দৃষ্ট হয়; এই জন্য মক্ষিকামস্তক শরীর-চ্যুত করিলেও, হঠাৎ ইহাদের মৃত্যু ঘটে না; বিচ্ছিন্ন অংশদ্বয়ে যে পৃথক পৃথক স্নায়বিক কেন্দ্র থাকে, তদ্দ্বারা জীবনীশক্তি কিয়ৎকাল অপ্রতিহত থাকে। এতদ্ব্যতীত মক্ষিকাশরীরে রক্তসঞ্চালনগতি অতীব মন্থর বলিয়া শোণিত-শোষক অক্সিজেন বাষ্প সর্ব্বদাই প্রচুরপরিমাণে দেহে সঞ্চিত থাকে। মক্ষিকার আঘাতসহিষ্ণুতার ইহা অন্যতম কারণ।

মক্ষিকার শ্বাসকার্য্যের যে ব্যবস্থা আছে, অপর পার্থিব জীবে তাহা প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। শ্বাসকার্য্যের জন্য অপর প্রাণিদেহে যেমন এক একটি যন্ত্র নির্দ্দিষ্ট থাকে, ইহাদের তদনুরূপ কোনও ব্যবস্থাই নাই। মক্ষিকাদেহের সর্ব্বাঙ্গে কতকগুলি সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ আছে, তদ্দ্বারা বায়ু শরীরপ্রবিষ্ট হইয়া শ্বাসকার্য্য শ্বাসসম্পন্ন করে। যাহাতে ধূলিকণা প্রভৃতি সূক্ষ্ম পদার্থ ছিদ্রপথে পতিত হইয়া কার্য্যের ব্যাঘাত উৎপাদন করিতে না পারে, ছিদ্রপথে তাহারও সুব্যবস্থা আছে।

মক্ষিকার পদযুগলের নির্ম্মাণকৌশলও বিস্ময়কর। পাঠকপাঠিকাগণ অবশ্যই দেখিয়াছেন, মক্ষিকারা কাচ প্রভৃতি অতিমসৃণ পদার্থের উপর স্খলিতপদ না হইয়া, যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া থাকে। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ বহু অনুসন্ধান ও পরীক্ষায় মক্ষিকার অনায়াসবিচরণের কারণ আবিষ্কৃত করিয়াছেন। পণ্ডিতগণ বলেন, পিচ্ছিল স্থানে বিচরণকালে ইহাদের পদপ্রান্ত হইতে এক প্রকার লালা নির্গত হইয়া পদযুগল যে কোন স্থানে সংলগ্ন করিয়া রাখে; এতদ্ব্যতীত ইহাদের পদের নিম্নদেশ কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কেশবৎ পদার্থে আবৃত থাকে, তদ্দ্বারাও এই কার্য্যের কতকটা সহায়তা হয়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। মাঘ। প্রথমেই শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "শ্রীপঞ্চমী" ;—দীনেন্দ্র বাবুর নিজের পুরাতন ছাঁচে ঢালা একখানি পল্লীচিত্র। বঙ্গীয় পল্লীর বিচিত্র উৎসব, পল্লীবাসীর ক্ষুদ্র বৃহৎ বিবিধ সুখ দুঃখ যে সাহিত্য-চিত্রের বিষয়ীভূত, সে বিষয়ে কোনও বিজ্ঞতম সম্পাদকের সহিত এই অজ্ঞতম লেখকের অণুমাত্র মতভেদ নাই। নিরীহ নগরবাসীর পুরদণ্ডপীড়িত ক্ষুধিত নয়নে জননী জন্মভূমির স্নিগ্ধ শ্যামল সৌম্য ছবি যে সম্পূর্ণ অভিনব ও সমধিক প্রীতির পদার্থ, এ বিষয়েও বোধ করি প্রমাণ উপস্থিত করিবার আবশ্যক অল্প। কিন্তু চিত্রের বিষয় যতই মনোজ্ঞ হউক, সুচিত্রিত না হইলে আক্ষেপের অবকাশ ঘটে। দীনেন্দ্র বাবুর প্রথম-রচিত চিত্রগুলির প্রত্যগ্র মাধুর্য্য, মনোরম বর্ণবিন্যাস, তাঁহার শেষ চিত্রমালায় সুলভ নহে। সৌন্দর্য্যসৃষ্টির মধ্যেই নব নব ভাববিকাশের আশা করা যায়। নিপুণ শিল্পী যদি পুরাতন সৌন্দর্য্যশূন্য 'চিত্র বস্তু'র নূতন অঙ্গরাগ করিয়া জাঁকাল ফ্রেমে বাঁধাইয়া সাধারণের সমক্ষে উপনীত করেন, তাহা বর্ণপ্রিয় বালকের নেত্ররঞ্জন করিতে পারে ; কিন্তু সৌন্দর্য্য-পিপাসীর চিত্তরঞ্জনের পক্ষে বর্ণবৈচিত্র্যমাত্রই পর্য্যাপ্ত নহে। সে জন্য অভিনব সৃষ্টি, ভাববিশেষের অভিব্যক্তি, প্রকৃতির সহিত সঙ্গতি প্রভৃতি বহুতর বিষয়ে শিল্পীর অবধান আবশ্যক। নিপুণ চিত্রকর দীনেন্দ্র বাবু ক্রমাগত নিজের পূর্ব্বসৃষ্টির পুনরাবৃত্তি ও অন্ধ অনুকরণ না করিয়া নূতন ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করেন, ইহাই আমাদের অভিপ্রেত। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "স্বাগত ও বিদায়" দুইটি গান, কবিতারূপে প্রকাশিত হইয়াছে। "স্বাগত" সুন্দর, কিন্তু "বিদায়" অকিঞ্চিৎকর। শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মিত্রের "হিমালয়ে" দার্জ্জিলিং ভ্রমণের বিবরণ, সুখপাঠ্য ; কিন্তু ভাষা গ্রাম্যতাদোষে অত্যন্ত দুষ্ট। লেখকের হাস্যরসসমাবেশের অত্যন্ত প্রয়াস অনেক স্থলেই বিফল হইয়াছে। রহস্যরচনা যেমন পাঠকদের, তেমনই লেখকদের পক্ষেও প্রলোভন-স্বরূপ ; ধর্ম্মশাস্ত্র বলেন, প্রলোভন জয় করিবে। আর সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রও বলিয়া গিয়াছেন, হাস্যরসরচনা কিছুদিন ফেলিয়া না রাখিয়া ছাপাইও না। উভয় উপদেশই অমূল্য ও অবশ্যপ্রতিপাল্য মনে করি। শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "চন্দ্র" পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্যোতিষশাস্ত্রীয় প্রবন্ধ। কিন্তু সাধারণের পক্ষে আয়ত্ত করা সহজ নহে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের "মীর কাসিম" দশম পরিচ্ছেদ এবার প্রকাশিত হইয়াছে। "স্বরলিপিতে" শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর গানটি উচ্চভাবে অনুপ্রাণিত। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী "পাণ্ডারপুর" প্রবন্ধে 'বোম্বাই অঞ্চলের সর্ব্বপ্রধান তীর্থস্থানের' বিবরণ দিয়াছেন। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বাভাবিক ভ্রমণরচনানৈপুণ্য 'পাণ্ডারপুরেও' প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। বিবিধ দ্রষ্টব্য বিষয়ের, দেশের ও দেশবাসীর, নিজের ও সঙ্গীর বিবিধ ঘটনার সমাবেশে ভ্রমণবৃত্তান্তটি মনোরম। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "হাসির গানে" 'মধুরে সমাপ্তি'।

ভারতী। ফাল্গুন। "বসন্ত-বন্দনা" শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রচিত কবিতা। বসন্তের বন্দনা নহে, বর্ণনা। "প্রফুল্লমুখী" শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের রচনা। লেখক বলিতেছেন, "দেবী চৌধুরাণী যখন প্রথম পড়ি, তখন উপন্যাসের গল্পাংশ ও প্রফুল্লমুখীর মধুময় চরিত্র বড় মধুর বোধ হইতেছিল ; কিন্তু দেবী যে নিষ্কাম ধর্ম্মের আদর্শ, এ বিষয়ে মনে কেমন একটু খট্‌কা লাগিয়াছিল। * * * সাধারণকে জানাইলে এই খট্‌কার একটা মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা,

এই আশায় এই প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি।" লেখকের আশা সফল হউক। প্রবন্ধটি সুচিন্তিত ও সুরচিত। এই প্রবন্ধের আর একটু বিশেষত্ব আছে, তাহার উল্লেখ আবশ্যক। উপসংহারে লেখক বলিতেছেন, "মহাকবির কাব্যে যে সকল অসঙ্গতি, অসম্পূর্ণতা, অসামঞ্জস্য প্রথম দৃষ্টিতে লক্ষিত হয়, তাহা অনেক স্থলে সমালোচকের বুদ্ধি ও বিবেচনার দোষে, কাব্যের ত্রুটিবশতঃ নহে। গ্রন্থকার মহাকবি, তাঁহার গ্রন্থ মহাকাব্য। ঘোলা জলে সূর্য্যের মলিন প্রতিবিম্ব হয়। সেটা কি সূর্য্যের দোষ, না জলের দোষ?" প্রবন্ধটির আদ্যন্ত এইরূপ বিনয়ে সিক্ত। অকারণে বা অল্প কারণে বঙ্কিম বাবুকে গালি দেওয়া আজকালকার 'ফ্যাশান্' বলিলেও চলে। হীরেন্দ্র বাবুও অনায়াসে বঙ্কিম বাবুকে দুই চারিটি পুষ্পাঞ্জলি দিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহার পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান রচনায় যেরূপ শান্ত সংযম ও মধুর বিনয়ের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালী বাক্যবাগীশগণের দৃষ্টান্তস্থল। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল শীল "দেশ বিদেশ" প্রবন্ধে "রামটেক" নামক মধ্যভারতের 'একটি পবিত্র হিন্দুতীর্থে'র পরিচয় দিয়াছেন। রচনাপ্রণালীর দীনতায় প্রবন্ধটির সৌন্দর্য্যহানি হইয়াছে। "শীতলা ষষ্ঠী" শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রচিত পল্লীচিত্র। "কোকিল ও বিরহিণী" শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির গান। "দুইটি শঙ্খ" শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসুর রচিত একটি চলনসই গল্প। গল্পরচনায় লেখকের প্রবণতা আছে। আশা করি, তাঁহার সাধনা সফল হইবে। "বিশ্বাসে সন্দেহে" অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত একটি কবিতা। সুপরিচিত শব্দমালায় গ্রথিত এই বাঙ্গলা কবিতাটির অর্থ-গ্রহণ করিতে ও উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া আমরা প্রথমে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া মনে মনে নিজ বুদ্ধির প্রতি অনেক দোষারোপ করিয়াছিলাম। কিন্তু পরে জানা গেল, আমার মত অনেকেই ইহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারেন নাই। বিধাতা "বিশ্বাসে সন্দেহে"র তুল্য কবিতা বুঝিবার শক্তি না দিন, আশ্বাস দিতে কুণ্ঠিত নহেন; সুতরাং আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি।

মুকুল। মাঘ। "শিশুর আকাঙ্ক্ষা" একটি ক্ষুদ্র কবিতা। "স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস" একটি সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত। লেখক বলেন, "বাল্যাবস্থাতেই দুর্গামোহনের কয়েকটি গুণ দেখা গিয়াছে, প্রথম পাঠে মনোযোগ। * * * তাঁহার দ্বিতীয় একটি গুণ এই ছিল যে, তাঁহার অবস্থা ভাল, নিজের পিতা ও খুড়া বড়মানুষ, এ জন্য তাঁহার একটুও অহঙ্কার ছিল না। * * * তাঁহার তৃতীয় একটি গুণ ছিল যে, তিনি পরদুঃখকাতর ছিলেন।" উত্তরকালে স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের চরিত্রে এই সকল গুণ বিকশিত হইয়াছিল। দুর্গামোহন বাবুর চিত্রখানি অতি সুন্দর হইয়াছে। "পার্লামেন্ট দর্শন" প্রবন্ধটি মনোরম ও বালক পাঠকদের উপযোগী। এই প্রবন্ধে পার্লামেন্টের দুইখানি ছবি আছে। "কানপুর" প্রবন্ধে কানপুরের বর্ণনাপ্রসঙ্গে সিপাহী-বিদ্রোহের একটু ইতিহাস আছে। এই প্রবন্ধের "স্মৃতিচিহ্নের" ছবিটি সুন্দর। "সূর্য্য-গ্রহণ" প্রবন্ধটি উৎকৃষ্ট। লেখক সহজ ভাষায় ও গল্পচ্ছলে গ্রহণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়া, অবশেষে তিনখানি চিত্রের সাহায্যে বিগত সূর্য্যগ্রহণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

মুকুল। ফাল্গুন। "ব্রাডল, ব্রাইট ও ফসেট" প্রবন্ধে উক্ত তিন জন ভারতহিতৈষীর জীবনচরিতব্যাখ্যার চেষ্টা আছে; সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে তিন জনের একজনকেও লেখক চিত্রিত করিতে পারেন নাই। ব্রাডল ও ব্রাইটের ছবি দুইখানি জঘন্য, ফসেটের ছবিখানি মন্দ নহে। "রাক্ষসের দেশে" আন্দামানের নামমাত্র বিবরণ আছে। আন্দামান দ্বীপের নাম শুনিয়া যে কৌতূহল উদ্দীপিত হয়, পড়িয়া তাহার তৃপ্তি হয় না। আন্দামানের আদিম অধিবাসীদের ছবিখানির ছাপা বড় অস্পষ্ট। "জগুনের গল্প" মন্দ নয়। "অতিবুদ্ধি" একটি রহস্য-কবিতা। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, লেখকের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে।

উৎসাহ। কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ দুই পৃষ্ঠায় "উপন্যাসের উপযোগিতা" প্রতিপাদিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়ের "জগৎ শেঠ" নামক ঐতিহাসিক প্রবন্ধটি বেশ হইতেছে। "বিহঙ্গমের উপকারিতা" শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বিশ্বাসের রচনা। প্রবন্ধটি মনোজ্ঞ ও জ্ঞাতব্য তত্ত্বে পূর্ণ। শ্রীযুক্ত শশধর রায়ের "নর বানর" একটি সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ।

উৎসাহ। পৌষ। শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের "এডিটার" একটি চলনসই নক্সা। "জুনিয়ার উকীল" একটি পদ্য—পাঁচালীর ছড়ার সঙ্গেও তাল পায় না,—তাহার উদ্ধৃত আনিতেও প্রবৃত্তি হয় না। হায় কষ্টকল্পিত রহস্যরচনা! "জুনিয়ার উকীল" হাস্যরসের উদ্রেক করিতে না পারুন, তাঁহার কল্যাণে "উৎসাহ" হাস্যভাজন হইয়াছেন।

উৎসাহ। মাঘ। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের "বাঙ্গালা ভাষার লেখক" প্রবন্ধটি আমরা আগ্রহসহকারে পাঠ করিয়াছি,—কিন্তু এই নিবন্ধের প্রতিপাদ্য কি, তাহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। অক্ষয় বাবু পাঠকের পক্ষে বলিতেছেন,—"অন্যান্য সুন্দর বস্তুর ন্যায় সুন্দর সাহিত্যকে ও বাঙ্গালী সমাদর করে না;—ইহার প্রমাণ চাহ ত একবার শিক্ষিত বাঙ্গালীর গৃহসজ্জার মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখ,—গৃহস্বামীর যেরূপ রুচি তদনুরূপ দুই চারি খানি ইংরাজী সাহিত্য দেখিতে পাইবে। তাঁহার বিশ্বাস, বাঙ্গলা সাহিত্যে কিছু নাই; কেবল সেই জন্যই বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার রুচি হয় না!" অনেক তথাকথিত 'শিক্ষিত বাঙ্গালীর 'গৃহসজ্জার মধ্যে অনুসন্ধান' করিয়াছি, দুর্ভাগ্যক্রমে দুই চারিখানি কলেজপাঠ্য কেতাবের ছিন্নাবশেষ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাই নাই। সাড়ে পনের আনা শিক্ষিত বাঙ্গালীর ঘরে সাহিত্যের সম্পর্কও নাই, আমাদের এই সংস্কার। ইহা বোধ করি অতিরঞ্জিত অত্যুক্তি নহে। বাঙ্গালীর অধ্যয়নানুরাগ সুপ্রসিদ্ধ।—নূতন করিয়া তাহা প্রমাণিত করিবার চেষ্টা বাক্যের অপব্যয়মাত্র!

পুণ্য। মাসিকপত্র ও সমালোচন। শ্রীমতী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ১ম হইতে ৪র্থ সংখ্যা পর্য্যন্ত। আমরা সাদরে "পুণ্যের" আবাহন করিতেছি। সম্পাদিকা এক সময়ে "সাহিত্যে" আমাদের সাহায্য করিতেন; বহুদিন তাঁহাকে সাহিত্যক্ষেত্রে না দেখিয়া আমরা দুঃখিত ছিলাম। সম্প্রতি তাঁহাকে এই নূতন ব্রতে দীক্ষিত হইতে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। আশা করি, তিনি অবলম্বিত ব্রতে সাফল্য লাভ করিবেন। এই তিন সংখ্যা "পুণ্য" দেখিয়া মনে হয়, আমাদের আশা বিফল হইবে না। 'সূচনায়' উল্লিখিত হইয়াছে, "পূর্ব্বাবধি এই নামেই ইহা আমাদের গৃহে পরিচালিত হইত, এবং হস্তযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া আমাদের আপনাদের মধ্যেই প্রকাশিত হইত। এখন তাহা লোকহিতার্থে জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশিত হইল; * * * এই পত্রে জনসমাজের উপযোগী সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, সঙ্গীত প্রভৃতি নানাবিষয়ক প্রবন্ধই স্থান লাভ করিবে। এতদ্ভিন্ন ইহাতে গৃহস্থের এবং মানবমাত্রেরই সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন আহারের বিষয় প্রতি মাসেই থাকিবে। ইহাতে গার্হস্থ্যধর্ম্মের অনুকূল শিল্পবিদ্যা প্রভৃতিরও অভাব দূর করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা যাইবে।" এ দেশে গার্হস্থ্য 'পারিবারিক' পত্রের অভাব আছে। "পুণ্যের" উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হইলে, সে অভাব দূর হইবে। প্রথম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "তর্পণতত্ত্ব" ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "রমণীর মাতৃত্ব" পুণ্য-প্রবৃত্তির উদ্বোধক উপযোগী প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বালক তানসেন" সুখপাঠ্য। দ্বিতীয় সংখ্যায় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মনুসংহিতা ও মাতৃভাব" উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ,—আলোচনার [illegible]

[illegible] পূর্ব্বপ্রকাশিত "[illegible]

প্রবন্ধেরই অনুবৃত্তি। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উল্লিখিত প্রবন্ধগুলি আমাদিগের ভাবে পরিপূর্ণ;—'সাহেবিয়ানা'র বিপরীত, কিন্তু 'আর্যামি' নহে। এ বিষয়ে ক্ষিতীন্দ্র বাবুর সমুদায় বক্তব্য সমাপ্ত হইলে, আমাদের বিস্তারিত আলোচনার সঙ্কল্প রহিল। ৪—৫ সংখ্যা। শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্করের রচিত "মহারাষ্ট্রীয়গণের ধর্ম্মোন্নতি" নামক সন্দর্ভটি মনোযোগ্য। এই প্রবন্ধে দেউস্কর মহাশয়ের মৌলিকতা ও চিন্তাশীলতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া, এই সন্দর্ভের অঙ্গহানি করিব না;—পাঠকগণ অভিনিবেশসহকারে আদ্যন্ত পাঠ করিলে, 'মহারাষ্ট্রীয়গণের ধর্ম্মোন্নতি'বিষয়ে অনেক অভিনব ও শিক্ষণীয় তত্ত্ব অবগত হইবেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর "সেনরাজগণের ইতিহাস" গবেষণাপূর্ণ প্রত্নতত্ত্ব। এই প্রবন্ধে লেখক পুরাতন মতের প্রতিবাদ ও নূতন মতের সংস্থাপন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর "কমলালেবু" প্রবন্ধে 'কমলা ও আরেঞ্জ প্রভৃতি দেশীয় ও বিদেশীয় নামগুলি কোথা হইতে আসিল, কেনই বা আসিল, কোথায় বা তাহাদের জন্মস্থান', দক্ষতাসহকারে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। "পুণ্যের" আর একটি বিশেষত্ব—আহারের ব্যবস্থা।—চন্দ্রকলা বা চন্দ্রকান্ত মেঠাই, বাগদা চিংড়ীর কট্‌লেট্, মেটের দোপেঁয়াজা, রামমোহন পোলাও, রুই মাছের ঘণ্ট প্রভৃতি সুপশাস্ত্রীয় প্রবন্ধগুলি চিত্তাকর্ষক,—মুখরোচক। এই 'পাউডার' ও 'রুজ্', 'বডিস্' ও 'ব্রুচ্', 'ফ্যান' ও 'ফ্যাশনে'র দিনে 'বামুনঠাকুর'ই অনেকের ভরসা।—এ অবস্থায় কাগজপত্রে "রুই মাছের ঘণ্ট" দেখিলেও আমরাও সন্তুষ্ট! এই প্রবন্ধগুলির সফলতা সম্বন্ধে প্রথমে আমাদের সন্দেহ ছিল;—কিন্তু এক্ষণে হরিদ্রারঞ্জিত ছিন্ন ভিন্ন "পুণ্য" দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি,—রান্নাঘরেও "পুণ্য" প্রবেশলাভ করিতেছে! পরিশেষে আমাদের অনুরোধ এই যে, সম্পাদিকা "পুণ্যকে" নিরবচ্ছিন্ন 'পারিবারিক' পত্রে পরিণত করুন। গৃহস্থের মানসিক উন্নতির জন্য যেমন নারীজাতির বিষয়ে আলোচনা চলিতেছে,—তেমনই পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের অনুকূল শিশুপালন, শুশ্রূষা প্রভৃতি বিষয়েও আলোচনা চলুক।

প্রদীপ। মাঘ। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের "আত্মবিবাহ" প্রবন্ধটি উৎকৃষ্ট। এই প্রবন্ধে চন্দ্র বাবুর একখানি চিত্র আছে। শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "মূক-বধিরের শিক্ষা" নামক প্রবন্ধটি সকলের পাঠ করা উচিত। "অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতি" কবিতাটি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা। এই অকিঞ্চিৎকর কবিতাটি কবিবর রবীন্দ্রনাথের যোগ্য হয় নাই। "অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু" নামক প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য; কিন্তু ইংরেজি কোটেশনে অত্যন্ত কণ্টকিত।

প্রদীপ। ফাল্গুন। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "কসীরাম পালের বক্তৃতা" একটি রঙ্গরচনা; লেখক অত্যন্ত ফেনাইয়া অতিবিস্তৃত করিয়া, কসীরামের বক্তৃতাকে শেষে পাঠকের পক্ষে দুর্বিষহ করিয়াছেন। "স্বাধীন ও পরাধীন নারীজীবন" চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। লেখিকার মতে, হিন্দু নারীদের অবনত "অবস্থার প্রথম ও প্রধান কারণ,—সম্পূর্ণরূপে অবরোধপ্রথা ও পরনির্ভরতা।" যে সকল সমাজে রমণী স্বতন্ত্রা ও আত্মনির্ভরশীলা, সেখানে কি স্ত্রীজাতির যথেষ্ট দুর্দ্দশা দেখা যায় না? আমাদের স্ত্রীজাতির অবস্থা অনেক অংশে শোচনীয় সে পক্ষে সন্দেহ নাই;—কিন্তু স্বদেশী চশমা ফেলিয়া দিয়া বিলাতী চ চোখে তাহার কার্য্যকারণপরম্পরা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিলে, অনেক প্রকৃত শোচনীয়তা অতিরিক্তমাত্রায় বড় দেখাইতে পারে। যাহা হউক, এ বিষয়ের আলোচনায় যথেষ্ট শুভফলের আশা করি।